অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত ও সম্পাদিত

জুল ভের্ন

রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

জুল ভের্ন রচনাবলী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ অদ্রীশ বর্ধন

প্রথম খণ্ড

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

□ □ □

প্রথম রচনাবলী প্রকাশ : ফাল্গুন, ১৩৬০

দ্বিতীয় প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬১

তৃতীয় সংস্করণ : পৌষ, ১৩৬৪

প্রকাশক : ময়ূখ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : ষোল টাকা

মুদ্রক : অজিত কুমার সামই

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

সূচিপত্র

□ □ □

॥ জুল ভের্ণ ॥

জন্ম নানতেস-য়ে, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮। পড়লেন আইন, হলেন সাহিত্যিক। আমেরিকা গেলেন ১৮৬৭ সালে। মারা গেলেন অ্যামিয়েন্সয়ে; ২৪শে মার্চ, ১৯০৫।

ভূমিকা

ফিদ্যো দ্বীপ, নানতেস ফ্রান্স।

ঘাড় গুঁজে লিখছে ছোট্ট একটি ছেলে—"অজানা অদ্ভুত বিস্ময় ঘেরা জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে চাই আমি। মানুষের চাইতেও ঢ্যাঙা পালকওয়ালা রহস্য-ধূসর জঙ্গল, তালগাছ আর লাল-নীল পাখী থাকবে সেই সব জায়গায়—থাকবে অনাবিষ্কৃত পর্বত-গহ্বর, গুপ্ত-সুড়ঙ্গের গোলক-ধাঁধা, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রহস্যময়তা।"

আরেকদিন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল ছেলেটি। সমুদ্রের আকাশ-প্রমাণ ঢেউ ফিদ্যো দ্বীপের সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাচ্ছে ছোট্ট ছেলেটিও। ঢেউয়ের নাগরদোলায় উঠে-নেমে-ঘুরে-দুলে সে পৌঁছোলো নামহীন কত দ্বীপে। কল্পনায় দেখল, যেন পাল খাটিয়ে নিয়েছে গাছের ওপর, পালতোলা গাছে বসে টহল দিয়ে ফিরছে পৃথিবীর সব কটা মহাসমুদ্রে।

বড় হয়ে এই ছেলেটিই বিশ্বকে উপহার দিলেন বিস্ময়কর গ্রন্থাবলী। চমকপ্রদ কল্পনা, দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার আর কৌতূহলোদ্দীপক ভবিষ্য-দর্শন দিয়ে গল্পের জালবোনার অপূর্ব মুন্সিয়ানা রাতারাতি তাঁকে পৌঁছে দিল খ্যাতির মধ্যগগনে। ডুবোজাহাজ, উড়োজাহাজ, ইলেকট্রিক ঘড়ি এবং আরো অনেক কিছুর ব্যবহারিক প্রয়োগ তখনো জনসাধারণের কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু ওঁর কল্পলোকের তত্ত্ববহুল আশ্চর্য বর্ণনা পড়ে মনে হল, আজ যা অসম্ভব, কাল তা সম্ভব। সায়ান্স-ফিকশন অর্থাৎ বিজ্ঞান-সুবাসিত কল্প-কাহিনীর জনকরূপে স্বীকৃতি পেলেন জুল ভের্ণ।

প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়ে রুটিনের মধ্যে প্রত্যেকেই চায় ক্ষণেকের জন্যেও মুক্তির শ্বাস ফেলাতে। পর্যটন আর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তাঁদের পলকের মধ্যে একঘেয়েমির মধ্যে থেকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে খোলামেলা প্রকৃতির আলয়ে; দৈনন্দিন দৃশ্য মুছে যায় চোখের সামনে থেকে—কলমের জাদুতে মনের পটে ভেসে ওঠে ভূগোলকের প্রত্যন্ত প্রদেশ, সমুদ্রের ধূ-ধূ বিস্তার, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের বিচিত্র নগরী, প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ মহাদেশে মানুষ আর প্রকৃতির আদিম বর্বরতা।

অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আমাদের প্রত্যেকের মনের গভীরে শেকড় চালিয়ে বসে আছে। ছোটোরা টেবিলের তলায় লুকিয়ে ভাবে জংলী হয়েছি, চেয়ার বেয়ে উঠে মনে করে পাহাড়ে উঠেছি; অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি বিশ্বজোড়া আকর্ষণের এ হল বহিঃপ্রকাশ। আদিম মানুষকে বাঁচতে হয়েছে দুঃসাহসকে সম্বল করে; সভ্যতার শৈশব থেকেই তাই আমাদের রক্তে নিহিত রয়েছে দুঃসাহসিকতার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। মরণ-পণ লড়াই, লোমহর্ষক পলায়ন অথবা রোমাঞ্চকর

অভিযানে অংশ না নিতে পারার ক্ষোভ মিটিয়ে নিই রোমাঞ্চ কাহিনীর পাতায় নিমগ্ন হয়ে।

ভ্রমণ আর অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া আরও একজাতের কাহিনীর মধ্যে মুক্তির স্বাদ পায় কর্মক্লিষ্ট মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছিল জড়বাদী বিজ্ঞান; কিন্তু আরো অনেক করণীয় ছিল। জুল ভের্ণ তা উপলব্ধি করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক কল্পনাসম্পন্ন আরো অনেকের মত উনিও বুঝেছিলেন, ট্রেন আর কলের জাহাজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিম্নতম ধাপমাত্র। শূন্যপথে পরিভ্রমণ এককালে ছিল আকাশ-কুসুমের পর্যায়ে; Montgolfier ভায়েরা যদিও হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন আকাশে ওড়া সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু ভের্ণ যখন 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' লেখেন বিমান-বিজ্ঞান তখন শৈশবাবস্থায়।

বিশাল ডানাওয়ালা মেশিনের ওড়া আর জেটের বিকট গর্জন আমাদের অন্তরে এখন আর শিহরণ জাগায় না। কিন্তু একশ বছর আগে বেলুনের আকাশ-বিহার দেখে জনগণ কি বিপুল হর্ষ অনুভব করতেন, তা উপলব্ধি করানো এ-যুগে বিলক্ষণ কঠিন। আকাশ-বিহারী বেলুনের উদ্দাম কল্পনার মধ্যে বিচিত্র রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছিলেন তখনকার মানুষ। বিংশ শতাব্দীতেও সে কাহিনী পড়ে রোমাঞ্চিত হন না, বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হন না—এমন ব্যক্তি খুব কমই আছেন।

যে-কোনো আন্দোলনে, আবিষ্কারে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা থাকেন। লাওনার্ডো দ্য ভিন্সির আঁকা উড়ন্ত মেশিনের ড্রইং সুবিদিত এবং আজও তা বিদ্যমান। তবে সাধারণতঃ দূর-দর্শকেরা পূর্বসূরীদের অবদান গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চান না; ভের্ণ সে-রীতির ব্যতিক্রম। বৈজ্ঞানিক প্রগতি ছাড়াও ভের্ণ অন্য বিষয়েও স্বপ্ন দেখতেন, কল্পনা করতেন। পৃথিবীকে দ্রুতবেগে একপাক ঘুরে আসা যায়, এই প্রতীতি তাঁর মধ্যে ছিল বলেই তিনি লিখেছিলেন 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ'। অনবদ্য এই কাহিনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত ভ্রমণের বিস্ময়। সারা ভূগোলকটা যেন ঘুরতে থাকে পাঠকের সামনে। ভারতবর্ষের সতী হওয়ার দৃশ্য, চীনদেশের বিস্ময়, আমেরিকার অ্যাডভেঞ্চার দ্রুত সঞ্চরমান সিনেমা দৃশ্যের মত দেখা যায় মনের মধ্যে। সারা পৃথিবীকে দৃশ্যপট করে এ-রকম সার্থক কাহিনী অন্য কোনো লেখক রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। দ্রুতগতি পর্যটনকে এ-ভাবে গল্পের মধ্যে এনে কাহিনীর মধ্যে গতি সঞ্চার করতে এমনভাবে বুঝি আর কেউ পারেন নি। কাহিনীটি অনন্য হয়েছে শুধু এই একটি কারণে।

রচনাশৈলী এবং রচনা সংখ্যা—দু'দিক দিয়েই অসাধারণ লেখক ছিলেন

জুল ভের্ন। প্রতি বছর তাঁর নতুন কাহিনীর বাহনে চেপে পাঠক-পাঠিকাবর্গ পাড়ি দিতেন বিশ্বের অজ্ঞাত বিস্ময়ের উদ্দেশে। প্রায় আশীটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি এবং পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর কেতাব পাওয়া যায়। বিশ্বের বর্ণনা দিতে প্রয়াসী হয়ে গহনতম অঞ্চলকেও কলমের ডগায় টেনে আনতে কসুর করেন নি তিনি। সমুদ্রের গভীরতা, মহাশূন্যের নৈঃশব্দ্য, ভূগর্ভের কেন্দ্রবিন্দু—কিছুই বাদ যায় নি তাঁর কল্পনার আওতা থেকে। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এ-সব অঞ্চলের বর্ণনা দেওয়া হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ; কিন্তু তিনি সে ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ব্যর্থ হয়েছিলেন, এমন কথা বলার কেউ আছে কি?

ভের্নের সফলতার একটা মন্ত্রগুপ্তি হল, পাঠককে তিনি পর্যটক বানিয়ে ছাড়েন। তাঁর গ্রন্থাবলী 'অত্যাশ্চর্য অভিযান লহরী' নামে পরিচিত। প্রতিটি গ্রন্থে তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন ব্রহ্মাণ্ডের নতুন নতুন স্থানে। ভ্রমণকে চোখের মণি করেছিলেন বলেই এ-জাতীয় গ্রন্থাবলী রচনা করে এতখানি খ্যাতিমান হয়েছিলেন তিনি।

'Les Voyages Extraordinary'-য়ের সিরিজের প্রথম উপাখ্যান হল 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন'। এ-গ্রন্থে তিনি শুধু কুশলী বিজ্ঞানী নন, দূরদ্রষ্টাও বটে।

'এ জার্নি টু দি সেণ্টার অফ দি আর্থ' প্রকাশ পেল ১৮৬৩ সালে। বিপুল-ভাবে অভিনন্দিত এ উপন্যাসটি তাঁর দুরন্ততম দুঃসাহসিক কীর্তি। তা সত্ত্বেও সমাদৃত হল কাহিনীটি এবং পাতায় পাতায় ছড়ানো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্ভার আহরণ করে চমৎকৃত হল তরুণ মহল। ভূ-কেন্দ্রের রহস্য আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু ভের্ন বর্ণিত দীর্ঘ পাতাল সুড়ঙ্গ, বিশাল সমুদ্র, প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ এবং আদিম অরণ্য পাঠকের অজ্ঞাতসারে তাঁকে পর্যটক বানিয়ে তোলে। তিনি শেখেন বিজ্ঞান এতদিন যা জেনেছে। তাছাড়াও তিনি শিখতে চান আরো অনেক কিছু যা একমাত্র বিজ্ঞানই জানাতে পারে। সংক্ষেপে, কৌতূহলের উন্মেষ ঘটে পাঠকের মধ্যে।

অনতিকাল পরেই ভের্ন লিখলেন 'এ জার্নি ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন'। কাহিনীটি মৌলিক হলেও গাণিতিক হিসেবে বোঝাই; পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে ভের্ন ভূরি ভূরি তত্ত্বের সমাবেশ করেছেন। পৃথিবীর উপগ্রহ পরিভ্রমণ যে অসম্ভব কিছু নয়, তা প্রমাণ করার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তবে এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর বিখ্যাত কাহিনী 'দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন'-য়ে চাঁদ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, ভের্নের উপরোক্ত কাহিনীটিতে তার অভাব ছিল। বছর সাতেক পরে লেখা 'রাউণ্ড দি মুন' লিখে অবশ্য

ভের্ণ সে ঘাটতি পূরণ করেন। 'রাউণ্ড দি মুন', 'এ জার্ণি ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন'-য়ের পরবর্তী কাহিনী। 'ডক্টর অক্সস এক্সপেরিমেণ্ট' এবং 'পারচেজ অফ দি নর্থ পোল'—এই দুটি উপন্যাসেরও গোড়াপত্তন ঘটে 'এ জার্ণি ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' উপন্যাসের মধ্যে।

১৮৬৭ সালে আবির্ভূত হল 'এ ফ্লোটিং সিটি।' সুবিখ্যাত 'গ্রেট ইস্টার্ণ' জাহাজে ভের্ণের আমেরিকা গমনের স্মৃতিচারণা নিয়ে লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এ-কাহিনীটি বিশেষভাবে মনে রেখে যায় ঐ কারণেই।

নিজের পালতোলা জাহাজ 'সেণ্ট মাইকেল'-য়ে বার কয়েক সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পর ১৮৭০ সালে ভের্ণ লিখলেন 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী।' অধিকাংশ সমালোচকের মতে এবং ভের্ণের নিজের মতেও এইটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই কাহিনীতে ভের্ণ শুধু নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বর্ণনাই দেন নি, সাবমেরিন নামক ডুবো-যান যে সত্যিই সম্ভবপর, অর্ধ শতাব্দী আগেই পাঠক-পাঠিকার মনে সে বিশ্বাস তিনি এনে দিয়েছিলেন। তিনি যে বর্ণনার সম্রাট এবং সমুদ্র যে তাঁর কত আপন, এই কাহিনীর টুকরো টুকরো ঘটনাচিত্রে তার নজীর মেলে। অদৃশ্য মহাদেশ আটলান্টিসের বর্ণনায় তাঁর কল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৮৭২ সালে ভের্ণ প্রকাশ করলেন তাঁর শ্বাসরোধী কাহিনী 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ।' অত্যন্ত দ্রুত ছন্দের এ-উপাখ্যানে বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবকাশ রাখেন নি ভের্ণ। দ্রুত ছন্দের কাহিনী রচনার মুন্সিয়ানা আরও একবার দেখিয়েছেন ভের্ণ 'মাইকেল ষ্ট্রগফ' উপন্যাসে। এক রুশীয় রাজদূতকে নিয়ে লেখা এ-উপন্যাস প্রকাশ পায় ১৮৭৬ সালে।

ভের্ণ নিজেই বলেছেন, ছেলেবেলায় 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' পড়তে ভালবাসতেন। পরবর্তী জীবনে রবিনসনদের নিয়ে অনেক উপন্যাস লিখেছেন উনি। 'রবিনসন ক্রুশো' ধারায় লেখা আরো জনপ্রিয় উপন্যাস 'মিষ্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড' প্রকাশ পায় তিনটি পৃথক খণ্ডে—'ড্রপড ফ্রম দি ক্লাউডস' 'অ্যাবানডন্ড্' এবং 'দি সিক্রেট অফ দি আয়ল্যাণ্ড'। ভের্ণের অন্যতম সেরা কাহিনী হল এই উপন্যাসটি, এবং এই গ্রন্থেই তিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির উপনিবেশ পত্তনের প্রতিভাকে যথোচিত সম্মানে ভূষিত করেছেন।

'নর্থ অ্যাণ্ড সাউথ' আমেরিকার গৃহযুদ্ধের গল্প; 'দি ফার কান্ট্রি' এবং 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস'—দুটো গল্পই উত্তর অঞ্চল নিয়ে লেখা; 'দি ভ্যানিস্ড্ ডায়মণ্ড' এবং 'দি স্টীম হাউস'—অদ্ভুত ঘটনাবলী, আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বর্বর প্রদেশের জীবন্ত বর্ণনা। গতানুগতিকতা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েও ভের্ণ কিন্তু কখনো হাস্যাস্পদ হননি—মুহূর্তের

বিস্ময়কে সঞ্জীবিত রেখেছেন পরবর্তী মুহূর্তে। 'দি ভ্যানিস্‌ড্‌ ডায়মণ্ড'-য়ে উনি দেখিয়েছেন একটা চোর অতিকায় কৃত্রিম হীরে নিয়ে আফ্রিকার মধ্য দিয়ে চম্পট দিচ্ছে। হীরেটি নকল, কিন্তু বিশেষজ্ঞরাও ধরতে পারেন নি কৃত্রিমতা। জিরাফ এবং অস্ট্রিচের সহায়তায় তস্কর মহাপ্রভু উধাও হচ্ছেন—অথচ একবারও কাহিনীকে অবিশ্বাস্য অবাস্তব বলে মনে হয়নি।

'দি বেগমস্‌ ফরচুন' উপন্যাসে ভের্ণ আগামীকালের আদর্শ নগরীর ছবি এঁকেছেন।

'হেকটর সারভাদাক' উপন্যাসে মহাশূন্যের বিশালতার বর্ণনা দেওয়ার পর থেকেই লেখা কমে আসে ভের্ণের। তাঁর স্বল্পবিদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে 'ক্লোভিস ডারডেনটর' এবং 'দি ট্রাইবুলেশন্‌স্‌ অফ এ চীনাম্যান'—শেষোক্ত কাহিনীটি এক চীনেম্যানকে নিয়ে। জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের ভুল যখন সে বুঝতে পারল, তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরূপে এ-দুটি উপন্যাস লেখেননি ভের্ণ। কিন্তু গল্প বলার জাদুতে এবং কৌতুকরসের সিঞ্চনে দুটিই সমানভাবে সুখপাঠ্য এবং রসোত্তীর্ণ।

নরওয়ে সম্পর্কে ভের্ণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল বলেই বোধকরি 'দি লটারী টিকিট'-এর মত সহজ গল্পেও অমন সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। 'দি চেজ অফ এ গোল্ডেন মেটিঅর' একটা অন্য জাতের গল্প। এর মধ্যে অবশ্য তিনি ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের এবং পৃথিবী নামক রঙ্গমঞ্চকে তিনি বিলক্ষণ জানেন। মানুষের প্রবৃত্তি যে ভাল হতে পারে, সে বিষয়ে অবিশ্বাসী ও উপহাসপরায়ণ হয়েই যেন এ-কাহিনী লিখেছেন ভের্ণ। 'ফর দি ফ্ল্যাগ', 'ফ্লোটিং আয়ল্যাণ্ড', 'রোবার দি কনকারার, 'দি মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড'-য়ে এমন যন্ত্রের কল্পনা করেছেন যা জল-স্থল-অন্তরীক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব। 'ফ্লোটিং আয়ল্যাণ্ড' অবশ্য এখনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন। 'ডক্টর অক্সস এক্সপেরিমেন্ট', 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড', 'সিক্রেট অফ উইলহেম স্টোরিজ', 'পারচেজ অফ নর্থ পোল' এবং 'অফ অন দি কমেট'—প্রতিটি উপন্যাসে তিনি ভিন্ন স্বাদের বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং তাঁর মৌলিক কল্পনাশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।

*　　*　　*　　*

ভের্ণের জন্ম নানতেস-য়ে ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখে। বাবার নাম পিয়েরি ভের্ণ। মায়ের নাম সোফিয়া। বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত আইনবিদ। ভের্ণ বাবার ইচ্ছাতেই প্যারিসে গিয়ে আইন পড়েন এবং ব্যারিস্টার হন। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ডুমাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ভের্ণ

লিখতে শুরু করেন ডুমাসের সঙ্গে মিলে মিশে, পরে একাই থিয়েটারের জন্যে লেখা ধরেন। ছন্দ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকটা গীতিনাট্য *'থিয়েটার লিরিক'-য়ে সেনভেসটেস এবং রেজ-য়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় এবং সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এরপর থেকেই তিনি লেখার নেশায় আচ্ছন্ন হন।

বাবাকে লিখে দিলেন ভের্ন - 'আমি আর বাড়ি যাবনা। আমি সাহিত্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চলেছি। একদিন হয়ত আমি ভাল লেখক হলেও হতে পারি, কিন্তু কস্মিনকালে আমি ভাল আইনবিদ হতে পারব না।'

প্যারিসে খুব কষ্টে দিন কেটেছে ভের্নের। টাকার অভাবে আইনের ছাত্রদের পড়িয়েছেন। সাহিত্য-সাধনায় কিন্তু সিদ্ধিলাভ করেননি প্রথমদিকে। দুরবস্থা বৃদ্ধি পেল ১৮৫৭ সালে বিবাহিত হওয়ার পর। পরিবার প্রতিপালনের অর্থও তাঁর ছিল না। দুইপুত্রসহ এক বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন ভের্ন।

১৮৫৮ সাল থেকেই ওঁর পর্যটন-কাহিনী প্রকাশ পেতে থাকে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়। খ্যাতিমান হলেন ১৮৬২ সালে 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' প্রকাশিত হওয়ার পর। বহু সপ্তাহ ধরে ঘষে-মেজে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করেছিলেন ভের্ন। কিন্তু প্রকাশকেরা ছাপতে রাজী হননি। রাগে দুঃখে অগ্নিকুণ্ডে পাণ্ডুলিপি নিক্ষেপ করেছিলেন ভের্ন। ভস্মীভূত হওয়ার আগেই তাঁর স্ত্রী কাগজের তাড়াটি উদ্ধার করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় ভের্ন অগ্নিদগ্ধ পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসেন এম. হেটজেল নামক প্রকাশককে। খবর এত ত'চপা পবে। বইটি তাঁরা প্রকাশ করছেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই ভের্নের বহু পুস্তকের প্রকাশক ছিলেন।

প্রশংসায় আত্মহারা না হয়ে ভের্ন তাঁর লক্ষ্য স্থির করে ফেললেন এবং লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা খাড়া করে সেইভাবে গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করে চললেন। ভের্ন-কাহিনীর সঙ্গে যাঁরা সবিশেষ পরিচিত, তাঁরা জানেন, ব্রহ্মাণ্ডের অগুন্তি বিস্ময়কে নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে, সব শ্রেণীর এবং সব বয়সের মানুষকে পেয়েছিলেন ভের্ন তাঁর 'অত্যাশ্চর্য অভিযান লহরী'র পাঠক-পাঠিকারূপে। এঁদেরকে তিনি পর্যটক সাজিয়ে নিয়ে গেছেন নিত্য-নূতন উদ্ভাবনের বাহনে চাপিয়ে স্রষ্টার সৃষ্টি দেখাতে।

ভের্নের সাফল্যের অন্যতম গুপ্তরহস্য হল বিষয়বস্তুর বিশদ বিবরণ। ভৌগোলিক সমিতির সদস্য দিলেন উনি। সমিতির গ্রন্থাগার এবং জাদুঘরে বসে অসংখ্য তত্ত্ব সংগ্রহ করে আনতেন। তারপর চিলেকোঠার ঘরে

*Les Pailles Rompues, L' Auberge des Ardennes, Le Colin Maillard এবং Onze Jours de Siege.

কেতাবঠাসা আলমারী পরিবৃত হয়ে লিখতে বসতেন 'অত্যাশ্চর্য অভিযান লহরী'। পাঠককে ফাঁকি দেননি বলে তিনি নিজেও ফাঁকে পড়েন নি।

ভের্ণ নিজেও ছিলেন উৎসাহী পর্যটক। সমুদ্রকে বড় ভালবাসতেন। ভের্ণের পুত্র বলেছেন, সমুদ্র স্তুতি শুরু করলে আর থামতে চাইতেন না উনি। জীবনের অর্ধেক সময় কাটিয়েছেন ওঁর নিজের জাহাজে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে। দেখে এসেছেন স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং বাল্টিক।

আমেরিকায় যান ১৮৬৭ সালে। নিউইয়র্কে নেমে ছ'শ লীগ পথ পাড়ি দিয়ে দেখে আসেন নায়গ্রা জলপ্রপাত। পরবর্তী জীবনে এই জলপ্রপাতের প্রসঙ্গ উঠলেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হতেন ভের্ণ।

ফরাসিদের মতই খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করতেন ভের্ণ। ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত লিখতেন একনাগাড়ে। শয্যাগ্রহণ করতেন কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে সাতটায় এবং বিছানায় শুয়েই রাতদুপুর পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলতেন রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক কেতাব। সে-বই ফুরোলে পড়তেন ভ্রমণ আর অ্যাডভেঞ্চারের কেতাব।

'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' প্রকাশিত হওয়ার পর একটা মজার চিঠি পেয়েছিলেন ভের্ণ রিফর্ম ক্লাবের জনৈক সদস্যের কাছ থেকে। 'ডেলী টেলিগ্রাফ'-য়ে প্রকাশিত যে প্রবন্ধটি পড়ে ফিলিয়াস ফগ পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন, সেই প্রবন্ধ সমন্বিত পাতাটি নাকি সেদিন 'রিফর্ম ক্লাবে'-ই পৌঁছোয় নি! ভের্ণ প্রাণ খুলে হেসেছিলেন চিঠি পড়ে এবং পত্রলেখককে জানিয়েছিলেন পরবর্তী সংস্করণে ভুল শুধরে নেবেন উনি। লিখবেন, প্রবন্ধটা ডেলী টেলিগ্রাফ মারফৎ রিফর্ম ক্লাবে পৌঁছোয়নি—জনৈক সদস্য এসে বলেছিলেন।

থিয়েটারের সঙ্গে কোন দিনই সম্পর্ক ছেদ করেননি ভের্ণ। নাট্যকারেরা উত্যক্ত করতেন তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়ার অনুমতি চেয়ে। দৃশ্যপট সম্বন্ধে ভের্ণের বেশ কিছু মৌলিক আইডিয়া ছিল। 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ' এবং 'মাইকেল স্ট্রগফ'য়ের সফল অভিনয় হয় প্যারিসে এবং প্রথম নাটকটি লণ্ডনেও অভিনন্দিত হয়।

'ফাইভ উইকস্ ইন এ বেলুন' প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় সোয়া শতাব্দী ধরে বছর বছর উপন্যাস প্রকাশ করে গেছেন ভের্ণ। কিছু সমালোচক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অধিক লিখনের জন্যে পুণরুক্তি দোষে দুষ্ট হবে তাঁর রচনাসম্ভার। ভের্ণ কিন্তু তাঁদের হতবুদ্ধি করেছিলেন। শেষের ক'বছর অবশ্য ভের্ণ নিজেও শংকিত ছিলেন এ-ব্যাপারে; কিন্তু দুর্জয় আত্মবিশ্বাস আর আশ্চর্য বহুমুখী প্রতিভার দরুণ প্রতিটি কাহিনীই উতরে গিয়েছে।

বৃটিশ জাতির কড়া সমালোচক ছিলেন ভের্ণ। বৃটেন-বাসিন্দারা কিন্তু তাঁর সমালোচনাকে সম্মান জানিয়েছেন। ভের্ণের স্বদেশপ্রেম সঙ্কীর্ণ ছিল না বলেই অন্য জাতির গুণের কদর করেছেন, অত্যাচারীকে কটাক্ষ করেছেন, নিপীড়িতকে সমবেদনা জানিয়েছেন। কারণ, তিনি সমুদ্র ভালবাসতেন, সঙ্গীত ভালবাসতেন এবং স্বাধীনতা ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন শিশুদের। শেষোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তদানীন্তন সমালোচক জুলি ক্রিস্টি। ভের্ণের নিজের মনে শিশুসুলভ কৌতূহল এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়ের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল বলেই শিশুদের অনুরক্ত ছিলেন তিনি। শিশুরা বালির কেল্লা বানিয়ে যে শিহরণ অনুভব করে, ভের্ণ কল্পনার সৌধ নির্মাণ করে তা অনুভব করতে পারতেন। তফাৎ শুধু গণ্ডীর মাপে। ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেনি ভের্ণের উদ্দাম কল্পনা।

কলকব্জা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি এবং কি ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হওয়া দরকার, তা তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে ফ্যানটাসটিক ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতেন স্কুলের সহপাঠীদের। ঘোড়াহীন বাষ্পচালিত শকটের মত আজগুবি কল্পনা বিস্তর কৌতুক বিতরণ করত সতীর্থদের। নতুন ধরনের একরকম রণপা'য়ে চেপে স্কুলের মাঠে চলে ফিরেও তাদের তাক লাগিয়ে দিতেন ভের্ণ। একবার বাড়ী থেকে পালিয়ে জাহাজে উঠে বসেছিলেন বিনা টিকিটে। বাবার হাতে বেদম মার খেয়ে কথা দিয়েছিলেন এরপর থেকে তিনি শুধু 'কল্পনায় ভ্রমণ করবেন'। উত্তরকালে তিনি অনেকাংশে এ-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

সাহিত্য সেবার জন্যে ফরাসি অ্যাকাডেমি তাঁকে সম্মানিত করেন 'লিজিয়ন অফ অনার' মেডেল দিয়ে।

শেষ জীবনে বধিরতা এবং অন্ধতার জন্যে লেখার পরিমাণ হ্রাস পায় তাঁর। বিশ্ব-বন্দিত জুল ভের্ণের জীবনাবসান ঘটে ১৯০৫ সালের ২৪শে মার্চ, অ্যামিয়েন্স শহরে।

প্রসঙ্গতঃ, ভের্ণের সব কাহিনীর ইংরেজী অনুবাদ হয়নি। যা হয়েছে, তার সবগুলিও সংগ্রহ করা দুষ্কর। ইচ্ছে থাকলেও তাঁর বহু উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ সম্ভব নয় ঐ কারণে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে এ-বিষয়ে সহযোগিতা পেলে উপকৃত হব।

জুল ভের্ণ—এই নামের প্রকৃত উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ আছে। চলতি উচ্চারণ ভর্ণ, ভার্ণ বা ভার্ণে হলেও ফরাসি উচ্চারণ ভের্ণ।

অদ্রীশ বর্ধন

কালো হীরে

[ব্ল্যাক ডায়মণ্ড]

জুল ভের্ণ সম্ভবত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কল্পনাপ্রবণ লেখক। আধুনিক সায়ান্স-ফিকশ্যন সাহিত্যের ইনি জনক। একশ বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময়ে এঁর কাহিনীতে যে উৎকণ্ঠা যে শ্বাসরোধী গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, আজও তা অতুলনীয়। 'কালো হীরে'র কাহিনী ঘটেছে মাটির নিচে—স্কটল্যাণ্ডের কয়লাখনির তলদেশে এক পাতালপুরীতে। ভূগর্ভের সেই তিমির রহস্যাবৃত দেশে আছে সুবিশাল গুহা এবং হ্রদ! 'কালো হীরে' ('ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস্') লেখকের চিত্তচাঞ্চল্যকারী উপন্যাসগুলির অন্যতম।

জুল ভের্ণকে প্রভাবিত করেছেন অনেক সাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় স্যার ওয়াল্টার স্কটের। স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ইতিহাস আর পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যে রোমান্স—তার আস্বাদ গ্রহণ করার উৎসাহ স্যার ওয়াল্টার স্কটই জুগিয়েছেন জুল ভের্ণকে।

ফলে, দুবার স্কটল্যাণ্ড বেড়িয়ে এসেছেন জুল ভের্ণ। দুবারই দুটি বই লেখেন। প্রথমবারে 'গ্রীন রে'। দ্বিতীয়বারে বর্তমান কাহিনী।

'ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস্' একটি অসাধারণ সায়ান্স-ফিকশ্যান এবং পুরোমাত্রায় মৌলিক। ভের্ণের জীবনীকার কেনেথ অ্যালট লিখেছিলেন, পরিত্যক্ত মঠ-গির্জা-দুর্গের বিষাদময় ভগ্নস্তূপ দেখে যদিও অনেকে লিখেছেন, কিন্তু ভাঙাচোরা এবং পরিত্যক্ত কলকব্জাও যে মনে দাগ রাখার মত বিষাদময় হতে পারে—এ উপলব্ধি যাঁদের মনে সবার আগে জেগেছে, জুল ভের্ণ তাঁদের অন্যতম।

উপন্যাসের মূল কাহিনী থেকে এমন কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হল, বর্তমান কালের পাঠকদের কাছে যা অনাবশ্যক মনে হতে পারে।

....

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুটি স্ববিরোধী চিঠি

মিঃ জে আর স্টার, ইঞ্জিনীয়ার (৩০ ক্যাননগেট, এডিনবরা) সমীপেষু—

মিঃ জেম্‌স্ স্টার যদি আগামীকাল অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে আসেন

(ডোচার্ট পিট, ইয়ারো শ্যাফট্), তাহলে এমন কিছু জানতে পারবেন, যা তাঁর কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হবে।

প্রাক্তন ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডের ছেলে হ্যারি ফোর্ড মিঃ জেম্‌স্ স্টারের জন্য সারাদিন ক্যালান্ডার স্টেশনে অপেক্ষা করবে।

মিঃ জেম্‌স্ স্টার যেন এই একান্ত গোপনীয় আমন্ত্রণকে পাঁচকান না করেন।

১৮—সালের তেসরা ডিসেম্বর সকালের প্রথম ডাকেই এই চিঠিটা এসে পৌছালো জেম্‌স্ স্টারের কাছে।

চিঠি পড়ে বেজায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক। চিঠিটা যে একটা মস্ত ধাপ্পা হতে পারে, এ সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনে এল না। অ্যাবারফয়েল কয়লাখানতে তিনি নিজেই বিশ বছর ম্যানেজারি করেছেন। ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডকে তিনি চেনেন।

জেম্‌স্ স্টারের শরীরের গড়ন বেশ মজবুত। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও চল্লিশ বছর বলে ভ্রম হয়।

ব্রিটেনের উন্নতির মূলে যাঁদের অবদান আছে, জেম্‌স্ স্টার তাঁদের অন্যতম। ব্যবহারিক বুদ্ধির জন্যে কর্মজীবনে তিনি সফল ব্যক্তি। তাঁর একদা মেহনতের ফল আজ অনেক ইঞ্জিনীয়ারই ভোগ করছেন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কয়লাস্তর পাতাল থেকে তুলে আনার ব্যাপারে আজকের সফলতার মূলে ইনি আছেন। বিশেষ করে অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি-অঞ্চলে ইনি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ভদ্রলোক সদবংশজাত। বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানীতে রীতিমত খ্যাতিমান পুরুষ।

কলকারখানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়লার চাহিদাও বেড়েছে। চাহিদা মেটাতে গিয়ে বহু কয়লাখনি শূন্য হয়ে গেছে। ভূগর্ভে বহু সুড়ঙ্গ বহু গ্যালারি নিয়ে এইভাবে অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিও একসময়ে পরিত্যক্ত হয়েছে।

দশ বছর আগে শেষবারের মত একটন কয়লা তোলার পর পাতাল-খনির যা কিছু যন্ত্রপাতি সব তুলে আনা হয়েছে ওপরে। কয়লা বওবার গাড়ী, লিফটের খাঁচাঘর, বাতাস সরবরাহের নল ইত্যাদি সব কিছুই পাহাড় করে ফেলে রাখা হয়েছে জমির ওপর। কিম্ভূতকিমাকার চেহারার অতিকায় বহুপদ-দানবের গতায়ু দেহের মত পড়ে রয়েছে জঠরশূন্য সুবিশাল কয়লাখনিটা। যেন একটা দানবিক কঙ্কাল।

কলকব্জার সবই তুলে আনা হয়েছিল—শুধু একটা সিঁড়ি ছাড়া। ইয়ারো শ্যাফ্‌টের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও কাঠের এই মই দিয়ে ডোচার্ট পিট পর্যন্ত নামা যায়।

ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্‌ স্টারের পরিচালনায় একদিন যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক মহা উৎসাহে কয়লা তুলেছে, আজ সেখানে কয়েকটা চালা ছাড়া কিছুই নেই।

শেষের সেদিনের কথা এখনও মিঃ স্টারের মনে পড়ে। তিনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ডোচার্ট পিটের ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড (তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর) এবং আরও কয়েকজন বিভাগীয় ম্যানেজার আর ওভারশিয়ার দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে ঘিরে।

শ্রমিকরা প্রত্যেকেই বিষণ্ণবদন। মাথার টুপি হাতে। খনিতে কয়লা আর নেই। সে বছর লাভ হয়নি বললেই চলে। যেটুকু হয়েছে, সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে—যাতে নতুন চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত কোনো রকমে চলে যায় সবার।

জন্মের মত এই কয়লাখনি ছেড়ে যাওয়ার আগে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যেকেই জড়ো হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারের মুখে বিদায় সম্ভাষণ শোনবার আশায়।

অত লোক। কিন্তু সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। মর্মস্পর্শী সেই দৃশ্য ভোলা যায় না

"বন্ধুগণ," আরম্ভ করলেন ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্‌ স্টার, "বিচ্ছেদের সময় এসেছে। আমাদের সবাইকে একই কাজের সূত্রে গেঁথে দিয়েছিল যে কয়লাখনি, আজ তার জঠর শূন্য। অনেক খোঁজ করেও নতুন স্তরের সন্ধান পাইনি। কয়লার শেষ ব্লকটাও এইমাত্র তুলে আনা হল ডোচার্ট পিট থেকে।"

ট্রাকে চাপানো কয়লার চাঙড়টা দেখিয়ে আবার বলেন জেম্‌স্‌ স্টার, "বন্ধুগণ, এ তো কয়লার টুকরো নয়, এ যেন খনির ধমনী থেকে নিংড়ে-আনা রক্তবিন্দু। কিন্তু এই শেষ। এতদিন আমরা মিলে-মিশে কাজ করেছি। এবার বিচ্ছেদের সময়। আমরা হয়ত ছড়িয়ে পড়ব দিকে দিকে রকমারি ধান্দায়, কিন্তু কেউ কাউকে ভুলব না। এই খনি এবং তার মালিকরাও ভুলবে না তোমাদের। যেখানেই আমরা থাকি না কেন, মনে রেখ আমরা স্বজন, ভায়ের মতই নিকট আত্মীয়। বিদায়, বন্ধুরা, বিদায়। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন!"

সবারই হৃদয় ভারাক্রান্ত। একে একে বিদায় জানিয়ে শ্রমিকরা ধীরে ধীরে মলিন বিষণ্ণ মুখে উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শেষবারের মতো ডোচার্ট পিটের কালো মাটিতে ধ্বনিত হল শ্রমিকদের পদধ্বনি। একদিন যেখানে ছিল জীবনের স্পন্দন, নৈঃশব্দ ছাড়া সেখানে আর কিছু রইল না।

একজন শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন জেমস্‌ স্টারের পাশে। নাম তাঁর সাইমন ফোর্ড, ওভারম্যান। পাশে একটি কিশোর। বছর পনেরো বয়স। কিছুদিন থেকে পাতাল-খনিতে কাজ করছিল ছেলেটি।

জেম্‌স্ স্টার এবং সাইমন ফোর্ড দুজনেই দুজনকে খাতির করতেন।

'গুডবাই, সাইমন।' বললেন ইঞ্জিনীয়ার।

'গুডবাই, মিঃ স্টার।' জবাব দিলেন ওভারম্যান।

'সাইমন, এডিনবরায় আমার বাড়ীর দরজা কিন্তু খোলা রইল তোমার জন্যে।'

'এডিনবরা অনেক দূর, মিঃ স্টার। ডোচার্ট পিট থেকে অনেক দূর।'

'অনেক দূর মানে? তুমি ডেরা নিচ্ছ কোথায় শুনি?'

'এইখানেই, মিঃ স্টার। এ খনি ছেড়ে আমরা আর নড়ছি না। বউ-ছেলে নিয়ে থাকবো এখানেই।'

'বিদায়, সাইমন, বিদায়। চললাম।' আবেগে গলা কেঁপে উঠল ইঞ্জিনীয়ারের।

'যাবার সময়ে যাই বলতে নেই, মিঃ স্টার, বলুন আসি। দেখবেন, অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতেই আবার আমাদের দেখা হবে!'

সাইমনের এই অন্ধ বিশ্বাস, যা কিনা মরীচিকার সমান, তাকে আঘাত দেওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না জেম্‌স্ স্টারের। ছেলের বিষণ্ণ দৃষ্টির সামনে বাপের দু'হাত শেষবারের মত জড়িয়ে ধরে চলে এসেছিলেন তিনি।

এ সব দশ বছর আগের কথা। এই দশ বছরের মধ্যে ওভারম্যান সাইমনের কোনো খবর পাননি জেম্‌স্ স্টার। এই প্রথম, দশ বছর পরে এই প্রথম, সাইমন ফোর্ড তাঁকে চিঠিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে পরিত্যক্ত অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে।

চিঠিখানা আবার পড়লেন জেম্‌স স্টার। আফসোস হল চিঠিটা আরো একটু প্রাঞ্জল নয় বলে। সাইমন আরো দু-চারটে কথা জুড়লেই পারত! কি বোঝাতে চাইছে চাইছে সাইমন? জেম্‌স স্টারের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে, এমন কি জিনিস আছে অ্যাবারফয়েলে?

কয়লার নতুন কোন শিরা আবিষ্কার করেনি তো বুড়ো ফোরম্যান? না, তা হতেই পারে না!

অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি চিরকালের মত ছেড়ে আসার আগে তন্নতন্ন করে কয়লার নতুন স্তরের খোঁজ করেছিলেন জেম্‌স স্টার। কয়লার আর একটি দানাও পাওয়া যাবে না জেনেই না অ্যাবারফয়েল ছেড়ে এসেছিলেন তিনি।

কিন্তু তবুও কেন এই আমন্ত্রণ? কি এমন থাকতে পারে সেখানে, যা কিনা ইঞ্জিনীয়ার জেমস স্টারের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক?

সাইমন পাকা খনিশ্রমিক। অভিজ্ঞতা তার প্রচুর। অ্যাবারফয়েল ছেড়ে

আসার পর বউ-ছেলে নিয়ে সে কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানা নেই জেম্‌স্‌ স্টারের। এখনই শুধু জানলেন, সাইমন ফোর্ড ইয়ারো শ্যাফ্‌টে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকবে এবং অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ক্যালান্‌ডার স্টেশনে সারাদিন হাজির থাকবে তার ছেলে হ্যারি। সুতরাং ডোচার্ট পিটে যেতেই হবে।

উত্তেজনায়, ভাবনায়, নানারকম কল্পনায় সারাদিন ছটফট করলেন জেম্‌স্‌ স্টার। তারপরেই যেন উত্তপ্ত মস্তিষ্কের গনগনে আগুনে একবিন্দু ঠাণ্ডা জল পড়ল।

ঘটনাটা ঘটল অপ্রত্যাশিতভাবেই। সেই দিনই সন্ধ্যা ছটায় ডাকে এল আর একটা চিঠি। পুরু খসখসে খাম। ঠিকানা যে হাতে লেখা সে হাতে কলম ধরার অভ্যেস নেই।

খামটা ছিঁড়ে ফেললেন জেম্‌স্‌ স্টার। দেখলেন, ভেতরে এক টুকরো কালজীর্ণ হলদেটে কাগজ ছাড়া আর কিছুই নেই—যেন একটা পুরোনো কপি-বুক থেকে ছিঁড়ে নেওয়া।

কাগজে লেখা শুধু একটা লাইন :

'ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্‌ স্টারের হয়রানিই সার হবে—সাইমন ফোর্ডের চিঠির এখন আর কোন মানেই হয় না।'

তলায় কোন সই নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যাওয়াই স্থির

প্রথম চিঠি পেয়ে যা ভাবতে শুরু করেছিলেন জেম্‌স্‌ স্টার, সব ভণ্ডুল হয়ে গেল দ্বিতীয় চিঠি পড়ার পর।

খামটা তুলে দেখলেন তিনি। হ্যাঁ, অ্যাবারফয়েল ডাকঘরের ছাপই বটে! কিন্তু তবুও এ চিঠি বুড়ো সাইমন ফোর্ড লেখেনি। লিখেছে এমন কেউ যে প্রথম চিঠির বৃত্তান্ত জানে।

সত্যিই কি প্রথম চিঠির এখন কোনো দাম নেই? না, বদ মতলব নিয়ে কেউ তাঁর অ্যাবারফয়েল যাওয়া বন্ধ করতে চায়? উদ্দেশ্য : সাইমন ফোর্ডের প্ল্যান বানচাল করে দেওয়া।

অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তেই পৌছোলেন জেম্‌স্‌ স্টার। দুটো চিঠির দু'রকম সুর তাঁর উদ্বেগকে আরো বাড়িয়ে দিল। নাঃ, ডোচার্ট পিটে যেতেই হবে। ধাপ্পাই যদি হয় তো হোক। যাচাই করে দেখতে দোষ কি? দুটোর

মধ্যে প্রথম চিঠিটাকেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিলেন। উড়ো চিঠির উড়ো খবরের চাইতে বুড়ো সাইমনের অনুরোধের দাম অনেক বেশী।

তাই পরের দিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হলেন ইঞ্জিনীয়ার স্টার। হেঁটে পৌঁছোলেন জেনারেল রেলওয়ে স্টেশনে। আধঘণ্টা পরে নিউহ্যাভেন গ্রামে পৌঁছে মাইলখানেক দৌড়ে গিয়ে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' স্টীমারের ডেকে উঠে বসলেন। ঘণ্টা তিনেক পরে এল স্টারলিং। লাফিয়ে জেটিতে নেমে ছুটলেন স্টেশনের দিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উঠে বসলেন ট্রেনে। নামলেন একঘণ্টা পরে। ক্যালান্‌ডার গ্রামে ট্রেন পৌঁছে গেছে।

একটি তরুণ দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনে। এগিয়ে এল ইঞ্জিনীয়ারকে দেখে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাটির তলেই ঘরসংসার?

এডিনবরা থেকে গ্লাসগো পর্যন্ত দশ-বারো মাইলের মধ্যে কয়লার খনি ছিল অনেকগুলো। কিন্তু সব কটারই জঠর শূন্য হয়ে যাওয়ায় এখন পরিত্যক্ত, যেমন হয়েছে অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি। দেড় হাজার থেকে দু হাজার ফুট পর্যন্ত পাতাল ফুটো করেও কয়লার নতুন শিরার কোনো সন্ধান পান নি ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্‌ স্টার। নাজেহাল হয়ে তবেই না তিনি অবসর নিয়েছিলেন!

কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যায় নি তো? কয়লার নতুন কোনো শিরা হঠাৎ বেরিয়ে পড়েনি তো? এ অসম্ভব যদি সম্ভবই হয়, তাহলে সব চাইতে উল্লসিত হবেন জেম্‌স্‌ স্টার স্বয়ং।

তরুণটি এগিয়ে এসেছিল। কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন ইঞ্জিনীয়ার, 'তোমারই নাম হ্যারি ফোর্ড—সাইমন ফোর্ডের ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিস্টার।'

'বাঃ, তোমাকে তো দেখছি চেনাই দায়! বছর দশেকের মধ্যে দিব্যি লম্বা হয়ে উঠেছ!'

'আমি কিন্তু স্যার আপনাকে দেখেই চিনেছি।' মাথা থেকে টুপিটা হাতে নিয়ে বলল হ্যারি, 'দশ বছর আগে যেরকম দেখেছি আপনাকে, এখনো ঠিক তেমনি আছেন—একটুও পালটান নি।'

'আরে বোকা, মাথায় টুপি দাও। বিনয় দেখাতে গিয়ে বৃষ্টিতে মাথা ভিজিয়ে সর্দি ডেকে আনবে নাকি?'

'বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত কি এখানে অপেক্ষা করবেন?' হ্যারি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে।

'না। এ বৃষ্টি ধরবে না। চল, বেরিয়ে পড়া যাক। তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'খুব ভাল।'

'মা?'

'খুব ভাল।'

'ইয়ারো শ্যাফ্‌টে আসবার জন্যে তোমার বাবা আমাকে চিঠিটা লিখেছিলেন, তাই না?'

'না। আমি লিখেছিলাম।'

'তাহলে দ্বিতীয় চিঠিতে আমাকে আসতে বারণ করেছিলেন তোমার বাবা?'

'না।'

'বেশ, বেশ।' আর কথা বাড়ালেন না জেম্‌স্‌ স্টার। শুধোলেন, 'বাবা কেন ডেকেছেন জানো?'

'জানি। বাবার মুখেই শুনবেন সব।'

'বাবা এখন আছেন কোথায়?'

'খনির মধ্যে।'

'অ্যাঁ! কি বললে? ডোচার্ট পিটের ভেতরে? ওখানেই বাস করছো তোমরা?'

'হ্যাঁ।'

'তাই নাকি? তাজ্জব কাণ্ড! কাজ বন্ধ হওয়ার পর তোমরা তাহলে খনি ছেড়ে বেরোও নি? যাও নি কোথাও?'

'এক দিনের জন্যেও নয়। বাবাকে তো চেনেন। খনিতেই তাঁর জন্ম। মরতেও চেয়েছেন খনির মধ্যে!'

'বুঝি, হ্যারি, সব বুঝি। এ তো শুধু খনি নয়. এ যে তার জন্মস্থান! ছেড়ে যেতে মন কি চায়! কিন্তু খনির মধ্যে থেকে তুমি সুখী তো?'

'নিশ্চয়ই। আমাদের চাহিদা তো খুব বেশি নয়।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। চলো, জোরে পা চালানো যাক।'

দশ মিনিট পরে ক্যালান্ডারের সীমানা ছাড়িয়ে এলেন দুজনে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডোচার্ট পিট ঃ পাতালের অন্ধকারে

হ্যারি ফোর্ডের বয়স পঁচিশ। মজবুত শরীর। তার রাশভারী গম্ভীর চাউনি আর স্বভাবগত চিন্তাশীল হাবভাব ছেলেবেলা থেকেই খনির অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নিখুঁত তার দেহের গড়ন, ঘন নীল চোখ আর কুঞ্চিত বাদামী চুল,—সব মিলিয়ে সুন্দর চেহারা।

শৈশব থেকেই খনিতে কাজ করার ফলে বাস্তবিকই কাজের লোক হয়ে উঠেছিল হ্যারি। মনে ছিল তার সাহস আর মুখে ছিল মিষ্টি। বাবার এবং নিজের মিলিত চেষ্টায় লেখাপড়া সে সাঙ্গ করেছিল অল্প বয়েসেই এবং যে বয়সে ছেলেরা শিক্ষানবীশ থাকে, সেই বয়েসেই কেউকেটা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

জেম্স্ স্টারের বয়স হলেও হাঁটতে পেছপা হতেন না তিনি। তা সত্ত্বেও জোয়ান হ্যারির সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। অগত্যা ঢিমেতালে চলতে লাগল হ্যারি। বৃষ্টির বাধা তখন অনেকটা কমে এসেছে। বড় বড় ফোঁটাগুলো মাটিতে পৌঁছাবার আগেই ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসের দাপাদাপিতে।

ক্যালানডার থেকে ইয়ারো শ্যাফটের দূরত্ব চার মাইল। এক সময়ে বারো মাস সরগরম থাকত এই পথ। কারণ, খনি চালু থাকত সারা বছর। কিন্তু এখন খনি-শিল্প বিদায় নিয়েছে, সে জায়গায় এসেছে কৃষি-শিল্প। শীতকালে চাষবাস বন্ধ। তাই ধু-ধু শূন্যতা বিরাজ করছে মাঠে প্রান্তরে। এক সময়ে যে অঞ্চলে দিবারাত্রি ওয়াগন বোঝাই কয়লা চালান যেত, এখন সে অঞ্চল নিস্তব্ধ। আগে যেখানে রেলপথ ছিল, এখন সেখানে পাথুরে পথ। জেম্স্ স্টারের মনে হল, তিনি যেন মরুভূমি পার হচ্ছেন।

বিষাদমাখা চোখে এদিক-ওদিক দেখছেন তিনি। মাঝে মাঝে থামছেন। কি যেন শুনতে চাইছেন উৎকর্ণ হয়ে। কিন্তু বৃথাই। আগের মত বহুদূর থেকে বাতাসে ভেসে-আসা ইঞ্জিনের সিটি বা চাকার আর্তনাদ নেই। খনি অঞ্চলের আকাশছোঁয়া চিমনি বা কালো ধোঁয়াও নজরে পড়ে না। এমন কি যে জমি একদা কয়লার গুঁড়োয় কৃষ্ণকালো থাকত, আজ তা পরিষ্কার। এ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয় জেম্স স্টারের চোখ।

হ্যারিও থেমে থেমে চলেছে। মিঃ স্টারের বুকভরা বিষাদ-মেঘ তারও মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। খনিতে তার জন্ম। খনিতেই সে মানুষ। তাই এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

বিষণ্নকণ্ঠে বললেন জেম্‌স্ স্টার, 'হ্যারি, সত্যিই সব পালটে গেছে। স-ব।'

'অ্যাবারফয়েলের কয়লা যদি না ফুরোতো, ধরিত্রী জঠর বোঝাই করে শুধু কয়লাই রেখে দিত, তা হলে এ দৃশ্য দেখতে হত না।' আক্ষেপ করে বলল হ্যারি।

'কিন্তু তা তো হবার কথা নয়, হ্যারি। ধরিত্রীর দূরদৃষ্টি আছে বলেই জঠরের বেশীর ভাগ জায়গা ভরেছে বালিপাথর, চুনাপাথর, আর আগ্নেয়পাথর দিয়ে। তার কোনটাকে আগুন স্পর্শ করতে পারে না।'

'সেই কারণেই ধরিত্রী বুঝি রক্ষে পেল। নইলে মানুষ নিজের সভ্যতার চাহিদা মেটাতে গোটা পৃথিবীটাকেই খুঁড়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিত। তাই ন, স্যার?' হ্যারি বললে।

'ঠিক বলেছ।'

কথায় কথায় গেল একটা ঘণ্টা। দূর থেকে দেখা যায় ডোচার্ট পিট-এর নিশানা। কতগুলো মাথান্যাড়া গাছ। ধারে কাছে কয়লার ভগ্নাংশও পড়ে নেই। চেটেপুটে কালোসোনার সবটুকুই যেন লুটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ছোট্ট একটা টিলার ওপর দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা লোহার কঙ্কাল রোদে-জলে তাতে জং ধরেছে, ভাঙন শুরু হয়েছে। কঙ্কালের চূড়োয় দেখা যাচ্ছে ঢালাই-লোহার প্রকাণ্ড চাকা, নিচে রোলার। এর ওপর দিয়ে এক-সময়ে দড়ির টানে পাতাল থেকে উঠে আসত খাঁচাভর্তি শ্রমিক।

নিচের তলায় পরিত্যক্ত ইঞ্জিন-রুমটার অবস্থা দেখলে কান্না পায়। তার শ্রীহীন ভগ্নদশা দেখে কে বলবে, দশ বছর আগে ঝকমক করত চকমকে ইস্পাত আর তামার তৈরী সেখানকার যন্ত্রপাতি। শ্যাওলা সবুজ স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে লোহালক্কড়, যন্ত্রপাতির ভাঙা টুকরো, দোমড়ানো রেলপথ।

এক জায়গায় পড়ে আছে একটা খাঁচার ভগ্নাবশেষ, দীর্ঘশ্বাস আর অব্যক্ত হাহাকার যেন বেরিয়ে আসছে তার ভাঙা বক্ষপিঞ্জর থেকে। আর এক জায়গায় পড়ে আছে বড় বড় ভাঙা বালতি। কয়েকটা টুকরো শিকল তখনও ঝুলছে তাদের গা থেকে। কোথাও দেখা যায় ভাঙা বয়লার-প্লেট, কোথাও বাঁকা পিস্টন-রড, কোথাও পাম্প-কূপের কড়িবরগা, কোথাও বা বাবিশ-চাপা চিমনি—যেন পুরাকালের কামান। হাওয়ায় দুলছে কালভার্ট, কাঁপছে ফাটা দেয়াল। বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ে জেম্‌স স্টারের। এ তো খনি নয়, এ যেন এক বিশাল দুর্গের প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ—বিষাদ আর বিয়োগ-ব্যথা যার ভাঙা পঞ্জরের অণু-পরমাণুতে মিশে আছে।

'এ যে দেখছি মরুভূমি!' বিষন্ন কণ্ঠে বললেন জেম্‌স স্টার। হ্যারি কোনো জবাব দিল না।

ইয়ারো শ্যাফ্‌টের মুখে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। পাতাল-গহ্বরের মাথায় ওপর ছাওনি এখনো রয়েছে বটে, কিন্তু ভেন্টিলেটরে বাতাস টেনে নেওয়ার সেই তীব্র বাঁশীর শব্দ আর নেই। পাতাল-গহ্বর এখন নীরব। যেন একটা মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ।

গহ্বরের প্রথম চাতালে পা দিলেন দুজনে।

অ্যাবারফয়েল খনিতে আগে অটোমেটিক ব্রেক লাগানো অনেক কলকব্জা সমেত দোলনা-মই ওঠানামা করতে পাতাল-গহ্বরে। খনি শ্রমিকেরা নির্বিঘ্নে নিচে নামত, বিনা শ্রমে ওপরে আসত। যন্ত্রটা অবশ্য জেমস স্টারই বার করেছিলেন মাথা খাটিয়ে। নাম দিয়েছিলেন 'ইঞ্জিন-মানব'।

খনি নিঃশেষিত হওয়ার পর সেই ঝোলানো সিঁড়িও উধাও হয়েছে। তার জায়গায় এসেছে লম্বা লম্বা মইয়ের সারি পঞ্চাশ ফুট অন্তর একটা চাতাল। চাতালে শেষ হয়েছে একটা মই, আবার নেমে গেছে আর একটা, এই রকম তিরিশটা মই বেয়ে নামলে তবে পৌঁছনো যায় একদম নিচের গ্যালারীতে অর্থাৎ পনেরো শো ফুট নিচে ভুগর্ভে। ডোচার্ট পিটের তলদেশে অবতীর্ণ হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

জেম্‌স স্টার উঁকি মেরে মইয়ের সারি দেখলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যারি, আগে তুমি নামো। সঙ্গে বাতি আছে তো?'

'আছে, কিন্তু 'সেফ্‌টি ল্যাম্প নয়।'

'তাতে কি! এখন তো আর গ্যাসে আগুন লেগে বিস্ফোরণের ভয় নেই।'

অতি সাধারণ একটা তেলের বাতির সলতে জ্বালিয়ে নিল হ্যারি। খনিতে কয়লার কণা যখন নেই এবং কারবুরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসার ও বিস্ফোরণের আশঙ্কা যখন নেই, তখন হেভী সেফ্‌টি ল্যাম্পের আর প্রয়োজন কি।

শুরু হল মই বেয়ে নামা। দেখতে দেখতে গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল দুটি মূর্তি! কাজল কালোর মধ্যে শুধু দপদপ করে জ্বলতে লাগল একচক্ষু বিবর-বাসিন্দার মত বাতির আলো; দশটা মই পেরিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন জেম্‌স স্টার। একটু জিরিয়ে নিয়ে নামলেন আরও পাঁচটা মই। ঠিক তখনি অনেক নিচে খনির তলদেশ থেকে ভেসে এল একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল শব্দছন্দ। স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল শব্দলহরী।

'কার গলা?' শুধোলেন জেমস স্টার।

'বলতে পারছি না।'

'তোমার বাবার নয় তো ?'

'আমার বাবার ? না, না, মিস্টার স্টার।'

'তা হলে কোনো প্রতিবেশীর নিশ্চয় ?'

'আমাদের কোনো প্রতিবেশী নেই।'

'তা হলে সবুর করা যাক। শব্দটা এগিয়ে আসছে।'

চাতালে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। কানে ভেসে এল গানের একটা কলি। স্কটল্যাণ্ডের গান।

সোল্লাসে বললে হ্যারি, 'এবার বুঝেছি—'সরোবর-সঙ্গীত' গাইছে কেউ! নিশ্চয় জ্যাক রিয়ান।'

'বড় মিঠে গলা তো ? জ্যাক রিয়ানটি কে ?'

'পুরানো দোস্ত ? খনিতেই কাজ করত।' বলে চাতালের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে হ্যারী ডাকল, 'হেই, জ্যাক!'

'... হ্যারি নাকি ?' জবাব এল তক্ষুনি, 'দাঁড়া, আসছি।' বলেই আবার গান ধরল সে তারস্বরে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আবির্ভূত হল বছর পঁচিশ বয়সের এক যুবক। দিব্যি লম্বা চেহারা। চোখে মুখে হাসি, প্রসন্ন মুখচ্ছবি। বাদামী চুল। লণ্ঠনের আলোকবৃত্তের মধ্যে সহসা উঠে এল হাসি-হাসি মুখখানা। পঞ্চদশ মইয়ের চাতালে পা রেখে উঠে দাঁড়াল ওপরে তাকিয়ে।

পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হলে জেম্‌স স্টার শুধোলেন, 'দশ বছর আগে একটা ছেলে কেবল গান গাইত। তুমিই কি সেই গাইয়ে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খনি বন্ধ হয়েছে, পেশা পালটেছি, কিন্তু স্বভাব বদলাতে পারিনি। দিন রাত ঘ্যান ঘ্যান করার চাইতে গান গাওয়া আর হাসা অনেক ভাল।'

'তা ঠিক। এখন কি করা হচ্ছে ?'

'চাষবাস। কিন্তু মোটেই জুৎ করতে পারছি না। কোদালের চাইতে গাঁইতি আমার হাতে ভাল চলে।'

'কিন্তু হঠাৎ কেন আবির্ভাব, তা তো বললি না, জ্যাক ?' বলল হ্যারি।

'একটু নাচ-গান-বাজনার আয়োজন হয়েছে।'

'সম্ভব নয়।'

'কেন ?'

'মিস্টার স্টার আমাদের অতিথি।'

'কিন্তু গানবাজনা তো সাত দিন পরে। তদ্দিন কি মিস্টার স্টার থাকবেন?' বলল জ্যাক।

'হ্যারি,' বললেন জেম্‌স স্টার, 'আমার জন্যে ভেব না। তুমি যাচ্ছ।'

'বেশ, আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় যাব।'

বিদায় নিয়ে আবার গলা ছেড়ে গান ধরল জ্যাক রিয়ান। দেখতে দেখতে তার বাতির আলো মিলিয়ে গেল ওপরে।

ডোচার্ট পিটের তলদেশে অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়, রশ্মিরেখার মত গ্যালারীর পর গ্যালারী চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। একদা যেথায় অশ্বতর বা অশ্বের ডাক আর খুরের শব্দ পাওয়া যেত, লৌহ-পথে গড় গড় করে চলতে কয়লাবোঝাই গাড়ী, গাঁইতি শাবল লোকজনের হাঁকডাকে সরগরম থাকতে সুড়ঙ্গ—আজ সে জায়গা মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধ। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে লোহার বরগা। কোথাও চুনাপাথর বা বালিপাথরের কৃত্রিম থাম আর স্তূপীকৃত রাবিশ।

হ্যারি বললে, 'সুড়ঙ্গের এই অন্ধকার গোলকধাঁধায় এখনও পথ চিনে যেতে পারবেন, তাই না মিস্টার স্টার?'

'তা পারব। গোলকধাঁধার গোটা প্ল্যান এখনও ভাসছে আমার চোখের সামনে।'

আগে হ্যারি, পেছনে ইঞ্জিনীয়ার এগিয়ে চলেছেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে। রেলপথের কাঠের স্লিপারের ওপর জুতোর শব্দ বিশাল গহ্বরের মধ্যে গম্‌গম্ করছে।

এমন সময় হঠাৎ এ কী। পঞ্চাশ পা যেতে না যেতেই অকস্মাৎ প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই ঠিকরে এসে পড়ল জেম্‌স স্টারের পায়ের কাছে।

আঁতকে উঠল হ্যারি। সচমকে লাফ মেরে পেছু হটে গেছেন ইঞ্জিনীয়ার। কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কথা নেই। অতি অল্পের জন্যে নির্ঘাত মৃত্যু সরে গেছে পায়ের পাশ দিয়ে! শেষে কথা বললেন ইঞ্জিনীয়ার, 'ব্যাপার কী? ছাদ আলগা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে!'

'মিস্টার স্টার,' রুদ্ধশ্বাসে বলল হ্যারি, 'পাথর আপনা হতে খসে পড়েনি! মানুষ ছুঁড়েছে!'

'মানুষ ছুঁড়েছে! সে কি কথা? কি বলতে চাও তুমি?'

'না, না, কিছু না।' সামলে নিয়ে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যায় হ্যারি। কিন্তু উদ্বিগ্ন চোখে চারপাশে তাকায় অন্ধকারের মধ্যে। তারপর বলে 'চলুন, আমার হাত ধরে চলুন।'

'চলো।'

এবার পেছনে থেকে, গা ঘেঁষে চলে হ্যারি। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে প্রতিটি অন্ধকার কোনে।

'আর কতক্ষণ, হ্যারি?'

'মিনিট দশেক।'

'তবে আর কী। তাহলে তো এসে গেছি।'

'কিন্তু,' বিড়বিড় করে হ্যারি বলে, 'এরকম দুর্ঘটনা এই প্রথম ঘটল। ঠিক ফেরার সময়ে পাথর ছিটকে আসা—'

'আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? দুর্ঘটনা একেই বলে!'

'তা হবে।' বলেই থমকে দাঁড়াল হ্যারি। কান খাড়া করে কি যেন সে শোনার চেষ্টা করে।

'কী হল?'

'পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনলাম যেন…না…আমারই ভুল। আসুন, স্যার, একসাথে যাওয়া যাক।'

যেতে যেতে বারবার পেছনে তাকায় হ্যারি। কি যেন শোনার প্রত্যাশায় কান খাড়া করে আছে সে।

কিন্তু বৃথাই। সামনে আর পিছনে নিবিড় তমিস্রা আর অখণ্ড স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না কয়লাখনির সেই পাতালপুরীতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফোর্ড পরিবার

মিনিট দশেক পরেই মূল গ্যালারীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন জেম্‌স স্টার হ্যারীকে সঙ্গে নিয়ে।

দূরের একটা পরিত্যক্ত খনিমুখ থেকে সামান্য আলোক-রশ্মি এসে পড়েছে জায়গাটায়। হাওয়াও আসছে।

গত দশ বছর এখানেই কুঁড়ে বানিয়ে দিন যাপন করছেন সাইমন ফোর্ড ধরিত্রীর অন্দরে, ভূপৃষ্ঠ থেকে দেড় হাজার ফুট নিচে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পরম সুখে কাটিয়ে দিয়েছেন দীর্ঘ দশটা বছর। পাতাল বলে অসুবিধে হয়নি। কারণ পাতালে সুবিধে অনেক। খাজনা বা ভাড়া আদায় করার জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই সেখানে। ওপরে যখন কনকনে শীত, নিচে তখন উষ্ণ

পরিবেশ। তাছাড়া, সাইমন ফোর্ডের কাছে শীত-গ্রীষ্মের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। দশ বছরে তিনি দশবারও পাতাল ছেড়ে বেরোননি।

তার কারণও ছিল। কাজকে যারা ভালবাসে, কাজের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে যায়। সাইমন ফোর্ড কয়লার খনিকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর জন্ম এক প্রাচীন খনি-পরিবারে। নিউক্যাসল্-এর বিশ হাজার খনিশ্রমিকের মধ্যে তাঁর পূর্বপুরুষরা একেবারে মিশে গেছিলেন। খনির মধ্যে নেমে খনির মধ্যেই পর-পর কয়েকটা পুরুষ কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

সাইমন ফোর্ডও তিরিশ বছর বয়েসে ডোচার্ট পিটে ওভারম্যান হয়েছিল। অ্যাবারফয়েল খনি অঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনি ডোচার্ট পিটে এ পদে উন্নীত হওয়া কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সাইমন ফোর্ডের পক্ষে অল্পবয়েসেই তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ খনি-প্রেম তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল জন্মাবধি।

কাজেই ডোচার্ট পিটের কয়লা যখন ফুরিয়ে গেল, প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেন সাইমন ফোর্ড। কিন্তু মন মানতে চাইল না। কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না তাই কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না ধরিত্রীর জঠর এত সহজে শূন্য হবে। কেউ সে কথা বললেও তিনি খেপে উঠতেন। দীর্ঘ দশ বছর তিনি পাতালবাস করেছেন একটি মাত্র আশা নিয়ে—একদিন অ্যাবারফয়েল খনি আবার জাগবে। খনির কয়লা শেষ হয়নি। কোথাও না কোথাও তা লুকিয়ে আছে। একদিন তার সন্ধান পাওয়া যাবে। অ্যাবারফয়েলের ঘুম ভাঙবে।

এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সুদীর্ঘ দশ বছর ভূগর্ভে কুঁড়ে বানিয়ে থেকেছেন সাইমন ফোর্ড। সে জন্যে স্বাস্থ্য তাঁর খারাপ হয়নি! কেননা দেড় হাজার ফুট নিচে হলেও জায়গাটা আশ্চর্যরকমের স্বাস্থ্যকর। হ্যারি নিয়মিত খাবারদাবার নিয়ে এসেছে ওপরের দুনিয়া থেকে। কাজেই স্ত্রী ম্যাগি-কে নিয়ে দিব্বি দিনযাপন করছিলেন পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো সাইমন ফোর্ড। কর্তার মত গিন্নীও বিশ্বাস করেন, অ্যাবারফয়েল মরেনি, ঘুমোচ্ছে, একদিন জাগবেই। সেদিন আবার সরগরম হয়ে উঠবে পাতালসুড়ঙ্গ, আবার লোকজনের হাঁকডাক, রেলপথে কয়লাবোঝাই ওয়াগনের গড়-গড়ানি, গাঁইতি আর শাবলের দমাদম শব্দে মুখর হয়ে উঠবে এই নিস্তব্ধ পুরী।

কৃষ্ণকালো সেই পাতাল কুটিরে দশ বছর পরে এসে পৌঁছোলেন ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স স্টার।

দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়েছিলেন সাইমন ফোর্ড। জেম্‌স স্টার পৌঁছোতেই সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কুশলবার্তার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষ হওয়ার

পর সাইমন ফোর্ড জানালেন, খাবার তৈরী। আগে খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর কাজের কথা। জেম্‌স্‌ স্টারও বিলক্ষণ ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। কাজেই দ্বিরুক্তি করলেন না।

খাবার টেবিলে বসে ইঞ্জিনীয়ার প্রসঙ্গটা তুললেন, 'সাইমন, তোমার চিঠিতে কিন্তু বেশ কৌতূহলের খোরাক ছিল।'

'তা ছিল।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'বলব,' বললেন সাইমন ফোর্ড, 'তবে এখন নয়। আগে খেয়ে নিন। তারপর ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে সব শুনবেন। নইলে বিশ্বাস করবেন না।'

'বেশ, তাহলে বলো দিকি ভায়া, এ চিঠিখানা কার লেখা?' বলে বেনামী সেই চিঠিটা টেবিলে রাখলেন জেম্‌স্‌ স্টার।

সাইমন চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন। হ্যারিও পড়ল। কিন্তু দুজনের কেউই হস্তাক্ষর চিনতে পারল না।

সাইমন বললেন, 'চিঠিতে কিন্তু অ্যাবারফয়েল ডাকঘরের ছাপ রয়েছে।'

হ্যারি বলল, 'আমার তো মনে হয়, কেউ মিস্টার স্টারের এখানে আসাটা ভাল চোখে দেখেনি। তাই উনি যাতে না আসেন, সেই চেষ্টাই করেছে।'

'কিন্তু কে সে?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বুড়ো সাইমন ফোর্ড, 'আমার গুপ্ত রহস্য এতখানি যে জেনে ফেলেছে, কি তার নাম?'

ম্যাগি বলল, 'স্যুপ যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খেয়ে নিয়ে কথা বললে হয় না?'

সুতরাং ভোজনপর্বে সকলের মন পড়ল পুরোদমে। আয়োজন নেহাত কম নয়। সবই স্কটল্যাণ্ডের খানা।

খাওয়া শেষ হতে গেল ঝাড়া একঘণ্টা। ইতিমধ্যে বার দুয়েক বাইরে গিয়ে হ্যারি চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে এসেছে। পাথর পতনের পর থেকেই ওর মনে স্বস্তি নেই। তারপর এই বেনামা চিঠি! সব মিলিয়ে তার মনের স্বাচ্ছন্দ্য উবে গেছে।

শেষ হল ডিনার। জেম্‌স্‌ স্টার বললেন, 'সাইমন, এবার তোমার গোপন কাহিনী বলে আমার কর্ণকুহর তৃপ্ত করো দিকি, বাপু।'

'কান নয়, আপনার পা দুটোকে আমার দরকার', জবাব দিলেন সাইমন, 'পথের ক্লান্তি বোধহয় নেই?'

'না, না, কিছুমাত্র নেই।'

'হ্যারি,' বললেন সাইমন, 'সেফ্‌টিল্যাম্প জ্বালাও।'

'সেফ্‌টিল্যাম্প!' সবিস্ময়ে বললেন জেম্‌স্‌ স্টার। বিস্ময়ের কারণও ছিল।

খনিতে দাহগ্যাসের অস্তিত্ব নেই। কারণ কয়লা নেই, তাই বিস্ফোরণের ভয়ও নেই, তবু সেফটিল্যাম্প কেন?

'ঝুঁকি নেওয়াটা সমীচীন হবে না', বললেন সাইমন ফোর্ড।

'ভায়া সাইমন, তারপর কি আমাকে খনির পোশাকও পরতে বলবে?'

'এখন নয়, এখন নয়—পরে।' চকচকে চোখে বললেন সাইমন ফোর্ড।

তিনটে প্রজ্জ্বলিত সেফটিল্যাম্প নিয়ে ফিরে এল হ্যারি।

কোন থেকে একটা গাঁইতি তুলে নিয়ে সাইমন ফোর্ড বললেন, 'চলুন।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কতকগুলি রহস্যজনক ঘটনা

এ কাহিনী যে অঞ্চলের, সেই হাইল্যাণ্ড আর লোল্যাণ্ডে ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী পিশাচ অশরীরী নিয়ে যে কতরকম কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। শিক্ষার বিস্তার সত্ত্বেও লোকের মন থেকে বিদেহীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি মুছে যায়নি। উপকথাকে কল্পকথা হিসেবে মেনে নেয়নি, বিশ্বাস করেছে। তাই ক্যালিডোনিয়ায় হেন লোক নেই যে কিনা প্রেত, পিশাচ আর পরীদের কাহিনী শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে পারে।

কুসংস্কার যে খনি-শ্রমিকদের মনেও শেকড় গেড়ে বসবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! তাই অন্ধকার খনির নিম্নতম প্রদেশেও বারোমেসে ভূতের উপদ্রব বর্তমান। তা না হলে ঝোড়ো রাতে পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে ঝাঁকায় কে? নতুন নতুন কয়লার স্তরের সন্ধান দেয় কে? ফায়ার-ড্যাম্প অর্থাৎ দাহগ্যাসে আগুন ধরায় কে? কে ঘটায় প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ? নিশ্চয় খনির উপদেবতারা। বেশির ভাগ স্কট-বাসিন্দা বিশ্বাস করে এইসব উদ্ভট কাহিনী।

অ্যাবারফয়েল খনিতেও অভাব নেই এ জাতীয় প্রেতবিশ্বাসীদের। এদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় জ্যাক রিয়ানের। গাইয়ে হিসাবে ও তল্লাটে জ্যাকের নাম ডাক আছে। অলৌকিক কাহিনী নিয়ে গান বেঁধে শীতের সন্ধ্যায় আসর জমাতে ওর জুড়ি নেই।

কিন্তু এসব গালগল্পে বিশ্বাস করত না। শুধু দুটি প্রাণী—সাইমন ফোর্ড আর তাঁর ছেলে হ্যারি। বছরের পর বছর পরিত্যক্ত খনি-গহ্বরে বাস করে ওরা প্রমাণ করে দিয়েছিল সব মিথ্যে, সব ভুয়ো।

শুধু প্রেত পরী পিশাচের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয়, ফোর্ড পরিবার আর

একটি তত্ত্বেও সমান অবিশ্বাসী ছিল। অ্যাবারফয়েলের কয়লার ভাঁড়ার চিরতরে ফুরিয়েছে, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি বাপ-বেটায়। তাই গত দশ বছর ধরে ওরা খনি গহ্বরে শাবল-গাঁইতি নিয়ে কেবলই খুঁজছে কয়লার স্তর। একটা দিনও বাদ যায়নি। লণ্ঠনের আলোয় পাথর ঠুকে ঠুকে কান পেতে শুনছে মনের মত প্রতিধ্বনি ফিরে আসে কিনা। ওরা শপথ করেছিল, খুঁজতে খুঁজতে যদি গোটা জীবনটাই ফুরিয়ে যায় যাক, খোঁজা বন্ধ হবে না। বাপ বিদায় নিলে, ছেলে একাই খুঁজবে—আমৃত্যু।

শুধু কয়লা-অন্বেষণই নয়, খনি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে, সে দিকেও খর নজর রেখেছিল দুজনে। থাম মেরামত করা, ছাদ অটুট রাখা, জল চোঁয়ানো বন্ধ করা ইত্যাদি সবই করতে হত দুজনকে।

এই রকম একটা কাজে তন্ময় হয়ে থাকার সময়ে হঠাৎ একদিন হ্যারি একটা শব্দ শুনেছিল। পাতাল-খনির অন্ধকার সুড়ঙ্গে কে যেন গাঁইতি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানছে দেওয়ালের ওপর।

রহস্যজনক শব্দ। কিন্তু গা ছমছম করেনি হ্যারির। দৌড়ে গেছিল শব্দের কারণ জানতে। গিয়ে কি দেখল ?

দেখল, শূন্য সুড়ঙ্গ। দেওয়ালে আলো ফেলেও গাঁইতির চোট কোথাও চোখে পড়ল না। হ্যারি ভাবল, স্রেফ শোনার ভুল।

আর একবার পাথরের একটা সন্দেহজনক খাঁজে হঠাৎ আলো ফেলতেই হ্যারির মনে হল সাঁৎ করে যেন একটা ছায়া সরে গেল। দৌড়ে গেল হ্যারি। কিন্তু মানুষ লুকোতে পারে, এমন কোনো খাঁজ বা ফাটল চোখে পড়ল না। অথচ কাউকে দেখতেও পেল না !

আর একমাসে দু-বার বিস্ফোরণের ধ্বনি শুনতে পেল হ্যারি। যেন দূরে কোথাও ডিনামাইট ফাটিয়ে কয়লার চাঙড়া খসানো হচ্ছে। দ্বিতীয়বার শব্দটা শুনে তন্নতন্ন করে খুঁজতে গিয়ে হ্যারি আবিষ্কার করল একটা ভাঙা থাম। সদ্য বিস্ফোরণের ফলে চূর্ণবিচূর্ণ।

বিস্ফোরণের জায়গাটা ভালভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে খটকা লাগল হ্যারির। বেশ গভীর গর্ত। যেন কয়লার নতুন স্তরের অনুসন্ধান চলছে। কিন্তু কে সে, কয়লার খোঁজে কে প্রেতচ্ছায়ার মত ডিনামাইট আর গাঁইতি নিয়ে ঘুরছে পাতাল-সুড়ঙ্গে ?

অদ্ভুত ! সত্যি বড় অদ্ভুত ব্যাপার !

জেমস্ স্টারের আবির্ভাবের দিন পনেরো আগে অন্ধকার সুড়ঙ্গে একাকী হাঁটছিল হ্যারি। আচমকা দেখল, প্রায় শ খানেক ফুট দূরে একটা আলো

সহসা নিভে গেল। যেন চকিতে নিভিয়ে দেওয়া হল। ধেয়ে গেল হ্যারি। কিন্তু রহস্য-বর্তিকার কোনো হদিশ পেল না।

এরপর থেকেই প্রায় আলেয়ার আলোর মত এখানে সেখানে আলো দেখা গেছে। বিদ্যুৎ-চমকের মত আলো ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেছে। কিন্তু রহস্যের কোনো কিনারা হয়নি। হ্যারিও তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অলৌকিক কাণ্ড বলেও মন মানতে চায়নি। এদিক দিয়ে বাপ-বেটায় দুজনেই একমত হয়েছিল।

এতদিন শুধু আলো, শব্দ আর ছায়া রহস্য নিয়েই বিব্রত ছিল হ্যারি। আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। কিন্তু জেম্‌স্ স্টারের পায়ের কাছে পাথর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর থেকে নতুন উদ্বেগ দেখা দিয়েছে ওর মনে। ছাদ থেকে পাথর ওভাবে খসে পড়ে না। শূন্য পথে পাথরটার গতিরেখা অনুমান করেই হ্যারি বুঝেছিল, পাথর নিক্ষেপের মূলে অন্য একটা শক্তি ছিল। কিন্তু সে শক্তি কার? এ আক্রমণের লক্ষ্য তো শুধু ইঞ্জিনীয়ার নন, ফোর্ড পরিবারও তো বটে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাইমন ফোর্ডের পরীক্ষানিরীক্ষা

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের চৌকাঠ পেরোলেন জেম্‌স্ স্টার, সাইমন ফোর্ড আর তাঁর ছেলে।

ভেন্টিলেটার-সুড়ঙ্গ দিয়ে সামান্য আলো আসছে। হ্যারির লণ্ঠন এখন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অচিরেই দরকার হবে লণ্ঠনের আলো। কারণ, ডোচার্ট পিট-এর শেষ প্রান্তে ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে চলেছেন সাইমন ফোর্ড।

মূল গ্যালারী ধরে মাইল দুয়েক যাবার পর তিনজনে একটা সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছোলেন। সুড়ঙ্গ তো নয় যেন গীর্জার গলিপথ। কাঠের ঠেকা দিয়ে আটকানো ছাদ, সাদা শ্যাওলায় ঢাকা। ফর্থ নদীর গতিপথ বরাবর সুড়ঙ্গ গেছে জমি থেকে দেড় হাজার ফুট নিচ দিয়ে।

লণ্ঠন নিয়ে আগে যাচ্ছে হ্যারি। আচমকা-লণ্ঠনের আলো পাশের একটা আঁধার-ঢাকা খাঁজে ফেলল ও। ভাবসাব দেখে মনে হল যেন সন্দেহজনক কোন ছায়া চোখে পড়েছে।

ইঞ্জিনীয়ার শুধোলেন,—'আর কদ্দুর?'

'আধ মাইল তো বটেই,' জবাব দিলেন সাইমন ফোর্ড, 'আগে এ পথ ট্রামে যেতেন, এখন হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।'

'তার মানে শেষ স্তরেরও শেষে।'

'খনির কোনো স্তরটাকেই ভোলেন নি দেখছি।'

'ভোলা কি যায়! কিন্তু সাইমন, ওর পর তো যাওয়া মুস্কিল হবে।'

'তা হবে। কয়লার শেষ চাঙড়টা ওখান থেকেই তুলে এনেছিলাম তো। শেষ ঘা-টা আমি মেরেছিলাম! তারপর ঘাড় হেঁট করে ফিরে এসেছিলাম শেষ চাঙড়ের পিছু-পিছু। কয়লা তো নয়, যেন খনির মৃতদেহ।'

কিছুক্ষণ সব চুপ। পুরোনো দিনের কথায় সবারই মন ভারাক্রান্ত।

সহসা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বুড়ো সাইমন বললেন, 'ভুল, ভুল, খনি মরেনি। আজও বেঁচে রয়েছে তার হৃদ্‌পিণ্ড, মিস্টার স্টার, খনির ধুকপুকুনি আজও থামেনি।'

'সাইমন, সত্যি করে বলো তো, কয়লার নতুন স্তরের সন্ধান পেয়েছো বুঝি!' কৌতুহল আর চাপতে না পেরে বলে উঠলেন জেম্‌স্ স্টার।

'না, মিস্টার স্টার, কোন স্তরের সন্ধান আমি পাইনি।'

'তবে কিসের?'

'স্তর যে আছে, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অকাট্য প্রমাণ।'

'কি শুনি?'

'ফায়ার ড্যাম্প অর্থাৎ কয়লা-খনির দাহ্য গ্যাস কি কখনো কয়লা না থাকলে ভূগর্ভে দেখা গেছে?'

'না, তা কি করে সম্ভব? কয়লা যেখানে নেই, ফায়ার-ড্যাম্পও সেখানে নেই। কারণ না থাকলে কার্য হবে কি করে?'

'আগুন না থাকলে যেমন ধোঁয়া হয় না, তাই না মিস্টার স্টার?'

'তা তো বটেই। কারবুরেটেড হাইড্রোজনের প্রমাণ তাহলে পেয়েছো বলো?'

'আমার মত বুড়ো খনি-ঘুঘুর কখনো ভুল হয় না, মিস্টার স্টার। আমাদের চিরশত্রু ফায়ার-ড্যাম্পকে চিনতে আমার ভুল হয় নি!'

'অন্য কোনো গ্যাসও তো হতে পারে। ফায়ার-ড্যাম্পের কোনো রঙ নেই গন্ধ নেই বললেই চলে। তাই বিস্ফোরণ না ঘটলে ফায়ার-ড্যাম্পের কথা খেয়ালই থাকে না!'

'মিস্টার স্টার, গত দশ বছর আমরা বাপ-বেটায় দিবারাত স্বপ্ন দেখেছি কিভাবে এ খনির সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়ে আনা যায়। নতুন স্তর কোথাও যদি

চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে, শপথ করেছিলাম তা খুঁজে বার করবই। কিন্তু করব কি করে? পাথর ফুটো করে? সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। কিন্তু খনি-শ্রমিক হিসাবে আমাদের যে সহজাত অনুভূতি আছে, তা অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি-বুদ্ধিকেও টেক্কা মারতে পারে। তাই ঠিক করলাম, সহজাত এই অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করব কয়লার নয়া স্তর। খনির পশ্চিম প্রান্তে বার দুয়েক আমরা আগুন দেখেছিলাম। দপ করে জলে উঠেই নিভে গেছে সে আগুন। আগুন জলেছে নিশ্চয় ফায়ার-ড্যাম্পের দরুন। আর, কে না জানে, ফায়ার-ড্যাম্প মানেই কয়লার শিরা লুকোনো রয়েছে কোথাও!'

'আগুন থেকে বিস্ফোরণ ঘটেনি?' বিস্মিত কণ্ঠে শুধোন ইঞ্জিনীয়ার।

'ছোট ছোট বিস্ফোরণ ঘটেছে—আগে যে ধরনের বিস্ফোরণ আমি নিজেই ঘটিয়েছি ফায়ার-ড্যাম্পের হাজিরা নেওয়ার জন্যে। আপনি তো জানেন, হামফ্রি ডেভী সেফটিল্যাম্প আবিষ্কার করার আগে কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফায়ার-ড্যাম্পের অস্তিত্ব পরখ করা হত।'

'মঙ্ক-এর কথা বলছো তো? ওদের কথা আমি শুনেছি, দেখিনি কোন দিন।' বললেন জেমস স্টার।

'কিন্তু আমি দেখেছি।' মৃদু হেসে জানান বুড়ো ফোর্ড, 'কারণ, আমি আপনার চাইতে দশ বছরের বড়। আমি দেখেছি সর্বশেষ মঙ্ক-কে কাজ করতে খনির পাতালে, অন্ধকারের বিভীষিকায়। মঠের সন্ন্যাসীদের মত লম্বা আলখাল্লা পরতো বলে এদের নাম হয়েছিল 'মঙ্ক' অর্থাৎ সন্ন্যাসী। আসলে ওদের নাম ছিল 'ফায়ারম্যান' অর্থাৎ আগুন-যোদ্ধা। সেকালে ছোট ছোট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপজ্জনক ফায়ার-ড্যাম্প গ্যাস জ্বালিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। নইলে এ গ্যাস খনির ছাদে গিয়ে জমা হত, তারপর যখন বিস্ফোরণ ঘটত—প্রলয় ঘটে যেত। সেই জন্যেই 'মঙ্ক' নামধারী ডানপিটেরা আপাদমস্তক পুরু কাপড়ের আলখাল্লায় ঢেকে মুখে মুখোস পরে হামাগুড়ি দিত সুড়ঙ্গে। বাতাস নির্মল থাকলে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে হত না। ডান হাতে ওরা নাড়ত জলন্ত মশাল। বিস্ফোরণের উপযুক্ত ফায়ার-ড্যাম্প জমা হলে দড়াম করে ফেটে যেত। মারাত্মক কিছু নয়। তাই দরকারমত বার কয়েক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাস্তা সাফ করে দিত আগুন-যোদ্ধা। কখনো কখনো অবশ্য বিস্ফোরণ মারাত্মক হলে যন্ত্রণায় ককিয়ে দুমড়ে মুচড়ে মারা যেত মঙ্ক। সে জায়গায় আসত আর একজন ডানপিটে। ডেভী ল্যাম্প বাজারে বেরোনোর আগে পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু ছিল। [illegible]টা আমার জানা। তাই

ফায়ার-ড্যাম্পের হাজিরা আমি টের পেয়েছি ডোচার্ড পিটে, নতুন কয়লার ঠিকানাও পেয়েছি।'

সাইমন ফোর্ড যা বললেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সেকালে এমনিভাবেই কয়লাখনির বাতাস শোষণ করা হত। সাউথ কেনসিংটন সায়ান্স মিউজিয়ামের মাইনিং গ্যালারীতে ফায়ারম্যানের মডেল এখনো দেখা যায়।

ফায়ার-ড্যাম্প, মার্শ-গ্যাস বা কারবুরেটেড হাইড্রোজেন শুধু বর্ণহীন নয়, গন্ধহীনও বটে। এ গ্যাস জ্বলে আস্তে আস্তে। শ্বাসক্রিয়া প্রায় অসম্ভব করে তোলে। কয়লাখনির পাতাল-গর্ভে এই বিষাক্ত গ্যাস জমা হতে থাকলে কোন শ্রমিকের পক্ষেই নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তার চাইতেও ভয়ঙ্কর হল, ফায়ার-ড্যাম্প যদি বাতাসের সঙ্গে আট শতাংশ, এমন, কি পাঁচ শতাংশ অনুপাতেও মিশে যায়, তাহলেই বিস্ফোরক মিশ্র-গ্যাসের উৎপত্তি ঘটে। তখন কোনোগতিকে আগুনের ছোঁয়া পেলেই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রলয়ঙ্কর সেই বিস্ফোরণের বর্ণনা আর নাই বা দিলাম।

ডেভী ল্যাম্প এই বিপদের সম্ভাবনাকে অনেকটা কমিয়ে আনে। এই বিশেষ লণ্ঠনে অগ্নিশিখা ঘিরে থাকে একটা ধাতব জালের নল। তা সত্ত্বেও কি বিস্ফোরণ ঘটে না? ঘটে। কিন্তু তার জন্যে ডেভী ল্যাম্প দায়ী নয়। অসাবধানী শ্রমিক ধূমপান করতে গিয়ে মরণ ডেকে আনে। আবার কখনো পাথরে গাঁইতির চোট পড়লে ফুলকি থেকে আগুন ধরে যায়। তবে, ফায়ার-ড্যাম্প সব কয়লাখনিতে থাকে না। স্তরে ভালো জাতের কয়লা থাকলে এক ধরনের উদ্‌বায়ী বস্তুও থাকে। তা থেকে ভুস্‌ভুস্‌ করে এন্তার ফায়ার-ড্যাম্প বেরোতে থাকে। সেফ্‌টিল্যাম্প এ ক্ষেত্রে একমাত্র সহায়।

হাঁটতে হাঁটতে সাইমন ফোর্ড ইঞ্জিনীয়ারকে বুঝিয়ে বললেন, কিভাবে খনির পশ্চিম প্রান্তে ফায়ার-ড্যাম্পের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে, ছোট বিস্ফোরণ বা আগুন জ্বালিয়ে প্রমাণ করাও হয়েছে। ফায়ার-ড্যাম্প বেরুচ্ছে সন্দেহ নেই। খুব অল্প পরিমাণে হলেও একনাগাড়ে বেরুচ্ছে।

একঘণ্টায় প্রায় চার মাইল পথ পেরিয়ে এলেন ইঞ্জিনীয়ার। উত্তেজনায় পথশ্রম বা সময় সম্বন্ধে কোন হুঁশ ছিল না ভদ্রলোকের। সাইমন ফোর্ডের কথাগুলো মনে তোলপাড় করছিলেন উনি। ভাবছিলেন, অনেক সময় পাথরের খাঁজে ছোটখাট 'পকেটে' ফায়ার-ড্যাম্প আটকে থাকে। তাও জ্বলতে জ্বলতে ফুরোয় বা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। একসময় ফুরিয়ে যায়। কিন্তু সাইমন যদি একনাগাড়ে বেরিয়ে আসা ফায়ার-ড্যাম্পের ঠিকানা পেয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কয়লা আছে সেখানে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কয়লার স্তরটা নেহাতই সামান্য, না বিশাল?

আগে আগে যাচ্ছে হ্যারি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ফাঁপা গলায় হেঁকে উঠলেন বুড়ো সাইমন, 'এসে গেছি, মিস্টার স্টার। এবার দেখা যাক—'

ইঞ্জিনীয়ার বললেন, 'আর সময় নষ্ট নয়।'

এই জায়গা থেকে পাতাল-সুড়ঙ্গ অকস্মাৎ চওড়া হয়ে বিশাল গহ্বরের আকারে অন্ধকার ভূগর্ভে নেমে গেছে। ভেন্টিলেটর নেই এদিকে। জমির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও নেই।

উদগ্র উত্তেজনায় জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন জেম্‌স্ স্টার। দেওয়ালের ওপর দেখলেন গাঁইতির দাগ। দশ বছর আগের দাগ। পাথর ফাটানোর চিহ্নও রয়েছে। পাথর এখানে খুবই কঠিন। তাই কয়লা ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফুটোনোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বালুপাথর আর কঠিন পাথরের এই শেষ সীমা থেকেই ডোচার্ট পিটের শেষ কয়লার চাঙড়া তোলা হয়েছিল দশ বছর আগে।

গাঁইতি তুলে সাইমন ফোর্ড বললেন, 'মিস্টার জেম্‌স্, পাথরের এই বাধা উড়িয়ে দিলেই ওপাশে কয়লার নতুন স্তর পাওয়া যাবে।'

'ফায়ার-ড্যাম্প এখানেই দেখা গেছে?' শুধোলেন ইঞ্জিনীয়ার।

'হ্যাঁ। দেওয়ালের ফাটলের কাছে লণ্ঠন ধরতেই ফায়ার-ড্যাম্প ধরা দিয়েছে।'

'কত উঁচুতে?'

'জমি থেকে দশ ফুট উঁচুতে।'

বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লেন ইঞ্জিনীয়ার। দুই চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইলেন পিতা-পুত্রের দিকে।

কারবুরেটেড হাইড্রোজেন পুরোপুরি গন্ধহীন নয়। জেম্‌স্ স্টারের ঘ্রাণ-শক্তি অত্যন্ত প্রখর। বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের কোনো গন্ধই তিনি পেলেন না। গ্যাসের পরিমাণ যত অল্পই থাকুক না কেন, ইঞ্জিনীয়ারের নাসিকাকে এড়িয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়। অথচ—

'ভুল করেনি তো এরা?' মনে মনে বলেন ইঞ্জিনীয়ার, 'তাও তো সম্ভব নয়। এরা জাত-শ্রমিক। বাজে কথা বলার লোক নয়। তাহলে—'

বাতাসে যে ফায়ার-ড্যাম্প নেই, হ্যারির নাকেও তা ধরা পড়েছিল। তাই অকস্মাৎ সে বলে উঠল সবিস্ময়ে, 'বাবা, ফাটল থেকে আর তো গ্যাস বেরুচ্ছে না!'

'বেরুচ্ছে না?' বলে ঠোঁট টিপে নিজেই বার কয়েক ঘ্রাণ নিলেন সাইমন

ফোর্ড। পরক্ষণে হ্যারির হাত থেকে লণ্ঠনটা ছিনিয়ে নিয়ে কাঁপা হাতে খুলে ফেললেন তার ধাতব জালটা। অনাবৃত অগ্নিশিখা জ্বলতে লাগল খোলা বাতাসে।

কোনো বিস্ফোরণ ঘটল না।

শুধু তাই নয়, শিখা চড় চড় করল না, পট পট শব্দও শোনা গেল না। ফায়ার-ড্যাম্পের পরিমাণ অল্প হলে এই সব চড়চড় পটপট কাণ্ড ঘটে।

লাঠির ডগায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে এবার মাথার ওপর তুলে ধরলেন সাইমন, কিন্তু নিষ্কম্প উজ্জ্বল অগ্নিশিখায় কোনো বিকার দেখা গেল না, ফায়ার-ড্যাম্পের অস্তিত্ব ধরা পড়ল না।

'দেওয়ালের কাছে নিয়ে যাও।' বললেন ইঞ্জিনায়ার।

তাই করা হল। সাইমন নিজে নাগাল পেলেন না, তাই হ্যারি লাঠিসমেত লণ্ঠন বাড়িয়ে ধরল ফাটলের কাছে। কিন্তু বৃথাই। কোনো চড়চড় পটপট ধ্বনি শোনা গেল না পরিষ্কার লণ্ঠন শিখায়।

না, কোনো সন্দেহই নেই, পাথুরে ফাটল থেকে ফায়ার-ড্যাম্প আর বেরুচ্ছে না।

আচম্বিতে চেঁচিয়ে উঠল হ্যারি।

'কি ব্যাপার?' শুধালেন স্টার।

'পাহাড়ের গায়ে ফাটলগুলো কে যেন বুজিয়ে দিয়েছে।'

'সে কী!' চমকে উঠলেন বুড়ো সাইমন!

'এই দ্যাখো!'

না, হ্যারির ভুল হয়নি। লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বোজানো ফাটলগুলো। বালি-সিমেণ্ট দিয়ে সদ্য বোঁজালো ফাটল। পাথরের গায়ে সাদা দাগ—কালো কয়লার পাতলা স্তরের পটভূমিকায় যে দাগ জ্বলজ্বল করছে।

'তারই কীর্তি! সে ছাড়া আর কেউ নয়!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল হ্যারি।

'তার কীর্তি মানে?' সবিস্ময়ে শুধোলেন জেম্‌স্ স্টার।

'হ্যাঁ, তারই কীর্তি! রহস্যজনক সেই আগন্তুকেরই কাণ্ড। প্রেতচ্ছায়ার মত সে পাতালগর্ভে হানা দিচ্ছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, যাকে আমি অন্তত একশবার দেখেছি, অথচ একবারও টিকির নাগাল পাইনি। মিস্টার স্টার, আপনার এখানে আসা যে চিঠি লিখে রোধ করতে চেয়েছে, কিছুক্ষণ আগেই ইয়ারো শ্যাফ্‌টের পাথুরে সুড়ঙ্গে যে পাথর ছুঁড়েছে আমাদের টিপ করে—এ সেই লোক!'

হ্যারির কথার মধ্যে এমন প্রত্যয়, এমন তেজ ফুটে উঠলো যে, ইঞ্জিনীয়ারের কাছে একটা কথাও অবিশ্বাস্য বা বাড়াবাড়ি মনে হল না। তা ছাড়া সব কিছুর প্রমাণই তো জলজ্বল করছে চোখের সামনে: কাল রাতেও যেখান দিয়ে এন্তার গ্যাস বেরিয়েছে ভুস্ভুস্ করে, আজ সেই ফাটল দিব্যি শীলমোহর করা বালি-সিমেণ্ট দিয়ে।

উত্তেজিত সাইমন ফোর্ড বললেন, 'হ্যারি, গাঁইতি নিয়ে আমার কাঁধে উঠে পড়ো তো, বাবা!'

দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। কাঁধের ওপর উঠে দাঁড়াল হ্যারি। গাঁইতির কয়েকটা প্রচণ্ড আঘাত হানল প্লাস্টার-করা ফাটলের ওপর।

গ্যাসের আওয়াজটা পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মৃদু বুদবুদ কাটার শব্দ, যেন সোডার বোতলের মুখ খুলে গেছে—ভসভস করে বেরুচ্ছে গ্যাস।

গাঁইতি নামিয়ে লণ্ঠন তুলে ধরল হ্যারি—ধরল ফাটলের মুখে।

আওয়াজ হল—ফটাস্! দেখা গেল, ছোট্ট শিখা—নীলাভ দ্যুতিঘেরা লালচে রঙের ছোট্ট শিখা—পাহাড়ের বুকে দপ করে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল আলেয়ার আলোর মত।

লাফিয়ে নেমে পড়ল হ্যারি। আনন্দে আটখানা হয়ে বুড়ো সাইমন জড়িয়ে ধরলেন ইঞ্জিনীয়ারের দু-হাত। পাতাল কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তারস্বরে 'আছে! আছে! মিস্টার জেম্স্, ফায়ার-ড্যাম্প আছে! কয়লাও আছে!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ
ডিনামাইটের বিস্ফোরণ

বৃদ্ধ সাইমন ফোর্ডের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত সফল হল। ফায়ার-ড্যাম্প থাকা মানেই কয়লা থাকা। সুতরাং কয়লার নতুন স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারোরই দ্বিমত রইল না। প্রশ্ন রইল শুধু কয়লাটা কি জাতের এবং পরিমাণে কতখানি। উত্তরটা অবশ্য যথাসময়ে জ্ঞাতব্য।

মনে ভাবেন জেম্স্ স্টার, 'কয়লা যখন আছে, তখন তা উদ্ধার করবই। তবে দশ বছর আগেকার কলকব্জাগুলো আবার নতুন করে বসাতে হবে, এই যা ফ্যাসাদ। সে ঝক্কি অবশ্যি মাথা পেতেই নেব। কয়লার শেষ না দেখে ছাড়ছি নে।'

'কি ভাবছেন, মিস্টার স্টার?' সাইমন ফোর্ড জিজ্ঞেস করেন, 'ডোচার্ট পিটে আসা কি সার্থক হয়েছে?'

'আলবৎ!' জোরের সঙ্গে বলেন জেম্‌স্‌ স্টার, কিন্তু খামাকো সময় নষ্ট না করে চলো ঘরে ফিরে যাওয়া যাক। কাল ডিনামাইট নিয়ে আসব এবং পাথর ফাটিয়ে কয়লার মুখ দর্শন করব। তারপর গড়ে তুলব নিউ অ্যাবারফয়েল কোম্পানী।'

বলা বাহুল্য, সাইমন ফোর্ড এক কথায় রাজী। মনের আনন্দে দুজনেই তখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখছেন। হ্যারি কিন্তু গুম মেরে আছে। তার মনে ভাবনার শেষ নেই। এই কয়লা আবিষ্কারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অদ্যাবধি যা যা ঘটেছে সেই সব ঘটনা একের পর এক ভিড় করে আসছে তার মাথায়। তাই ভবিষ্যতের চিন্তায় মনে তার অস্বস্তি।

পরের দিন সকালে পেট ভরে প্রাতরাশ খেয়ে সদলবলে বেরুলেন ইঞ্জিনীয়ার। এবার ফোর্ড-গিন্নী ম্যাগিও সঙ্গে গেল। সঙ্গে রইল বেশ কিছু যন্ত্রপাতি, ডিনামাইট, লণ্ঠন এবং একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা জ্বলার মত তেলসমেত একটা সেফ্‌টিল্যাম্প।

সদা হুঁশিয়ার জেম্‌স্‌ স্টার ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেখে নিলেন ফায়ার-ড্যাম্প তখনো বেরুচ্ছে কিনা। দেখলেন, বেরুচ্ছে। তবে আগের মত তেমন বেগে নয়। ফাটল বন্ধ করেছিল যে কীর্তিমান ব্যক্তিটি, আবার ফাটল বোঁজানোর চেষ্টা সে করেনি।

এবার শুরু হল পাথর খোঁড়া। ঘণ্টাখানেক শাবল-গাঁইতি চালিয়ে বেশ খানিকটা পাথর খুবলে বার করে আনা হল। তারপর কয়েকটা ছেঁদা করে ডিনামাইট-কার্টিজ ঠেসে দেওয়া হল ভেতরে। লম্বা পলতের মুখে আগুন দিয়ে জেম্‌স্‌ স্টারের দলবল সরে গেল অনেক দূরে।

বিস্ফোরণের আওয়াজ জাগল কিছু পরেই। পাতালপুরীর গোলকধাঁধা গম-গম করে উঠল সেই শব্দে।

চারজনেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গেল বিস্ফোরণের জায়গায়। গিয়ে দেখল, পাথরের বুকে জেগে উঠেছে এক গহ্বর। কাজলকালো অন্ধকার। সুগভীর।

হ্যারি লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল গর্তের মধ্যে, কিন্তু আটকালেন জেম্‌স্‌ স্টার। বললেন, 'থামো। বিষাক্ত বাতাস বেরিয়ে যাক।'

মিনিট পনেরো উদ্বিগ্ন অন্তরে অপেক্ষা করল সবাই। কারোরই যেন তর সইছে না। তারপর লম্বা লাঠির ডগায় লণ্ঠন বেঁধে গর্তের মুখে এগিয়ে দেওয়া হল। শিখা একটুও কাঁপল না, চড়-বড় শব্দ করল না, নিভে গেল না।

নিমেষে লণ্ঠন নিয়ে গহ্বরের মধ্যে উধাও হয়ে গেল হ্যারি।

গহ্বরের মুখ খুব সরু। একজনের বেশি একবারে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

তাই মুখ আগলে বাকি তিনজনে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এক-একটা মিনিট যেন এক-একটা বছর। কিন্তু হ্যারি ফিরে এল না, গলাও শোনা গেল না। মুখ বাড়িয়ে ইঞ্জিনীয়ার নিশ্ছিদ্র-অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। নিবিড় তমিস্রা যেন গিলে নিয়েছে হ্যারির লণ্ঠনকে।

গেল কোথায় হ্যারি? খাদে তলিয়ে যায় নি তো, এত গভীর খাদ যে, হ্যারির গলাও শোনা যাচ্ছে না।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন বুড়ো সাইমন ও তাঁর স্ত্রী ম্যাগি। আর থাকতে না পেরে সাইমন সবে ভেতরে পা বাড়াতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে অন্ধকারের মধ্যে আলোর আবির্ভাব ঘটল—প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর উজ্জ্বল হল ধীরে ধীরে। তারপরেই শোনা গেল হ্যারির গলা: 'মিস্টার স্টার, সুস্বাগতম্! বাবা-মা, এস! নিউ অ্যাবারফয়েলের দরজা খুলে গেছে!'

নবম পরিচ্ছেদ

অভিযান

হ্যারির চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে নতুন খনির ভেতরে ঢুকে পড়লেন জেমস্ স্টার, ম্যাগি এবং সাইমন ফোর্ড। ঢুকে দেখলেন এক বিরাট গ্যালারী। যেন মানুষের হাতে শাবল আর গাঁইতি দিয়ে খোঁড়া। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বিস্মৃত খনি। যেন আলাদীনের আশ্চর্য ম্যাজিক তাঁদের অতর্কিতে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে সেখানে।

কিন্তু তা তো নয়! সেডিমেণ্টারী পাথর গড়ে তোলার ফাঁকে ফাঁকে ভূস্তরই এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছে নিজেকে। একদিন হয়ত প্রবল প্রবাহ বয়ে গেছে এখান দিয়ে, আজ কিন্তু সব শুকনো। হাজার ফুট ভূতলের গ্র্যানাইট পাথর ক্ষয়ে গিয়ে আজও সেই প্রবাহের চিহ্ন ধরে রেখেছে আপন বুকে। বাতাস বিশুদ্ধ। বেশ বোঝা যায়, বাইরের জগতের হাওয়ার সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে কোথাও।

ফায়ার-ড্যাম্প? নিশ্চয়ই 'পকেটে' জমেছিল খানিকটা। এখন তা নিঃশেষিত। তবুও সাবধানের বিনাশ নেই। হ্যারি তাই বারো ঘণ্টা একনাগাড়ে জ্বলার উপযুক্ত সেফটিল্যাম্প সঙ্গে নিয়েছে।

অভিযাত্রীদের অন্তরে আনন্দের জোয়ার—মুখে তাই কথা নেই। চারিদিকে শুধু কয়লা আর কয়লা। অফুরন্ত এই কয়লার ভাণ্ডারের মাঝে এসে সাইমন ফোর্ডও যেন বোবা হয়ে গেছেন।

সামনে যখন আর বাধা নেই, তখন এগুতে ক্ষতি কি ? তাই অভিযাত্রীরা আনন্দে ডগমগ হয়ে ঘণ্টাখানেক হনহন করে হেঁটেই গেলেন। আরও যেতেন, যদি না চওড়া গ্যালারীটা আচমকা ফুরিয়ে যেত।

গ্যালারীর পরেই প্রকাণ্ড একটা গহ্বর। উচ্চতা বা গভীরতা বুঝি হিসেবের বাইরে। অন্ধকারের মধ্যে ছাদ কোথায় ঠেকেছে বা সামনের দেওয়াল কদ্দূরে আছে—কিছুই দেখা গেল না। লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল শুধু একটা জিনিস: জল। কালো কাঁচের মত স্থির জল। বিশাল একটা সরোবরে তীরে দাঁড়িয়ে আছে অভিযাত্রীরা। এবড়োখেবড়ো খোঁচা খোঁচা পাথরের বলয়ে বেষ্টিত সেই বিশাল হ্রদের বুঝি শেষ নেই।

ফোর্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হল্ট্! আর এগোলেই ডুব দিয়ে পাতালে পৌঁছোতে হবে।'

ইঞ্জিনীয়ার বললেন, 'তাছাড়া আমাদের ফেরাও তো দরকার।'

সাইমন ফোর্ড বললেন, 'তা তো বটেই। এবার বলুন দিকি মিস্টার জেম্স্, আপনি কি খুশী ?'

'আলবৎ খুশী।' জবাব দিলেন ইঞ্জিনীয়ার, 'সাইমন, যেটুকু দেখলাম, তা থেকেই বলা যায় একশো বছরেও এ খনি শেষ করা যাবে না।'

'বলেন কি, মাত্তর একশো বছর!' সহর্ষে বললেন সাইমন ফোর্ড, 'আমার তো মনে হয়, হাজার বছরেও এ ভাঁড়ার খালি হবে না!'

'ভগবান তাই করুন,' বললেন জেম্স্ স্টার, 'কয়লার জাতটা কেমন ?'

'চমৎকার! নিজেই দেখুন না।' বলেই গাঁইতির এক ঘায়ে কয়লার একটা চাকলা খসিয়ে আনলেন বৃদ্ধ সাইমন, 'কি দেখছেন ? চকচকে কয়লা, তাই না ? তার মানেই তো এ কয়লা সেরা জাতের, এ কয়লার শৈলজ তেল, মানে কিনা, বিটুমিনাস বস্তু যতখানি আছে, ততখানি আর আর কোনো কয়লায় নেই। আরও দেখুন, কত সহজে ভেঙ্গে যাচ্ছে। অথচ ধুলো হচ্ছে না। মিস্টার জেম্স্, বিশ বছর আগে হলে এ খনি সনসী আর কারম্ফিকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিত!'

বাতির আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়লার চাকলাটা দেখতে দেখতে জেম্স্ স্টারও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'জাত কয়লা বটে, কোনো সন্দেহ নেই। চলো, আজ এই কয়লা দিয়েই কেটলি গরম করা যাবে।'

হ্যারি বললে, 'মিস্টার জেম্স্, আমরা গ্যালারী দিয়ে কোন্ দিকে এসেছি বলুন তো ?'

'কম্পাস থাকলে ঠিক বলা যেত।'

সাইমন ফোর্ড বলে উঠলেন, 'আমি বলতে পারি। আমরা রয়েছি স্টার্লিংয়ের পাতালে—'

'ও কিসের শব্দ ?' সহসা বলল হ্যারি।

কান খাড়া করতেই সবাই শুনলেন শব্দটা। অনেক দূর থেকে যেন অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে আসছে। শব্দটা আসছে মাথার ওপর থেকে। ভূস্তরের পাথুরে জমিতে কিসের একটা গুমগুম শব্দ উঠছে আর পড়ছে—বিরামবিহীনভাবে।

কিছুক্ষণ কারো মুখে রা খসল না। সবাই উৎকর্ণ এবং বিস্মিত।

পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠলেন বুড়ো সাইমন, 'আরে! নিউ অ্যাবারফয়েলের রেলপথে ট্রাক চলা শুরু হয়ে গেল নাকি ?'

হ্যারি বললে, 'বাবা, এ শব্দ ঢেউয়ের শব্দ। সমুদ্রতীরে ঢেউ আছড়ে পড়ছে!'

'তার মানে কি আমরা সাগরের তলায় ? অসম্ভব!'

'না, অসম্ভব নয়,' বললেন ইঞ্জিনীয়ার, 'হয়তো আমরা লক ক্যাটরিন-এর ঠিক নিচেই গুলতানি করছি।'

'তাহলে ছাদ নিশ্চয় তেমন পুরু নয়। নইলে শব্দ আসছে কি করে ?'

'না, খুব পুরু নয়। সেই কারণেই এ গহ্বর এত বিশাল।' বললেন জেম্স্ স্টার, 'তার ওপর বাইরের আবহাওয়াও ভাল নয়। ঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্র ফুঁসছে বলেই ঢেউয়ের গজরানি শুনতে পাচ্ছি।'

'থাকলেই বা সাগরের তলায় ? কয়লা তুলতে দোষ কি ?' বললেন সাইমন ফোর্ড।

'কোনো দোষই নেই। বরং সাগরের তলা দিয়ে আটলান্টিকের মেঝে খুঁড়ে এমন এক পেল্লায় সুড়ঙ্গ আমরা বানাবো যার ভেতর দিয়ে অনায়াসেই পৌঁছানো যাবে মার্কিন মুলুকে।' বললেন ইঞ্জিনীয়ার।

'ঠাট্টা করছেন নাকি ?' সন্দিগ্ধ স্বর সাইমনের।

'পাগল! খালি তোমারই উৎসাহে যা একটু অসম্ভবের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলাম। কিন্তু সে কথা যাক। এখন তো ফেরা দরকার। গাঁইতি এখানেই থাকুক। ফিরে এসে কাজ করা যাবে 'খন। চলো, ঘরে ফিরি।'

পথ হারানোর কোনো ভয় নেই। কারণ, গ্যালারীর মধ্যে সিধে পথ চলে গেছে ডোচার্ট পিটের দিকে। আগে আগে মাথার ওপর লণ্ঠন উচিয়ে চলেছে হ্যারি। হুঁশিয়ার চোখে দুপাশের শাখা সুড়ঙ্গ ছেড়ে এগিয়ে চলেছে মূল গ্যালারী ধরে। এমনি করে এক মাইল পথ পার হল তারা। কোন অসুবিধেই নেই। আর তারপরেই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল সেই ঘটনা।

আচম্বিতে যেন এক জোড়া অদৃশ্য ডানার ঝটপটানিতে ধড়ফড় করে উঠল বাতাস। এক ধাক্কায় হ্যারির হাতের লণ্ঠন ঠিকরে পড়ল পাথুরে মেঝেতে—পড়েই চুরমার হয়ে গেল।

নিবিড় অন্ধকারে নিমিষে তলিয়ে গেলেন জেম্‌স স্টার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ। লণ্ঠনের তেল ছড়িয়ে গেছে পাথরে। সুতরাং আলো আর জ্বলবে না।

সবাই বিস্মিত হতভম্ব। কারো মুখে কথা নেই। কি এক অজানা আতঙ্কে সবাই যেন বোবা হয়ে যায় কিছুকালের জন্য। কে এই অদৃশ্য শত্রু? কেন তার এই শয়তানি? পাতাল-বিবরে ঘাপটি মেরে থেকে কুচক্রী শয়তান কি উদ্দেশ্যে বারে বারে হামলা করছে তাদের ওপর? নতুন আবিষ্কৃত দুর্গম এই কয়লাখনিতে সে কি কোন নবাগতের আবির্ভাব চায় না? কেন চায় না?

এই একই চিন্তা মুহূর্তে সবাইকে যেন গ্রাস করে ফেলে।

এখনও পাঁচ মাইল যেতে হবে। ডোচার্ট পিটে ঢুকে আরও ঘণ্টাখানেক হাঁটলে তবেই পৌছানো যাবে পাতাল-কুটিরে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ নিবিড় আঁধারে আরও দীর্ঘ। কারণ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ চলা মানেই সময় দ্বিগুণ লাগা।

সাইমন ফোর্ড হঠাৎ হেঁকে উঠলেন, 'ঘাবড়াও মাৎ। আমাদের অন্ধকারে চলা অভ্যেস আছে। অন্ধের মত হাঁটবো, কিন্তু পথ হারাবো না। হ্যারি, পথ দেখাও। সবাই একসঙ্গে থাকুন।'

শুরু হল অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে পথ চলা। কারও মুখে শব্দ নেই। সবারই মনে ভয় আর উদ্বেগ: কে এই অদৃশ্য শয়তান? কি তার উদ্দেশ্য? চোখের সামনে আলকাতারার মত কালো অন্ধকার। সে অন্ধকার এত ঘন যে অতর্কিতে কেউ হানা দিলে আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়।

কিন্তু বাহাদুর বটে হ্যারি! অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে আঙুলের ডগায় দেওয়াল ছুঁয়ে, প্রতিটি ফাটলে হাত বুলিয়ে, শাখা-সুড়ঙ্গ পাশ কাটিয়ে ঠিক এগিয়ে চলল মূল গ্যালারী ধরে। এক ঘণ্টার পথ দু'ঘণ্টায় শেষ হল।

সাইমন শুধোলেন, 'গ্যালারী শেষ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ডোচার্ট পিটে ঢুকবার সুড়ঙ্গ পেয়েছো?'

'না।' বাস্তবিকই, হ্যারির হাতে নিরেট পাথর ছাড়া আর কিছুই ঠেকছে না।

বুড়ো সাইমন এবার নিজেই এগিয়ে গেলেন। নিজেই পাথরের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পথ খুঁজতে লাগলেন।

তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন ভয়ার্ত কণ্ঠে : হয় তাঁরা পথ হারিয়েছেন, না হয় ডিনামাইট দিয়ে ফাটানো পাথরে সুড়ঙ্গ কেউ বন্ধ করে দিয়েছে।

নিউ অ্যাবারফয়েলে কয়েদ হলেন সাঙ্গপাঙ্গসহ জেম্‌স স্টার!

দশম পরিচ্ছেদ

আগুন-ডাইনী

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জেম্‌স স্টারের বন্ধুবান্ধবরা। ইঞ্জিনীয়ার শুধু নিরুদ্দেশ নন, নিখোঁজ হওয়ার একটা জুৎসই কারণও মিলছে না। চাকরকে জিজ্ঞেস করে শুধু জানা গেল, জেম্‌স স্টার গ্র্যানটনশায়ার থেকে জাহাজে উঠেছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ক্যাপ্টেন নিবেদন করলেন, মিস্টার স্টারকে তিনি স্টার্লিংয়ে নামিয়ে দিয়েছেন। তার পর থেকে ভদ্রলোকের আর খবর নেই। সাইমন ফোর্ড চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, খবরটা যেন পাঁচকান না হয়। জেম্‌স স্টার সে অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে রেখেছেন। অ্যাবারফয়েলের খনি-অঞ্চলে যাচ্ছেন, এ কথা কাউকে বলেন নি।

কাজেই হইচই পড়ে গেল এডিনবরাতে। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল ইঞ্জিনীয়ারের অন্তর্ধান-রহস্য! রয়াল ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্ট স্যার ডব্লিউ এল্‌ফিন্স্‌টোন সমিতির অধিবেশনে জেম্‌স স্টারের একটা চিঠি দাখিল করলেন। সভায় হাজির থাকতে না পারার দরুন ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। এ রকম চিঠি আরো দু-তিনখানা বেরুলো। জানা গেল, তিনি এডিনবরাতে নেই। কিন্তু কোথায় আছেন সে তথ্য রহস্যাবৃত হইল। অথচ এ রকম বেয়াড়া ক্রিয়াকলাপ নাকি তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। কাজেই প্রথমে যে বিস্ময় জেগেছিল, তা থিতিয়ে গিয়ে উদ্বেগ দেখা দিল।

বন্ধুরা কেউই আঁচ করতে পারল না যে, উনি অ্যাবারফয়েলে গেছেন। কিন্তু যেহেতু জাহাজ থেকে তিনি স্টার্লিংয়ে নেমেছেন, অতএব তল্লাসি-পর্ব ঐ অঞ্চলেই প্রসারিত হল।

কিন্তু বৃথাই। ইঞ্জিনীয়ারকে ও তল্লাটের কেউ দেখেনি। দেখেছিল শুধু একজনই। জ্যাক হ্রিয়ান। কিন্তু তার আস্তানা অ্যাবারফয়েল থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। তাছাড়া গানবাজনা নিয়ে সে তখন এতই ব্যস্ত যে ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে যে অনেক হোমরা-চোমরা ব্যক্তিরই মাথাব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে, তা জানতেও পারল না।

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ল এবার। গোয়েন্দা বহাল করা হল। নামী দৈনিকগুলোয় ইস্তাহার ছাপা হল। ইঞ্জিনীয়ারের চেহারার বর্ণনা দেওয়া হল। কবে এডিনবরা ছেড়েছেন, তাও লেখা হল। সবাই জানল, ইংল্যাণ্ডের তথা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সহসা হারিয়ে গেছেন—বুঝি বা চিরকালের জন্য।

হ্যারি ফোর্ডকে নিয়ে একজন ছাড়া কেউ মাথা ঘামাল না। সে জ্যাক রিয়ান। আরভিন উৎসবে হ্যারি আসবে কথা দিয়েছিল। না আসায় খুবই মনঃক্ষুন্ন হল জ্যাক। গান গাইতে গিয়ে বহুবার তাল কাটল। হ্যারির অভাবে অমন নাচ-গান বাজনায় ভরা উৎসবটাই মাঠে মারা গেল জ্যাকের কাছে। খবরের কাগজে জেম্স স্টারের অন্তর্ধান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি তখনো ওর কাছে পৌঁছোয় নি। তাই উৎসবের পরের দিনই ও ঠিক করল, গ্লাসগো থেকে ট্রেনে চেপে ডোচার্ট পিটে গিয়ে হ্যারিকে এক হাত নেবে। কি তার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। মরতে মরতে বেঁচে গেল বেচারা জ্যাক রিয়ান।

অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল বারোই ডিসেম্বর রাতে। অলৌকিক কাণ্ডকারখানার নাম শুনলে নাক সিঁটিয়ে 'ফুঃ' করত যারা তাদেরও চোয়াল ঝুলে পড়ল এই ঘটনার পর। মেলরোজ ফার্মে তাহলে ভূতপ্রেত দত্যিদানো ডাকিনীযোগিনীর অভাব নেই? সর্বনাশ! সর্বনাশ!

স্কটল্যাণ্ড উপকূলে আরভিন একটা ক্ষুদে সমুদ্র বন্দর। ফির্থ অব ক্লাইডের মুখের কাছেই আকস্মিক এক বাঁক, তার মধ্যে অবস্থিত এই সুরক্ষিত পোতাশ্রয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোকস্তম্ভ আছে। কোথায় চোরাপাহাড় আর কোথায় উপকূল তা দেখিয়ে দেয় এই আলোক সংকেত, পাকা নাবিকরা সংকেত দেখেই হুঁশিয়ার হয়—সিধে পথে চলে। ফির্থ অব ক্লাইড হয়ে গ্লাসগো যাওয়ার পথে অথবা আরভিন উপসাগরে প্রবেশের সময় তাই এ অঞ্চলে জাহাজডুবি বড় একটা ঘটে না। জাহাজ, কাছেই থাকুক কি দূরেই থাকুক, অমাবস্যার অন্ধকারে বা দারুণ ঝড় জলেও অনেকে সংকেত দেখে পথ চিনে নেয়।

আরভিন শহরে একটা ভাঙা কেল্লা আছে। এক কালে এক কেল্লা প্রাসাদের মালিক ছিলেন রবার্ট স্টুয়ার্ট। স্কটল্যাণ্ডের যত্রতত্র এমনি ভগ্নস্তূপ যে কত ছড়িয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। আর, সব জায়গাতেই নাকি নরক গুলজার করে তুলেছে অন্ধকারের অশরীরীরা। হাইল্যাণ্ডের আর লোল্যাণ্ডের সর্বত্রই এ বিশ্বাস অল্পবিস্তর সবারই মনে আছে।

উপকূলে কেল্লা আরও অনেক আছে। কিন্তু সব চাইতে পুরোনো বলে রবার্ট স্টুয়ার্টের ডানডোনাল্ড কেল্লা-প্রাসাদের নামই সর্বাধিক।

ডানডোনাল্ড কেল্লা-বাড়ীতে জনমানব থাকে না। থাকে শুধু ও অঞ্চলের যত উদ্বাস্তু কায়াহীন। শহর থেকে দু মাইল দূরে উঁচু টিলার ওপর গড়া ভুতুড়ে কেল্লার ছায়া মাড়াতেও কেউ আসে না। যাদের অ্যাডভেঞ্চারের বাতিক আছে, এমনি দু-চারজন আগন্তুক আসে ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে ঘুরঘুর করতে, কিন্তু তাদের একাই আসতে হয়—সঙ্গী কেউ হয় না। লাখ টাকা দিলেও শহরের মার্কামারা ডানপিটেও সঙ্গে আসবে না। ভাঙা কেল্লাকে নিয়ে অনেক কাহিনী শোনা যায়। সব চাইতে লোমহর্ষক কাহিনী 'আগুন-ডাইনী'দের নিয়ে। কেল্লাটি নাকি ওরাই দখল করেছে।

শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা পয়লা নম্বরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারা তো দিব্বি গেলে বলে, তারা নাকি এই ভয়-দেখানো ভয়ানকদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া চেহারা স্বচক্ষে দেখেছে। বলা বাহুল্য, এদেম মধ্যে জ্যাক রিয়ান অন্যতম।

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতও নয়। বাস্তবিকই ডানডোনাল্ড কেল্লা-বাড়ীতে হরবখৎ দাউ-দাউ অগ্নিশিখা দেখা যায়। কখনো ভাঙা পাঁচিলে, কখনো বা উঁচু মিনারের চূড়ায় লাফিয়ে ভৌতিক নাচ নাচে এই রহস্যময় অগ্নিশিখা।

আগুনের শিখাকে দেখতে আগুন-ডাইনীর মত কিনা, বা আদৌ সেই অগ্নিশিখার নাম আগুন-ডাইনী হওয়া উচিত কিনা—সে প্রশ্ন বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সদুত্তর নিশ্চয়ই মিলবে। কিন্তু তা দেখছে কে? কুসংস্কারের কুয়াশার মধ্যে বিভ্রম দেখা এক জিনিস আর খাঁটি পদার্থ বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বিশ্লেষণ করা আর এক জিনিস।

মোট কথা, আগুন-ডাইনীদের ভুতুড়ে নাচ শহরের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় জবর আতঙ্ক। কেন না অমন যে গান-পাগল জ্যাক রিয়ান, সে-ও ডাইনী-নাচের তালে ব্যাগপাইপ বাজাতে সাহস পায় না।

'বাপরে! ওসব নারকীয় অর্কেস্ট্রার মধ্যে আমি নেই।' বলে জ্যাক।

প্রায় সন্ধ্যাতেই গল্পের আড্ডা বসে শহরের ঘরে ঘরে। আড্ডায় ভূতের গল্পই হল সব চাইতে জমাটি গল্প, বিশেষ করে আগুন-ডাইনীদের কীর্তিকলাপ। এ ব্যাপারে জ্যাকের জুড়ি নেই।

উৎসবের শেষ রাতে আনন্দ-ফুর্তির উদ্দাম স্রোতে মেজাজ ভাসিয়ে এমনি গল্পই জমিয়েছে জ্যাক। শ্রোতারাও লোম-খাড়া করে শুনছে অলৌকিক সেসব কাণ্ডকারখানা। ঘরের ঠিক মাঝখানে বসানো তেপায়া লোহার আঙটায় গনগনে কয়লার আঁচে গল্পের মৌতাত রীতিমত জমে উঠেছে।

বাইরে ঝড়ের ঘনঘটা। কালির মতো কালো অন্ধকার। আকাশে নিশ্ছিদ্র মেঘের রাশি। সাগরে গড়াচ্ছে কুয়াশার তাল। দক্ষিণ-পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় বাতাস বিক্ষুব্ধ, ঢেউ উত্তাল। আকাশ, পৃথিবী আর জল যেন নিবিড় তমিস্রায় মিশে একাকার হয়ে গেছে। বাতাস বইছে উপকূলের দিকেই। এহেন দুর্যোগময় রাতে আরভিন উপসাগরে জাহাজ ভেড়ানো মানেই আত্মঘাতী হওয়া।

অবশ্য আরভিনের ক্ষুদে জাহাজঘাটায় তেমন ভারী জাহাজ কখনো আসেও না। ছোট জাহাজের যাতায়াতও ঘন ঘন নেই। তাই সেই রাতে উপকূলের দিকে একটা জাহাজকে ছুটে আসতে দেখে চোখ কপালে উঠল জেলেদের। সব কটা পাল তুলে দিয়ে পড়ি কি মরি করে ধেয়ে আসছে জাহাজটা। এ তো বড় ভয়ানক কথা! উপসাগরের মুখ যদি তার চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে চোরাপাহাড়ে তো আর আশ্রয় মিলবে না। বরং আরও কিছুক্ষণ এভাবে এগোলে জাহাজ যে ছাতু হয়ে যাবে!

জ্যাক রিয়ান সেই মুহূর্তে একটা রোমাঞ্চকর গল্পের উপসংহার টানছে। শুনতে শুনতে গা ছমছম করছে শ্রোতাদের। মনের এ অবস্থায় কোনো কিছুই অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

আচম্বিতে হট্টগোল শোনা গেল বাইরে।

আমার গল্প ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো—বলে দলবল নিয়ে জ্যাক রিয়ান ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে।

গিয়ে দেখল, পিচের মত কুচকুচে কালো আঁধার। দেখল, ঝড়-বৃষ্টি লুটোপুটি খাচ্ছে উপকূল বরাবর। আর দেখল, জনাতিনেক ছেলেকে, পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

দৌড়ে গেল জ্যাক রিয়ান। বন্ধুরাও এল পেছনে।

গিয়ে শুনল চেঁচামেচিটা ওদের টনক নড়ানোর জন্যে নয়—আগুনের জাহাজের মাঝিমাল্লাদের সংবিৎ ফেরানোর জন্য। ওরা করছে কি? না জেনে যে মরতে চলেছে? জাহাজ যে খান্ খান্ হয়ে যাবে একটু পরেই। কিছু দূরেই দেখা যাচ্ছিল একটা বস্তুর ছায়া, যেন একতাল মিশমিশে অন্ধকার··· সমুদ্রের বুকে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে ভাসমান বস্তুটা···অন্ধকারের মধ্যে আলোর কণা, পালের সাদা আভাস আর গলুইয়ের সবুজে-রঙা বাতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা একটা জাহাজ। পাথরের দিকে তীরবেগে ছুটে আসছে জাহাজখানা।

'সিগন্যাল দেখাও! সিগন্যাল!' চেঁচিয়ে উঠল একজন।

'সিগন্যাল দেখাও বললেই কি দেখানো যায়? ঝড়ের দাপটে একটা মশালই জ্বালাতে পারছি না, তার আবার সিগন্যাল!' বলল এক জেলে।

কাজেই গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করা ছাড়া পথ নেই। কিন্তু বুনো মোষের ক্ষ্যাপা নিশ্বাসের মত ঝড়ের হুহুঙ্কার পেরিয়ে কোনো শব্দই বুঝি পৌঁছোচ্ছে না দুর্ভাগা জাহাজে।

'ব্যাপার কি?' শুধোলো এক জেলে।

'ডাঙায় নামতে চায়, মনে হচ্ছে?' বলল আরেকজন।

'ক্যাপ্টেন কি আরভিন-আলো সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখে না?' বলল জ্যাক রিয়ান।

'তাই তো মনে হয়,' বলল এক জেলে। বলেই থমকে গেল। কারণ আচম্বিতে বিকট চিৎকার করে উঠেছে জ্যাক রিয়ান।

দেখা গেল, জলের দিকে নয়, ডাঙার ভেতরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে জ্যাক। আধ মাইল দূরে ডানডোনাল্ড কেল্লা-বাড়ীর ভাঙা মিনারের চূড়ো থেকে লকলক করে লাফিয়ে উঠেছে এক ভৌতিক অগ্নিশিখা—ঝড়ের মুখে কাঁপছে, দুলছে, এঁকেবেঁকে নাচছে সেই আশ্চর্য আগুন।

'আগুন-ডাইনী! আগুন-ডাইনী!' কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্কটল্যাণ্ডবাসীরা এবার একযোগে আর্তনাদ করে উঠল।

নৃত্যপর সেই অগ্নিশিখার সঙ্গে মানব-দেহের সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে অবিশ্যি কড়া ডোজের কল্পনা দরকার, তবে বাতাসের বুকে জলন্ত নিশানা উড়িয়ে শিখাটা যেন মাঝে মাঝে গোটা টাওয়ারটাকেই জড়িয়ে ধরছে; মনে হচ্ছে, এই বুঝি মিলিয়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই যেতে গিয়েও লেগে থাকছে তার নীলচে প্রান্ত।

'আগুন-ডাইনী! আগুন ডাইনী!' ভয়ার্ত চিৎকার ঝড়ের ধমকানিকেও এবার ছাপিয়ে উঠল।

জাহাজ ছুটে আসার রহস্যও বোঝা গেল এবার। কুয়াশায় পথ হারিয়ে ডানডোনাল্ড কেল্লা-বাড়ীর অগ্নিশিখাকে আরভিন-আলো ভেবে ভুল করেছে ক্যাপ্টেন। মনে করেছে, উপসাগর সামনেই। অথচ উপসাগর তখনও দশ মাইল উত্তরে। কাজেই আগুন-ডাইনীর ছলনায় দিশেহারা জাহাজ ছুটে আসছে সেইদিকে যেদিকে রয়েছে পাথর ও ডাঙা—ধ্বংস আর মৃত্যু!

কি করা যায়? কেল্লায় উঠে আগুন নেভাবে? কিন্তু এতবড় বুকের পাটা আছে কার? আগুন-ডাইনীর ডেরায় ঢোকার মত ডানপিটে এ দলে

কে আছে? জ্যাক রিয়ান? বেপরোয়া জ্যাক রিয়ান হয়ত কোমর বাঁধত, কিন্তু আর সময় নেই। ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ভেসে এল ভয়ঙ্কর মড়মড় শব্দ।

চোরাপাহাড়ে আছড়ে পড়ছে পথহারা জাহাজ। আলো নিভে গেছে। মড়মড় শব্দে পাথরের মধ্যে পথ করে নিয়ে ফেনাময় বেলাভূমির ওপর আস্তে আস্তে কাৎ হয়ে পড়ছে জাহাজখানা।

আর কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত কাকতালীয়! ঠিক সেই সময়ে সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল সুদীর্ঘ সেই অগ্নিশিখা—যেন অদৃশ্য দানবের এক ফুৎকারে মিলিয়ে গেল আগুন-ডাইনীর অট্টহাসি। সমুদ্র, পৃথিবী, আকাশ নিমেষে তলিয়ে গেল মিশমিশে তমিস্রায়।

শেষবারের মত 'আগুন-ডাইনী' বলে তারস্বরে চিৎকার ছাড়ল জ্যাক রিয়ান। অশরীরী প্রেতিনীর অগ্নিময় কায়া অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসীম আতঙ্ক যেন মূর্ত হয়ে উঠল সেই চিৎকারে।

পরমুহূর্তেই সাহস ফিরে এল। শুধু জ্যাক রিয়ানের নয়, সকলের। ভূতের ভয়ে রোমাঞ্চিত মানুষগুলো সহসা বিপন্ন নাবিকদের কথা ভেবে বেপরোয়া হয়ে উঠল। কোমরের দড়ি বেঁধে ছুটে গেল সাগরতীরে।

ক্যাপ্টেন আর জনাআষ্টেক নাবিককে টেনে তোলা হল জল থেকে।

কিন্তু কাঠের গুঁড়ি বোঝাই 'মোটালা' জাহাজের খণ্ডবিখণ্ড অংশগুলো নাচতে লাগল তাথৈ তাথৈ তরঙ্গের মাথায় মাথায়।

উদ্ধারকার্যে আহত হয়েছিল জ্যাক রিয়ান এবং আরও তিন জন। বেচারা জ্যাককে একটা বিরাট ঢেউ শূন্যে তুলে নিয়ে আছাড় মেরেছিল পাথরের ওপর। সঙ্গীরা কোমরের দড়ি ধরে টেনে না তুললে জ্যাক আর বাঁচত না।

কাজেই কাহিল শরীর নিয়ে দিন কয়েক বিছানায় শুয়ে থাকতে হল ডানপিটে জ্যাককে। শুয়ে শুয়ে ও খালি গান গাইত আর ভাবত, ভূতপ্রেত নেই বলে কে? না থাকলে 'মোটালা' জাহাজকে ভুলিয়ে এনে ডাঙায় আছাড় মারল কেন?

ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত শুরু করলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা একযোগে বললে, জাহাজ ভেঙেছে ডানডোনাল্ড কেল্লা-বাড়ীর অলৌকিক আগুনের দরুন। ঝড়জলের আঁধার রাতে লেলিহান আগুন দেখে ক্যাপ্টেন ভুল করেছিলেন। সুতরাং জাহাজকে পথ ভুল করানোর জন্য দায়ী আগুন-ডাইনীরা।

কিন্তু বিচারকর্তারা তো এসব অতিপ্রাকৃত কাহিনী নিয়ে কারবার করেন না। তাঁরা চান প্রমাণ। আগুন যখন জলছে, নিশ্চয় সে আগুন কেউ

জালিয়েছে। কিন্তু সে কে? আগুন জালাটা নেহাতই দুর্ঘটনা, না বিদ্বেষপ্রসূত? এককালে ব্রিটন-উপকূলে লুঠেরারা এই কুকীর্তি করত। আলো দেখিয়ে পথ ভুলিয়ে জাহাজ ধ্বংস করে লুঠপাঠ করাই ছিল তাদের রুটি রোজগারের একমাত্র পথ। কখনো রজনভরা গাছ জালিয়ে দেওয়া হত ঘোর অমানিশায়। কখনো মোষের শিংয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হত। শেষকালে আইন করে কড়া শাস্তির বিধান দিয়ে বর্বরোচিত এই ব্যবসা বন্ধ করা হয়। 'মোটালা' জাহাজ ধ্বংসের মূলেও এরকম কোনো কুঅভিসন্ধি নেই তো?

পুলিশ ডানডোনাল্ড কেল্লা-বাড়ীতে গিয়ে তন্নতন্ন করে সব কিছু দেখল। পরী বা উপদেবতার পায়ের ছাপ মাটিতে না পড়তে পারে, কিন্তু মানুষের তো পড়ে। কিন্তু ভিজে মাটিতে নতুন-পুরোনো কোনো পদচিহ্নই পাওয়া গেল না।

মিনারের অত উঁচু চূড়োয় কি করে আগুন জালানো হল, তাই নিয়ে ভাবতে বসল পুলিশ। কিন্তু অনেক খুঁজেও দেশলাইয়ের কাঠি বা কাগজের পোড়া টুকরোও কোথাও পাওয়া গেল না। তবে কি ঘাস জালানো হয়েছে? অথবা কাঠ? কিন্তু সে সবেরও তো দগ্ধাবশেষ নেই! না আছে জালানি না আছে কাঠকয়লা, না আছে ছাই! আগুন জ্বললে ভুষিকালি লেগে পাথর কি মিনার কালো হওয়া উচিত। কিন্তু সেরকম কালো দাগও নেই কোথাও!

তাহলে হয়তো আগুন কোন দুষ্ট লোকের হাতেই জ্বলেছে। কিন্তু তাও তো সম্ভব না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বহু মাইল দূরে সমুদ্রবক্ষ থেকে যে বিশাল আগুনের লেলিহান শিখা কুয়াশা ভেদ করে দেখেছে, তা মানুষের হাতে আঙটায় বা মশালে জ্বলা সম্ভব নয়।

সুতরাং পর্বতের মূষিক প্রসবই সার হল। তদন্ত শেষ হল। পুলিশের মুখ চুন হল। আর ভূতবিশ্বাসীদের প্রেত-বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেল।

জ্যাক রিয়ান তো বলেই ফেলল, 'আরে বাবা! আগুন-ডাইনী দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন-জালায় না। তাদের নিঃশ্বাসে বাতাসে আগুন ধরে যায়—কাঠকয়লার একটা কণাও দরকার হয় না।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্যাক রিয়ানের অদ্ভুত সাহস

সারা গায়ের কালসিটা আর মচকানির ব্যথা পুরোপুরি যেতেই দিন দুই পরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল জ্যাক। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে রওনা হল স্টেশনের দিকে। উদ্দেশ্য :- বাল্যবন্ধু হ্যারিকে ঝেড়ে কাপড় পরানো।

স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক, এমন সময়ে চোখে পড়ল দেওয়ালে সাঁটা এক পোস্টার :

'গত ৪ঠা ডিসেম্বর এডিনবরার ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্ স্টার গ্র্যান্টন পায়ার থেকে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ জাহাজে যাত্রা করেন। সেই দিনই তিনি স্টার্লিংয়ে অবতরণ করেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খবর নেই।

'এঁর সম্বন্ধে যদি কারও কিছু জানা থাকে, তাহলে তিনি যেন দয়া করে এডিনবরার রয়াল ইন্সটিটিউসনের প্রেসিডেন্টকে খবর দেন।'

প্রাচীর-পত্রের বিজ্ঞপ্তি পড়ে চোখ কপালে উঠল জ্যাকের। একবার পড়ে বিশ্বাস হল না, পড়ল আর একবার। তারপর সবিস্ময়ে আপন মনেই বললে, 'তাজ্জব কথা তো! ৪ঠা ডিসেম্বরই তো হ্যারির সঙ্গে মিস্টার স্টারকে দেখলাম ডোচার্ট পিটের মইতে! সে তো দশ দিন আগেকার কথা! তারপর থেকে ভদ্রলোক নিরুদ্দেশ! এবার বুঝলাম, কেন হ্যারি আসেনি উৎসবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন এল। রয়াল ইন্সটিটিউসনের প্রেসিডেন্টকে খবর দিতে তর সইল না জ্যাকের। ট্রেনে উঠে রওনা হল ইয়ারো শ্যাফ্‌টের দিকে।

ঘণ্টা চারেক লাগল ইয়ারো শ্যাফ্‌টে পৌঁছোতে। আশপাশে কোনো পরিবর্তন নেই। মরুভূমির মত নৈঃশব্দ চারিদিকে বিরাজমান।

ভাঙা শেডে ঢুকে শ্যাফ্‌টে উঁকি দিল জ্যাক। অন্ধকার গহ্বর। কিছুই দেখা যায় না। কিছুই শোনা যায় না।

'লণ্ঠনটা গেল কোথায়?'

নাঃ, লণ্ঠন নেই! জ্যাকের নিজস্ব লণ্ঠনটি যে জায়গায় রাখা থাকতো, সে স্থানও শূন্য। লণ্ঠন উধাও।

'ভারী মুশকিল হল তো!' দমে যায় জ্যাক। কুসংস্কার যাবে কোথায়! শেষকালে মরিয়া হয়ে বলল, 'মরুক গে! নীচে তো নামি, যা হয় হোক!'

বলেই একটার পর একটা মই বেয়ে পাতালে নামতে শুরু করল জ্যাক। ডোচার্ট পিটের নাড়ীনক্ষত্র তার জানা। নইলে অন্ধকারে একা নামতে সাহস করত না। তা সত্ত্বেও হুঁশিয়ার হল জ্যাক। মইয়ের প্রতিটি ধাপ পরখ করে নামতে লাগল নীচে। ঘুণধরা ধাপ যদি একবার ভাঙে, পনের শো ফুট নীচে আছড়ে পড়তে হবে। মনে মনে চাতালের হিসেবও রাখে সে। তিরিশটা চাতাল নামতে তবে শ্যাফ্‌টে তলদেশে পৌঁছোনো যায়। একবার তলায় পা পড়লে অন্ধকারের মধ্যেও হ্যারির কুঁড়ে বার করে নিতে অসুবিধে হবে না।

এক-দুই গুনতে গুনতে ছাব্বিশ সংখ্যক চাতালে এসে পৌঁছোলো জ্যাক। এখনও দুশো ফুট বাকী।

সাতাশ নম্বর মইয়ের প্রথম ধাপে পা রাখার জন্যে পা বাড়ালো জ্যাক। কিন্তু পা শূন্যেই রইল—ধাপ স্পর্শ করল না। হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে মই ধরতে গেল। কিন্তু বৃথাই।

সাতাশ নম্বর মই চিরকাল সেখানে থাকে, সেখানে নেই। সাদা কথায়, মইটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠল জ্যাক! ব্যাপার কী? এই মই দিয়েই যদি জেম্‌স্ স্টারকে নিয়ে হ্যারি নীচে নেমে থাকে, তবে কি মইয়ের অভাবে তিনি আর ওপরে ওঠেন নি? শুধু জেম্‌স্ স্টার কেন, ফোর্ড ফ্যামিলিরই বা খবর কি? কোথায় তাঁরা? জেম্‌স্ স্টার নিরুদ্দেশ হয়েছেন দশ দিন আগে। তার মানে এই ক দিন এঁরা প্রত্যেকেই পাতালে বন্দী রয়েছেন! খাবার-দাবার ফুরিয়েছে, না আছে?

চাতাল থেকে মুখ বাড়িয়ে গলা ফাটিয়ে হ্যারির নাম ধরে বারকয়েক হাঁক পাড়লো জ্যাক। কিন্তু পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সে ডাকের প্রতিধ্বনি দূর হতে দূরে সুড়ঙ্গের গভীরে হারিয়ে গেল!

আর দেরী করল না জ্যাক। সড়সড় করে মই বেয়ে ওপরে উঠল। ক্যালান্ডার স্টেশনে পৌঁছে এডিনবরা এক্সপ্রেসের টিকিট কাটল। তিনটে নাগাদ হাজির হল লর্ড প্রোভোস্টের সামনে।

জ্যাকের তরতরে বর্ণনা শুনে কারো মনে সন্দেহের ছায়াটুকুও রইল না। তৎক্ষণাৎ খবর গেল জেম্‌স্ স্টারের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী স্যার উইলিয়াম এল্‌ফিন্‌স্টোনের কাছে। তিনি হুকুম দিলেন, অবিলম্বে খনির মধ্যে লোক নামানো হোক।

সেই দিনই সন্ধ্যায় একদল অভিযাত্রী জ্যাকের নেতৃত্বে পৌঁছোলো ইয়ারো শ্যাফ্‌টের মুখে। গাঁইতি, লণ্ঠন আর দড়ির মই নিয়ে চটপট তারা নামল সাতাশ-নম্বর চাতালে।

লম্বা দড়ির আগায় লণ্ঠন বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হল নীচে। স্পষ্টই দেখা গেল তলায় মই একটাও নেই। সব উধাও।

তার মানে, খনির ভেতরে যাঁরা আছেন, তাঁদের সাথে বহির্জগতের যোগাযোগ ইচ্ছে করে ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

লণ্ঠন টেনে তুলে নেওয়া হল। ঝুলিয়ে দেওয়া হল দড়ির মই। আগে নামল জ্যাক রিয়ান। পেছনে স্যার উইলিয়াম এল্‌ফিন্‌স্টোন এবং বাকী সবাই।

একদম নীচের চাতালে পৌঁছে দেখা গেল, কেউ কোথাও নেই। নিঝুম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে কয়লা কালো অন্ধকারের মধ্যে। তারপরেই স্যার উইলিয়ামের চমক ভাঙল জ্যাক রিয়ানের চিৎকারে, 'পোড়া মই! এই যে এইখানে!'

'পোড়া মই?' ঘাবড়ে গেলেন স্যার উইলিয়াম, 'সে কী কথা! ছাই কী এখনও গরম আছে, না ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে?'

জ্যাক বললে, 'স্যার আপনার কি মনে হয়, মিস্টার স্টার নিজেই মই পুড়িয়ে পাতালবাসী হয়েছেন?'

'নিশ্চয় না, নিশ্চয় না!' বললেন স্যার উইলিয়াম, 'চলো ওঁদের ঘরে যাওয়া যাক। তাহলেই জানা যাবে ব্যাপারটা কি।'

লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগোলো জ্যাক রিয়ান। পেছনে বাকী অভিযাত্রীরা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দেখা গেল পাথরের গা খুঁড়ে তৈরী সাইমন ফোর্ডের অভিনব কুঁড়ে। কিন্তু ঘরদোর অন্ধকার। জানালার বাতির আভাস নেই।

বেগে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল জ্যাক।

কিন্তু বাড়ী খালি।

সব কটা ঘরই তন্নতন্ন করে দেখা হল। কিন্তু কারো ছায়া দেখা গেল না। আসবাবপত্র সুবিন্যস্ত। গৃহকর্ত্রী ম্যাগি যেন এই ছিল, এই নেই। ভাঁড়ারে খাবারদাবারও প্রচুর! বেশ কিছুদিন চলে যায়।

এ কী প্রহেলিকা? বাসিন্দারা গেল কোথায়? কবেই বা গেল?

শেষ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ঘরের ক্যালেণ্ডারেই পাওয়া গেল। যে অঞ্চলে দিন নেই, রাত নেই, সে অঞ্চলে দিনগত পাপক্ষয়ের হিসেব রাখার জন্য ম্যাগি ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলো পেন্সিল দিয়ে দাগ দিত।

দেখা গেল, শেষ কাটাকুটির চিহ্ন রয়েছে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। জ্যাক বললে, জেম্স্ স্টার তার আগের দিন অর্থাৎ ৪ঠা ডিসেম্বর এসেছিলেন খনিতে! তাহলে, জেম্স্ স্টার সাইমন ফোর্ডের গোটা ফ্যামিলিকে নিয়ে ৬ই ডিসেম্বর, মানে ঠিক দশ দিন আগে, কুঁড়ে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন! খনিতে কয়লার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন কি? উঁহু, হতেই পারে না।

সুতরাং মাথায় হাত দিয়ে বসলেন স্যার উইলিয়ম।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শুধু লণ্ঠনগুলো জলতে লাগল আকাশের তারার মত।

সহসা বিকট চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক রিয়ান, 'ঐ, ঐ!'

দূরে দেখা গেল একটা আলো! বেশ উজ্জ্বল। গ্যালারীর অন্ধকারে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে আলোটা।

'পাকড়াও! পাকড়াও!' বলে লাফিয়ে উঠলেন স্যার উইলিয়াম।

'কাকে ধরবেন? ও যে পেত্নীর আলো?' কাঁপা গলায় বলল জ্যাক।

কিন্তু স্যার উইলিয়াম আর তাঁর সঙ্গীরা ভূতপ্রেত বড় একটা মানেন না। কাজেই তাঁরা পাঁই পাঁই করে দৌড়োলেন আলোর পেছনে। অগত্যা জ্যাককেও পিছু নিতে হল।

কিন্তু এ যেন মরীচিকার পেছনে দৌড়ানো। দৌড়তে দৌড়তে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল, হাঁপ ধরে গেল, তবুও আলোর নাগাল ধরা গেল না। মনে হল দারুণ ক্ষুদে কিন্তু বেজায় চটপটে কিছু একটা বয়ে নিয়ে চলেছে উজ্জ্বল আলোটাকে। মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে বাঁকের মুখে, আবার দেখা যাচ্ছে ক্রশ-গ্যালারীর শেষ প্রান্তে। এক একবার মনে হচ্ছে, এই বুঝি নিভে গেল কিন্তু না, পরক্ষণেই আবার ঝলসে উঠছে পাথরের কোণে। মোটের ওপর, মায়া-বাতির কাছেও যেতে পারল না কেউ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

এক ভাবে আগে আগে সমানে ছুটে চলেছে ভুতুড়ে আলোটা। ক্লান্তি নেই, বিরতি নেই—আলেয়া যেন।

তার পেছনে ছুটলেন স্যার উইলিয়াম তাঁর দলবল নিয়ে। আর ছুটছে জ্যাক রিয়ান—বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। এ আলোর নাগাল পাওয়া যে মানুষের সাধ্য নয়, তা সে ভাল করেই জানে।

ছুটতে ছুটতে সবার হাঁফ ধরে গেল। তবু থামলে চলবে না। মিস্টার স্টারের সন্ধান পেতে হলে ঐ আলোই একমাত্র ভরসা। কিন্তু সত্যিই কি ভরসা? প্রশ্নটা স্যার উইলিয়ামের মনে যে এক আধবার উঁকি মারে নি, তা নয়। আলোটা কি তাঁদের বন্ধু, না দুশমন? ওটা কি তাঁদের টেনে নিয়ে চলেছে সেই মৃত্যুফাঁদের দিকে, যেখানে নিয়ে গেছে মিস্টার স্টার ও সাইমন ফোর্ডের পরিবারবর্গকে? কিন্তু আলোটার পেছনে যেখানে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে হচ্ছে, সেখানে প্রশ্নটা গভীরভাবে ভাববার ফুরসত কোথায়?

জ্যাক রিয়ান তো তখন মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করে দিয়েছে। পেত্নী যখন আলো নিয়ে ছোটে, তখন তার পেছনে দৌড়ে মানুষ কোথায় যায়, ভাবতে ভাবতে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

ঘণ্টাখানেক এমনি দৌড়োদৌড়ি করার পর দলবল নিয়ে স্যার উইলিয়াম পিট-এর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছোলেন।

তখন অবশ্য প্রত্যেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আলোটা আলেয়ার আলো কিনা।

তারপরেই যেন আলো আর সন্ধানীদলের মাঝের ব্যবধান কমে আসতে লাগল। আলেয়ার আলোর দম কি তাহলে ফুরোলো? না, এর আগে ফোর্ড ফ্যামিলি আর জেম্‌স্‌ স্টারকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যেখানে আনা হয়েছিল, সে জায়গা এসে পড়লো? বলা মুশকিল!

ব্যবধান কমে আসছে দেখে গতিবেগ দ্বিগুণ করল অভিযাত্রী দল। যে আলো জ্বলছিল প্রায় দুশো ফুট দূরে, এখন তা জ্বলছে পঞ্চাশ ফুট দূরে। ব্যবধান আরও কমছে। আলোর আভায় একটা প্রাণীকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। মাথা ফেরাতেই একবার মানুষের দেহরেখার অস্পষ্ট আদল পাওয়া গেল। আলেয়ার কি শরীর থাকে? মহা ফাঁপরে পড়ল বেচারা জ্যাক রিয়ান।

খনির এ অঞ্চলে ছোট-বড় সুড়ঙ্গর গোলকধাঁধা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। শরীরী আলেয়া যে কোনো মুহূর্তে আলো নিভিয়ে গা-ঢাকা দিতে পারে।

সম্ভাবনাটা স্যার উইলিয়ামের মাথাতে এসেছিল। কিন্তু তিনি অবাক হচ্ছিলেন, পালাবার এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চোখের ধাঁধা ঐ আলো গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছে না কেন?

আলেয়ার আলো যেন এই ভাবনার মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। কেন না, স্যার উইলিয়াম কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল শরীরী আলেয়া! তীরবেগে ধেয়ে গেল অভিযাত্রীরা! গিয়ে দেখল, সামনে পাথুরে দেওয়াল। এক জায়গায় শুধু একটা ফাটল, একটা সরু সুড়ঙ্গ।

পলতে ঠিক করে নিয়ে লণ্ঠন বাগিয়ে নিমেষে ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন স্যার উইলিয়াম এবং তাঁর দলবল।

একশো পা-ও যেতে হল না। সুড়ঙ্গ ক্রমশঃ চওড়া হচ্ছে, বিশাল হলের আকার ধারণ করছে। এমন সময়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

দেওয়ালের কাছে পড়ে চারটে দেহ। লাশ কি?

'জেম্‌স্‌ স্টার!' গলা কেঁপে গেল স্যার উইলিয়ামের।

'হ্যারি! হ্যারি!' বন্ধুর পাশে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল জ্যাক।

হ্যাঁ, তাঁরাই বটে। দেওয়ালের গায়ে নিস্পন্দ দেহে শুয়ে তাঁরা চারজনে—জেম্‌স্‌ স্টার, সাইমন ফোর্ড, হ্যারি আর ম্যাগি।

একটা দেহ কিন্তু সহসা নড়ে উঠল। শোনা গেল ম্যাগির ক্ষীণ কণ্ঠ, 'ওঁদের! আগে ওঁদের।'

স্যার উইলিয়াম তক্ষুনি ইঞ্জিনীয়ার এবং আর সকলের মুখে ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি দিতে লাগলেন। পেটে কিছুটা যেতেই চাঙা হয়ে উঠলেন।

অন্ধকার খনি-গহ্বরে আবদ্ধ হতভাগ্য সেই অভিযাত্রী দল। ব্র্যাণ্ডি দিয়ে ভঙ্গ হল দশ দিনের উপবাস।

জেম্‌স্‌ স্টার পরে বলেছিলেন স্যার উইলিয়ামকে—এই দশ দিনে নির্ঘাৎ মারা পড়তেন তাঁরা। কিন্তু কে যেন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনবার জাগভর্তি জল আর একটুকরো পাঁউরুটি পাশে রেখে দিয়ে গিয়েছিল। সহৃদয় এই ব্যক্তি ওঁদের প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন কোনমতে। কিন্তু জল আর পাঁউরুটি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারেন নি।

স্যার উইলিয়ামের কিন্তু সন্দেহ হয়, রহস্যময় এই ব্যক্তি আরও কিছু করেছেন। ইনিই কি আলেয়ার আলো হয়ে পথ দেখিয়ে অনাহারে মৃতপ্রায় অভিযাত্রীদের কাছে নিয়ে এসেছেন উদ্ধারকারীদের?

হয়ত তাই। ফলে, প্রাণে বেঁচে গেলেন ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাগি, সাইমন আর হ্যারি ফোর্ড। যে ফাটল দিয়ে তাঁরা ডোচার্ট পিটে পৌছোলেন, সে ফাটল অন্ধকারে না খুঁজে পাওয়ার কারণ, কেউ বা কারা পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে, ফাটলের কাছে যাবার সঙ্কীর্ণ পথটা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিল। অন্ধকারে তাই ওঁরা ঠাহর করতে পারেন নি। সোজা কথায়, ওঁরা যখন পাতালপুরীর বিস্ময় দেখে বিস্ময়ান্বিত, ঠিক তখনি নির্মম কোনো শত্রু প্ল্যানমাফিক পুরোনো আর নয়া অ্যাবারফয়েলের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগ একে-একে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিউ অ্যাবারফয়েল

ইঞ্জিনীয়ারদের গায়ে যদি অতিমানুষের শক্তি থাকত, আর সেই শক্তির সাহায্যে যদি স্টার্লিং, ডাম্‌বারটন ও রেনফ্রু অঞ্চলের নদী, হ্রদ, মাঠ, বন সমেত হাজার ফুট পুরু নিরেট ভূত্বক তুলে ধরা যেত, তাহলে সেই প্রকাণ্ড ঢাকনার নিচে দেখা যেত এক সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ গহ্বর-এলাকা—যে গহ্বর-এলাকার সঙ্গে সারা বিশ্বে কিছুটা তুলনা চলে শুধু কেন্‌টাকির ম্যামথ গুহার।

কয়েক শো রকমারি আকারের গুহা দিয়ে গড়া সেই গহ্বর। গহ্বর না

বলে তাকে মৌচাক বললেই অবশ্য মানায়। মৌচাকের মতই অগুনতি গুহা-কোষ—খেয়াল মত সাজানো আর আকারে বিশাল। এত বিশাল যে, মৌমাছি কোন্ ছার, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডাইনোসরজাতীয় দানবিক পশু এবং টেরোড্যাকটিল-জাতীয় উড়ন্ত খেচর বিভীষিকারাও স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

বহু অতিকায় রন্ধ্রবিশিষ্ট সেই গোককধাঁধায় আছে সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, গ্যালারীর পর গ্যালারী। তার কোথাও উচ্চতা এত বেশী যে, উচ্চতম গির্জাও হার মেনে যায়। কোথাও বা মঠমন্দিরের মত সঙ্কীর্ণতা, সরু সরু অলিগলি। কোথাও অনুভূমিক সরলতা। কোথাও বা উঁচুনিচু, আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই। এক সুড়ঙ্গ থেকে অন্য সুড়ঙ্গ যাতায়াতের অজস্র পথ, অসংখ্য যোগাযোগ।

খিলানের মত হরেকরকম গহ্বরের বিশাল ছাদগুলোকে ধরে রেখেছে মোটা মোটা থাম। বালিপাথর আর স্লেটপাথরের থামগুলো বহুস্তরে আকীর্ণ —এবড়ো-খেবড়ো। কয়লায় ঠাসা প্রতিটি সুড়ঙ্গ। বালিপাথর আর স্লেট-পাথরের স্তরে মাঝে মাঝে দামী কয়লার এমনি ঠাসাঠাসি যে মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কয়লা তো নয়, যেন এই আজব খনির কৃষ্ণরুধির—গোলকধাঁধার জটিলতার রন্ধ্রে সীমাহীন সমৃদ্ধি নিয়ে যার বিস্তার।

ক্যালেডোনিয়ান খালের তলা দিয়ে উত্তরে দক্ষিণে প্রায় চল্লিশ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে কল্পনাতীত এই সুবিশাল কয়লাখনি। গাঁইতির ঘা না পড়া পর্যন্ত এই খনির গুরুত্ব অবশ্য পুরোপুরি হিসাবে আসবে না। তা সত্ত্বেও সেখানকার কয়লার পরিমাণ যে কারডিফ আর নিউক্যাসেলের সম্মিলিত কয়লাকেও টেক্কা মারতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া এ খনিতে সুবিধাও অনেক। প্রকৃতি সেখানে নিজের হাতে স্তরের পর স্তর পাথর এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে আর অবর্ণনীয় ভূকম্পনের ফলে থাম গ্যালারী সুড়ঙ্গ এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, মানুষকে আর বাড়তি খাটতে হবে না। নিউ অ্যাবারফয়েলের সুড়ঙ্গগুলো প্রকৃতি নিজে বানিয়ে রেখেছে এমনিভাবে, যেন সহজেই কয়লা তোলা যায়।

সমস্তটাই অকল্পনীয় মহাবিস্ময়কর সন্দেহ নেই। প্রকৃতি একাই সাজিয়েছে বর্ণনাতীত সেই গোলকধাঁধা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, মানুষের হাতে খোঁড়া যেন এই কয়লাখনি—পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল শত সহস্র বছর, সহসা এখন বুঝি তার পুনরাবিষ্কার ঘটল।

কিন্তু তা তো নয়। এ সম্পদ পরিত্যাগ করে যাওয়া মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। মানুষ নামধেয় উইপোকায় দাঁতের কামড় কোনদিনই

পড়েনি স্কটল্যাণ্ডের এই ভূগর্ভে। বিস্ময়কর এ কীর্তির জন্য দায়ী একমাত্র প্রকৃতি স্বয়ং। মিশরীয় গোলকধাঁধা বা রোমীয় বিবর সমাধিও তুচ্ছ মনে হয় এর কাছে—এর কিছুটা তুলনা চলে শুধু সেই বিখ্যাত ম্যামথ গুহার সঙ্গে।

ম্যামথ গুহার বিস্তার বিশ মাইলেরও বেশী। দুশো ছাব্বিশটা চওড়া সড়ক, এগারোটা হ্রদ, সাতটা নদী, আটটা জলপ্রপাত, বত্রিশটা নিতল পাতকূয়া আর সাতান্নটা গম্বুজ নিয়ে গড়ে উঠেছে সেখানকার প্রকৃতির রাজ্য। কয়েকটা গম্বুজের উচ্চতা নাকি সাড়ে চারশো ফুটেরও বেশী।

ম্যামথ গুহার মতই নিউ অ্যাবারফয়েলের স্রষ্টা মানুষ নয়—প্রকৃতি নিজে।

অতুলনীয় সম্পদে ভরা নতুন এই পাতাল-সাম্রাজ্যের আবিষ্কার সম্ভব হল শুধু একমাত্র বুড়ো সাইমন ফোর্ডের দিবারাত্রির প্রচেষ্টায়। দশ বছরের পরিশ্রম, সহজাত অনুভূতি ও অটুট আত্মবিশ্বাস—এই সব কটির দুর্লভ সম্মেলন ঘটায় যা অন্যেরা কল্পনাও করতে পারে না, বৃদ্ধ সাইমন পেলেন সেই অভাবনীয় পুরস্কার।

মনে প্রশ্ন জাগে দশ বছর আগে এই নয়া দুনিয়ার তোরণপথে এসে জেম্‌স্‌ স্টারের খনিও কেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? একমাত্র ভুল বা দুরদৃষ্ট ছাড়া তাকে আর কি বলা যায়? এই ধরনের কাজকর্মে ও পরীক্ষানিরীক্ষায় এ জাতীয় কাণ্ড হামেশাই ঘটে।

পাতালরাজ্যকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তুলতে হলে দরকার সূর্যালোকের। দিনের পক্ষে, বিশেষ কোন তারকার কিরণ হলেও চলবে।

জল জমেছে সে রাজ্যের অগণিত গহ্বরে। তাই পুকুর, ডোবা, সরোবরের অভাব নেই। এক-একটা সরোবর তো লক ক্যাটারিনকেও হার মানায়—এত বড়। লক ক্যাটারিন অবশ্য এই পাতালরাজ্যের ঠিক ওপরেই।

ঢেউ, স্রোত বা জোয়ার-ভাঁটার খেলা কোনদিন দেখা যায় নি পাতালের সেই নদী-সরোবরে। বার্চ বা ওক গাছের শাখা বাতাসে আন্দোলিত হয় নি তার তীরে। পাহাড়ের ছায়াও কাঁপেনি তার জলপৃষ্ঠে। সেকেলে গথিক দুর্গের মহাকায় প্রতিবিম্বও পড়েনি ছলছল জলে। স্টিমবোট কোন দিন সেখানকার জল তোলপাড় করেনি, পড়েনি আলোর প্রতিফলন। সূর্যের চোখধাঁধানো কিরণ, চাঁদের মনভোলানো আলোর ঝিকিমিকি কোনদিন দেখা যায় নি সেখানকার আয়নার মত স্বচ্ছ স্থির জলে।

কিন্তু একদিন আসবে, যেদিন ইলেকট্রিক তারকার ঝলমল আলোয় ঝকমক করবে নদী-সরোবর। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা, খালনালায় সংযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে বিচিত্র জলপথ।

গাছপালা কোনদিনই পাতালসাম্রাজ্য দেখা যাবে না, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোককে সে ঠাঁই দিতে পারবে। কলা যখন ফুরোবে—শুধু এই পাতাল-সাম্রাজ্যে নয়, নিউ ক্যাস্‌ল্‌, আলোয়া এবং কারডিফেও, তখন নাতিশীতোষ্ণ এই ভূগর্ভে এমন একটা দিন আসা বিচিত্র নয়, যখন সেখানে দেখা যাবে এমনি ভিড় যে, গ্রেট ব্রিটেনের গরীবরা মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকুও পাবে কিনা কে বলতে পারে!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়লা নগরী

এই ঘটনার তিন বছর পরের কাহিনী।

স্টার্লিংশায়ারে বেড়াতে এসে টুরিস্টরা গাইড-বুক খুললেই দেখে 'নিউ অ্যাবারফয়েলে'র নাম। ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে নাকি এই খনি একটা বিরাট আকর্ষণ। কারণ, 'নিউ অ্যাবারফয়েল' একমেবাদ্বিতীয়ম্‌!

স্টার্লিংশায়ার থেকে মাত্র ঘণ্টা কয়েক গেলেই খনির প্রবেশ-পথ। বিপদের সম্ভাবনা না থাকায় জমি থেকে দেড় হাজার ফুট ভূগর্ভে নামতে দর্শকদের বুক কাঁপে না। ক্যালাণ্ডার থেকে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে শুরু হয়েছে একটা ঢালু সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে দেখা যাবে বিশাল গম্বুজ, বুরুজ আর খাঁজকাটা পাঁচিল—যেন কেল্লার মুখে তোপ দাগবার সুসজ্জিত ব্যবস্থা। প্রকাণ্ড এই টানেল ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মিশেছে দানবগৃহের মত বিশাল ভূপ্রকোষ্ঠের সঙ্গে। ধরিত্রীর জঠর যেন খুবলে নেওয়া হয়েছে সেখানে।

জলের চাপে চালিত ওয়াগনে রেলপথ বেয়ে গড় গড় করে ঘণ্টাখানেক গেলেই যাত্রীরা পৌঁছে যায় কোলটাউনে, অর্থাৎ কয়লা-নগরীতে। নামটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই। কিন্তু মাটির তলায় পৃথিবীর উদরে যে গাঁয়ের পত্তন ঘটেছে, এ নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম-ও তাকে মানায় না।

কয়লা-নগরীতে পৌঁছে দর্শকরা দেখতে পায় বিদ্যুৎশক্তির আশ্চর্য খেলা। দেখে, কি আশ্চর্য উপায়ে পাতালনগরীকে তাপ আর আলো যুগিয়ে চলেছে ইলেকট্রিসিটি।

ভেন্টিলেটরের কাজ চালানোর মত সরু সরু অগুন্তি সুড়ঙ্গ আছে নিউ অ্যাবারফয়েলে। কিন্তু তা দিয়ে পর্যাপ্ত আলো আসে না। তাই, ডায়নামোর বিদ্যুৎ দিয়ে সূর্যের মত আলোর চাকতি জ্বালানো হয়েছে খিলানের ফাঁকে, থামের গায়ে বা উঁচু ছাদে। সূর্য ছাড়া নকল তারার ঝিকিমিকিও দেখা যায় ইলেকট্রিক বাতির কল্যাণে।

ঘুমোনোর সময় এলেই সুইচ টিপে নিভিয়ে দেওয়া হয় নকল সূর্যের মালা। আর অমনি অন্ধকারে ডুব দেয় নিউ অ্যাবারফয়েল।

যন্ত্রপাতি রাখা হয় বায়ুশূন্য আধারে। তাই ফায়ার ড্যাম্পে স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ার কোনো ভয় নেই। বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও নেই। কয়লা-নগরীর ঘরে ঘরেই এমনি ব্যবস্থা—বিদ্যুৎ-বাতির সুবিধে আছে, কিন্তু বিস্ফোরণের ভয় নেই।

কয়লা তোলা শুরু হয়েছে। কার্বন-সমৃদ্ধ পাথরের দাম যে কত, হিসেব করে তার নাগাল পাওয়া যায় নি। অনেকগুলো সুড়ঙ্গ দিয়ে সরাসরি খনি থেকে ওপরের জমিতে কয়লা তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। হাইড্রলিক রেলপথ রাখা হয়েছে শুধু কয়লা নগরীর বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য।

হলঘরের মত বিশাল যে গহ্বরে আটক হয়েছিলেন প্রথম অভিযাত্রীদল, তার গড়ন অনেকটা রাজদরবারের খিলেনওয়ালা আকাশছোঁয়া গম্বুজের মত। লম্বা লম্বা থামগুলোর মাথা দেখা যায় না। এক-একটা থামের দৈর্ঘ্য কম-সে কম তিনশো ফুট। এ উচ্চতার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু কেন্টাকি-গুহার সেই ম্যামথ ডোম-এর।

মার্কিন মুলুকে যত প্রাকৃতিক গুহা আছে, ম্যামথ ডোম তাদের মধ্যে বৃহত্তম। অনায়াসে পাঁচহাজার লোক সেখানে কুলিয়ে যায়। নিউ অ্যাবার-ফয়েলের পাতালঘরের বিশালতাও হুবহু তাই। গড়নও সেই রকম। শুধু পর্বতগুহার ছাদ ভেদ করে ঝরে-পড়া চুনের জলে সূচ্যগ্র ঝারীর বদলে কয়লার খোঁচা, পাথরের চাপে ঠেলে-বেরিয়ে-আসা সেই খোঁচা-কয়লার চাকচিক্য নাকি দেখবার মত।

গম্বুজের ঠিক নীচে একটা হ্রদ। বিশালতার দিক দিয়ে যে হ্রদের সঙ্গে একমাত্র ম্যামথ গুহার ডেড সী-র তুলনা চলে। স্বচ্ছতোয়া সরোবরে খেলে বেড়ায় বিস্তর মীন—কিন্তু সে মাছের চোখ নেই। ইঞ্জিনীয়ার স্টার এ হ্রদের নাম দিয়েছেন লক ম্যালকম।

সাইমন ফোর্ডের নতুন বাড়ী এইখানেই গড়ে উঠেছে। পাঁচটা জানালা দিয়েই দেখা যায় লক ম্যালকমের স্থির জলরাশি। মাস দুয়েক পরে পাশেই আর একটা বাড়ী তৈরী হল। এ বাড়ীতে আস্তানা গাড়লেন জেম্‌স্ স্টার।

খনি শ্রমিকদের সারি সারি স্থায়ী নিবাস লক ম্যালকমের তীর আর খিলেনের নীচে গড়ে উঠল। একে-একে সবাই নেমে এল পাতালখনির ডেরায়। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল কয়লা-নগরী। দেখতে দেখতে হ্রদের তীরে টিলার চূড়ায় একটা গির্জাও মাথা চাড়া দিল।

সুউচ্চ খিলান আর বহু-উঁচুতে-হারিয়ে-যাওয়া থামের সারি থেকে ঝুলন্ত ইলেকট্রিক-চাকতির উজ্জ্বল আলোয় যখন ঝলমল করে পাতাল-নগরী, তখন ফ্যান্টাসি রাজ্যের মত অপরূপ হয়ে ওঠে কোল-টাউন। দর্শকরা বিহ্বল হয়ে পড়ে। ফলে, মুখে মুখে প্রকৃতির ফ্যান্টাসি-ল্যাণ্ডের খবর ছড়িয়ে গেল দেশে।

কয়লা-নগরীর বাসিন্দাদের বুক ফুলে ওঠে এমন খাসা একটা রাজ্য থাকার সুযোগ পেয়ে। ওপরের পৃথিবীতে যাবার নাম করে না কেউ। জেম্স্ স্টার আর সাইমন ফোর্ডও মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন কোলটাউনে। ওপরের ঢুনিয়ায় না যাওয়ার একটা ছুতো বার করেছেন সাইমন। বলেন, ওখানে নাকি 'বারো মাস'ই বৃষ্টি। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সে তুলনায় পাতালপুরীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বাস্তবিকই আদর্শস্থানীয়। ফলে, তিন বছরের মধ্যেই জমজমাট হয়ে উঠল কয়লা-নগরী।

এই সময়ের মধ্যে অনেক শিশুও ভূমিষ্ঠ হল; কিন্তু রোদ্দুর কি জিনিস, তা তারা জানল না। পৃথিবীর আলোও কোনো দিন দেখল না।

মেলরোজ ফার্ম ছেড়ে ফুর্তিবাজ জ্যাক রিয়ান ফিরে এল নিউ অ্যাবার-ফয়েলের কয়লা ভাঙার কাজে। সঙ্গে এল ব্যাগ পাইপ আর অন্যান্য গান-বাজনার সরঞ্জাম। সাইমন ফোর্ডের নব-গৃহে ছোট্ট একটা ঘরে ডেরা নিল সে। গান গেয়ে, আজগুবী গল্প বলে আসর জমাতে তার জুড়ি নেই। শ্রমিক হিসেবেও তার দক্ষতা কম নয়। তাই ছমাস যেতে না যেতেই ফোরম্যানের পদে উন্নীত হল জ্যাক।

একদিন কথা প্রসঙ্গে রোমাঞ্চকর সেই অভিযানের গল্প হচ্ছে।

সাইমন ফোর্ড বললেন, 'জ্যাক না থাকলে সেদিন আমরা কেউ বাঁচতাম না।'

প্রতিবাদ করল জ্যাক। বলল, 'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আপনাদের বাঁচিয়েছে এ খনির উপদেবতা।'

'তোমার মুণ্ডু!' বলল হ্যারি, 'তোমার মত কুসংস্কার থাকলে সেই রকমই মনে হয় বটে।'

রেগে গেল জ্যাক, 'কুসংস্কার কিনা সেদিনই আমরা দেখেছি। অত দৌড়েও তো আলেয়ার আলোর নাগাল পাই নি। হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘোড়দৌড় করিয়েছে আমাদের, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সমেনে থেকেই!'

ফোর্ড বললেন, 'বেশ তো, আলেয়ার আলোর রহস্য একদিন আমরা জানবই।'

'যেদিন জানবেন, সেদিন কপাল খুবই মন্দ।' বলল জ্যাক।

'দেখা যাক।'

নিউ অ্যাবারফয়েলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে কয়লানগরীর সকলে। কিন্তু হ্যারি যত খবর রাখে, ততটা আর কেউ জানে না। পাতালপুরীর রহস্যময় গোলকধাঁধা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। খনির কোন্ অংশে গেলে মাথার ওপর ফির্থ অব ক্লাইড পাওয়া যাবে এবং লক লোমোণ্ড আর লক ক্যাটরিন কদ্দুর পর্যন্ত বিস্তৃত তা তার নখদর্পণে। খনির কোন্ থামগুলো মাথার ওপর গ্র্যামপিয়ান পর্বতমালা ধরে রেখেছে, কোন্ খিলেন ডামবারটনের বনেদের কাজ করছে সে খবর হ্যারি ছাড়া কেউ বলতে পারে না। কোন্ জলাশয়ের ঠিক ওপর দিয়ে ব্যালক থেকে ট্রেন চলেছে, স্কটল্যাণ্ডের উপকূল ঠিক কোথায় শেষ হল, কোথায় শুরু হল সমুদ্র—তা গড়গড় করে বলে যায় হ্যারি। বছরের যে সময়ে রাত আর দিনমান ঠিক সমান হয়, সেই ২১শে মার্চ বা ২১শে সেপ্টেম্বরের দিন সে তাণ্ডব-সমুদ্রের প্রলয়-গর্জন পাতালে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে দেয় দর্শকদের।

হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় টোঁ-টোঁ করতে পেলে আর কিছুই চায় না হ্যারি। শাল্‌তি নিয়ে সে জলে জলে ঘোরে। পাতালপুরীতে অনেক বুনো পাখী বাসা বেঁধেছে। মাছ-লোভী পাখী থেকে শুরু করে কাদাখোঁচা, পাতিহাঁস, পিন্‌টেলস্‌ ইত্যাদি অনেক বিহঙ্গ আছে সে দলে। বন্দুক নিয়ে এদের শিকার করা হ্যারির আর এক নেশা; পাকা নাবিক যেমন দূর দিগন্ত দেখে অভ্যস্ত, হ্যারির চোখ তেমনি অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

দিনরাত্র ডানপিটের মত টোঁ টোঁ করলেও একটা বিপুল আশা কিন্তু অনির্বাণ দীপশিখার মতই জ্বলছে হ্যারির অন্তরে। বহু বাধা, বহু বিপদ, বহু বিঘ্নের মধ্যে অতর্কিতে আবির্ভূত হয়ে যে রহস্যময় শরীরী বা অশরীরী তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, বন্ধু ও বাবা-মার জীবন রক্ষা করেছে—সেই মঙ্গলময় প্রহেলিকার জট একদিন সে ছাড়াবেই ছাড়াবে।

তবে একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। নিউ অ্যাবারফয়েল আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত বুড়ো সাইমনের ফ্যামিলির ওপর ধারাবাহিকভাবে যে চোরা আক্রমণ চলেছিল, তার আর পুনরাবৃত্তি ঘটে নি।

তাই, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করেছে আশ্চর্য নগরী কোল-টাউনে। আমোদ-প্রমোদের অভাব নেই মোটেই। অবসরবিনোদনের ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি রবিবারে কখনও জলে-গুহায় দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া,

কখনও বা চড়ুইভাতির আয়োজন হয়। আর হয় গান-বাজনা। শোনা যায় ব্যাগপাইপ-সঙ্গীত। স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের সেই রাগিণী শুনে লক ম্যালকমের তীরে দৌড়ে আসে কয়লা-নগরীর বাসিন্দারা। হাইল্যাণ্ড কসটিউম পরে তখন নাচ জুড়ে দেয় জ্যাক রিয়ান।

সাইমন ফোর্ড কি আর সাধে বলেন, কোল-টাউন স্কটল্যাণ্ডের রাজধানীকে হারিয়ে দিতে পারে, কারণ এ রাজ্যে শীতের কামড় নেই, গ্রীষ্মের দাবদাহ নেই, চিমনির ধোঁয়াও নেই!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুতোর ডগায় প্রাণটা

হেসেখেলে দিন কাটছে পাতালবাসীদের। দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের সাধ মিটেছে। কাজেই আর চাই কি!

কিন্তু হ্যারি যেন দিনকে দিন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। অন্ধকার জল-বিবরে সে সঞ্চরণ করে অবসর পেলেই, আর দিনরাত কি যেন ভাবে। অমন যে দিলখোলা আমুদে সখা জ্যাক, সে-ও হ্যারির মনের নাগাল ধরতে পারে না। হাসিঠাট্টাও চলে তাই নিয়ে।

সেদিনও জ্যাক এ নিয়ে ঠাট্টা করছে হ্যারিকে। হ্যারি নিশ্চুপ—কোন জবাবই দিচ্ছে না। শেষে একসময় সে বললে, 'একটা কথা শুনে রাখ, জ্যাক। এ খনির অদৃশ্য উপদেবতাকে একদিন আমি দৃশ্যমান করবোই করব।'

জ্যাক তো হেসে খুন। বললে, 'কেন, পেত্নীর কান মলে দিবি বুঝি?'

হ্যারি বলল, 'হ্যাঁ, একজনের কান মলব, আর একজনকে মাথায় তুলে নাচব। কারণ, একজন আমাদের খতম করতে চেয়েছে, আর একজন আমাদের বাঁচিয়েছে।'

জ্যাক সিরিয়াস হয়ে গেল। গভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার তো মনে হয় এ এ কীর্তি দুজনের নয়—একজনের। নির্ঘাৎ কোন পাগলের।'

'পাগলা না কচু!' হ্যারি যেন ক্ষেপে ওঠে, 'পাগল কখনো ওরকম ঠাণ্ডা মাথায় মই পুড়িয়ে খুন করবার প্ল্যান আঁটে না!'

'কিন্তু পাগল না হলে তিন-তিনটে বছর সে এ রকম ডুবও মারতো না।'

হ্যারি এবার অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে জ্যাকের দিকে। তারপর ফিসফিস করে বললে এক আশ্চর্য কাহিনী।

বললে, 'জ্যাক, নিউ অ্যাবারফয়েলের পাঁচ মাইল পশ্চিমে পাথরের স্তূপ

যেখানে মাথার ওপর 'বেন লোমোণ্ড'কে ধরে রেখেছে, সেখানে একটা কুয়ো আমি দেখেছি। একদম খাড়াভাবে পাতালে নেমে গেছে কুয়োটা। হপ্তাখানেক আগে আমি কুয়োটার গভীরতা মাপতে গেছিলাম। দড়ি নীচে নামিয়ে দিচ্ছি, সেইসঙ্গে নিজেও ঝুঁকে পড়েছি, এমন সময় মনে হল যেন কুয়োর ভেতরের বাতাস অস্থির হয়ে উঠেছে অতিকায় ডানার ঝটপটানিতে।'

জ্যাক হতবাক, শেষে বলল, 'পাখী-টাখী ঢুকেছে বোধহয়।'

'না জ্যাক, আজ সকালেই আমি আবার গেছিলাম কুয়োর ধারে। গিয়ে কি শুনলাম জানো?'

'কি?'

'গোঙানি। কুয়োর ভেতর কে যেন গোঙাচ্ছে।'

'গোঙানি!' জ্যাক যেন গুডিয়ে ওঠে। তারপর সামলে নিয়ে একটু পরে বলে, 'নিশ্চয় বাতাসের শব্দ। আর নয়তো নির্ঘাৎ কারো বিটলেমো!'

'আমি কাল সে রহস্য ভেদ করবো, বুঝলি?' দৃঢ়কণ্ঠে হ্যারি এবার বলল।

'তার মানে?'

'আগামী কাল কুয়োর মধ্যে আমি নামছি।'

'অ্যাঁ!' বিচিত্র আওয়াজ বেরিয়ে এল জ্যাকের গলা থেকে, 'বলছিস কি? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

কিন্তু হ্যারিকে টলানো গেল না। পরের দিন ভোর ছটায় দড়িদড়া ইত্যাদি নিয়ে হ্যারি রওনা হল পাতাল-কুয়োর দিকে। নাচার জ্যাক অবশ্য সঙ্গেই আছে। এছাড়াও সঙ্গে গেল আরো তিনজন শ্রমিকবন্ধু। এ অভিযানের বিন্দুবিসর্গও জানানো হল না জেম্‌স্ স্টার বা সাইমন ফোর্ডকে।

দশ ফুট লম্বা দড়ি নামিয়ে দেওয়া হল কুয়োর মধ্যে। এক প্রান্ত বাঁধা হল হ্যারির কোমরে, উরুতে এবং বাংমূলে। ফলে খালি রইল দু হাত। কোমরের বেল্টে রইল সেফটিল্যাম্প আর চামড়ার খাপে ধারালো ছোরা।

কুয়োর মুখ প্রায় বারো ফুট চওড়া। একটা কাঠের বরগা ফেলে দেওয়া হল আড়াআড়িভাবে। দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা হল বরগার ঠিক মাঝখানে। তারপর বন্ধুরা আস্তে আস্তে দড়ি ধরে নামিয়ে দিল হ্যারিকে।

অকুতোভয় হ্যারি নামতে লাগল ধীরে ধীরে। সেকেণ্ডে মাত্র ফুট খানেক। কুয়োর ঠিক মাঝখান দিয়ে নামবার দরুন আলোটা ঘুরে ঘুরে পড়তে লাগল কালো দেওয়ালে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল হ্যারি। তেলতেল

পাথুরে দেওয়ালে বৈচিত্র্য কিছু নেই। এত মসৃন পাথর বেয়ে উপরে ওঠা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

যে কোনো অভাবিত বিপদের জন্যে তৈরী রইল হ্যারি। হুশিয়ার মন, তীক্ষ্ণ চোখ আর সজাগ কান নিয়ে সে নামল আরও মিনিট দুয়েকের পথ অর্থাৎ প্রায় ১২০ ফুট।

গহ্বরের গায়ে গলি-সুড়ঙ্গ আশা করেছিল হ্যারি। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে গেল না। দেখল, শুধু কুয়োটা ফানেলের মত নীচের দিকে সরু হয়ে যাচ্ছে। আর, একটা টাটকা বাতাসের প্রবাহ তলার দিক থেকে ওপরে আসছে।

নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে দেখে আরও নামতে লাগল হ্যারি। থমথমে নৈঃশব্দ যেন শ্বাস রোধ করে তোলে। অন্ধকারের রহস্য এখনো নিষ্ক্রিয়! এখনো থাবা বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি ঝুলন্ত হ্যারির ওপর।

গা ছমছম করে হ্যারির। খাপ থেকে ছোরা টেনে নিয়ে বাগিয়ে ধরে শক্ত মুঠোয়।

১৮০ ফুট নামবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি আলগা হয়ে যায়। কুয়োর তলদেশ এসে গেছে!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হ্যারি। দারুণ ভয় ছিল, যে কোনো মুহূর্তে ওপরের দড়ি হয়তো কেউ কেটে দেবে। কিন্তু দড়ি তো কাটলই না, উপরন্তু ঘাপটি মেরে কারও বসে থাকার মত চাতাল-টাতালও মসৃণ দেওয়ালে চোখে পড়ে নি।

কুয়োর তলদেশে জায়গা খুবই কম। কোমরের বেল্ট থেকে লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল হ্যারি। দেখল, অনুমান মিথ্যে নয়।

ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গ জেগে উঠল লণ্ঠনের আলোয়। সরু মুখ। এত সরু যে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হল। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ভীষণ চমকে উঠল হ্যারি!

কিসে যেন বাধা পেল সে। বাধাটা যেন মানব-দেহের। চমকে সরে আসে হ্যারি। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার এগোলো, হাত বুলিয়ে দেখল বরফের মত ঠাণ্ডা একটা দেহ। গা ঠাণ্ডা বটে, তবে পুরোপুরি নয়। শরীরের উত্তাপ যেন একটু অনুভব করা যায়।

তৎক্ষণাৎ টেনে হিঁচড়ে দেহটাকে সুড়ঙ্গের মুখে নিয়ে এল হ্যারি। লণ্ঠনের আলোয় কি দেখল?

দেখল, একটা শিশু।

অস্ফুট চিৎকার করে উঠে হ্যারি। ভাল করে নজর করতেই দেখল, শিশু তখনও জীবিত। ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। এত ক্ষীণ যে, যে কোনো মুহূর্তে তা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।

আর দেরি করা যায় না। সব কিছু ভুলে গেল হ্যারি। চটপট দড়ি বাঁধল কোমরে। বাঁ হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে জাপটে ধরল বুকের ওপর। ডান হাতের মুঠোয় রইল ছোরা। টান দিল সে দড়িতে।

সংকেত ওপরে পৌছতেই দড়ি টান-টান হয়ে গেল। ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে লাগল হ্যারি।

মিনিট কয়েক কিছুই ঘটল না। যেন ভয়ের কোথাও কিছু নেই। তারপরেই আচম্বিতে কুয়োর তলদেশ থেকে ভেসে এল দমকা হাওয়ার শব্দ। বাতাস যেন তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে…

চকিতে নীচের দিকে তাকালো হ্যারি। আলো আঁধারির ছায়া-মায়ায় দেখল, আবছামত কি যেন একটা ক্রমশ উঠে আসছে ওপর দিকে…আসছে… আসছে…তার পরেই সাঁ করে গা ঘেঁসে উঠে গেল বস্তুটা।

অতিকায় একটা পাখী। কি পাখী তা দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল, বিশাল ডানার প্রচণ্ড ঝাপ্‌টায় বাতাসে ঝড় তুলে এক উড়ন্ত বিভীষিকা উঠে গেল ওপরে। শূন্য পথেই থমকে গেল পাখীটা, দুলে উঠল পলকের জন্য, পর মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমায় ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যারির ওপর।

আত্মরক্ষার জন্য শুধু একটা হাতই মুক্ত আছে হ্যারির। ছোরাসুদ্ধ সেই হাত ঘুরিয়ে সাংঘাতিক চঞ্চুর মরণ-কামড় সে এড়িয়ে গেল কোনো মতে। পাখীটার নজর কিন্তু বাচ্চার ওপর নেই—যত আক্রোশ তার হ্যারির ওপর। দড়ি ঘুরছে—তাই ছোরা মেরে পাখীটাকে খতম করা গেল না।

আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল পাখীটা…আবার…আবার…অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও আওয়াজ শোনা যাবে—এই আশায় এবার বিকট গলায় চেঁচাতে লাগল হ্যারি।

সে ডাক ওপরে পৌছোলো নিশ্চয়। তাই দড়িতেও টান পড়ল আগের চেয়ে বেশি। দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল হ্যারি।

কিন্তু তখনও আশি ফুট উঠতে বাকী। এমন সময়ে পাখীটা রণনীতি পালটালো। সোজাসুজি আক্রমণ না করে হ্যারির মাথার দু ফুট ওপরে, মানে হাতের নাগালের ঠিক বাইরে, দড়ি আঁকড়ে ধরে চঞ্চুর আঘাতে দড়ি কাটতে লাগল।

কী ভয়ানক! হ্যারির চুল খাড়া হয়ে গেল অবস্থা দেখে।

একটা সুতি কেটে গেল। একটু একটু করে ছেঁড়া জায়গাটা আরও ছিঁড়ছে। আর বিষম আতঙ্কে সেই দৃশ্য দেখছে হ্যারি শূন্যে দুলতে দুলতে।

নিদারুণ নিরাশায় বুক ফাটা চীৎকার করে ওঠে হ্যারি।

দ্বিগুণ বোঝার দরুন আরো সুতি ছিঁড়ল। এখন বাকী শুধু আধখানা দড়ি।

ছোরা ছুঁড়ে ফেলে দিল হ্যারি। অমানুষিক চেষ্টায়, দড়ি ছেঁড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ছেঁড়া অংশের ঠিক আগের দড়িটুকু। ডান হাতের শক্ত মুঠোয় প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরেও মনে হল দড়ি হড়কে গলে যাচ্ছে মুঠোর মধ্যে দিয়ে।

কোলের বাচ্চা ফেলে দিয়ে দু হাতের মুঠো দিয়ে দড়ি আঁকড়ে ধরতে পারত হ্যারি। কিন্তু কথাটা ও ভাবতেও পারল না।

জ্যাক রিয়ান আর তিন সঙ্গী হ্যারির আর্ত চীৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিল। লম্বা লম্বা টানে আরও তাড়াতাড়ি দড়ি টেনে তুলতে লাগল ওরা।

হ্যারির কিন্তু শক্তি ফুরিয়েছে। মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। ছেঁড়া দড়ি ওপরে পৌঁছোবে বটে, কিন্তু হ্যারি আর পৌঁছোবে না। চোখ বন্ধ করল হ্যারি। খুলল পরক্ষণেই। দেখল, বিশাল পাখীটা ভয় পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দড়ির শেষ প্রান্তটা মুঠির মধ্যে এসে পৌঁছেছে···আরও কিছুক্ষণ · মুঠোর মধ্যে থেকে এইবার পিছলে বেরিয়ে যাবে খুঁটটা·· এই গেল···

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সবল হাতে শিশু সমেত হ্যারিকে ধরে ফেলল ওর বন্ধুরা। টেনে তুলল কুয়োর পারে।

স্নায়ু আর সইতে পারল না। বন্ধুদের কোলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল হ্যারি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রহস্যময়ী নেল্

ঘণ্টা দুয়েক পরে।

হ্যারি তখনো অজ্ঞান। বাচ্চার প্রাণ ধুকধুক করছে দেখে জ্যাক রিয়ান তাকে কটেজে নিয়ে গেল। সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে গেল, বুড়ো সাইমন ফোর্ড তখন অ্যাডভেঞ্চারের বৃত্তান্ত শুনছে, ম্যাগি তখন বাচ্চার সেবায় ব্যস্ত।

হ্যারি যাকে শিশু ভেবেছিল, আসলে সে শিশু নয়—কিশোরী, বছর পনেরো-ষোল বয়স।

মেয়েটির দুই চোখের বিহ্বলতা আর ক্লিষ্ট মুখের শীর্ণতা দেখলে মায়া লাগে। দিবালোকের অভাবে চামড়ার রঙ ফ্যাকাসে, অনেক কষ্ট পাওয়ার ফলে মুখ অতিশয় শীর্ণ। শরীর তো নয়, যেন ক'খানি হাড়ের সমাবেশ—এত রোগা, এত পাতলা! সব মিলিয়ে অদ্ভুত হলেও কমনীয়!

জ্যাক রিয়ান দেখেশুনে কিশোরীকে পরী বলে বসল।

পরী না হলে এমনি অলৌকিকভাবে কারো আবির্ভাব ঘটে না। অন্ধকারের মধ্যে পরীর জীবন যে ভাবেই কাটুক না কেন, ও কিশোরী যে মানবী নয়—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। মেয়েটির মুখের গড়নও যেন কেমন-কেমন। বাতির আলোয় ফ্যালফেলে চাহনিও মানবিক নয়; যেন বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছে পরী মেয়েটি। যা কিছু দেখছে, তাই নতুন লাগছে, তাই অবাক হচ্ছে।

ম্যাগির বিছানায় শুয়ে আছে পরী-মেয়ে। একটানা লম্বা ঘুমের পর চোখ মেলে চাওয়ার মতই আস্তে আস্তে যেন নব জীবনের সঞ্চার ঘটছে তার মধ্যে। ম্যাগি তাই দেখে ঝুঁকে পড়ল। মোলায়েম গলায় শুধোলো, 'তোমার নাম কি, মা?'

'নেল।' বলল পরী-মেয়ে।

'তোমার কষ্ট হচ্ছে, নেল? যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'ক্ষিদে পেয়েছে! অনেকদিন না খেয়ে আছি।'

এই কটি কথা শুনেই ম্যাগি বুঝল, নেল কথা বলায় অভ্যস্ত নয়। তাছাড়া নেলের ভাষা সেকেলে গেলিক ভাষা। সাইমনের ফ্যামিলিতে মাঝে মাঝে এ ভাষায় কথা বলা হয়। তাই ম্যাগির বুঝতে অসুবিধে হল না। সঙ্গে সঙ্গে সে খাবার নিয়ে এল। খাওয়ার ধরন দেখে মনে হল, স্রেফ না খেয়েই মরতে বসেছিল নেল। কে জানে অন্ধকার পাতাল-গহ্বরে কদ্দিন এভাবে ছিল ও।

ম্যাগি জিজ্ঞেস করল, 'গর্তের মধ্যে কদ্দিন ছিলে নেল?'

নেল জবাব দিল না। মনে হল, প্রশ্নটা ধরতে পারেনি।

ম্যাগি আবার শুধোলো, 'আন্দাজ কদ্দিন?'

'দিন?' আস্তে আস্তে এমনভাবে বলল নেল, যেন দিন শব্দটার কোনো মানে ওর জানা নেই।

ম্যাগি পরম স্নেহভরে নেলের হাত ধরল। মিষ্টি হেসে বলল, 'তোমার বয়স কত, নেল?'

আবার মাথা নাড়ল নেল।

ম্যাগি বলল. 'কত বছর তোমার বয়স ?'

'বছর ?' এ শব্দটাও যে নেলের জানা নেই, তা ওর মুখ দেখে বোঝা গেল।

সাইমন, হ্যারি, জ্যাক এবং আর সবাই গভীর সমবেদনায় মূক হয়ে রইল। মোটা খসখসে পশমের নোংরা পোশাকে মোড়া কিশোরী নেলের অসহায় অবস্থা প্রত্যেকের মন বেদনায় ভরিয়ে তোলে।

হ্যারির ঘোর তখন কেটে গেছে। পলকা মেয়েটার করুণ চাহনি ওকে বিষম বিচলিত করে। বিছানার কাছে গিয়ে সে নেলের হাত মুঠোয় তুলে নিল। চোখে চোখ রাখল। করুণ হাসি ছায়ার মত ভেসে গেল নেলের রক্তহীন অধরের ওপর দিয়ে।

হ্যারি বলল, 'নেল, খনির তলায় আর কে ছিল ? একলা ?'

'একলা। একলা! অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল নেল। সোজা উঠে বসল। আতঙ্ক ফুটে উঠেছে তার হাবভাবে। হ্যারির চোখে চোখ রেখে যে চাহনি নরম হয়ে এসেছিল, আবার তা উদভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

'কেউ নেই, বড় একলা।' পাগলের মত নেল বারবার বলে। তারপর আবার এলিয়ে পড়ে—যেন বসে থাকবার শক্তি নিঃশেষ তার।

ম্যাগি বলে, 'আহা রে, বেচারি বড় কাহিল হয়ে পড়েছে।'

নেলকে ধরে সে শুইয়ে দিয়ে আবার। বললে, 'ঘুমোক। ঘণ্টাকয়েক ঘুমোক। খেয়েদেয়ে গায়ে শক্তি আসুক। তারপর অন্য কথা এস সাইমন, হ্যারি, ওকে ঘুমোতে দাও।'

সবাই চলে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল নেল।

ঘটনাটা সামান্য নয়। চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। শুধু কয়লার খনিতে নয়, সারা স্টার্লিংশায়ারে। তারপর সারা দেশে। মুখে মুখে রঙ ধরতে ধরতে গল্প অতিরঞ্জিত হয়ে চলে। মেয়েটিকে নাকি পাথরের মধ্যে পোঁতা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। কয়লার স্তরে গাঁথা বহু প্রাচীন জীবের কঙ্কাল যেভাবে গাঁইতির ঘা খেয়ে ধরা দেয়, মেয়েটির আবির্ভাবও নাকি তেমনি রহস্যময়।

নেল কিন্তু এ সবের কিছুই জানল না, শুনলও না। কদিন যেতে না যেতেই সে বিখ্যাত হয়ে গেল। একটা বিস্ময়ে পরিণত হল। কুসংস্কার যাদের মাথার পোকা, তারা নেলকে ঘিরে পুরাণের পিলে-চমকানো কাহিনী তৈরি করে চলল। কেউ কেউ বলে, নেল হল ঐ কয়লাখনির শরীরী আত্মা।

জ্যাক রিয়ানের মুখে এই সব গালগল্প শুনে হ্যারি বললে, 'মন্দ কি! শরীরী

আত্মাও যদি হয়, ও হল শুভ আত্মা—অশুভ নয়। শুভ বলেই খনির অন্ধকারে আটক থেকে যখন মরতে বসেছিলাম, নেল জল-রুটি দিয়ে আমাদের প্রাণে বাঁচিয়েছিল। এ কাজ নির্ঘাৎ নেলের—আর কারো নয়! তবে হ্যাঁ, অশুভ আত্মাও একটা আছে। খনির মধ্যেই আছে। সময় আসুক, তাকেও পাকড়াও করব।'

এ খবর জেম্‌স্ স্টারের কানেও গিয়েছিল। কটেজে আসবার পরের দিন, নেলের শরীর তখন মোটের ওপর ভালই, জেম্‌স্ স্টার এলেন দেখা করতে। এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন তাকে।

দেখা গেল, নেল অনেক কিছুই জানে না। রোজকার অনেক ব্যাপারই তার অজানা। তাই বলে বোকা সে নয়। রীতিমত বুদ্ধিমতী। তবে অনেক কিছু তার জানা নেই। যেমন, সময়ের হিসেব। সময়কে যে দিন আর ঘণ্টার মাপে ভাগ করা হয়—নেল তা জানে না। এমন কি, দিন আর ঘণ্টার নামও শোনেনি!

রাতের অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছিল নেলের। তাই বিদ্যুৎবাতির প্রখরতা সইতে হিমসিম খেতে লাগল বেচারী। অন্ধকার হলেই কিন্তু আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ওর দৃষ্টিশক্তি। চোখের মণি তখন এত প্রসারিত হয় যে, নিবিড় তমিস্রার খুঁটিনাটি দেখতে পায়।

নেলের মনে বাইরের জগতের কোনো ছাপই যে পড়েনি তা দুদিনেই বোঝা গেল। খনির দুনিয়া ছাড়া বেচারী আর কোনো দিগন্ত দেখেনি। পাতালপুরীর নিতল রহস্য ছাড়া ও আর কিছুই জানে না।

সবার মনেই প্রশ্ন—আকাশে সূর্য আর তারাদের খবর কি নেল জানে? জানে কি বিশাল এই পৃথিবীতে আছে কত শহর আর গ্রাম? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে অগুনতি বিশ্ব?

কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব নেই। কেন না, বহু শব্দেরই অর্থ ধরতে পারে না নেল। তাই উত্তরও দিতে পারে না।

নিউ অ্যাবারফয়েলের পাতালপুরীতে নেল একা থাকত কিনা, এ প্রশ্নের জবাব জানতে গিয়ে বৃথাই নাকানিচোবানি খেলেন জেম্‌স্ স্টার। এ নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই ভয়ে কাঁটা হয়ে যায় নেল। হয় ও জবাব দিতে চায় না, অথবা জবাবের ভাষা খুঁজে পায় না। কিন্তু একটা অবর্ণনীয় রহস্য যে ওর উপলব্ধির মধ্যে আছে, তাতে কারো কোনো সন্দেহ নেই।

জেম্‌স্ স্টার একবার শুধিয়েছিলেন, 'নেল, আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও, না যেখানে ছিলে সেখানেই ফিরে যেতে চাও?'

প্রথম প্রশ্নের জবাবে সোল্লাসে বলেছিল নেল, 'হ্যাঁ চাই!'

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব যখন চাওনা হল, তখন আতঙ্কে সে শুধু কেঁদে উঠেছিল, কিছু বলেনি, হয়ত বা বলতেই পারে নি।

নেল এই যে অনেক প্রশ্নের জবাব দিত না, সেজন্যে বা তার এই অবাধ্যতার জন্যে রাগ করতেন না জেম্স্ স্টার বা হ্যারি ফোর্ড। বরং উদ্বিগ্ন হতেন। কয়লার খনি আবিষ্কারের মূলে যা-যা ঘটনা ঘটেছে, তা মনে পড়ে যেত। সেসব ঘটনার কোনোটিই আজ পর্যন্ত খোলসা হয়নি। তারপর যদিও তিন-তিনটে বছর কেটে গেছে এবং আর কিছুই ঘটেনি, তবু প্রতি মুহূর্তেই অদৃশ্য শত্রুর কাছ থেকে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা করে এসেছেন তাঁরা।

তাই প্রহেলিকাময় পাতালসরোবরে আবার অভিযান চালানোর সঙ্কল্প নিল সকলে।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রীতিমত বলীয়ান হয়ে এ অভিযানে নামা হল। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু দেখা গেল, কয়লার স্তরের ফাঁক দিয়ে পাতালপুরীর নিচ পর্যন্ত প্রসারিত গহ্বরে থই থই করেছে শুধু জল আর জল।

এ নিয়ে প্রায়ই জল্পনা-কল্পনা চলে জেম্স্ স্টার, সাইমন আর হ্যারির মধ্যে। এক বা একাধিক দুষ্ট 'শক্তি' পাতালপুরীর তমিস্রায় ওৎ পেতে থাকলে নেল নিশ্চয়ই হুঁশিয়ার করে দিত খনিবাসীদের। কিন্তু নেল সে সবের ধার দিয়েও যায় না। বরং বিগত জীবনের সামান্যতম উল্লেখ ঘটলেই সে এমন ত্রস্তচকিত হয়ে ওঠে যে, এ নিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে আর পীড়াপীড়ি না করার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়। ঠিক হয়, সময় এলে আপনা থেকেই নেল বলবে ওর গোপন রহস্য।

কটেজে থাকতে থাকতে দিন পনেরোর মধ্যেই প্রৌঢ়া ম্যাগির দারুণ ন্যাওটা হয়ে উঠল নেল। এটুকু ও বুঝেছিল যে, যে গৃহে এত আদরযত্ন, সে গৃহ ছেড়ে তার আর কোথাও যাওয়া চলবে না। বরং আগের দিনের কথা ভুলে যাওয়াই মঙ্গল। তাছাড়া, নেলকে গোড়া থেকে বাড়ির মেয়ের মত দেখতে শুরু করেছিল সবাই। কাজেই নেলের কাছে এরা ছাড়া আর আপন কেউ ছিল না।

বড় মিষ্টি মেয়ে নেল। নেলের মধুর ব্যবহারে সবাই যেমন খুশী, তেমনি সকলের আপন-করে-নেওয়া আচরণে নেলের মনও কৃতজ্ঞতায় টইটুম্বুর।

নেলকে নিজের হাতে উদ্ধার করতে না পারার জন্যে জ্যাক রিয়ানের মনে বিলক্ষণ খেদ ছিল। প্রায়ই কটেজে আসত জ্যাক। গান গাইত। নেল

কোনো দিন গান কি জিনিস, শোনে নি : কাজেই খুব ভাল লাগত ওর। কিন্তু একটা জিনিস কারোই চোখ এড়ায় না। নেল গান শোনার চাইতেও হ্যারির তাত্ত্বিক কথাবার্তা শুনতে বেশী ভালবাসে। হ্যারির এই সব কথা থেকেই ধীরে ধীরে বাইরের জগৎ সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা ঘুচিয়ে দিচ্ছে নেল।

নেলের সশরীরে আবির্ভাবের পর থেকেই বেচারা জ্যাক রিয়ানের অশরীরী বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছিল। মাস দুয়েক পরে ভিত আরও নড়ল! হ্যারি এমন একটা আবিষ্কার করে বসল, যা কিনা কেউ ভাবতেও পারে নি। ফলে আরভিনে ডানডোনাল্ড কেল্লায় আগুনপরীদের আবির্ভাবের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

বেশ কয়েক দিন ধরেও খনির দক্ষিণ অঞ্চলে দীর্ঘ অভিযান চালানোর পর সরু একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে উঠতেই হ্যারি দেখল, পথের শেষ হয়েছে কেল্লার একটা ফাটলে। আচমকা ফাঁকায় বেরিয়ে চমকে যায় হ্যারি। চারপাশে ডানডোনাল্ড কেল্লার ধ্বংসস্তূপ!

সেই দিনই বোঝা গেল, নিউ অ্যাবারফয়ে আর ভগ্নস্তূপে ভরা এই পাহাড়চূড়ার মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ আছে। কিন্তু সুড়ঙ্গর ওপর মুখ এমনভাবে ঢাকা যে বাইরে থেকে দেখে বোঝবার জো নেই। পাথর আর ঝোপ ছাড়া কিছুই দেখাই যায় না। সেই কারণে অত তদন্ত করেও ম্যাজিস্ট্রেটরা সুড়ঙ্গের সন্ধান পান নি।

দিন কয়েক পরে জেম্‌স্ স্টার নিজেই এলেন। সঙ্গে এল হ্যারি। কয়লার খনির সুড়ঙ্গ-রহস্য দেখে তাজ্জব হলেন স্টার।

শুধু তাজ্জবই নয়, নিজের মনের কথাটাও বলে ফেলেন তিনি, 'হয়ে গেল! ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেল। আগুন-পরী দেখে আর তো কেউ ভিরমি খাবে না!'

'তাতে কিন্তু সম্পূর্ণ খুশী হতে পারছি না, মিঃ স্টার।' হ্যারি বলল, 'রাক্ষস খোক্কসের যুগ না হয় ফুরোলো, কিন্তু তাতে খনির রহস্য তো ফুরোচ্ছে না।'

'বুঝেছি,' জেম্‌স্ স্টার বলেন, 'খনির অন্ধকারে যারা ঘাপটি মেরে আছে, তাদের এখনো পাত্তা পাওয়া যায় নি। তবে এটা বোঝা গেল যে, এই রাস্তা দিয়েই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। সেই অন্ধকার ঝড়ের রাতে এরাই আগুন জেলেছিল, আগুন নেড়েছিল। 'মোটালা' জাহাজ তাই দেখে পথ ভুল করে পাথরে আছড়ে পড়েছিল। জ্যাক রিয়ান আর তার বন্ধুরা না থাকলে সেকেলে হার্মাদদের মতই ভাঙা জাহাজ লুঠ করে ছাড়ত ওরা। এখন প্রশ্ন হল, তারা যারাই হোক, এখনো কি আছে খনিতে?'

'আলবৎ।' বিশেষ জোরের সঙ্গে জবাব দেয় হ্যারি, 'আছে বলেই তো ওদের নাম করলেই আঁৎকে ওঠে নেল।'

কথাটা মিথ্যে নয়। রহস্যময় প্রেতচ্ছায়ার মত প্রায়-অদৃশ্য জীবেরা খনির অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে বলেই তো মুখ খুলতে চায় না নেল। আতঙ্কে শিউরে ওঠে, আর মুখ বুঁজে থাকে

জেম্‌স্ স্টার জেদ ধরলেন রহস্যের সমাধান করতেই হবে। নইলে খনির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভাঙা দুর্গের মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল পুলিশ। হ্যারি নিজেও ঝোপেঝাড়ে কয়েক রাত কাটালো। কিন্তু বৃথাই। সুড়ঙ্গ দিয়ে কায়া নিয়ে কোনো মানুষকে বেরোতে দেখা গেল না।

কাজেই সবাই ধরে নিল, হানাদাররা ভয়ের চোটে খনি ছেড়ে লম্বা দিয়েছে। যাবার আগে জেনেই গেছে যে, নেল আর বেঁচে নেই। ইঁদারার মধ্যে যেখানে নেলকে ফেলে ওরা পালিয়েছিল, অনাহারে সেখানেই সে অক্কা পেয়েছে।

পরিত্যক্ত নিরালা খনি গহ্বরে নিরিবিলিতে থাকা যায়। তাই ওরা এখানে আস্তানা নিয়েছিল। কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে। খনিতে ক্রমশ লোক বাড়ছে। কাজেই, সবাই নিশ্চিত হল যে, ওরা চম্পট দিয়েছে। আর ফিরবে না।

জেম্‌স্ স্টার কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগলেন। হ্যারি নিশ্চিত হতে পারল না। হ্যারির বিশ্বাস, নেল নিজেই খনি-রহস্যের সঙ্গে জড়িত নইলে এত দিনেও চুপচাপ কেন? বিপদ যদি কেটে গিয়েই থাকে, তবে মুখ খুললেই তো পারে?

একদিন তাই সবাই মিলে ঠিক করলে, নেলকে একটু আভাস দেওয়া দরকার। নেল যে ওঁদের কাছে কতখানি, তা জানানো দরকার।

ছুটির দিন। খনির ভেতরে কাজ বন্ধ, ওপরেও তাই। লোকজন পায়চারি করছে, গান গাইছে। নিউ অ্যাবারফয়েলের শূন্য গহ্বর গমগম করছে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লুকোচুরিতে।

লেক ম্যালকমের বাঁ পাড় বরাবর বেড়াচ্ছে হ্যারি আর নেল। বিদ্যুৎবাতি সেখানে তত জোরালো নয়। পাথরের গম্বুজে আলো ঠিকরে পড়ছে, ধারালো কোণায় কোণায় ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে কালো অন্ধকারে। এই গোধূলি আলো ভালো লাগে নেলের। পুরো আলো এখনো তার চোখে সয় না।

ঘণ্টাখানেক পায়চারি করার পর সেন্ট গিলেজ গির্জার সামনে পৌঁছোলো দুজনে। চাতালের ওপর খাড়া গির্জার ছায়া ভাসছে লেকের জলে।

হ্যারি বলল, 'নেল, দিনের আলো এখনো তোমার চোখে সয় না—সূর্য তো নয়ই, তাই না?'

'ঠিক বলেছো। স্বর্গের যে চেহারা তোমার মুখে শুনেছি, তা দেখার মত আমার চোখের জোর এখনো হয় নি।'

'পৃথিবীর ঐশ্বর্য তোমার চোখে যেদিন ধরা পড়বে সেদিন বুঝবে চোখ যাদের নেই তাদের দুঃখ কি! কিন্তু সত্যিই কি তুমি পাতালে জন্মাবার পর থেকে মাটির ওপরে যাওনি?'

'সত্যি।'

'তখন অবশ্য পাতাল ছেড়ে বাইরে যাওয়া মুশকিল ছিল, কিন্তু এখন নয়। রেল রয়েছে। মনে করলেই বেরোনো যায়। যাবে? স্রষ্টার সৃষ্টি নিজের চোখে দেখবে।'

'আরো দু দিন পরে।'

'কেন নেল? মৃত্যু-গহ্বর থেকে তোমাকে তুলে এনেছিলাম, তুমি প্রাণ ফিরে পেয়েছো। তবুও তুমি বাইরের জগৎ দেখতে চাও না কেন? পাতাল তোমার ভাল লাগে?'

'ভুল বুঝো না, হ্যারি। গোধূলির আলো যে কত মিষ্টি, তা আমি বুঝি। আধা অন্ধকারে কত যে খেলা চলে, তা দেখার চোখ চাই। জান ছায়া ভেসে যায়···পালিয়ে পালিয়ে যায়···দু হাত বাড়িয়ে তাদের ধরতে গিয়েও ধরা যায় না···পেছন পেছন ছুটতে কি মজাই না লাগে! গোল চাকার মত ছায়ারা জড়াজড়ি করে। কত খেলাই না খেলে! শুধু চেয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়। তবুও আশ মেটে না! খনির একদম পাতাল-অঞ্চলে আলো জ্বলে··· গভীর গর্তের মধ্যে অদ্ভুত রোশনাই দেখা যায়। আওয়াজ শোনা যায়। যেন কারা কথা কইছে। হ্যারি, এটাও এক আশ্চর্য দুনিয়া। একে বুঝতে হলে, জানতে হলে আমার চোখ চাই, আমার মন চাই!'

'বুঝলাম। কিন্তু একলা থাকার সময়ে তোমার ভয় হত না?' হ্যারি জিজ্ঞেস করে।

'সত্যিই যখন একলা ছিলাম, একদম ভয় লাগতো না।' গলা কেঁপে যায় নেলের।

'কয়লার সুড়ঙ্গে যদি হারিয়ে যেতে?'

'নতুন খনির অন্ধিসন্ধি আমার মুখস্ত।'

'নতুন খনির বাইরে কোনো দিনই কি বেরোও নি?'

'মাঝে মাঝে বেরোতাম।' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে নেল বলে, 'অ্যাবার-ফয়েলের পুরানা খনি পর্যন্ত যেতাম।'

'আচ্ছা। আমাদের পুরনো কটেজ দেখেছিলে?'

'কটেজ? তা, হ্যাঁ, দেখেছিলাম বই কি! ভেতরের লোকদের দূর থেকেই অবশ্য দেখতাম!'

'নেল, তারা কারা জানো? আমার বাবা, মা আমি। পুরনো বাড়ি ছেড়ে যেতে কারোই মন চায় নি, তাই ওখানে থেকে গিয়েছিলাম।'

'গেলে ভালই করতে।' মৃদু কণ্ঠ নেলের!

'কেন, নেল? ছেড়ে যাই নি বলেই না আজ নতুন খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ফলে কত লোকের মুখে হাসি ফুটেছে, বলো তো? শুধু তাই নয়, তুমি প্রাণ ফিরে পেয়েছো, এত লোকের মন জয় করে বসেছো?'

'আমার হয়তো ভালই হয়েছে। কিন্তু অন্যের?'

'অন্যের মানে? কি বলতে চাও নেল?'

'না...না...কিছু না। হ্যারি, নতুন খনির ভেতর খুব নিরাপদ নয়। বিপদ এখানে পদে পদে! অনেক দিন আগে কয়েকজন লোক কিভাবে জানি ঢুকেছিল...অনেক দূর গিয়েছিল...তারপর আর ফিরতে পারে নি! রাস্তা হারিয়েছিল!'

'রাস্তা হারিয়েছিল?' স্থির চোখে চেয়ে রইল হ্যারি।

'হ্যাঁ, পথ খুঁজে পায় নি।' গলা কাঁপছে নেলের, 'বাতি নিভে গিয়েছিল। ফেরবার পথও গুলিয়ে গিয়েছিল!'

সোল্লাসে বলল হ্যারি, 'আর তার ফলে আট দিন আট রাত তারা কয়েদ হয়েছিল এই কয়লার গারদে! নেল, তারা মরতে বসেছিল, কিন্তু ঈশ্বর আছেন। তাঁর দয়াতেই অদৃশ্য পরীর মত হাজির হয়েছিল এক উপকারী বন্ধু। সে তাদের খাবার এনে দিয়েছিল। তারপর খনির গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার পথও বাৎলে দিয়েছিল। সে না থাকলে, এইখানেই তাদের জ্যান্ত কবর হত। তাই না নেল?'

হাঁ করে তাকিয়েছিল নেল, 'তুমি জানলে কি করে?'

'আমি তো তাদের মধ্যেই ছিলাম। আর ছিলেন জেম্স্ স্টার, বাবা আর মা!'

সজোরে হ্যারির বাহু চেপে ধরল নেল। পলকহীন চোখে চেয়ে রইল হ্যারির দীপ্ত চোখের পানে: 'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। নেল, সেদিন সেই অদৃশ্য পরী না থাকলে আমরা কেউই বাঁচতাম না। আজ বুঝেছি, কে সেই পরী! নেল, তুমিই সেই অন্ধকারের বন্ধু!'

দুই হাতে মুখ ঢাকল নেল। হ্যারি ওকে এভাবে কখনো বিচলিত হতে

দেখেনি। ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে সে বলল, 'নেল, তোমার জীবন যারা বাঁচিয়েছে, তাদের জীবন তো তুমি আগেই বাঁচিয়েছিলে। আমরা তা ভুলি নি নেল, কোনো দিন ভুলবও না ?'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আঁধার-আগন্তুক

নিউ অ্যাবারফয়েলের কয়লা বিস্তর মুনাফা আনছে। লাভের ভাগ জেম্‌স্ স্টার এবং সাইমন ফোর্ডও পান। হ্যারি পার্টনার রয়েছে খনি-কোম্পানীর। কিন্তু কটেজ ছাড়ার কথা কেউ ভাবতেও পারে। বাবার জায়গায় হ্যারি হয়েছে ওভারম্যান। খনিশ্রমিকদের কাজ তদারকে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় সে।

বন্ধুর সৌভাগ্যে আনন্দে আটখানা জ্যাক রিয়ান। হ্যারির মন যে নেলের দিকে টেনেছে, জ্যাকের চোখে তা এড়ায়নি।

একদিন দুই বন্ধুতে দেখা হল ম্যান-ইঞ্জিনে।

ম্যান-ইঞ্জিন হল লিফটের মত কল। খনিতে নামা-ওঠার সেকেলে ব্যবস্থা। খনিতে নামার খাড়াই গর্তে একটা চোঙা ক্রমাগত নামা-ওঠা করতে থাকে। চোঙার গায়ে কতকগুলো মাচা আছে। সুড়ঙ্গের গায়েও কতকগুলো চাতাল আছে। চোঙা যখন খনির তলদেশ ছুঁয়ে থাকে, মাচা আর চাতাল তখন এক হয়ে যায়। নীচে থেকে যে ওপরে যেতে চায়, সে চাতাল থেকে মাচায় গিয়ে ওঠে। চোঙা ওপরে উঠে স্থির হলেই সে মাচা থেকে নেমে এবার ওপরের চাতালে দিয়ে দাঁড়ায়। চোঙা আবার নেমে যায়। তারপর আবার চোঙার মাচায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। চোঙা ওপরে উঠলেই আবার চাতাল। এমনি করে ধাপে ধাপে জমির ওপরে ওঠা, ওপরের জমি থেকে ভূগর্ভেও নামা যায়। এ যন্ত্র ততক্ষণই নিরাপদ, যতক্ষণ পাকা লোকের হাতে তার চালাবার ভার থাকে।

যাই হোক, খাড়াই সুড়ঙ্গের এক মাঝামাঝি চাতালে দুই বন্ধুতে দেখা। জ্যাক নীচে নামছে, আর হ্যারি ওপরে উঠছে। বিদ্যুৎ-বাতিতে পরস্পরের মুখ দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল দুজনে। উচ্ছ্বাস কমলে জ্যাক বলল, 'কি হে, বিয়ে করছ কবে ?'

'বিয়ে ?' অবাক হবার ভান করে হ্যারি।

'ন্যাকামি ছাড়ো ! বলি, নেল তোমার বউ হচ্ছে কবে ?'

'নেল আমার বউ হবে কেন ?'

'তোর না হলে কিন্তু আমার বউ হয়ে যেতে পারে।'

'হোক না।'

'বটে ! ঈর্ষা হচ্ছে না ?'

'ঈর্ষা কেন হবে ?'

'আরে মলো যা! তা নেলকে তুই মনে মনে পছন্দ করিস, মুখ ফুটে বললেই হয়। না বললে আমিই কিন্তু বিয়ে করে ফেলব, বলে রাখছি।'

'দেখ জ্যাক', হ্যারি এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'বিয়ে করব বললেই কি করা উচিত ? ধরেছিস ঠিকই, নেলকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু ভুললে চলবে না, জন্ম ওর খনির অন্ধকারে। বলতে গেলে অন্ধ। আলো চোখে সয় না। পৃথিবী কি বস্তু, তা দেখেই নি। বাইরের জগতের কোনো শিক্ষা ও পায়নি।'

'তাহলে কি পাঠশালায় পড়াবি ?'

'ইয়ার্কি মারিসনি।' হ্যারি বলে, গলায় ওর গভীর আন্তরিকতা, 'আমি নিজেই পড়াবো। ওকে শিক্ষিত সভ্য জগতের উপযুক্ত করতে হবে। পৃথিবীর রঙ-রূপ দেখাতে হবে। তবে তো বিয়ে।'

'ওরে বাবা! প্রাণে এত শখ! বেশ তো, তা পৃথিবীর রঙ-রূপ ওকে দেখাচ্ছিস কবে ?'

'শীগ্‌গীরই। খনির রিফ্লেক্টরে এখন আর ওর চোখ ধাঁধায় না। এবার ওকে দেখাব সূর্য।'

সে দিন এই পর্যন্ত হল। ফূর্তিবাজ জ্যাক নামল নীচে।

তারপরেই কথাটা ছড়িয়ে পড়ে হ্যারির নিকট জনদের মধ্যে বাবা-মা বিলক্ষণ খুশী হলেন। জেম্‌স্ স্টার তো বটেই। খনিতে যার জন্ম, খনির মানুষের সঙ্গেই তো তার বিয়ে হওয়া উচিত। সুতরাং আদর্শ জুটি হবে হ্যারি আর নেল। এখন শুধু নেলকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়াই যা বাকী।

এই আনন্দ-সংবাদের মধ্যে একটা চিন্তা কিন্তু প্রায়ই খোঁচা মারে জেম্‌স্ স্টারের মাথায়। চিন্তাটা ভয়ের। আগে যে কাণ্ড ঘটেছে, তা যে আবার ঘটবে না—এমন কথা নিশ্চিন্ত করে বলা যায় না। খনি-রহস্যের আদ্যোপান্ত জানে নেল। কিন্তু সে মুখে চাবি দিয়েছে। নতুন বিপদ যদি আসে আর সে বিপদে খনিবাসীরা যদি বিপন্ন হয়, তাহলে এখন থেকেই তো তার মোকাবিলা করার জন্য তৈরী হওয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে ? কোন্ পথে ? ভাবতে ভাবতে একদিন তিনি সাইমন ফোর্ডকে কথাচ্ছলে বললেন, 'বেশ

তো, বিয়ে হলেই ল্যাটা চুকে যায়। নতুন বিপদ কোন্ দিক দিয়ে আসতে পারে, নেল তা জানে। বিয়ের পর সেই বিপদে স্বামীকে বিপন্ন হতে দেখলেই নেল মুখ খুলবে। খনিবাসীরাও বেঁচে যাবে। কাজেই সেদিক থেকেও বিয়েটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার।'

মোটের পর, হ্যারি-নেলের বিয়েতে কারোই কোনো আপত্তি দেখা গেল না। সবাই খুশী—শুধু একজন ছাড়া।

বিশ্রাম-অবকাশে যখন ইলেকট্রিক বাতিগুলো নিভে যায়, শিল্প-নগরীতে যখন তমিস্রার রাজত্ব শুরু হয় এবং কয়লা-নগরীর বাসিন্দারা যে যার বাড়ি বসে জিরোয়, তখনই নিউ অ্যাবারফয়েলের ছায়ামায়ার অজানা পুরী থেকে বেরিয়ে আসে এক রহস্যময় আগন্তুক।

সবাই নিশ্চিন্ত, হ্যারি-নেলের বিয়েতে বাধা সৃষ্টি করার কেউ নেই পাতালপুরীতে। তাহলে কেন বারেবারে এই ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটে?

অতি সঙ্কীর্ণ অতি জটিল দুর্গম রন্ধ্রপথে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় কেন সে কৃষ্ণকীটের মত অমানিশার অন্ধকারে দেখা দেয় বারে বারে?

তমালকালো তমিস্রায় শ্বাপদের মত জ্বলন্ত চোখ চারদিকে কেন তাকায় রহস্যমূর্তি? কেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় লেক ম্যালকমের ধারে ধারে?

কেনই বা সে বারে বারে ছুটে যায় সাইমনের কটেজের পাশে? কি দরকার তার অত চুপিসারে যাওয়ার? পাছে কেউ দেখে ফেলে, সেই ভয়ে কিসের অত ভয়? কাকেই বা ভয়? কিন্তু সত্যিই কি ভয়, না অন্য কিছু?

কটেজের জানলায় কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে ছায়ামূর্তি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কানে ভেসে আসে টুকরো টুকরো কথা। ছায়ামূর্তি যেন ক্ষেপে যায়। শূন্যে ঘুসি আস্ফালন করতে থাকে। তার হাবভাব দেখে মনে হয়, যেন এই শান্তির নীড়কে পায়ে দলে চূর্ণ করতে না পারা পর্যন্ত মন তার কিছুতেই শান্ত হবে না।

কিন্তু কেন তার এই উন্মাদ আক্রোশ? কেন এই বিজাতীয় জিঘাংসা? কেনই বা আড়িপাতা কথা কানে যেতেই অবরুদ্ধ ক্রোধে ফেটে পড়ে সেই ছায়াময় প্রাণী, শক্ত চোয়ালে দাঁতে দাঁত পিষে বারবার বলে, 'বিয়ে! ওর সঙ্গে নেলের বিয়ে! না—না—না, এ হবে না! এ হতে পারে না!'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয়

আগষ্ট মাসের বিশ তারিখে খনির বাইরে রওনা হল চারজন—নেল, হ্যারি, জেম্‌স্ স্টার আর জ্যাক রিয়ান।

প্রোগ্রাম ঠিক করাই ছিল। বিশ্বের রূপ দেখানোর অনুষ্ঠান-সূচী। পর্যায়ক্রমে উদ্ভাসিত হবে ব্রহ্মাণ্ড-সৌন্দর্য নেলের চোখের সামনে। তাই রওনা হলেন রাত্রে। রাতের রূপ দেখার পর ভোর হবে। কিভাবে অন্ধকারের পর আলোর জগৎ শুরু হয় তা দেখা যাবে।

শেষ ট্রেন ধরে খনির বাইরে এল চারজনে। দু চোখে যা পড়ে, অবাক হয়ে দেখে নেল। মাথার ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে যাচ্ছে। বিস্মিত কণ্ঠে সে শুধোয়, 'হ্যারি তালতাল ধোঁয়া কিসের?'

হ্যারি বুঝিয়ে দেয়, 'ওটা মেঘ। বাষ্প জমে ভেসে চলেছে।'

'মেঘ। বাঃ! মেঘের ফাঁক দিয়ে চকচক করছে ওসব কী?'

'তারা। আমাদের সূর্যের মতই কোটি কোটি সূর্য ছড়িয়ে আছে ব্রহ্মাণ্ডে।'

'সূর্য! সে তো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, শুনেছি। এতো মিটমিট করছে।'

জেম্‌স্ স্টার তখন বুঝিয়ে দেন সূর্য হয়েও তারারা কেন চোখ ধাঁধায় না। বলেন, 'ওরা যে অনেক দূরে রয়েছে, নেল! এত দূরে যে, ওদের হীরের কুচির মত দেখায়। জোনাকির মত মিটমিট করে। এমন অনেক সূর্য আছে, যাদের আলো এখনও পৃথিবীতে পৌঁছোয় নি। সব চাইতে কাছের নক্ষত্রের নাম ভেগা। ঐ তো মাথার ওপর জলজল করছে, দেখছো? পাঁচ হাজার কোটী লীগ (এক লীগে প্রায় তিন মাইল) দূরে রয়েছে ভেগা। কাজেই তার উজ্জ্বলতা যত চোখ ধাঁধানোই হোক, আমাদের চোখে ভেগা মিটমিটে তারা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু কাল সকালে আমাদের যে সূর্য আকাশে উঠবে, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ওদের তুলনায় বেশী নয়—মাত্র তিন কোটি আশী লক্ষ লীগ। তাই সূর্যের ওপর চোখ রাখার সাধ্য আমাদের নেই।'

নেলের প্রশ্নের প্রাথমিক বর্ষণটা ধীরে ধীরে কমে এল। সে যেন বোবা হয়ে যায়। রাত সাড়ে এগারোটার সময়ে তারা পৌঁছলো ফির্থ অব ফোর্থ-এর তীরে। নৌকা ঘাটে ভাসছে। জেম্‌স্ স্টার ব্যবস্থায় ত্রুটি রাখেন নি।

ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ ভেঙে পড়ছে পায়ের কাছে। ঢেউয়ের মাথায় লক্ষ তারার রোশনাই। বিমুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে নেল। আপন মনে বলল 'হ্রদ বুঝি?'

'না,' জবাব দিল হ্যারি, 'নদীর মোহনা। সাগরের একটা বাহুও বলা যায়। বইতে পড়েছো—এবার স্বচক্ষে দেখ, জলের ধারা কি বিশাল অঞ্চল জুড়ে চলেছে জমির ওপর দিয়ে। এ জল হ্রদের জলের মত বদ্ধ নয়, তেমন মিষ্টিও নয়—নোনতা।'

নেল আঁচলা করে জল মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিল, 'ঈস, কী নোনতা!'

'হ্যাঁ। জোয়ার আসছে, তাই সমুদ্রের জল এখানেও এসেছে। সমুদ্রের জলে নুনই থাকে। সমুদ্রই পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে।'

'সমুদ্রের জলই যদি মেঘ থেকে ঝরে নদী সৃষ্টি করে তো নদীর জল মিষ্টি হল কি করে?' শুধোয় নেল।

'তা-ই হয়। সমুদ্রের নোনা জল উবে যাওয়ার সময়ে নুন নীচেই থাকে—শুধু জলটাই মেঘ হয়ে ঝরে পড়ে অন্য জায়গায়।' বুঝিয়ে দিলেন জেম্‌স্ স্টার।

আচমকা নেল চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কী! ও কী! বনে আগুন লেগেছে নাকি?'

'না, চাঁদ উঠেছে।'

জ্যাক বলে উঠল, 'আকাশের পরীরা রূপোর থালায় তারা তুলছে।'

হেসে ফেললেন জেমস্ স্টার, 'তুলনাটা অদ্ভুত হয়ে গেল না?'

'কেন? অদ্ভুত হবে কেন?' বললে জ্যাক, 'চাঁদ উঠলেই তো তারারা নিভে যায়। তার মানে, তারার দল তখন রূপোর থালায় এসে জমে। তাই চাঁদ যত ঝকঝক করে, তারার দল ততই হারিয়ে যেতে থাকে।'

'হুঁ', জেম্‌স্ স্টারের গলা শোনা যায়, 'আসল কথা হল, চাঁদ আমাদের আনক কাছে আছে, সূর্যের চেয়েও অনেক কাছে। তাই চাঁদের আলো তারার আলোর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। আর তাই চাঁদ উঠলে তারা দেখা যায় না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত বিশাল থালার মত স্নিগ্ধ কিন্তু উজ্জ্বল চাঁদের দিকে চেয়ে রইল নেল। দেখতে দেখতে চারদিক চাঁদের আলোয় ধুয়ে গেল। কী অপূর্ব দৃশ্য!

সবাই উঠে বসল নৌকোয়। শুরু হল দাঁড়টানা। চাঁদের কিরণ-বিছানো

জলধারার ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে ছুটে চলল, ওরা। যেন রূপোর পথ দিয়ে পিছলে চলেছে জলযান।

হ্যারির কাঁধে মাথা রেখে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে নেল। বেচারী! ত্রিভুবনের এত শোভা সহসা দেখে সইতে পারেনি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে মন। .

রাত দুটোয় গ্রান্টন বন্দরে পৌছোলো নৌকো। ঘুম ভাঙল নেলের। চারজনে পায়ে হেঁটে চলল শহরের মধ্য দিয়ে। দিগন্তের কুয়াশা দেখে নেল অবাক হয়। শহর দেখে বিস্মিত হয়। স্কটল্যাণ্ড রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদ হোলিরুড দেখে তাজ্জব বনে যয়ে।

অবশেষে আর্থার্স সীট-এর চূড়োয় এসে পৌছোয় চারজনে। ছোট্ট একটা পাহাড়। ৭৫০ ফুট উঁচু। স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁর এক বিখ্যাত উপন্যাসে লিখেছিলেন, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে হলে এই পাহাড়েই ওঠা উচিত। জেম্‌স্ স্টার তাই সদলবলে বসলেন সেখানে।

পূর্ব দিকে চেয়ে আছে নেল। দূর দিগন্তে কুয়াশার মায়াজাল। তারি মাঝে ফিকে গোলাপী আভা। মাথার ওপর ভাসমান মেঘেও লেগেছে উষার রাঙা ছোঁয়া। আর্থার্স সীট-এর সানুদেশে এডিনবরা তখনও নিদ্রামগ্ন রাতের অন্ধকারে। দু-একটা বাতি শুধু মিট মিট করছে এধারে ওধারে—যেন ভোরের তারা দেখাচ্ছে প্রাচীন নগরীর বাসিন্দারা।

পশ্চিম দিগন্তে পর্বতশিখরের সারি। নেলের ভারী অদ্ভুত লাগছে এই আলো-আঁধারির মধ্যে।

পূব দিগন্তে সাগরের বুকে তখন শুরু হয়েছে রঙের খেলা। বর্ণালীর সব কটা বর্ণ সেখানে জন্ম নিচ্ছে, মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার রক্তাভা মিশছে মধ্য গগনের বেগুনী আভার সাথে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে রঙের প্যালেটের রূপ পালটাচ্ছে। গোলাপী থেকে লোহিত, লোহিত থেকে অগ্নিবর্ণ। সূর্যের সাতঘোড়ার পথ যেখানে সাগরের দিক্‌চক্রবালে মিশেছে, দিনের সূচনা ঘটেছে ঠিক সেইখানে।

শহরের পানে চোখ ফেরাল নেল। ছাইয়ের মত আলো সেখানে। কিছু পরে সাগর থেকে ছিটকে এলো সবুজ রশ্মি। দিগন্ত পরিষ্কার থাকলে সকাল-সন্ধ্যায় সাগরের বুক চিরে অদ্ভুত এই রশ্মিকে বিচ্ছুরিত হতে যারা দেখেছে, তাদের অবাক হবার কথা নয়। কিন্তু নেল যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে; সহসা ও সটান দাঁড়িয়ে উঠল. 'আগুন! আগুন।'

সূর্যের রক্তাভায় আগুনের মত জ্বলেছে স্যার ওয়াল্টর স্কটের মনুমেন্ট। দুশ' ফুট উঁচু ঘড়ি-স্তম্ভকে দূর থেকে লাইট হাউসের মত অপরূপ ঠেকছে।

দিন হয়েছে। সূর্য উঠেছে। ডিমের কুসুমের মত মস্ত চাকতিটা তখনও ভিজে ভিজে—যেন সমুদ্রে সত্যিই ডুব দিয়ে ছিল এতক্ষণ। আস্তে আস্তে আর্দ্রতা দূর হল, ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেল—লক্ষ ফারনেসের গনগনে আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সূর্য।

এত দীপ্তি সহ্য করা নেলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে চোখ বন্ধ করল। তাতেও হল না পাতা ভেদ করে মণি অবধি ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রক্তরাঙা দীপ্তি। তাই চোখে আঙুল চাপা দিল নেল। উত্তেজনায় কাঁপছে সে।

হ্যারি বলল, 'নেল, পশ্চিমে তাকাও।'

'না। আমাকে সইতে দাও। চোখকে সওয়াতে দাও।' কম্পিত কণ্ঠে নেল বললে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প দেখছে সে। অবশেষে সে হাত সরায়। আনন্দে বিস্ময়ে প্রদীপ্ত তার মুখ। হঠাৎ সে বলল নতজানু হয়ে, যেন গেয়ে উঠল, 'ভগবান! কি অপূর্ব সুন্দর তোমার সৃষ্টি!'

এডিনবরার পানে চোখ ফেরাল নেল। আলো ঠিকরে পড়ছে শহরের বুকে। ছায়া-অন্ধকারের স্তূপ থেকে উঠে আসছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ। পশ্চিমে শিখরে শিখরে সূর্য উল্লাস! আগুন-আলোর নৃত্য!

বিচিত্র এই দৃশ্য যেন আচম্বিতে ভেঙে পড়ে নেলের অন্ধ দুনিয়ায়। এত দিন যা ছিল তমিস্রা-অবগুণ্ঠিতা, অকস্মাৎ রঙ আর রূপের বন্যা বয়ে গেল সেখানে। আলো-অন্ধকারের এই সংঘর্ষ সইতে পারল না নেল। তার মাথা ঘুরতে লাগল। বিশ্বরূপের বিশালতায় মুহ্যমান পাতাল-কন্যা লুটিয়ে পড়ল হ্যারির সবল বাহুর মধ্যে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কী ভয়ানক

প্রোগ্রাম ছিল পুরো দু-দিনের। রূপের পৃথিবীর যতটা সম্ভব এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই দেখানো হবে নেলকে। তারপর ফিরে যাওয়া হবে কয়লা-নগরীতে।

তাই সেদিন ওঁরা ট্রেনে গ্লাসগো গেলেন। ব্রীজে দাঁড়িয়ে নদীর ওপর বিবিধ জলযানের ছুটোছুটি দেখেন তাঁরা। রাত কাটান রয়াল হোটেলে।

পরের দিন তাঁরা পৌঁছোলেন রবরয়ের দেশে। যে রবরয়কে স্যার ওয়াল্টার স্কট অমর করে গেছেন তাঁর রচনাসম্ভারে—এই তাঁর সেই দেশ। পাহাড়, বন, হ্রদ দিয়ে সাজানো প্রকৃতির নিজস্ব নিকেতন।

পথে যেতে যেতে দু চোখে যা পড়ে, সব কিছুরই অতীত ইতিহাস তুলে ধরেন জেম্‌স্ স্টার। ছবির মত বর্ণনা! নেলের মনোজগতে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সঞ্চিত হতে থাকে। ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে-আসা আশ্চর্য কাহিনী যেন মূর্ত হয় তার চোখের সামনে।

অবশেষে ওঁরা পৌছোলেন লক ক্যাটরিনের তীরে। 'রবরয়' নাম লেখা একটা ছোট্ট ষ্টিমবোট ভাসছে জলে।

লক ক্যাটরিন আসলে একটা হ্রদ। কিন্তু এত বড় যে, মনে হয় যেন সাগরের মোহনা। চওড়ায় দু মাইল। লম্বায় দশ মাইল। হ্রদ ঘিরে পর্বতমালা। যেন পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রকৃতির মুকুর।

জেম্‌স্ স্টার বললেন, 'এ হ্রদের সঙ্গে বান বা পাঁকাল মাছের তুলনা করা হয়েছে। কারণ এর জল নাকি কস্মিনকালেও জমে বরফ হয় না। সত্যিমিথ্যে জানি নে। তবে ভুললে চলবে না 'লেডী অব দি লেক'-এর সেই বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার এই লোকেই ঘটেছিল।'

'রবরয়' ষ্টিমবোটের ডেকে ব্যাগপাইপ বেজে উঠল। একজন হাইল্যাণ্ডার জাতীয় পোশাক পরে জাতীয় বাজনা নিয়ে সুর-রচনায় মত্ত। বনের পত্রমর্মর, জলের ছলছলানি আর হাওয়ার সরসরানির সঙ্গে সুরের ঐকতানে মুগ্ধ হল সকলে। মনের আনন্দে তালে তাল মিলিয়ে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে ফুর্তিবাজ জ্যাক রিয়ান :

তখন বেলা তিনটে। পশ্চিমদিকের এবড়ো-খেবড়ো তীরভূমি দেখা যাচ্ছে। এদিককার জমি তত বন্ধুর নয়। আধ মাইল দূরে দেখা গেল জাহাজঘাটা। 'রবরয়' সেখানে ভিড়বে। যাত্রারা নেমে ক[illegible] নাগুর হয়ে যাবেন স্টার্লিং।

একদিনের পরিশ্রমেই নেতিয়ে পড়েছে নেল। নতুন বিস্ময় দেখলে অস্ফুট উচ্ছ্বাসধ্বনি ছাড়া গলা দিয়ে আর শব্দ বেরুচ্ছে না। সত্যিই তো, ভগবানের রাজ্যে বিস্ময়ের কি শেষ আছে। একদিনে এত বিস্ময় ঐটুকু হৃদয় সইতে পারবে কেন? দরকার এখন ঘণ্টা কয়েকের বিশ্রাম। নেলের হাত মুঠোয় তুলে নেয় হ্যারি, বলে, 'নেল!'

'বলো।'

'কয়লা-নগরীর চেনা জগতে এইবার ফিরব।

'যা দেখলাম, তা অপূর্ব, অদ্ভুত—কোনোদিনই ভুলব না! চলো, এবার ফিরি।'

'নেল,' আবেগে হ্যারির গলা কাঁপছে, 'ঈশ্বর সাক্ষী, মানুষ সাক্ষী,

তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার গৌরব আমি লাভ করতে চাই। দেবে কি সে অধিকার?

সরল চোখে হ্যারির পানে তাকায় নেল, 'তাতেই যদি তুমি সুখী হও হ্যারি, তবে তাই হোক—'

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ অবর্ণনীয় একটা কাণ্ড ঘটল।

তীরভূমি থেকে 'রবরয়' তখনও আধ মাইলটাক দূরে। আচম্বিতে থরথর করে কেঁপে উঠল ষ্টিমবোট। ষ্টীমারের তলদেশ হ্রদের তলায় ঘষটে গেল। প্রবল চেষ্টা করেও 'রবরয়'কে নড়াতে পারল না ষ্টীমার-ইঞ্জিন।

দুর্ঘটনার কারণ সাংঘাতিক। লক ক্যাটরিনের পূর্বাঞ্চল অকস্মাৎ জলশূন্য হয়ে গেল। যেন সহসা বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে হ্রদের তলদেশে। দেখতে দেখতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জল নেমে গেল। সমুদ্র-সৈকতের মত প্রায় শুষ্ক হয়ে যায় সারা অঞ্চলটা। বলতে গেলে সব জলই নিমেষ মধ্যে উধাও হয়েছে পাতাল-বিবরে।

জেম্‌স্‌ স্টার তৎক্ষণাৎ বুঝেছিলেন, কি বিপর্যয় ঘটে গেল! আকুল কণ্ঠে তিনি হাহাকার করে উঠলেন, 'গেল! গেল! নিউ অ্যাবারফয়েল গেল! বন্ধুবান্ধব সব গেল! হা ঈশ্বর, এ কী করলেন!'

বিংশ পরিচ্ছেদ

হুঁশিয়ার

সেদিন নিত্য দিনের কাজের ছন্দে গমগম করছে নিউ অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভ। দূর থেকে ভেসে আসছে ডিনামাইট বিস্ফোরণের শব্দ, কয়লা-পাথর ভেঙে পড়ার হুড়মুড় আওয়াজ। মুহুর্মুহু গাঁইতির ঘায়ে খসছে কয়লার চাঙড়। ড্রিলিং মেসিন একঘেয়ে শব্দে ছিদ্র সৃষ্টি করে চলেছে পাথরের নতুন নতুন স্তরে।

সব মিলিয়ে কানে তালা লাগার মত অবস্থা। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে পাখা। বায়ু-যাতায়াতের পথ দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে ঠেলে দিচ্ছে সুড়ঙ্গ পথে। কাঠের ঠেলা-দরজাগুলো দমাদম শব্দে আছড়ে পড়ছে বাতাসের ঝাপটায়। নীচের টানেলের ট্রেন ছুটছে—টেনে নিয়ে চলেছে কয়লা ভর্তি ওয়াগন। গতিবেগ ঘণ্টায় পনেরো মাইল। অটোমেটিক হুঁশিয়ার-ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দে শ্রমিকরা পথ করে দিচ্ছে—লাইন ছেড়ে পাশে দাঁড়াচ্ছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনের দৌলতে খাঁচাগুলো ক্রমাগত পাতাল থেকে মর্ত্যে উঠছে আর নামছে।

ইলেকট্রিক চাকতির প্রখর আলোয় দিনের মত ঝলমল করছে গোটা কয়লা-নগরী।

প্রচণ্ড উৎসাহে কাজ চলছে। ওয়াগনভর্তি কয়লা ঢালা হচ্ছে ম্যান-ইঞ্জিনের নীচে। একটা শিফট শেষ হয়েছে। শ্রমিকরা জিরোচ্ছে। শুরু হয়েছে আর একটা শিফট। বিরতি নেই। এক ঘণ্টাও ফাঁক নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে কটেজের দোরগড়ায় বসে আছেন সাইমন ফোর্ড আর ম্যাগি। পাইপ টানছেন সাইমন ফোর্ড। উৎকৃষ্ট ফরাসি তামাকের আমেজে মেজাজ শরীফ। কথা চলছে জেম্‌স্ স্টার, হ্যারি আর নেলকে নিয়ে। কে জানে, এই মুহূর্তে ওরা কোথায়! এতটা সময় বাইরে কাটিয়ে বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে না?

হঠাৎ ঠিক এই সময়ে একটা প্রলয়ংকর শব্দ শোনা গেল। ভয়ানক সে গর্জন-ধ্বনিতে কান যেন বধির হয়ে যায়। আচম্বিতে বিষম বিপুল এক জলপ্রপাত বুঝি ভেঙে পড়েছে খনিগর্ভে—হুহুংকারে পাতাল কাঁপিয়ে জলের প্লাবন নামছে কয়লা-নগরীতে।

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত সটান দাঁড়িয়ে উঠলেন সাইমন ফোর্ড আর ম্যাগি। সঙ্গে সঙ্গে ফুলতে লাগল লক ম্যালকমের জলরাশি। বন্যার মত উত্তাল তরঙ্গ কুল ছাপিয়ে আছড়ে পড়ল কটেজের দেওয়ালে। ম্যাগিকে নিয়ে তরতরিয়ে ওপর তলায় উঠলেন সাইমন।

কয়লা-নগরীর চারদিকে ততক্ষণে হৈচৈ, কান্নাকাটি, 'গেল গেল' রব পড়ে গেছে! অকস্মাৎ জলপ্লাবনে আতঙ্কিত বাসিন্দারা চেঁচাচ্ছে প্রাণভয়ে। লেকের চারপাশ ঘেরা উঁচু পাথরে আশ্রয় নিচ্ছে শ্রমিকরা।

গুজব রটছে। চরমে পৌঁছোয় আতঙ্ক। কয়েকটি শ্রমিক পরিবার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়োলো সুড়ঙ্গপথে মাটির ওপরে পালাবার মতলবে।

ভয়ের কারণ একটাই। নিশ্চয় সমুদ্র নেমে এসেছে খনিগহ্বরে। এ খনির বিস্তার সেই ক্যালেডোনিয়ান ক্যানাল পর্যন্ত তো! তাই যদি হয়, তাহলে ইঁদুরের মত জলভর্তি খনিতে ডুবে মরতে হবে খনিবাসিন্দাদের।

টানেলের মুখে পলাতকদের প্রথম দল পৌঁছোতেই বাধা দিলেন সাইমন ফোর্ড। কটেজ থেকে নেমে এসে তারস্বরে বললেন, 'পালিও না, দাঁড়াও। বন্যা যদি সত্যিই খনি ভাসিয়ে নিয়ে যায় তো, কেউই পালিয়ে বাঁচতে পারবে না! জলের তোড় তার আগেই সবাইকে চুবিয়ে মারবে। কিন্তু ফিরে ছাখো। জল তো আর উঠছে না! বিপদ কেটে গেছে!'

কয়েকজন পাল্টা চেঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু খনির দূরে দূরে যারা কাজ করছে, তাদের কি হবে?'

'ভেবো না। লক ম্যালকমের চাইতে উঁচু অঞ্চলে রয়েছে তারা।'

সাইমনের কথা যে মিথ্যে নয়, তা অচিরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। জলের তোড় আচমকা এল বটে, কিন্তু বিশাল খনিগহ্বরের তলার অঞ্চল ডুবিয়ে দিয়েই জল ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। দেখা গেল, কিছুই হয়নি। কেবল লক ম্যালকমের জল কয়েক ফুট বেড়ে গেছে মাত্র।

কয়লা-নগরীর কোনো ক্ষতি হল না। প্রাণহানি ঘটেছে বলেও মনে হল না। সাইমন আঁচ করতে পারলেন না, আসল ব্যাপারটা কি! জলের তোড় কি ভূগর্ভ-সঞ্চিত পাতাল-জলাধার থেকে সবেগে উত্থিত হল? সাত-পাঁচ ভাবনা ও রটনার অবসান ঘটল সেইদিনই সন্ধ্যায়। স্থানীয় খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হল সহসা জল-শূন্য-হয়ে-যাওয়া লক ক্যাটরিনের রং-চঙা বিবরণ। নেল তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে এসেও বলল সেই একই কাহিনী। খনিগর্ভে কারো প্রাণহানি ঘটেনি শুনে আশ্বস্ত হল চারজনেই।

স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রিয় হ্রদ ক্যাটরিনের সে দৃশ্য আর কহতব্য নয়! হ্রদের তলা ফুটো হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি। আচমকা একটা মস্ত ফাটল দেখা দিয়েছে লক ক্যাটরিনের তলায়। তাই নিমেষের মধ্যে জলরাশি নেমে এসেছে নিউ অ্যাবারফয়েলের লেকে। যে লক ক্যাটরিন নিয়ে কত কবিতা কত কাহিনী কত রোমান্স আর রোমাঞ্চের সৃষ্টি, চোখের পলকে তা সেঁধিয়েছে ধরণীর জঠরে—অবশিষ্ট রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলে কয়েক একর জায়গা জুড়ে একটা পুকুর!

বিদঘুটে কাণ্ড সন্দেহ নেই। হৈ-হৈ পড়ে গেল সারা দেশে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা গোটা হ্রদ পাতাল আশ্রয় করল! এমন কাণ্ড কে কবে শুনেছে! জনগণ যদি এখন চাঁদা তুলে লক ক্যাটরিনের ফুটো মেরামত করে ফের জল না ঢালে, তাহলে তো স্কটল্যাণ্ডের মানচিত্র থেকে লক ক্যাটরিনকে মুছে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্যার ওয়াল্টার স্কট ধরাধামে থাকলে তাঁর বুক ভেঙে যেত নাকি এ দৃশ্য দেখলে!

তলা ফুটো হওয়াটা অবশ্য খুব বিচিত্র নয়। পাথরের স্তর সেখানে এত পাতলা ছিল যে, ভাবাই যায় না।

কিন্তু বিপর্যয়টা কি নিছক প্রাকৃতিক, না কারও নষ্টামি? নতুন করে শঙ্কা ঢুকল জেম্‌স্ স্টার আর হ্যারি ফোর্ডের মাথায়।

নেলকে এ প্রশ্ন শুধোনো যায় না। কেননা, এমনিতেই তার চোখমুখের

অবস্থা এত খারাপ যে তাকানো যায় না। তার ওপর না-বলতে-পারা বেদনায় বেচারী যেন ছটফট করছে। তাই হ্যারি একদিন দলবল নিয়ে নৌকোয় চাপল। উদ্দেশ্য সরেজমিন তদন্ত করা। হ্রদের যে অঞ্চলে পাথুরে থামের ডগায় এত দিন ছাদ ধরা ছিল, সেই অঞ্চলে গিয়ে সংশয়ের অবসান ঘটল। নষ্টামিই বটে!

বিস্ফোরণের চিহ্ন তখনই দেখা গেল। কে বা কারা ডিনামাইট দিয়ে থাম উড়িয়ে দিয়েছে। তাই পাতলা পাথুরে স্তর লক ক্যাটরিনের বিপুল জল আর ধরে রাখতে পারে নি। ছাদ ফুটো করে জল নেমে এসেছে হুড়মুড় করে।

নষ্টামি! পূর্বপরিকল্পিত শয়তানি! বারুদের কালো দাগেই সে প্রমাণ জলজ্বল করছে ওদের সামনে।

বিড়বিড় করে বললে জেম্‌স্ স্টার, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন। শুধু হ্রদ নেমেছে, তাই রক্ষে। সমুদ্রটাও তো নেমে আসতে পারত! তাহলে?'

সাইমন বললেন, 'গোটা খনিটাই ভরে যেত নোনা জলে।'

'কিন্তু কে এই দুশমন?' চিন্তিত কণ্ঠে বলেন জেম্‌স্ স্টার, 'সে কি একা? না, অনেকে? বহুজনের কীর্তি হলে অনেক দিন আগেই বোধহয় ধরা যেত। তাই মনে হয়, দুশমন একাই একশো। কিন্তু বলিহারি যাই তার ধড়িবাজ ও শয়তানী বুদ্ধির। ঘোল খাইয়ে দিচ্ছে আমাদের। হতভাগ্য বদমাশটা পণ করেছে, নিউ অ্যাবারফয়েলকে ধ্বংস করবেই। শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মূর্খতা। খনিগহ্বরের শত সহস্র রন্ধ্রপথের সব কিছুই তার নখদর্পণে। নইলে নির্বিঘ্নে একটার পর একটা বজ্জাতি করে চলেছে, অথচ আমরা তার টিকিটিও দেখতে পাচ্ছি না, এ কি করে সম্ভব?'

'নেলকে জিজ্ঞেস করলেই ল্যাঠা চুকে যায়।' বলল জ্যাক রিয়ান।

'না।' হ্যারি আপত্তি করল, 'ও যখন নিজে থেকে বলবে, তখন শুনবো। তার আগে নয়।'

'বেশ, তবে তাই হোক।' বললেন জেম্‌স্ স্টার, 'তবে বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি বিয়ের পাটটা চুকিয়ে নাও। সামনের মাসেই এই সময়ে, কি বল?'

দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। কটেজে ফিরে এসে কিন্তু ডিনামাইটে থাম উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটা সবাই চেপে গেল। কি দরকার আতঙ্ক সৃষ্টি করে। কি আর ক্ষতি হয়েছে! স্কটল্যাণ্ডের বহু হ্রদের একটি না হয় পাতালে প্রবেশ করেছে।

নেল ও হ্যারির বিয়ের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ধুমধাম ততই বাড়তে লাগল নিউ অ্যাবারফয়েলে। কার আনন্দ তখন কে দ্যাখে—এমনি অবস্থা। সেই সঙ্গে কিন্তু কতকগুলো অদ্ভুত দুর্ঘটনাও ঘটতে লাগল পরপর।

যেমন, হঠাৎ আগুন লাগল নীচের তলার সুড়ঙ্গে। কাঠের ঠেকনাগুলোয় আগুন লাগানো হয়েছিল একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প দিয়ে। বাতিটা ঠেকনার পাশেই পাওয়া গেল। জীবন বিপন্ন করে আগুন নিভালো হ্যারি তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। নইলে কয়লা তোলা মাথায় উঠতো। ভাগ্যিস আগুন নিভোনোর কার্বন ডায়অক্সাইড গ্যাস ছিল, নইলে সেদিনই বন্ধ হয়ে যেত খনি।

আর একবার দেখা গেল, ম্যানইঞ্জিনের একটা কাঠের খোঁটা করাত দিয়ে কে কেটে রেখেছে। পুরো খাঁচাটাই ভেঙে পড়েছিল নীচে। কাছেই কাজ তদারক করছিল হ্যারি। রাবিশের মধ্যে থেকে তাকে টেনে বার করার পর দেখা গেল, কপাল ক্রমে শুধু যা তার প্রাণহানিটাই ঘটেনি!

দিন কয়েক পরে আবার দুর্ঘটনা। এবারও আহত হল হ্যারি। কলে-চলা ট্রাম রাস্তায় কয়লা ভর্তি ওয়াগনে চেপে ফিরছিল সে। আচমকা কিসে সংঘর্ষ লাগল। ঠিকরে পড়ল হ্যারি। পরে দেখা গেল ট্রামলাইনের ওপর আড়াআড়িভাবে বসানো একটা লোহার বরগা।

সংক্ষেপে, এমনি ভৌতিক কাণ্ড আরো ঘটল। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল খনিময়। সাইমন ফোর্ড কিন্তু বারবার বলে চলেন, 'এ কাজ কখনই একজনের নয়—পুরো একটা দলের।'

এরপর নতুন করে পুলিশ এল, পাহারা বসল, টহল চলল, যেখানে-সেখানে যেতে বারণ করা হল হ্যারিকে। শত্রুপক্ষের লক্ষ্য তো তার ওপরেই—কাজেই হুঁশিয়ার থাকা ভাল। নেলের কানে যাতে এসব কাণ্ড না পৌছায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা হল। কি দরকার অযথা মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে।

বিয়ের দিনটি নিয়েও ভাবনা বাড়ল। ঐ দিনই যে শত্রুপক্ষের ঘৃণা শতগুণে প্রকাশ পাবে না এমন কথা কে বলতে পারে হলফ করে? কে জানে, ঐ দিন কি দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে সেই অদৃশ্য বিভীষিকা?

বিয়ের এক সপ্তাহ আর বাকী। সকাল বেলা কটেজ থেকে বেরিয়েছে নেল। কটেজের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে ফিরছে, হঠাৎ সিঁড়ির কাছে পৌছেই এমন চমকে উঠল যে, তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ের আর্ত চীৎকার।

নিস্তব্ধ খনির মধ্যে সেই কান্নার প্রতিধ্বনি যেন গুমরে উঠল।

দৌড়ে এল ম্যাগি, হ্যারি আর সাইমন। দেখল, কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে নেল। মৃত্যুকে চাক্ষুষ দেখলে বুঝি এমনি চেহারা হয়। মুখের পরতে পরতে নিঃসীম আতঙ্কের প্রতিচ্ছবি। বিস্ফারিত দৃষ্টি নিবদ্ধ কটেজের দরজার পাল্লায়।

কপাটে লেখা কয়েকটি লাইন—গত রাতের অন্ধকারের সুযোগে আততায়ীর রচনা। সেই দেখেই নেলের ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

চিঠিটা এই :

সাইমন ফোর্ড, পুরোনো খনির সর্বশেষ কয়লার স্তর তুমি কেড়ে নিয়েছো আমার কব্জা থেকে। তোমার ছেলে হ্যারি কেড়েছে আমার নেলকে। তুমি গোল্লায় যাও! তোমাদের সর্বনাশ হোক! নিপাত যাক নিউ অ্যাবারফয়েল! —সিল ফ্যাক্স।

'সিল ফ্যাক্স!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন সাইমন আর ম্যাগি।

'কে সে?' হ্যারির প্রশ্ন।

'সিল ফ্যাক্স!' বলতে বলতে আবার থর থর করে কেঁপে উঠল নেল। ম্যাগি তাড়াতাড়ি তাকে কটেজে নিয়ে গেল।

জেম্‌স্ স্টারও দৌড়ে এসেছিলেন। তন্ময় হয়ে পড়ছিলেন পাল্লার চরমপত্রটা।

শেষে বললেন, 'সাইমন, এ চিঠি যে হাতে লেখা সেই হাতই আমাকে সেবার চিঠি লিখে তোমার চিঠির উল্টো কথাই জানিয়েছিল, অর্থাৎ এখানে আসতে নিষেধ করেছিল। যাক, লোকটার নাম তাহলে সিল ফ্যাক্স। যে রকম তুমি বিচলিত হয়েছ, তাতে বুঝছি, নামটা তোমার অচেনা নয়। কে এই সিল ফ্যাক্স?'

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মঙ্ক

'সিল ফ্যাক্স' নামটা শুনেই বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডের স্মৃতির কপাট যেন সহসা খুলে গেল। সিল ফ্যাক্স! ডোচার্ট সুড়ঙ্গের শেষ 'মঙ্ক'-এর নামও ছিল সিল ফ্যাক্স!

সেকালে, সেফটি-ল্যাম্প আবিষ্কারের আগে, 'মঙ্ক'রা অপরিহার্য ছিল কয়লার খনিতে। সিল ফ্যাক্সও ছিল এমনি এক 'মঙ্ক'। ডাকাবুকো মানুষ ছিল সে। ভয়ানক চেহারা নিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেও প্রতিদিন সবচেয়ে বিপদের

জায়গায় হাজির থাকত সিল-ফ্যাক্স। খনি-গহ্বরের যেখানে যেখানে দাহ্য গ্যাস মানে ফায়ার-ড্যাম্প জমে থাকে, সেই সেই জায়গায় গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাত ডানপিটে 'মঙ্ক'। সাইমন প্রায়ই দেখতে সিল ফ্যাক্সকে। দেখত, নিঃসঙ্গ ভীষণদর্শন মানুষটা একলাই হামগুড়ি দিচ্ছে যত্রতত্র। সঙ্গে থাকত একটা দানবিক পেঁচা। হারফাঙ জাতের তুষার-পেঁচা। নানান ভাবে 'মঙ্ক'কে সাহায্য করত হারফাঙ। দুর্গম যে অঞ্চলে দেশলাই রাখবার ক্ষমতা সিল ফ্যাক্সের নেই, তুষার-পেঁচা সেখানে উড়ে যেত জলন্ত সলতে নিয়ে। দাহ্য গ্যাসে ওটা শূন্য থেকে ফেলে দিত। আর তার পরেই ঘটত বিস্ফোরণ।

হঠাৎ একদিন বলা নেই কওয়া নেই—উধাও হয়ে গেল বুড়ো সিল ফ্যাক্স। সেই সঙ্গে একটি অনাথা মেয়ে। খনিতেই জন্ম হয়েছিল মেয়েটির। সিল ফ্যাক্সই তার ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দা ছাড়া সংসারে মেয়েটির আর আপনজনও কেউ ছিল না। সেই মেয়েই যে এই নেল, তা এখন বোঝা গেল।

পনেরো বছর পাতালের কোনো এক গোপন গহ্বরে মানুষ হয়েছে নেল। তারপর হ্যারির আবির্ভাব ঘটেছে। উদ্ধার পেয়েছে নেল।

রাগে দুঃখে সমবেদনায় সোজাসুজি সব কথাই বলে গেলেন বুড়ো সাইমন ফোর্ড। এত দিন যে রহস্যময় প্রাণীটিকে হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে নিউ অ্যাবারফয়েলে, সিল ফ্যাক্সই যে সেই লোক—এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই নেই।

সাইমন বললেন, 'সিল ফ্যাক্সকে আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, 'হারফাঙ বাহন'। তখনি সিল ফ্যাক্সের বেশ বয়স হয়েছিল। আমার চাইতে বছর পনেরো-কুড়ি বেশী বয়স তো বটেই। জংলী টাইপের সে বরাবরই। কাউকে ঘেঁষতে দিত না। আগুন বা জলকে থোড়াই কেয়ার করত। 'মঙ্ক'-এর কাজ বিপজ্জনক। প্রতি পদে প্রাণসংশয়। এ কাজে তাই লোক পাওয়া যেত না। কিন্তু সিল ফ্যাক্স যেচে 'মঙ্ক' হয়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে হরবখৎ পাল্লা কষেই মাথা বিগড়েছিল ওর। লোকে বলত, বদমাশ। আমি বলতাম, উন্মাদ। শক্তিতে অসুরের সমান। খনির প্রতিটি ফাটল আর সুড়ঙ্গ তার নখদর্পণে। পেনসন পেত সামান্যই। আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, এত দিন নির্ঘাৎ মরে গিয়েছে।'

জেম্‌স্‌ স্টার বললেন, 'সিল ফ্যাক্স লিখেছে, 'পুরোনো খনির সর্বশেষ কয়লার স্তর তুমি কেড়ে নিয়েছ আমার কব্জা থেকে'। এ কথাটার মানে কি?'

'আসল প্রশ্নই করেছেন। বললাম না, মাথায় ছিট দেখা গিয়েছিল সিল ফ্যাক্সের। তাই ওর কেমন জানি ধারণা হয়ে গিয়েছিল, অ্যাবারফয়েল

খনিতে ওর অধিকার জন্মে গিয়েছে। ডোচার্ট সুড়ঙ্গে ওকে কাজ করতে হত। এ সুড়ঙ্গ যত গভীর হয়েছে, কয়লা যত বেশী কাটা হয়েছে, ততই ও ক্ষিপ্ত হয়েছে আর ততই বেড়েছে জংলীপনা। প্রত্যেকটা গাইতির খটাং খটাং আওয়াজে ও কি রকম শিউরে শিউরে উঠত—মনে পড়ে ম্যাগি ?'

ম্যাগি সায় দেয়, 'মনে পড়বে না আবার ? বেশ মনে পড়ে।'

জেম্স্ স্টার বললেন, 'ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হল। দৈবাৎ নতুন কয়লার স্তরের সন্ধান পেয়েছিল সিল ফ্যাক্স ! ক্ষ্যাপা জংলীর মত জায়গাটাকে সে আগলাতে চেয়েছে। দিনরাত খনিতে টহল দিতে দিতে তোমার গুপ্ত রহস্য সিল ফ্যাক্স জেনে ফেলেছিল। জেনেছিল, তুমি আমাকে কটেজে আমন্ত্রণ জানাবে। তাই তোমার চিঠির উল্টো কথা সে লিখেছিল আমাকে। তাই এখানে পৌছোতে না পৌছোতেই পাথরের চাঙড় ঠিকরে গেল হ্যারির দিকে। ইয়ারো সুড়ঙ্গে মই ধ্বংস হল ঐ একই কারণে। নতুন কাজের জায়গায় দেওয়ালের ফাটল বন্ধ হওয়ার রহস্যও এখন আর রহস্য নয়। সেই কয়লার কারাগারে আমরা বন্দী হলাম তারই জিঘাংসায়। শেষে মুক্তি পেলাম দয়াময়ী নেলের কৃপায়।'

'উন্মাদ—বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছে সিল ফ্যাক্স !' বললেন সাইমন, 'নইলে পেঁচাকে দিয়ে আমাদের লণ্ঠন নিভোতো না। পেঁচাকে সে লেলিয়েছে আরো একবার, হ্যারি আর নেল যখন দড়ি ধরে শুকনো কুয়ো থেকে উঠছিল ওপরে। দড়ি আর একটু হলেই তো কেটে ফেলেছিল ঐ পেঁচা।'

'হ্যারি আর নেলের বিয়ের খবরে ওর রাগ আর ঘৃণা কিন্তু দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।' বলল ম্যাগি।

'তা তো বাড়বেই। যার জন্যে ডোচার্ট সুড়ঙ্গ হাতছাড়া হয়েছে, তারই ছেলের সঙ্গে কিনা নাতনীর বিয়ে ! অসম্ভব !' বললেন সাইমন।

'কিন্তু এখন কি করা ? সিল ফ্যাক্স যে চরমপত্র দিয়েছে, তার মোকাবিলা করা যায় কিভাবে ?' চিন্তিত কণ্ঠে বলেন জেম্স্ স্টার।

ঠিক, ঠিক। সবই তো হল, কিন্তু আদত সমস্যারই তো এখনো কোন কিনারা হয় নি। উন্মাদ সিল ফ্যাক্সের পৈশাচিক জিঘাংসা থেকে নিউ অ্যাবারফয়েল, নেল, হ্যারি এবং অন্য সকলের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে হলে এখন কি করণীয় ? চিন্তা ও উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট সবার চোখেমুখে। নীরব কামরা। কারো মুখে কথা নেই।

জ্যাক রিয়ান এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। শুধু শুনেছে, একটাও কথা বলেনি। এবার সে মুখ খুলল, বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। যে বুড়ো

সিল ফ্যাক্সের কথা এতক্ষণ শুনলাম, সেই সিল ফ্যাক্সই যে বর্তমান সিল ফ্যাক্স, তা আমরা বুঝছি কি ভাবে? পুরনো সিল ফ্যাক্সের যে বয়সের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, তাতে তার তো এখন বেঁচে থাকারই কথা নয়! থাকলেও এত বুড়ো হয়ে পড়েছে যে, নড়াচড়া করাই তার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু হ্যারিকে লক্ষ্য করে পাথরের চাঙড় ছোঁড়া, থাম ভাঙা ইত্যাদি যেসব কাণ্ড আজ পর্যন্ত খনিতে ঘটেছে, তা কি ঐ বুড়ো সিল ফ্যাক্সের পক্ষে করা সম্ভব? আমার তো মনে হয়, এ সিল ফ্যাক্স অন্য কোন লোক অথবা বুড়ো সিল ফ্যাক্সের সঙ্গে আরো লোক আছে।'

তাই তো! সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল। এ যে আর এক সমস্যা এবং গুরুতর সমস্যাই! জ্যাকের কথাটা মোটেই উড়িয়ে দেবার নয়। সত্যিই তো, কে এই সিল ফ্যাক্স? জরাজীর্ণ থুত্থুড়ে বুড়ো সেই পুরনো সিল ফ্যাক্স তো এ হতে পারে না? তাহলে?

শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে সিদ্ধান্ত করে, একমাত্র নেলই পারে সাংঘাতিক এই বিপদের গোলকধাঁধা থেকে তাদের উদ্ধার করতে। কিন্তু—

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নেলের বিবরণ

এ গোলকধাঁধা থেকে বেরনোর পথ একমাত্র নেলই যে শুধু বাতলাতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই।' কিন্তু প্রশ্ন হল, যে প্রচণ্ড শক সে খেয়েছে আর তার ফলে এখন যেরকম কাহিল অবস্থা তার, তাতে তাকে এ আলোচনার মধ্যে টানা কি সঙ্গত হবে?

এ প্রশ্নের কোন পরিষ্কার জবাব নেই। সবাই তাই চুপচাপ—ভাবছে।

শেষে হ্যারি বললে, 'না, এভাবে অন্ধকারে থাকা কখনই ঠিক নয়, যে কোন সময় গুরুতর বিপদ ঘটতে পারে। নেল ছাড়া গতি নেই। আমি বরং যাই, নেলকে বুঝিয়ে বলি। ওর এখন সব কথা বলার সময় এসেছে সিল-ফ্যাক্স-রহস্য ভেদের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।'

'যেতে হবে না হ্যারি, আমি নিজেই এসেছি।' জবাব এল দোরগোড়া থেকে। পরক্ষণে ফ্যাকাশে মুখে ঘরে ঢুকলো নেল। কেঁদে কেঁদে দুই চোখ ফুলে উঠেছে।

'আপনারা সবাই শুনুন।' নেল বলল, 'যাকে আপনারা বাড়ির বউ করতে চলেছেন, তার পূর্ব কাহিনী শুনুন আজ।'

'নেল!' বিচলিত কণ্ঠ হ্যারির।

'ওকে বলতে দাও, হ্যারি।' জেম্‌স্‌ স্টার বললেন।

নেল বলল, 'হ্যাঁ, আমিই সিল ফ্যাক্সের নাতনী। সিল ফ্যাক্স ঐ একজনই আছে। খুব বয়েস হয়েছে বটে, তবুও ঠাকুর্দা এখনো বিরাট তাগড়াই জোয়ান, গায়ে তার প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি। যাক সে কথা—নিজের কথা বলি। আমি মা কি জিনিস জানতাম না। জানলাম এখানে এসে।'

বলতে বলতে নেল গভীর চোখে তাকাল ম্যাগির পানে।

'বাছা রে!' বিড়বিড় করে ওঠে ম্যাগি।

'বাবা কি জিনিস জানতাম না। জানলাম ওঁকে পেয়ে!' সজল চোখে নেল তাকায় সাইমন ফোর্ডের দিকে: 'আমার বন্ধু ছিল না—তাও পেলাম হ্যারিকে পেয়ে। পনেরো বছর আমি খনির অন্ধকারে কাটিয়েছি ঠাকুর্দার সঙ্গে। পনেরো বছর! সঙ্গী ঐ ঠাকুর্দা! কল্পনা করে নিন অবস্থাটা! কিন্তু এসব আপনাদের ভাল লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না।'

নেল চুপ করল।

'না, না, নেল, তুমি বল।' গভীর আবেগে হ্যারির গলা কাঁপছে।

'ঠাকুর্দা ভয়ানক হলেও আদরযত্ন করত আমাকে। খুঁজেপেতে খাবার এনে খাওয়াতো। শৈশবের স্মৃতি ফিকে হয়ে এলেও মনে আছে, একটা ছাগলী দুধ খাওয়াত আমাকে। মন আমার ভেঙে গিয়েছিল ছাগলীর মৃত্যুতে। আমার ভাঙা মন জোড়া লাগাতে ঠাকুর্দা একটা অন্য জন্তু ধরে আনল। শুনলাম, চারটে পা থাকলেও এ জন্তুর নাম কুকুর। কিন্তু কুকুর ছাগলীর মত শান্তশিষ্ট নয়। সে কী ঘেউ ঘেউ চীৎকার! ঠাকুর্দা নিজেও চেঁচামেচি পছন্দ করত না। শব্দ শুনলেই আঁৎকে উঠত। আমাকেও মুখ বুজে থাকতে শিখিয়েছিল ঐটুকু বয়সেই। কিন্তু এ শিক্ষা কুকুরকে কিছুতেই দেওয়া গেল না। কাজেই কুকুরকে একদিন সরে যেতে হল খনির শব্দহীন জগৎ থেকে।'

একনাগাড়ে এতখানি বলে নেল বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটু থেমে আবার সে শুরু করে, 'ঠাকুর্দার নিজের সঙ্গী বলতে ছিল একটা বিকট দর্শন তুষার পেঁচা হারফাঙ। প্রথম প্রথম তাকে দেখে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমি দুচক্ষে দেখতে না পারলেও কেন জানি হারফাঙ আস্তে আস্তে আমাকে ভালবেসে ফেলল। দারুণ ন্যাওটা হয়ে গেল আমার। কাজেই আমার ভয় চলে গেল। আমিও হারফাঙ-অন্ত প্রাণ হলাম। হারফাঙ ঠাকুর্দার হুকুম যত না তামিল করত, তার চাইতেও বেশী কথা মানত আমার।

তাইতেই হল বিপদ। ঠাকুর্দা দারুণ হিংসুটে ছিল তো! তাই ঠাকুর্দার সামনে আমরা ছাড়াছাড়ি থাকতাম। হারফাঙ নিজেও কিন্তু বুঝত ব্যাপারটা। মনিব থাকলে আমার কাছেই আসত না!…কিন্তু এভাবে বললে, আমার কথা ফুরোবে না…যেটুকু দরকার শুধু তাই বলা যাক।'

'না, মা, সব বলো।' বললেন জেম্‌স্ স্টার।

'খনিতে জায়গার অভাব ছিল না' ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেল আবার বলে, 'তবুও জ্বলন্ত চোখে আপনাদের কটেজ দেখত ঠাকুর্দা। চোখ দেখেই অশুভ ইঙ্গিত পেতাম। নিজের পছন্দসই ডেরা এ কটেজ থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর্দা আপনাদের এখানে থাকাটা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারত না। কটেজে কারা থাকে, এ প্রশ্ন আমার মুখ থেকে বেরোলেই মুখ অন্ধকার হয়ে যেত ঠাকুর্দার। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলত না। জবাবও দিত না। কিন্তু যেদিন ঠাকুর্দা জানল আপনারা পুরোনো আস্তানায় আর খুশী নন, ঠাকুর্দার এলাকাতেও নাক গলাতে চান, সেদিন সত্যি সত্যিই রাগে ফেটে পড়ল ঠাকুর্দা। পণ করল, নতুন খনিতে পা দিলেই খতম করা হবে আপনাদের। অত বয়েসেও অসুরের মত শক্তি ধরে ঠাকুর্দা। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, কোনো বুড়ো মানুষ অমন বলবান হতে পারে। তর্জন-গর্জন শুনে আমি ভয়ে কাঁপতাম। ভয় নিজের জন্যে নয়—আপনাদের আর ঠাকুর্দার জন্যে।'

একটু থেকে দম নিয়ে নেল আবার বলতে থাকে, 'প্রথম যেদিন আপনারা নিউ অ্যাবারফয়েলের সুড়ঙ্গে ঢুকলেন, সেদিনটা ছিল সাংঘাতিক। আপনারা ঢুকে পড়েছেন দেখেই ঠাকুর্দা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে গিয়ে ঢোকবার পথ বন্ধ করে দিল। আপনারা বন্দী হলেন। আপনাদের দূর থেকে দেখতাম —চিনতাম না। কিন্তু কয়েকজন খ্রীষ্টান না খেতে পেয়ে মারা যাবে—এ তো হতে পারে না। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে জল আর রুটি এনে দিতাম। ইচ্ছে ছিল পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু ঠাকুর্দার সজাগ চোখ এড়িয়ে তা সম্ভব ছিল না! কাজেই দেখলাম, মৃত্যু আপনাদের অবধারিত।'

জেম্‌স্ স্টার ও বুড়ো সাইমন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছেন। ম্যাগির চোখ সজল। আর নিষ্পলক চোখে হ্যারি তাকিয়ে আছে নেলের দিকে।

নেল বলে চলে, 'ঠিক তখনি জ্যাক রিয়ান এল বন্ধুবান্ধব নিয়ে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি ওদের দেখলাম আসার সঙ্গে সঙ্গেই। পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম আপনাদের কাছে। যখন ফিরছি, খপ করে আমার হাত চেপে ধরল ঠাকুর্দা।

তাকে রাগে চণ্ডাল হতে দেখলাম সেই প্রথম! আমায় মেরেই ফেলত বোধহয়! কিন্তু তা না ফেললেও টেঁকা দায় হল আমার। ঠাকুর্দা পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গেল। নিজেকে 'আঁধার আর আগুনের রাজা' বলে ঘোষণা করল। তারপর যেদিন খনির কয়লায় আপনাদের যন্ত্রের ঘা পড়ল, ঠাকুর্দা সেদিন কি মারটাই মারল আমাকে! যে কয়লা ঠাকুর্দার নিজের, সেই কয়লাই কিনা চুরি! আর তার জন্যে পিটুনি খেলাম আমি! সে কী মার! পালাতে চেয়েছিলাম। পারলাম না। অন্ধকারেও যেন চোখ জ্বলে ঠাকুর্দার। মাস তিনেক আগে আবার রাগে চণ্ডাল হল ঠাকুর্দা। শুকনো কুয়োর মধ্যে আমায় নামিয়ে দিয়ে উধাও হল অন্ধকারে। যাবার সময় বারবার হাঁক দিল হারফাঙকে। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে গেল না। হ্যারি, এই কুয়ো থেকেই তুমি আমাকে তুলে এনেছিলে।'

'উঃ কী সাংঘাতিক!' ম্যাগির বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা যায়।

ক্ষণেক থামে নেল, তারপর আবার বলতে থাকে, 'কদিন ঐ কুয়োয় ছিলাম, জানি না। শুধু মনে আছে, হ্যারি যখন এল, তখন বেশ বুঝছিলাম, আমার মৃত্যু হচ্ছে।'

নেল এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে বুড়ো সাইমন ও ম্যাগির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এখন বুঝছেন তো সিল ফ্যাক্সের নাতনীর সঙ্গে আপনাদের ছেলে হ্যারির বিয়ে হলে কি হবে? আপনারা সকলেই মারা পড়বেন!'

'নেল!' আবেগঘন কণ্ঠে ডাকল হ্যারি।

'না। বাধা দিও না আমাকে। সবার মঙ্গলের জন্যেই আমাকে ফিরে যেতে দাও ঠাকুর্দার কাছে। আমি গিয়ে তাকে বোঝাই। হয়ত কাজ হবে।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হ্যারি, 'আমাদের ছেড়ে যাবে?'

জেম্‌স্ স্টার বাধা দিলেন, 'নেল, তোমার সিদ্ধান্ত ভুল—এ কথা বলব না। কিন্তু তোমাকে তো আমরা অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে দিতে পারি না। পাগলকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। সিল ফ্যাক্স যে শক্তি নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করতে চাইছে, আমরা চাই সেই শক্তি নাশ করতে।'

'পারবেন না।' সঙ্গে সঙ্গে বলল নেল, 'ঠাকুর্দার আশ্চর্য শক্তির নমুনা আপনারা বহুবার পেয়েছেন। ঠাকুর্দা কোথাও নেই, অথচ সর্বত্র আছে। ঠাকুর্দা অশরীরীর মত অদৃশ্য, ভগবানের মত সবজ্ঞ। মিঃ স্টারকে এখানে আনবার গোপন পরিকল্পনা কি করে জানল ঠাকুর্দা? কি করে টের পেয়েছে আমার বিয়ে হচ্ছে হ্যারির সঙ্গে?'

হ্যারি কি বলতে যাচ্ছিল, তাতে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে নেল বলে চলল, 'ঠাকুর্দা উন্মাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু উন্মাদ মনের মধ্যেও একটা অতি-মনের সন্ধান আমি পেয়েছি। ছেলেবেলায় মুখে মুখে কত শিক্ষাই দিয়েছে ঠাকুর্দা। ঈশ্বরকে জেনেছি তার মুখের কথায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড মিথ্যে সে শিখিয়েছিল। মানুষ মাত্রই নাকি বিশ্বাসঘাতক। মানুষ-জাতির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণায় আমার মন ভরিয়ে তোলার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেনি ঠাকুর্দা।

'তাই হ্যারি আমাকে উদ্ধার করার পর যখন কটেজে এলাম, আমি ভয়ে

অমন কুঁকড়ে ছিলাম। আপনারা ভেবেছিলেন, মানুষ জাত সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার জন্যেই ঐরকম দিশেহারা ভাব। তা নয়। ঠাকুর্দার শিক্ষা অনুযায়ী ভেবেছিলাম, একদল বদমাস লোকের পাল্লায় পড়েছি। ধীরে ধীরে সে ধারণা কেটে যায়। বুঝলাম, ঠাকুর্দা আমাকে ঠকিয়েছে।'

নিস্তব্ধ কামরা। কারো মুখে কথা নেই। শুধু শোনা যায় নেলের উদ্দীপ্ত কণ্ঠ, 'এখন বুঝছি, আমাকে নয়—ঠাকুর্দা নিজেকেই ঠকিয়েছে। তাই ফিরে যেতে চাই। যে সুড়ঙ্গে শৈশবে কেটেছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই ঠাকুর্দা ঠিক আসবে। আমাকে আবার কোলে নেবে। তারপর? তারপর দেখাই যাক না তার সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।'

কিন্তু কেউই রাজী হল না নেলের প্রস্তাবে। শুরু হল বাগবিতণ্ডা, অবশেষে ক্লান্ত নেল মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ আর সইতে পারল না। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ম্যাগির দু বাহুর ওপর।

ঘর থেকে সবাইকে বার করে দিল ম্যাগি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নেলের বিয়ে

বুনো সিল ফ্যাক্স ফাঁকা আওয়াজ করে না। মিথ্যে ভয় দেখানো তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। অ্যাবারফয়েল খনিকে চূর্ণবিচূর্ণ করার নিশ্চয় কোনো ভয়ঙ্কর ফিকির রয়েছে তার মুঠোয়।

তাই হুঁশিয়ার থাকাই ভাল। সশস্ত্র প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হল। খনিতে ঢোকবার আর বেরোবার সব কটা পথে দিবারাত্র কড়া নজর। আগন্তুক দেখলেই জেরায় জেরায় তাকে নাজেহাল করা হয়।

নেলের উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য সব খবরই তার কাছে বলা হয়। হ্যারি তার পেছনে আঠার মত লেগে থাকায় নেল কথা দিল সে পালাবে না।

বিয়ের আর মাত্র সাত দিন বাকী। নতুন কোনো দুর্ঘটনার খবর নেই। শ্রমিকদের আতঙ্ক তাতে কমে কিছুটা। কাজের উৎসাহে নতুন জোয়ারের সূচনা দেখা দেয়।

জেম্‌স স্টার কিন্তু বসে নেই। সিল ফ্যাক্সকে গরুখোঁজা খুঁজছেন। প্রতিহিংসার আগুনে যার অন্তর জলেপুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে, সেই বুড়ো জংলী যখন পণ করেছে, নেল আর হ্যারির বিয়ে পণ্ড করবে—তখন তা কার্যকরী করার চেষ্টা করবেই। তার আগেই লোকটাকে পাকড়াও করা দরকার। যে সুড়ঙ্গ দিয়ে ডানডোনাল্ড দুর্গের ভগ্নস্তূপে বেরোনো যায়, কড়া পাহারা সেখানেও বসল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! সিল ফ্যাক্স যেন উবে গিয়েছে খনি-গহ্বর থেকে! নতুন করে পাতিপাতি করে খুঁজেও তার ছায়াটুকুও দেখা গেল না!

অবশেষে এল বিয়ের দিন।

কিন্তু সিল ফ্যাক্স এল না। তার অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও নেই কোথাও।

দিন শেষে কয়লা-নগরীতে উদ্দীপনার বন্যা বয়ে গেল। সাজ-সাজ রব

পড়ে গেল শ্রমিকদের মধ্যে। কাজকর্ম সব বন্ধ। প্রত্যেকেই যে যার ভাল পোশাক পরে ছুটল ফোর্ড পরিবারকে সম্মান জানাতে, আনন্দের বখরা নিতে।

রাত এগারোটার সময়ে লক ম্যালকমের তীরে সেণ্ট গাইল্‌স্‌ গির্জাতে বিয়ে হবে নেল আর হ্যারির। যথা সময়ে কটেজ থেকে বেরুলো হ্যারি তার মায়ের সঙ্গে। নেল রইল সাইমনের সঙ্গে। পেছনে উৎফুল্ল জেম্‌স্‌ স্টার। পাশে জ্যাক রিয়ান—পরনে ব্যাগপাইপ আদলের জমকালো পোশাক! সবার পেছনে কয়লা-নগরীর অন্যান্য প্রধানরা।

বাইরে আগষ্টের গুমোট। বাতাসে ঝড়ের ইঙ্গিত। ঝড়ো হাওয়া মধ্যে মধ্যে কয়লা-নগরীতেও প্রবেশ করছে। গুমোট সেখানেও। সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে যে বাতাস ঢুকছে, তাতে রয়েছে বিদ্যুতের ছোঁয়া। ব্যারোমিটারের পারা এত নীচে নেমেছে যে কয়লা-নগরীর আকাশ সমান বিশাল ছাদের তলায় সঞ্চিত এই বিদ্যুৎ-বওয়া বাতাসে ঝড়ের হুহুঙ্কার যে-কোনো মুহূর্তে শোনা যেতে পারে।

.কিন্তু আবহাওয়া নিয়ে কারো মাথা ব্যথাই নেই।

আলোয় আলোয় ঝলমল করছে পাতালপুরী। ছাদে জ্বলছে ইলেকট্রিক চাকতি। যেন শত সূর্যের দীপ্তি সেখানে।

গির্জাতেও আলোর মালা। জানলায় জানলায় রোশনাই। দরজায় প্রতীক্ষারত পাদরী উইলিয়াম হবসন।

লক ম্যালকমের জল কেটে এগিয়ে আসছে একটি নৌকা। নৌকোয় বর, কনে এবং আত্মীয় পরিজন।

অরগ্যান বাজছে! বর-কনে উঠে এসেছে। পাদরী বিয়ের মন্ত্র পড়তে সবে শুরু করেছেন, এমন সময়ে কানের পরদা-ফাটানো শব্দ এল বাইরে থেকে।

গির্জা থেকে শ'খানেক গজ দূরে একটা পাথর খসে পড়েছে লেকের জলে। মস্ত পাথর। লেকের তীরভূমিতে এত দিন যা চাতাল হয়ে শোভা পেয়েছে, কি এক অজ্ঞাত কারণে সহসা তা খসে পড়েছে জলে। বিস্ফোরণ নয়—ভেঙে পড়াও নয়। নিঃশব্দে খসেছে পাথরের চাঁই—সশব্দে আছড়ে পড়েছে হ্রদের মধ্যে, আর সেই সঙ্গে নদীর মত তীব্র স্রোত নামছে পর্বতরন্ধ্র দিয়ে। কল্পনাও করা যায়নি অত বড় একটা গুহা আর জল লুকিয়ে ছিল পাথরটার আড়ালে।

আচম্বিতে ভাঙা পাথরের ফাঁক দিয়ে আবির্ভূত হল একটা ছিপনৌকা। জলের তোড়ে নিমেষ মধ্যে ছিটকে গেল লেকের মাঝঅঞ্চলে।

ক্যানোর মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ। কালো আলখাল্লায় আবৃত দেহ। এলোমেলো চুল। লম্বা সাদা দাড়ি উড়ছে বুকের ওপর। হাতে একটা প্রজ্জ্বলিত ডেভি ল্যাম্প—অগ্নিশিখা ধাতুর জালতি দিয়ে ঢাকা।

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল তার ডাকাতে হুঙ্কার: 'ফায়ার-ড্যাম্প! ফায়ার-ড্যাম্প! নিপাত যা! নিপাত যা তোরা!'

সত্যি সত্যিই সেই মুহূর্তে বাতাসে পাওয়া গেল কারবুরেটেড হাইড্রোজেনের বিশেষ গন্ধ। হাল্কা গন্ধ—কিন্তু ফ্যায়ার-ড্যাম্পই বটে!

পাথর খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুগ-যুগ সঞ্চিত বিস্ফোরক বাষ্প ছাড়া পেয়েছে

পর্বত-গুহা থেকে। পরিমাণে বিপুল এই দাহ-গ্যাস এত দিন আটকে ছিল মুখবন্ধ বিশাল ঐ সুড়ঙ্গে। এখন তা ছুটছে অদৃশ্য শক্তি নিয়ে ছাদের দিকে। লক্ষ ধারায় নির্গত হচ্ছে বিস্ফোরক বাষ্প। বায়ুমণ্ডলে যে চাপে বাতাস আছে, তার পাঁচ-ছ গুণ বেশী চাপে এ গ্যাস উঠে যাচ্ছে উঁচু খিলানের দিকে।

মারাত্মক এই গ্যাসের গোপন সঞ্চয়ের হদিস জানত বলেই এতদিন ঘাপটি মেরে ছিল সিল ফ্যাক্স। এখন বোতলের ছিপি খোলার মত গর্তের পাথর সরিয়ে দিয়েছে। বাতাসে-গ্যাস মিশে প্রলয়ংকর বিস্ফোরক মিশ্রণ সৃষ্টি হয়ে গেল সবার চোখের সামনেই। গোটা খনি-গর্ভ ভরে উঠেছে এই বিস্ফোরক গ্যাসে।

দলবল নিয়ে হ্রদের তীরে দৌড়ে এসেছিলেন জেম্‌স্ স্টার। কাণ্ড দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন গলা ফাটিয়ে 'বাইরে···খনির বাইরে যাও!'

মহাপ্রলয় যে আসন্ন, ইঞ্জিনীয়ার জেম্‌স্ স্টার তা পলক মধ্যেই বুঝেছেন।

'ফায়ার-ড্যাম্প! ফায়ার-ড্যাম্প!' প্রত্যুত্তরে যেন ব্যঙ্গ করে উঠল বুড়ো সিল ফ্যাক্স।

'খনির বাইরে······খনির বাইরে!' আবার গলা ফাটালেন জেম্‌স্ স্টার।

পালানোর সময় কোথায়? ক্যানোয় দাঁড়িয়ে মূর্তিমান বিভীষিকার মত বৃদ্ধ সিল ফ্যাক্স। হাতে ল্যাম্প। যে কোনো মুহূর্তে কার্যকর হবে তার হুমকি। শুধু যে নাতনীর সঙ্গে হ্যারির বিয়েই বন্ধ হবে তা নয়, গোটা কয়লা-নগরীর তাবৎ জনগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একটি মাত্র প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে!

বৃদ্ধের মাথার ওপর উড়ছে একটা অতিকায় হারফাঙ। সাদা পালকে কালচে ফুটকি। তুষার-পেঁচা।

ঠিক সেই সময়ে কে যেন ঝপাৎ করে ঝাঁপ দিল জলে। জল তোলপাড় করে সাঁতরে গেল ছিপনৌকো লক্ষ্য করে।

জ্যাক রিয়ান! ধ্বংস শুরু হওয়ার আগেই বৃদ্ধের নৌকোয় সে পৌঁছোতে চায়।

সিল ফ্যাক্সও দেখল জ্যাককে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ফেলল ডেভি ল্যাম্পের কাঁচ। শিখাসহ সলতে নাড়তে লাগল বাতাসে।

নৈঃশব্দ্য। মরণের ডম্বরু-ধ্বনি অতর্কিতে শব্দহীন হলে যে মৃত্যু-রাজ্যের সূচনা দেখা যায়—মনে হল খনি-গর্ভে তার আবির্ভাব ঘটেছে। নিঃসীম হতাশার মধ্যেও জেম্‌স্ স্টার অবাক হলেন: এ কী! এতক্ষণে যে খনি উড়ে যাওয়ার কথা!

বিস্ফোরণ না ঘটার কারণ সিল ফ্যাক্স চকিতে বুঝে নিল ক্রোধবিকৃত মুখে। ইশারায় ডাগল হারফাঙকে। ফায়ার-ড্যাম্প এত পাতলা যে বাতাসের নীচের তলায় থাকতে না পেরে ওপরে জমা হচ্ছে—গম্বুজছাদের ঠিক নীচে।

ছোঁ মেরে জ্বলন্ত সলতে নিয়ে উঠে গেল হারফাঙ। বক্র নখরে জ্বলছে অগ্নিশিখা। ভ্রূক্ষেপ নেই দানবিক পেঁচার। এ কাজেই সে পোক্ত। ডোচার্ট সুড়ঙ্গে কত সলতে সে ফেলেছে! এ তো ছেলেখেলা তার কাছে! ঘুরতে ঘুরতে উঠে চলল সে বিশাল ডানার প্রচণ্ড ঝাপটায়—উন্মাদ মনিবের প্রসারিত হাতের তর্জনীর ইঙ্গিত যেদিকে, সেই বিশাল খিলেন-ছাদের দিকে। সাঁ-সাঁ করে উঠতে লাগল যেন একটা পুরাকালের পক্ষী!

চোখ মুদল অনেকেই। নিউ অ্যাবারফয়েলের এই শেষ।

ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যারির হাত ছাড়িয়ে লোকের ধারে দৌড়ে গেল নেল। ভয়-উদ্বেগের লেশমাত্র নেই তার চোখে। হাঁক দিল সে প্রশান্ত গলায় 'হারফাঙ! হারফাঙ! এই যে আমি! আয়! আয় বলছি!'

ন্যাওটা পাখী হকচকিয়ে গেল ডাক শুনে। দ্বিধায় ভাসল ক্ষণেক। তারপরেই যেই নেলের গলা চিনল, অমনি জ্বলন্ত সলতে জলে ফেলে দিয়ে গোঁৎ খেয়ে চক্রাকারে নেমে এল নেলের পায়ের কাছে।

গগনবিদারী এক চীৎকার শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। পাতাল-গম্বুজে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লড়াই লেগে বুড়ো সিল ফ্যাক্সের সেই শেষ চীৎকারের রেশ নিয়ে।

জ্যাক রিয়ান ইতিমধ্যে ছিপনৌকোর কাঠ মুঠোয় চেপে ধরেছে। বিকট চীৎকার ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিল বৃদ্ধ। জীবনধারণে আর লাভ কী? প্রতিহিংসা তো নেওয়া গেল না!

'বাঁচাও! বাঁচাও!' হাহাকার করে উঠল নেল।

শুনেই জলে ঝাঁপ দিল হ্যারি। জ্যাককে নিয়ে জল তোলপাড় করে ফেলল, বহু ডুব দিল, কিন্তু জংলী সিল ফ্যাক্সকে আর পাওয়া গেল না।

লক ম্যালকমের জল শিকার পেলে সহজে ছাড়ে না। কয়লা-মানবের সমাধি ঘটল কয়লা-হ্রদের নীচেই।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বুড়ো সিল ফ্যাক্সের উপকথা

ছ মাস পরে সেণ্ট গাইল্‌স গির্জাতেই কালো পোশাকে বিয়ে হল নেলের সঙ্গে হ্যারির।

বর-বউ ফিরে এল কটেজে। নিরুদ্বেগ আনন্দে আটখানা বুড়ো সাইমন, ম্যাগি আর জেম্‌স্‌ স্টার। জ্যাক রিয়ান তো একাই নেচে, গেয়ে, বাজিয়ে তাক লাগিয়ে দিল সবাইকে।

পরদিন থেকে নতুন করে শুরু হল খনির কাজ।

সাইমন আর ম্যাগি নিজেদের বিয়ের সুবর্ণ-জয়ন্তীর কথা ভাবছেন। জ্যাক রিয়ান ঠাট্টা করে বলে, 'শুধু একটায় হবে না, দুটো সুবর্ণ-জয়ন্তী দেখতে চাই।

মুচকি হাসেন সাইমন। ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে!

কিন্তু আশ্চর্য আয়ু নিয়ে বেঁচে রইল বুড়ো সিল ফ্যাক্সের তুষারপেঁচা। অন্ধকার অঞ্চলে ভুতুড়ে পাখির মত উড়তে দেখা যায় তাকে। বুড়ো মারা যাবার পর হারফাঙকে নেল কাছে রাখার চেষ্টা করেও পারেনি। দিন কয়েক পরেই সে পালাল।

মনিবের মতই হারফাঙ মানুষ সইতে পারে না। সইতে পারে না আর একজনকে। সে হল হ্যারি। হ্যারি তার দু চক্ষের বিষ। পাখির মধ্যে এ রকম ঈর্ষা বড় একটা দেখা যায় না। শুকনো কুয়োর তলা থেকে হ্যারি যেদিন নেলকে তুলে এনেছিল, সেদিন সে বাধা দিয়েছিল অনেক, কিন্তু আটকাতে পারে নি।

সেই দিন থেকেই যেন বিদ্বেষ-বিষে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল হারফাঙ। তাই সে ফের উড়ে গেল আঁধার অঞ্চলে। মাঝে মাঝে সে উড়ে আসে লেক ম্যালকমের ওপর—পাক দিতে থাকে চক্রাকারে। তীরে দাঁড়িয়ে দেখে নেল। চোখের জলে দৃষ্টি তার বারবার ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

কেন এমন করে হারফাঙ, কে বলবে! কি চায় সে? পুরনো বন্ধুকে? হ্রদের টলটলে জলের তলায় চির-নিদ্রিত দোস্ত সিল ফ্যাক্সকে এক পলক দেখবার জন্যেই কি হন্যে হয়ে ওড়ে সে?

কারণ যাই থাক, জ্যাক রিয়ান এই নিয়েই অনেক গালগল্প বানিয়ে ফেলল। অত্যাশ্চর্য সেই সব গান আর গল্প শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় বন্ধুবান্ধবের।

অলৌকিক এই সব কাহিনীর জন্যেই স্কটল্যাণ্ডের উপকথায় আর গানে গানে আজও অমর হয়ে রয়েছে অ্যাবারফয়েল কয়লা-খনির প্রাক্তন মঙ্ক সিল ফ্যাক্স আর তার দানব-পাখি হারফাঙ।

ডঃ অক্সের এক্সপেরিমেণ্ট

মহাকাশ-অভিযানের রোমাঞ্চ বর্ণনা করতে গিয়ে 'রাউণ্ড দি মুন' উপন্যাসে ডক্টর অক্সের অভিনব এক্সপেরিমেণ্টের সূচনা করেছিলেন জুল ভের্ণ।

"সময়কে কজায় আনা"—এই আইডিয়া এর পর থেকেই সায়ান্স-ফিকশন কাহিনীকারদের বহু উপাখ্যান লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। সময়-পর্যটন নিয়ে অনেক ভালো ভালো কাহিনী লেখা হয়েছে। প্রথম এবং আজও সেরা কাহিনা হল ওয়েলসের 'টাইম মেশিন'। ভের্ণের রচনার অনুরূপ কাহিনী হল ওয়েলসের ছোট গল্প 'দি নিউ অ্যাকসিলেটর'।

ডক্টর অক্সের আইডিয়া জটিলরূপ ধারণ করেছে ইদানীংকালের সায়ান্স ফিকশনে। [illegible] এমন এক সিক্রেট এজেণ্টকে কল্পনা করা হচ্ছে, যে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোনো জাত, সম্প্রদায় বা সমাজকে ঘানির বলদ বানিয়ে ছাড়ছে। ডক্টর অক্সের চরিত্রে বাস্তব চরিত্র ডক্টর গোয়েবলস এবং ভবিষ্যতের কল্পচরিত্র 'বিগ ব্রাদার'য়ের ছায়া আছে।

ম্যাপ খুঁজলে পাওয়া মুস্কিল কুইকোয়েনডন শহর

ফ্ল্যানডার্সের পুরোনো অথবা নতুন ম্যাপ খুলে ছোট্ট শহর কুইকোয়েনডন খুঁজে বার করার চেষ্টা যদি করেন, তাহলে খুব সম্ভব হতাশ হবেন। তবে কি ধরে নিতে হবে, অন্যান্য অনেক শহরের মতই অদৃশ্য হয়ে গেছে কুইকোয়েনডন? না। ভবিষ্যতের শহর? মোটেই না। ভূগোল যাই বলে বলুক, কিন্তু কুইকোয়েনডন শহর আছে, আছে গত আট ন'শ বছর ধরে। সেই সঙ্গে আছে দুহাজার তিনশ তিরানব্বইটা আত্মা—ঐ হিসেবের জন্যে অবশ্যমাথাপিছু একটা করে আত্মা ধরার অনুমতি আপনাকে দিতে হবে। ফ্লানডার্সের মাঝামাঝি অঞ্চলে—অডিনার্দে থেকে সাড়ে তেরো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে আর ব্রাগিস থেকে সওয়া কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত এই শহর। এসকটে'র শাখা 'ভার' নদী এ শহরের তিনটে সেতুর তলা দিয়ে বয়ে গেছে। টুরনে-তে যেমন দেখা যায়, ঠিক সেই ধরনের মধ্যযুগীয় অদ্ভুতদর্শন ছাদ এখনও এ সব সেতুতে দেখা যায়। মনোরম এই জায়গাটিতে দেখা যাবে একটা প্রাচীন

সম্রান্ত পল্লীনিবাস। পল্লীনিবাসের প্রথম প্রস্তরফলক স্থাপিত হয়েছে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে—স্থাপন করেছেন কাউণ্ট বডুইন এবং পরে কন্‌সতান্তিনোপ্‌লের সম্রাট। মাটি থেকে তিনশ সাতায় ফুট উঁচু একটা সিটি হল-ও আছে এখানে। গথিক-জানলা জপমালার মত সাজানো খাঁজবিশিষ্ট দুর্গ প্রাচীর আর সুউন্নত বুরুজ মধ্যস্থ বিশাল ঘণ্টা দেখে তাক লেগে যাবে আপনার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এখান থেকে শোনা যাবে পাঁচটা অষ্টম স্বরের সুমধুর ঐক্যতান—সুখশ্রাব্য সেই আকাশ-পিয়ানোর খ্যাতি ছড়িয়েছে বহুদূর। ব্রাগিস-এর বিখ্যাত ঐকতানও নাকি হার মেনে যায় এই সুমিষ্ট সংগীতের কাছে।

কুইকোয়েনডনে বিদেশীরা যদি কখনো এসে পড়ে, তাহলে 'টাউনহল' না দেখা পর্যন্ত এই বিচিত্র শহর ছেড়ে যায় না। টাউনহলে আপনি দেখতে পাবেন ব্রানডনের আঁকা উইলিয়ম অব ন্যাশু'র পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি ; ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন চার্চ অব সেণ্ট ম্যাগলয়েরের ছবি ; প্রশস্ত 'প্লেস সেণ্ট এরনাফে'র ঢালাই লোহার কুয়োর চিত্র—যার প্রশংসনীয় অলংকরণের পুরো কৃতিত্ব প্রাপ্য চিত্রশিল্পী-কর্মকার কুয়েনটিন মেটসিস-এর ; চার্লস দ্য বোল্ডের কন্যা মেরী অফ বার্গাণ্ডির আদি সমাধি মন্দিরের চিত্র—বর্তমানে তাঁর কফিন বার্গিসে চার্চ অব নোতরদামে রক্ষিত ; এই রকম আরও কত চিত্তাকর্ষক ছবি যে আছে টাউনহলে তার ইয়ত্তা নেই।

কুইকোয়েনডনের প্রধান শিল্প হল দুগ্ধজাত দ্রব্য আর যবের চিনি প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা। কয়েক শতাব্দী ধরে ভ্যানট্রিকসি-রা শাসন করে আসছেন এই শহর—বাবার পর ছেলে, তারপর তস্য ছেলে—এইভাবেই চলেছে শাসনকার্য। তা সত্ত্বেও কিনা ফ্লানডার্সের ম্যাপে পাত্তা নেই কুইকোয়েনডনের। তবে কি শহরটিকে ভুলে গেছলেন ভৌগোলিকেরা, না ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়েছে মানচিত্র থেকে? তা আমি বলতে পারব না ; কিন্তু কুইকোয়েনডন শহরের অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই আছে, আছে এর সরু সরু রাস্তাঘাট, সুদৃঢ় প্রাচীর, স্পেনের বাড়ীঘরদোরের মত গৃহসারি, বাজার, বার্গোমাস্টার—এত জিনিস আছে যে সম্প্রতি এক আশ্চর্য ঘটনার রঙ্গমঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই শহর। সে ঘটনা যেমন অসাধারণ, তেমনি অবিশ্বাস্য—তবুও তা সত্য। বর্তমান কাহিনীতে সেই ঘটনাই বিবৃত করা হবে।

পশ্চিম ফ্লানডার্সের ফ্লেমিংদের সম্পর্কে কিছু বলা বা তাদের বিরুদ্ধে কিছু চিন্তা এখানে করা হবে না। লোক হিসেবে তারা ভালই, জ্ঞানী, বিচক্ষণ, সামাজিক, ঠাণ্ডা মেজাজী, অতিথিপরায়ণ, কথাবার্তায় এমনকি মনের দিক দিয়েও লঘুতা তারা পরিহার করে চলে! কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক মানচিত্রে

তাদেরই দেশের একটা অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক শহরকে কেন এখনো দেখানো হয়নি—এ সমস্যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

এই ত্রুটি, এই অনুল্লেখের জন্য আমরা অবশ্যই দুঃখিত। ইতিহাসেও কি কুইকোয়েনডনের নাম নেই? ইতিহাস যদি ভুল করে থাকে তো, আঞ্চলিক ধারাবিবরণীতে? আঞ্চলিক ধারাবিবরণী ভুল করে থাকলে দেশের ঐতিহ্যে? কিন্তু না, মানচিত্রে, গাইডবুকে, এমন কি পথনির্দেশনাতেও নাম নেই আশ্চর্য এই শহরের! আপনি হয়তো ভাবছেন এই নীরবতা নিশ্চয় শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করে তুলবে। তাই চট করে বলে নিই, কুইকোয়েনডনের এমন কোন শিল্প বা ব্যবসাবাণিজ্য নেই যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে—যদিও বা কিছু থেকে থাকে তো চটপট সে-সবের ঝামেলা মিটিয়ে চুপচাপ বসে থাকে নাগরিকরা। যবের চিনি আর দুগ্ধজাত খাদ্য শহরেই খেয়ে নেওয়া হয়—রপ্তানী কিছুই হয় না। সংক্ষেপে, কাউকেই প্রয়োজন হয় না কুইকোয়েনডনবাসীদের। তাদের চাহিদা সীমিত, তাদের অস্তিত্ব সাদাসিধে। তারা শান্ত, সহজ, ঢিমে—এককথায়, ফ্লেমিং। নর্থ সী আর এসকটের মাঝামাঝি অঞ্চলে এখনো এ জাতীয় মানুষ দেখা যায়।

শহরবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করছেন বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আর কাউন্সেলর নিকলসি

"আপনি তাহলে তাই মনে করেন?" জিজ্ঞেস করলেন বার্গোমাস্টার।

"হ্যাঁ—আমি তাই মনে করি," কয়েক মিনিট নীরবতার পর জবাব দিলেন কাউন্সেলর।

"বুঝতেই পারছেন, হট করে কিছু করা সমীচীন হবে না।" আবার বললেন বার্গোমাস্টার।

"দশ বছর ধরে গুরুতর এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আমরা," উত্তর দিলেন কাউন্সের নিকলসি, "ভ্যান ট্রিকসি, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আজও একটা পাকা সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত মন তৈরী করতে পারলাম না।"

"আপনার দ্বিধা যে কেন, তা আমি বুঝেছি," প্রায় সওয়া ঘণ্টা ঘাড় হেঁট করে অনেক ভাবনাচিন্তার পর মুখ খুললেন বার্গোমাস্টার, "বেশ ভালভাবেই তা উপলব্ধি করেছি। আপনার দ্বিধার অংশীদারও হচ্ছি। সমস্যাটা আরও হুঁশিয়ার হয়ে না তোলাপাড়া করে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়াই বিচক্ষণতা হবে আমাদের পক্ষে।"

নিকলসি জবাব দিলেন—"এটা ঠিক যে কুইকোয়েনডন শহরের মত এমনি শান্তিপূর্ণ শহরে নগরপালের পদটা নেহাতই অদরকারী।"

গম্ভীরভাবে বললেন ভ্যান ট্রিকসি—"কোনো কিছু যে একেবারে নিশ্চিত, এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা অপিচ বলেননি, বলবার সাহসও করেননি। যে কোনো নিশ্চয়-কথন যে বেশ কয়েকটা অপ্রীতিকর দুর্ঘটনাসাপেক্ষ, এ তথ্য তাঁরা বিশ্বাস করতেন।"

খুব আস্তে আস্তে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন কাউন্সেলর; তারপর প্রায় আধঘণ্টা বসে রইলেন নীরবে। এই আধঘণ্টা বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলর দুজনেই একটা আঙুলও নাড়লেন না। তারপর ভ্যান ট্রিকসিকে নিকলসি জিজ্ঞেস করলেন বিশবছর আগে তাঁর পূর্বপুরুষেরা কোতোয়ালের এই আপিসটা তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন কিনা। সমস্যাটা তো আর নেহাৎ সোজা নয়, প্রতি বছরে এই আফিসের জন্যে কুইকোয়েনডন শহরকে তেরশ পঁচাত্তর ফ্রাঁ এবং কতিপয় সেনটাইম খেসারৎ দিতে হচ্ছে।

"আমার বিশ্বাস, করেছিলেন," জবাব দিলেন বার্গোমাস্টার। নির্মল ললাটে রাজকীয় ভঙ্গিমায় হাত রেখে বললেন—"কিন্তু মনস্থির করার আগেই গতায়ু হলেন অমন বিচক্ষণ মানুষটা। শুধু এই প্রশ্নেই নয়, শাসন সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয়ই বঞ্চিত হল তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত থেকে। ঋষি ছিলেন উনি। ওঁর পথই আমাদের অনুসরণ করা উচিত নয় কি?"

বার্গোমাস্টারের অভিমতের বিরুদ্ধে বলার মত কোনো কিছু কল্পনাতে আনতেও অক্ষম ছিলেন কাউন্সেলর নিকলসি।

নম্রকণ্ঠে আবার বললেন ভ্যান ট্রিকসি—"জীবিতকালে কোনো বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই যিনি মারা যান, এ সংসারে একমাত্র তিনিই মোক্ষলাভের কাছাকাছি গিয়ে পৌছোন!"

এই কথা বলে, আঙুলের ডগা দিয়ে একটা ঘণ্টা টিপে ধরলেন বার্গোমাস্টার। ফলে, যে শব্দ উত্থিত হল, তা দীর্ঘশ্বাসের চাইতেও ক্ষীণ। অচিরে লঘু পদশব্দ শোনা গেল টালিবাঁধানো মেঝের ওপর—যেন বাতাসে ভর দিয়ে পিছলে এগিয়ে আসছে কোমল পদযুগল। পুরু গালিচার ওপর দিয়ে ছুটন্ত ইঁদুরেরপক্ষেও এর চাইতে বেশী শব্দ করা সম্ভব নয়। প্রচুর-তৈলাক্ত কব্জায় ভর করে নিঃশব্দে খুলে গেল ঘরের দরজা। চিত্রার্পিতের মত দরজার ফ্রেমে আবির্ভূত হল এক তরুণী। স্বর্ণবর্ণ অলকগুচ্ছ অপরূপ শোভায় লুণ্ঠিত তার কাঁধে, পিঠে। রূপসীর নাম সুজেল ভ্যান ট্রিকসি, বার্গোমাস্টারের একমাত্র কন্যা। কানায় কানায় তামাকে ভরা একটা পাইপ বাবার হাতে তুলে দিলে সুজেল, সেইসাথে

জলন্ত অঙ্গার পাত্র। পরক্ষণেই প্রায় নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে। প্রবেশের সময়ে যতখানি শব্দ জাগ্রত হয়েছিল সুচারু পদযুগলে, প্রস্থানের সময়ে তার চাইতে এতটুকু বেশী শোনা গেল না।

জ্ঞানবৃদ্ধ বার্গোমাস্টার পাইপ ধরিয়ে নিলেন এবং অচিরে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন নীলাভ ধোঁয়ার মেঘে। আর, সুগভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলেন কাউন্সেলর নিকলসি।

কুইকোয়েনডনের সরকার সম্পর্কিত আলোচনায় তন্ময় হয়ে এই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তি যে ঘরে বসেছিলেন, সে ঘরটা আসলে কালো কাঠের ওপর অপরূপ সুন্দর অলংকরণ করা একটা মনোহর বৈঠকখানা। বিশাল আগুনের চুল্লী জুড়ে রয়েছে ঘরের একটা দিক। সে চুল্লী এত উঁচু আর এত বড় যে একটা গোটা ওক গাছই পোড়ানো যায় তার মধ্যে, এমন কি একটা আস্ত ষাঁড়কেও ঝলসানো যায়। চুল্লীর বিপরীত দিকে লোহার জালি লাগানো জানলার রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে মোলায়েম মিঠে সূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। চিমনীর ওপর ঝুলছে মাস্কাত আমলের ফ্রেমে বাঁধানো একটা প্রতিকৃতি। মেমলিংয়ের আঁকা চিত্র। নিঃসন্দেহে ভ্যান ট্রিকসির কোনো মহাজ্ঞী পূর্ব-পুরুষের ছবি। চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষ। হ্যাপ্‌সবার্গের সম্রাট রুডলফের সঙ্গে যখন ফ্রেমিংরা আর গাই ডি ড্যামপেরি যুদ্ধে মত্ত ছিলেন, তখনকার আমলের।

বার্গোমাস্টারের প্রাসাদে সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষ হলো এই বৈঠকখানা। শুধু তাই নয়। কুইকোয়েনডনে যে ক'টি অত্যন্ত আরামপ্রদ কক্ষ আছে, তাদের অন্যতম। ফ্লেমিস স্টাইলে সাজানো এ ঘর। সূচাগ্রমুখ স্থাপত্যের চকিত-বৈশিষ্ট্য, খেয়াল-খুশী, সুন্দরতা এবং উৎকট খাম-খেয়াল এ ঘরের প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে বিধৃত। এইসব কারণেই শহরের রীতি অদ্ভুত স্মৃতি-মন্দিরগুলোর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে এই কক্ষ। কনভেন্ট অথবা বোবাকালার আবাসস্থানও এ ভবনের চাইতে কম শব্দহীন নয়। শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই এ প্রাসাদে; মানুষ এখানে হাঁটে না, পিছলে বেড়ায়; তারা কথা বলে না, গুন গুন করে। তার মানে এই নয় যে এ সৌধে স্ত্রীলোক নেই। তাঁরা আছেন। বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসির গৃহিণী ম্যাডাম ব্রিগিটি ভ্যান ট্রিকসি, তার কন্যা সুজেল ভ্যান ট্রিকসি, এবং ঘরকন্না দেখাশুনা করার জন্যে লোচ জানশো তো আছেন, এ ছাড়াও আছেন বার্গোমাস্টারের বোন হারমান্স।সী। হারমান্স চিরকুমারী, প্রৌঢ়া। শৈশবাবস্থায় ভাইঝি সুজেল তাঁকে টাটানেমান্স নামে ডাকত, সেই থেকে এখনও উনি এই আটপৌরে নামেই পরিচিত। এত ছন্দপতন আর গোলমাল সত্ত্বেও কিন্তু বার্গোমাস্টারের প্রাসাদ মরুভূমির মতই শান্ত।

বার্গোমাস্টারের বয়স প্রায় পঞ্চাশ ; মোটা নন, রোগাও নন, বেঁটে নন, লম্বাও নন ; লাল নন, ফ্যাকাশেও নন ; হাসিখুশী নন, বিষণ্ণ বদনও নন। পরিতৃপ্তও নন ; অপরিতৃপ্তও নন ; সোৎসাহী নন, ম্রিয়মানও নন ; অহংকারী নন, বিনয়ীও নন ; ভাল নন, খারাপও নন ; মুক্তহস্ত নন, কৃপণও নন, কাপুরুষও নন ; কোনো কিছুরই খুব বেশী নন, খুব কমও নন—সব কিছুতেই মধ্যম পথ অবলম্বনই তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাঁর চলনবলনের অপরিবর্তনীয় মন্থরতা, ঝুলে থাকা নিম্ন চোয়াল, সর্বদা উঠে থাকা ওপরের চক্ষুপল্লব, দৃঢ়সংবদ্ধ ললাট—যা পেতলফলকের মত মসৃণ এবং বলিরেখাবিহীন, যে কোনো মুখের ভাব-দেখে-চরিত্র-বলিয়েকে অনায়াসে বলতে বাধ্য করে যে মূর্ত ঢিলেমি বলে যদি কিছু থাকে তো তা এই বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি। রাগ অথবা উত্তেজনা, যে কোনো কারণেই ভদ্রলোকের হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুতস্পন্দিত অথবা মুখ আরক্ত হোক না কেন, আবেগের কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। বিরক্ত হলে চক্ষুতারকা কখনই সঙ্কুচিত হত না, সে বিরক্তি যত ক্ষণিকই হোক না কেন। সব সময়ে ভাল পোশাক পরে থাকতেন বার্গোমাস্টার—খুব বড়ও নয়, আবার খুব ছোটও নয় সে পোশাক এবং একনাগাড়ে তা পরতে পরতে ছিঁড়ে ফেলার মত লোক বলেও মনে হত না তাঁকে। মস্ত আকারের চৌকোনো জুতো পায়ে দিতেন বার্গোমাস্টার। তিনপুরু সুখতলা আর রুপোর বাক্‌লস্ লাগানো থাকত সে জুতোয়! বিচিত্র এই জুতো এত দিন টিঁকত যে নিরাশ হয়ে পড়ত তাঁর মুচি। মাথায় পরতেন ইয়া বড় এক টুপী। ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্লানডার্স যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে, তখনি জন্ম এই টুপীর। অতএব বুঝতেই পারছেন, কম সে কম চল্লিশ বছর বয়স টুপীটার। তাহলে কি জানা গেল বলুন তো? আবেগ আর উত্তেজনা থেকেই শরীর আর আত্মার অবক্ষয় ঘটে, পোশাক আর শরীরের জীর্ণতা আসে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ বার্গোমাস্টার উদাসীন, কর্মকুণ্ঠ, উদ্যমহীন হলেও আবেগবান নন মোটেই—কোনো কিছুরই উত্তেজনা সঞ্চার করতে পারে না তাঁর অলস অন্তরে। ক্ষয় আর ব্যয়—এই শব্দের অভাব ছিল তাঁর অভিধানে। আর তাই, কুইকোয়েনডন এবং তস্য প্রশান্ত জনগণকে শাসন করার যোগ্যতম ব্যক্তি বলে নিজেকে গণ্য করতেন ভদ্রলোক।

ভ্যান ট্রিকসি ম্যানসনের চাইতে কম শান্ত নয়, কুইকোয়েনডন শহর। শান্তিপূর্ণ এই আবাসেই মনুষ্যজন্মের শেষ সীমা পর্যন্ত অতিবাহিত করতে হবে বার্গোমাস্টারকে। মরবার আগে অবশ্য তাঁকে দেখে যেতে হবে, ষাট বছর সংসার সুখ উপভোগের পর অনাবিল শান্তিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হবার জন্য তাঁর আগেই সমাধিমন্দিরে রওনা হয়েছেন সাধ্বীপত্নী ম্যাডাম ব্রিগিটি ভ্যান ট্রিকসি।

এই জায়গাটা একটু খোলসা করা দরকার।

১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একটা প্রথা চলে আসছে ভ্যান ট্রিকসি বংশে। বিপত্নীক হওয়ার পর প্রতি ভ্যান ট্রিকসি আবার "বিয়ে করবেন তাঁর চাইতে কমবয়েসী এমন আর একজন ভ্যান ট্রিকসি যুবতীকে—যিনি কালক্রমে বিধবা হবেন এবং তার চাইতে কমবয়েসী আরেকজন ভ্যান ট্রিকসি যুবককে বিয়ে করবেন। এই ভাবেই বিবাহ-পুনর্বিবাহ চলবে বংশপরম্পরায় এবং কোনো দিনই সমাধান ঘটবে না সমস্যাটার। দীর্ঘকালের মধ্যে বারেকের জন্যেও রদবদল ঘটেনি এই বিচিত্র প্রথার। যান্ত্রিক নিয়মে পালাক্রমে দেহরক্ষা করেছেন মেয়ে অথবা পুরুষ ভ্যান ট্রিকসি। কাজেই বর্তমান ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসির দ্বিতীয় স্বামী হলেন আমাদের বার্গোমাস্টার। বয়েসে তিনি স্বামীর চাইতে দশ বছরের বড়। কর্তব্যে যদি অবহেলা না করেন, তাহলে যথা-বিহিতভাবে তাঁকে স্বামীর আগেই ধরাধাম ত্যাগ করে প্রথামাফিক স্থান ছেড়ে দিতে হবে নয়া ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসির জন্যে। পারিবারিক প্রথা ভঙ্গ করার পক্ষপাতী নন বার্গোমাস্টার। তাই পথ চেয়েছিলেন এই দিনটির। তাঁর ম্যানসন—সেখানে দরজার পাল্লা কখনো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে না, মেঝে কখনো কচমচ করে না, চিমনি কখনো শন্‌শন্‌ করে না, বায়ুনির্দেশক মুরগী কখনো খটখট করে না, আসবাবপত্র কখনো মট্‌মট্‌ করে না, তালা কখনো কড়াং কড়াং করে না, এবং নিজ ছায়ার চাইতে পুরবাসীরা কখনো বেশী শব্দ করে না। এমন বাড়ীর সন্ধান পেলে দেবতা হারপোক্রেটিস নিশ্চয় তা পছন্দ করে ফেলতেন "নৈঃশব্দ মন্দিরের" জন্য।

নিঃশব্দে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করছেন নগরপাল প্যাসফ্‌

ওপরে বর্ণিত চিত্তাকর্ষক কথোপকথন যে সময় সমাপ্ত হল, ঘড়িতে তখন বাজে অপরাহ্ণ তিনটে। পৌনে চারটের সময় মস্ত পাইপটা ধরিয়ে নিলেন ভ্যান ট্রিকসি। কোয়ার্ট খানেক তামাক অনায়াসেই ধরে যায় পাইপের বিশাল খোলে এবং পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সমাপন করলেন তামাকু সেবন।

দীর্ঘ এই সময়ে কেউ কারো সঙ্গে একটি কথাও বললেন না।

পুনরুক্তি করা কাউন্সেলরের স্বভাব। তাই প্রায় ছটা নাগাদ তিনি শুরু করলেন—"তাহলে আমরা ঠিক করলাম—"

"যে কিছুই ঠিক করব না।" জবাব দিলেন বার্গোমাস্টার।

"আমার তো মনে হয়, মোটের ওপর, আপনিই ঠিক, ভ্যান ট্রিকসি।"

"আমারও তাই মনে হয় নিকলসি। আরও কিছু খবরাখবর জানা গেলে নগরপালের ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করব আমরা। মাস খানেকের মধ্যে তার কোনো দরকার হবে না।"

"বছর খানেকের মধ্যেও হবে না।" জবাব দিলেন নিকলসি। বলে, পকেট-রুমালের ভাঁজ খুলে সন্তর্পণে নাক মুছলেন।

আবার নৈঃশব্দ নেমে আসে প্রায় সওয়া ঘণ্টার মত।

আটটা নাগাদ পালিশ-করা কাঁচের সেকেলে লমফো নিয়ে এল লোতু। বার্গোমাস্টার বললেন কাউন্সেলরকে—"আলোচনা করার মত আর কোনো জরুরি বিষয় নেই?"

"না, ভ্যান ট্রিকসি। অন্তত আমার আর জানা নেই।"

বার্গোমাস্টার বললেন—"শুনলাম, অডিনার্দে গেটের টাওয়ারটা নাকি শীগগিরই ভেঙে পড়ছে?"

"আ!" জবাব দিলেন কাউন্সেলর, "যে কোনোদিন যে কোনো পথচারীর মাথায় ভেঙে পড়লে অবাক হব না।"

"সে দুর্ঘটনা ঘটার আগে আমার মনে হয় টাওয়ার সম্পর্কিত ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা উচিত।"

"আমারও তাই মনে হয়, ভ্যান ট্রিকসি।"

"এর চাইতেও অনেক জরুরী বিষয় কিন্তু আছে।"

"তাতে কোনো সন্দেহই নেই। যেমন ধরুন, চামড়ার বাজারের ঝামেলা।"

"সে কি! এখনও জ্বলছে নাকি বাজারটা?"

"এখনও জ্বলছে। প্রায় তিন হপ্তা হল।"

"আগুন জ্বলা অব্যাহত রাখার জন্যে কোনো সিদ্ধান্ত কি আমরা কাউন্সিলে নিইনি?"

"আপনার উদ্যোগেই নেওয়া হয়েছে, ভ্যান ট্রিকসি।"

"এ আগুন জ্বলার ব্যাপারে এইটাই কি নিশ্চিততম অথচ সহজতম পন্থা নয়?"

"নিঃসন্দেহে।"

"অপেক্ষা করা যাক। আর কিছু"

"না," বলে মাথা চুলকোতে লাগলেন কাউন্সেলর। দরকারী বিষয় যে কোনটাই ভুলে যান নি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে গেলে মাথা চুলকোনো তাঁর স্বভাব।

বার্গোমাস্টার বললেন—"ভাল কথা, জলের তোড়ে সেন্ট জ্যাকুইলের নীচু অঞ্চল প্লাবিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা কি শোনেননি ?"

"শুনেছি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে জলের তোড়টা চামড়ার বাজারের দিকে যায়নি! তাহলে আগুনের প্রতাপও কমত। আর বেশ খানিকটা আলোচনার ঝক্কিও পোহাতে হত না আমাদের।"

"কি আর করবেন বলুন, দুর্ঘটনার মত অযৌক্তিক আর কিছুই নেই। কোনো নিয়মশৃঙ্খলাই নেই ওদের মধ্যে! একটাকে দিয়ে যে আরেকটাকে সামলাবো, তারও কোনো উপায় নেই।"

দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ভ্যান ট্রিকসির এই মূল্যবান অভিমত হজম করতে বেশ খানিকটা সময় গেল কাউন্সেলরের।

তারপর বললেন—"বিরাট কাণ্ডটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখনো কথা বলিনি।"

"কি বিরাট কাণ্ড? বিরাট কাণ্ড তাহলে আছে?" জানতে চাইলেন বার্গোমাস্টার।

"আছে বৈকি। শহর আলোকিত করার বিষয়টা বলছি।"

"ও হ্যাঁ। যতদূর মনে পড়ে, ডক্টর অক্সের শহরে আলো বসানোর পরিকল্পনার কথাই বলছেন আপনি?"

"ঠিক তাই।"

"সেকাজ তো চলছে, নিকলসি," জবাব দিলেন বার্গোমাস্টার। "পাইপ বসানো হয়ে গেছে, কাজও শেষ।"

মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন কাউন্সেলর—"এ ব্যাপারটা আমরা বোধহয় একটু তাড়াতাড়ি করে ফেললাম।"

"হয়ত। কিন্তু আমাদের অজুহাত এই যে, ডক্টর অক্স একাই গোটা এক্সপেরিমেন্টের খরচ বহন করছেন।"

"সেটা যে আমাদের একটা জবর অজুহাত, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাহলেই আমরা সময়ের তালে পা মিলিয়ে উন্নতির পথে এগুবো। এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয়, তাহলে ফ্লানডার্সে একমাত্র কুইকোয়েনডেন শহরেই আলো জ্বলবে এবং তা জ্বলবে এমন এক বস্তুর সাহায্যে যার নাম অক্সি—কি যেন গ্যাসটার নাম?"

"অক্সিহাইড্রিক গ্যাস।"

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে গেল। লোক এসে জানালে বার্গোমাস্টারের রাতের খানা তৈরী।

বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন কাউন্সেলর নিকলসি। এতগুলো বিষয় আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ভ্যান ট্রিকসির উদরানল তখন রীতিমত প্রজ্বলিত। স্থির হল, যুক্তিসঙ্গত দীর্ঘ বিলম্বের পর খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সভা ডাকা হবে এবং অডিনার্দে গেটের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অতঃপর রাস্তার দরজার দিকে পা বাড়ালেন স্থিতধী দুই শাসনকর্তা। সর্বশেষ ধাপে পৌঁছে ছোট্ট একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিলেন কাউন্সেলর। কুইকোয়েনডনের রাস্তাঘাটে এখনও আলো জ্বালিয়ে দেননি ডক্টর অক্স। তাই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাস্তায় পথ দেখার জন্য এই লণ্ঠন।

প্রস্থানের উদ্যোগপর্বেই সওয়া ঘণ্টা লাগল নিকলসির। কেননা, লণ্ঠন জ্বালানোর পর গরুর চামড়ার পেল্লায় মোজা আর ভেড়ার চামড়ার দস্তানা পরতে হল তাঁকে। এরপর তুলে দিতে হল ওভারকোটের ফারের কলার। চোখের ওপর নামিয়ে দিতে হল আবরণ, বাগিয়ে ধরতে হল কাক-চঞ্চুর অনুকরণ ভারী ছাতা। অক্টোবরের রাত, শীত নেহাৎ কম নয়।

কর্তামশাইকে আলো দেখানো শেষ করে সবে দরজায় খিল দিতে যাচ্ছে লোচ, এমন সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত বিশ্রী শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে।

হ্যাঁ! অদ্ভুত মনে হলেও সত্য! একটা বিশ্রী শব্দ! সত্যিকারের বিশ্রী কান ঝালাপালা-করা শব্দ! ১৫১৩ সালে স্প্যানিয়ার্ডরা দুর্গ টাওয়ার দখল করার পর থেকে এমন ভয়ংকর বিকট শব্দ আর কুইকোয়েনডনে শোনা যায় নি। শ্রদ্ধেয় ভ্যান ট্রিকসির প্রাসাদের দীর্ঘ সুপ্ত প্রতিধ্বনি জেগে উঠল সেই ভয়ানক শব্দে!

দমাদম করে কে যেন ধাক্কা মারছে দরজার ওপর! যে দরজায় আজ পর্যন্ত পাশবিক স্পর্শ পড়েনি, সেই দরজাই ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে কার প্রবল মুষ্ট্যাঘাতে! শব্দ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। এবার যেন লাঠি দিয়ে কার স্পর্ধিত হাত প্রবল আঘাত হেনে চলেছে দরজার পাল্লায়। সেই সঙ্গে শোনা গেল চীৎকার আর হাঁকডাক।

"মঁসিয়ে ভ্যান ট্রিকসি! মঁসিয়ে বার্গোমাস্টার! খুলুন, তাড়াতাড়ি খুলুন!"

বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলর এমন স্তম্ভিত হলেন যে বাকরহিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে।

এ যে কল্পনারও অতীত! ১৩৮৫ সাল থেকে যে কামান ব্যবহৃত হয়নি, পল্লীনিবাসের সেই সেকেলে কামানটা কেউ যদি বৈঠকখানা লক্ষ্য করে দেগে

দিত, তাহলেও এতখানি হতভম্ব হতেন না ভ্যান ট্রিক্‌সি ম্যানসনের বাসিন্দারা।

ইতিমধ্যে আরো বৃদ্ধি পেল মুষ্ট্যাঘাত এবং চেঁচানি। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে শান্তস্বরে সাড়া দিল লোচ:

"কে ওখানে?"

"আমি! আমি! আমি!"

"কে আপনি?"

"নগরপাল প্যাসফ!"

নগরপাল প্যাসফ! যার আপিস দশ বছরের মত বন্ধ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কর্তা-ব্যক্তিরা, ইনিই সেই প্যাসফ! হল কি? চতুর্দশ শতাব্দীতে যা ঘটেছিল, আবার কি তাই ঘটল? বার্গাণ্ডিয়ানরা কি কুইকোয়েনডন আক্রমণ করেছে? এর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপারে তো বিচলিত হবার পাত্র নন নগরপাল প্যাসফ! ধীরতা, প্রশান্তি আর ঢিলেমিতে স্বয়ং বার্গোমাস্টারকেও ছাড়িয়ে যান তিনি।

ভ্যান ট্রিকসির জিহ্বা অসাড় হয়ে গেছিল এই ব্যাপারে। সুতরাং তিনি ইঙ্গিত করলেন। সরে গেল খিল। খুলে গেল দরজা।

ঝড়ের মত ভেতরে প্রকোষ্ঠে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়লেন নগরপাল প্যাসফ। দেখে শুনে মনে হল, এই মাত্র যেন তুফান মাথায় নিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

এর চাইতেও গুরুতর পরিস্থিতিতেও বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায় না সাহসিনী লোচের। সুতরাং সে-ই জিজ্ঞেস করল—"ব্যাপার কি, মঁসিয়ে প্যাসফ?"

"ব্যাপার কি! সুবৃহৎ মারবেল গুলির মত চোখে অকৃত্রিম উত্তেজনা ফুটিয়ে ফেটে পড়লেন নগরপাল। "আমি আসছি ডক্টর অক্সের আস্তানা থেকে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা দিচ্ছেন উনি। সেইখানে -"

"সেইখানে?"

"সেইখানে আমি এমন একটা কথা কাটাকাটি শুনেছি, যা—মঁসিয়ে বার্গোমাস্টার, ওঁরা রাজনীতি আলোচনা করছেন!"

"রাজনীতি!" পুনরাবৃত্তি করলেন, বার্গোমাস্টার এবং তৎক্ষণাৎ খাড়া হয়ে গেল তাঁর পরচুলা।

"রাজনীতি!" আবার শুরু করলেন নগরপাল প্যাসফ। "একশো বছরের মধ্যে কুইকোয়েনডনে যা হয়নি, তাই। দেখতে দেখতে আলোচনা গরম হয়ে গেল, অ্যাডভোকেট আঁদ্রে সুট আর ডক্টর ডোমিনিক কাসটোস এমন ক্ষেপে গেলেন যে মনে হল বিবাদের মীমাংসার জন্যে ডুয়েল লড়ে বসবেন।"

"ডুয়েল! কুইকোয়েনডনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ! অ্যাডভোকেট স্যুট আর ডক্টর কাসটোস আর কি বললেন?"

"ঠিক এই কথা: ডক্টর বললেন—মঁসিয়ে অ্যাডভোকেট, আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। যা বলছেন, তা ওজন করে বলছেন না!"

এত জোরে হাত মুঠো করে ফেললেন ভ্যান ট্রিকসি যে সাদা হয়ে গেল গাঁটগুলো। ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন কাউন্সেলর এবং হাত থেকে খসে পড়ে গেল লণ্ঠন। মাথা নাড়তে লাগলেন নগরপাল। মেজাজ খিঁচড়ে দেওয়া এমন কুৎসিত শব্দও কিনা উচ্চারণ করতে পারেন দেশের দু'দুজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি!

বিড়বিড় করে বললেন ভ্যান ট্রিকসি—"ডক্টর কাসটোস যে অতি বিপজ্জনক লোক, সে বিষয়ে আর দ্বিমত থাকতে পারে না। মাথা-গরম মানুষ! আসুন আপনারা!"

শুনে, বার্গোমাস্টারের পিছু পিছু বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন কাউন্সেলর নিকলসি ও নগরপাল প্যাসফ।

প্রথমশ্রেণীর ফিজিওলজিস্ট ডক্টর অক্স এবং তাঁর এক্সপেরিমেন্টের দুঃসাহস

ডক্টর অক্স নামধারী এই অসাধারণ ব্যক্তিটি তাহলে কে?

ভদ্রলোক যে মৌলিক চরিত্রের অধিকারী, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীমহল তাঁকে চিনতে পারে এক ডাকেই। শিক্ষিত ইউরোপে ফিজিওলজিস্ট ডক্টর অক্সের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ডেভিস, ড্যালটন, বসটক্স, মেন্‌জিস, গডুইন, ভিরর্ডট্‌স—এঁরা সকলেই আধুনিক বিজ্ঞানে ফিজিওলজিকে উচ্চতম আসনে বসিয়ে গেছেন। ডক্টর অক্স এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

ডক্টর অক্স আকারে ও উচ্চতায় মাঝামাঝি। বয়স—না, তাঁর বয়স বা কোন্ দেশের অধিবাসী তিনি, তা আমরা বলতে পারব না। তাছাড়া, তার কোন দামও নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রীতিমত অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব। ধমনীতে বইছে তাঁর উষ্ণ উগ্র রক্ত—যেন হফম্যানের কেতাব থেকে বেরিয়ে আসা একটা সত্যিকারের ক্যাপামি। কুইকোয়েনডনের শান্তশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য দেখলে কৌতুক বোধ হয়। কি নিজের দিক দিয়ে অথবা নিজস্ব বক্তব্যের দিক দিয়ে, অদম্য আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী ডক্টর অক্স। হাসছেন সব সময়ে; হাঁটছেন মাথা তুলে, স্বচ্ছন্দে কাঁধ দুলিয়ে; অচঞ্চল চাহনিতে, চলনে-বলনে নেই আড়ষ্টতা, নেই জড়তা। নাসিকারন্ধ্র

সদাই স্ফীত এবং টাটকা বাতাস আহরণে ব্যস্ত। এ চেহারা দেখলে ভাল না লেগে উপায় নেই। অতিমাত্রায় সজীব তিনি, দেহের প্রতিটি কলকব্জায় সুষ্ঠু সমতা। শিরায় বইছে পারার পিচ্ছিলতা আর পায়ের তলায় রয়েছে যেন শ'খানেক ছুঁচ। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ধাতে নেই তাঁর। তেজালো শব্দ আর প্রচুর অঙ্গভঙ্গী সহ তিনি অবিরাম ছটফট করছেন তো করছেনই।

ডক্টর অক্স কি তাহলে খুব ধনী, তা নাহলে গাঁটের কড়ি খরচ করে একটা গোটা শহরকে আলোকিত করার দায়িত্ব তিনি নেবেন কেন? সম্ভবত তাই। অতখানি বিলাসে যিনি মত্ত হতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে এ ছাড়া আর কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

কুইকোয়েনডন শহরে ডক্টর অক্স এসেছেন পাঁচমাস আগে। সঙ্গে এসেছে তাঁর সহকারী, গিডিয়নে ইজিনি। হজিনি মাথায় দিব্বি লম্বা, শুকনো খটখটে, শীর্ণ। মনিবের চাইতে এক তিলও কম যায় না সে প্রাণশক্তিতে।

এখন আসা যাক অন্যতম প্রশ্নে। নিজের পয়সায় গোটা শহরটাকে আলোকিত করার প্রস্তাব করলেন কেন ডক্টর অক্স? অন্যান্য ফ্লেমিং থাকতে শান্তিপূর্ণ কুইকোয়েনডনকে বেছে নিলেন কেন? কেন আয়োজন করলেন অশ্রুতপূর্ব এক পদ্ধতি দিয়ে শহরে আলো জ্বালানোর? না কি এ একটা ছলনা? শহরে আলো জ্বালানোর অজুহাতে সজীব মানুষ নিয়ে ফিজিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট করার মতলব? সংক্ষেপে, মৌলিক চরিত্রের অধিকারী এই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিকের আসল অভিপ্রায়টা কি? আমরা জানি না। কারণ, সহকারী ইজিনি ছাড়া আর কারো কাছে পেট আলগা করেন না ডক্টর অক্স। ডক্টর অক্সকে অন্ধের মত মেনে চলে সহকারী ইজিনি।

যাই হোক, বাহ্যতঃ, ডক্টর অক্স শহরে আলোর মালা সাজানোর ব্যবস্থা করছেন এবং শহরে এরকম একটা ব্যবস্থার একান্তই দরকার ছিল। "বিশেষ করে রাত্রে"—বলেছিলেন নগরপাল প্যাসফ। সেই অনুসারে আলো জ্বলার গ্যাস তৈরীর কারখানাও চালু হয়ে গেছে। কাজে লাগার প্রতীক্ষায় রয়েছে গ্যাসমিটার। রাস্তার নীচ দিয়ে পাতা গ্যাসবাহক পাইপগুলোর সংখ্যাও শীগগির বৃদ্ধি পাবে। কেননা, পাঁচজনে যেখানে যাতায়াত করে, এমন বড় বড় বাড়ীগুলোয় শীগগিরই জ্বলবে গ্যাসবার্ণার। প্রগতিশীল নাগরিকদের অট্টালিকাও বাদ যাবে না।

পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয় ভুলে যাননি, কাউন্সেলর এবং বার্গোমাস্টারের দীর্ঘ কথোপকথনের সময়ে বলা হয়েছিল, শহরে আলো দেওয়ার পরিকল্পনাটা নয়।

কয়লা পাতন করে পাওয়া যায় কারবারেট অফ হাইড্রোজেন। কিন্তু কুইকোয়েডন শহরে আলো দেওয়া হবে আরো আধুনিক এবং বিশ গুণ উজ্জ্বল একটি গ্যাসের সাহায্যে। এ গ্যাসের নাম, অক্সিহাইড্রিক গ্যাস যা তৈরী হবে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশিয়ে।

ডক্টর অক্স কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফিজিওলজিস্টই নন, নিপুণ কেমিষ্টও বটে। সাধারণ জল থেকে কিভাবে প্রচুর পরিমাণে এ গ্যাস উৎপাদন করতে হয় তা তিনি জানতেন। এজন্যে জলে প্রথমে সামান্য অ্যাসিড মিশিয়ে দিতেন। তারপর নিজের আবিষ্কৃত কয়েকটা নতুন মৌলিক পদার্থের সাহায্যে জল বিশ্লিষ্ট করে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট গ্যাস বানিয়ে নিতেন। দুটো গ্যাসকে পৃথক করার জন্য দামী জিনিসপত্র, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, দাহ্য-পদার্থ—কিছুরই দরকার হত না তাঁর। জলভরা বড় বড় পাত্রের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেণ্ট চালিয়ে দিলেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন—এই দুই মৌলিক উপাদানে ভেঙে যেত জল। অক্সিজেন যেত একদিকে; আর তার দ্বিগুণ আয়তন হাইড্রোজেন যেত আর একদিকে। দুটো পৃথক রিজার্ভারে সঞ্চয় করা হত তাদের। কারণ দুটো গ্যাস যদি মিশে যায় এবং তাতে আগুনের ফুলকি এসে পড়ে, তাহলে ভয়ংকর বিস্ফোরণে কারখানা উড়ে যাবে। তাই এই সতর্কতা। এরপর দুই রিজার্ভার থেকে আলাদা পাইপের মধ্যে দিয়ে দুটো বিভিন্ন গ্যাস বার্ণারের মুখে পৌঁছোয় এবং সেখানে এমন ব্যবস্থা থাকে যে বিস্ফোরণ ঘটে না। ফলে, পাওয়া যায় এক আশ্চর্য উজ্জ্বল শিখা।

অফুরন্ত এই সংমিশ্রণের ফলে কুইকোয়েনডন শহর যে অত্যাশ্চর্য আলোক-মালায় সজ্জিত হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তা নিয়ে যে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন না ডক্টর অক্স এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী, তা অচিরেই প্রকাশ পাবে এর পরের বিবরণীতে।

যেদিন নগরপাল প্যাসফ বিকট হট্টগোল করে বার্গোমাস্টারের বাড়ী প্রবেশ করলেন, তার পরের দিন ল্যাবরেটরীতে কথা বলছিলেন গিডিয়ন ইজিনি আর ডক্টর অক্স। গ্যাসের কারখানার মূল বাড়ীর একতলায় অবস্থিত এই ল্যাবরেটরীতে দুজনেই থাকতেন এক সঙ্গে।

হাত ঘসতে ঘসতে সোল্লাসে বললেন ডক্টর—"ওহে ইজিনি, কাল আমার সম্বর্ধনা সভায় দেখলে তো ঠাণ্ডা-রক্ত কুইকোয়েনডনবাসীদের। আবেগ উত্তেজনার দিক দিয়ে ওরা স্পঞ্জ আর প্রবাল-আঁচিলের মাঝামাঝি! ওদের কথা কাটাকাটি আর চেঁচিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে পরস্পরকে উত্যক্ত করার রকমটা নিজের চোখে দেখলে তো? ওরা কিন্তু এর মধ্যেই নৈতিক আর দৈহিক,

এই দুই দিক দিয়েই রূপান্তরিত। এই তো শুরু। বাছাধনদের একটু বড় ডোজ না দেওয়া পর্যন্ত রগড় জমবেই না!"

"তা যা বলেছেন, স্যার," কড়ে আঙুলের প্রান্ত দিয়ে ধারালো নাক চুলকে নিয়ে বলল ইজিনি, "এক্সপেরিমেণ্টের শুরুটা ভালোই। বুদ্ধি করে কলটা যদি বন্ধ করে না দিতাম, তাহলে যে কি ঘটত, তা ভাবাই যায় না।"

"অ্যাডভাকেট স্থুট আর ডক্টর কাসটোসের তর্কাতর্কি তো শুনেছো তুমি," আবার শুরু করেন ডক্টর অক্স। "কথাগুলো মোটেই অভব্য নয়। কিন্তু কুইকোয়েনডনবাসীদের মুখে তা এমনই মারাত্মক শোনালো যেন তরোয়াল কোষমুক্ত করার আগে হোমারের বীরেরা পরস্পরের প্রতি যতগুলো অপমানকর গালিগালাজ নিক্ষেপ করেছিল, তাদেরকেও হার মানায়! বলিহারি যাই এই ফ্লেমিংদের। দুদিন বাদেই দেখবে কি হাল করি বাছাধনদের!

"ওরা তাহলে ভাববে আমরা নেহাতই অকৃতজ্ঞ," এমন স্বরে বলল ইজিনি যেন মানুষকে শ্রদ্ধা করাই তার পরম ধর্ম।

"বারে!" বললেন ডক্টর, "ওরা আমাদের সম্বন্ধে ভাল ভাবে কি মন্দ ভাবে, তাতে কি আসে যায়? এক্সপেরিমেণ্ট সফল হলেই হল।"

হাসল ইজিনি। হাসিতে বিদ্বেষ ছড়িয়ে জবাব দিলে—"তাছাড়া শ্বাসযন্ত্রে এ ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হলে কুইকোয়েনডনবাসীদের ফুসফুস বিগড়ে যাওয়ার আশংকাও কি নেই?"

"সেটা অবশ্য খুবই খারাপ! কিন্তু তাও তো বিজ্ঞানের স্বার্থে। জীবচ্ছেদ এক্সপেরিমেণ্টে ছুরি কাঁচির তলায় শুতে যদি কুকুর ব্যাঙ আপত্তি জানায়, তাহলে কি তাতে কর্ণপাত করবে তুমি?"

কুকুর ব্যাঙের সঙ্গে পরামর্শ করলে জীবচ্ছেদ অপারেশনে কিঞ্চিৎ আপত্তি জানাত তারা। কিন্তু ডক্টর অক্স মনে করলেন, অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে ফেলেছেন তিনি। তাই তৃপ্তি-সূচক মস্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন এরপরেই!

যুক্তিটা যেন মনে ধরেছে, এমনি স্বরে বললে ইজিনি—ঠিকই বলেছেন, স্যার। কুইকোয়েনডনবাসীদের চাইতে ভাল জীবই বা আর পেতাম কোথায়।"

"না, পে-তা-ম না।" প্রতিটি অক্ষরে জোর দিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন ডক্টর অক্স।

ওদের নাড়ী টিপেছেন?"

"শ'খানেকবার টিপেছি!"

"গড়পড়তা গতি কত?"

"মিনিটে পঞ্চাশও নয়। ব্যাপারখানা বোঝো তাহলে। যে শহরে একশ-বছরে আলোচনার ছায়াও পড়েনি, যেখানে গাড়োয়ান গাল পাড়ে না, যেখানে কোচোয়ান পরস্পরকে অপমান করে না, যেখানে ঘোড়া লটকান দেয় না, যেখানে কুকুর কামড় বসায় না, যেখানে বেড়াল আঁচড়ে দেয় না—এমন একটা শহর যেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে কাঠের পুতুলের মত, বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাদের হাতে কোন কাজ থাকে না—যে সহরে নাগরিকরা কোনো কিছু সম্পর্কেই উৎসাহবোধ করে না, তা তা সে শিল্পই হোক কি ব্যবসাই হোক। এমন একটা শহর যেখানে সশস্ত্র পুলিশ উপকথার সামিল এবং যেখানে একশ বছরের মধ্যে একটা মামলা কোর্টে ওঠেনি—সংক্ষেপে, যে শহরে তিন শতাব্দীর মধ্যে ঘুসি মারা তো দূরের কথা, কেউ একটা চড়ও মারেনি! ইজিনি, এ ব্যবস্থা চলতে পারে না। আমরাই সব পালটে দেব, ঢেলে গড়ব।"

"ঠিক, ঠিক," সোল্লাসে বললে অত্যুৎসাহী অ্যাসিসট্যান্ট। "ব্যাপক আকারে করা হোক এক্সপেরিমেন্ট—চূড়ান্ত কিছু একটা হয়ে যাক।"

"আর যদি তা চূড়ান্ত হয়," বিজয়-গৌরবে জুড়ে দিলেন ডক্টর, "তাহলে পৃথিবী সংস্কারে নামব আমরা!"

বার্গোমাস্টার আর কাউন্সেলর দেখা করতে এলেন ডক্টর অক্সের সঙ্গে

অস্থির অন্তরে রাত কাটানো যে কি দুর্ভাগ্য, সবশেষে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন কাউন্সেলর নিকলসি এবং বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি। গুরুতর ঘটনা ঘটেছে ডক্টর অক্সের বাড়ীতে এবং এই নিয়ে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল দুজনের। অকৃত্রিম অনিদ্রারোগে ভুগলেন সারা রাত। এ ব্যাপারের ফলাফল যে কি দাঁড়াবে, তাঁরা কল্পনাই করতে পারলেন না। এ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি প্রয়োজন হবে? মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ওঁরা দুজনে—সুতরাং এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত নাক গলাতে কি তাঁরা বাধ্য হবেন? এ রকম বিশ্রী একটা কেলেংকারী যাতে আবার ভবিষ্যতে না ঘটে, সেজন্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কি ঠিক হবে? এই ধরণের শত সহস্র সংশয়ে তোলপাড় হয়ে গেল দুজনের নরম প্রকৃতি, সুরাহা আর হল না। সেদিন রাতে অবশ্য পরস্পরের কাছে বিদায় নেওয়ার আগে একটা "সিদ্ধান্ত" নিয়েছিলেন, পরের দিন আবার সাক্ষাৎ হবে দুই প্রধানে।

তাই পরের দিন সকালে বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি নিজেই রওনা হলেন কাউন্সেলর নিকলসির বাড়ীর দিকে। গিয়ে দেখা গেল, নিকলসি অনেকটা

শাস্ত। বার্গোমাস্টার নিজেও চিত্তের অস্থিরতা খানিকটা দমন করে ফেলেছিলেন।

"নতুন কিছু ?" জিজ্ঞেস করলেন ভ্যান ট্রিকসি।

"কালকের পর থেকে নতুন কিছু নেই।" জবাব দিলেন নিকলসি।

ঘণ্টাখানেক আলোচনার অন্তে দেখা গেল মোট তিনটে মন্তব্য উচ্চারিত হয়েছে দুই বন্ধুর মুখ থেকে। সে মন্তব্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ডক্টর অক্সের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন দুজনে এবং এ ব্যাপারে নতুন কোন খবর ভদ্রলোকের পেট থেকে বার করা হবে কিনা, সে চেষ্টা করা হবে। যদিও ডক্টর অক্সকে তা বুঝতে দেওয়া হবে না।

এরপর দুজনে যা করলেন, তা একেবারেই তাঁদের স্বভাব বিরুদ্ধ। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই মহারথী যাত্রা করলেন। তা কাজে পরিণত করতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গুটি গুটি এগোলেন ডক্টর অক্সের ল্যাবোরেটরী অভিমুখে। যে অডিনার্দে গেটের চুড়ো পড়োপড়ো, তারই সন্নিকটে শহরের ল্যাবোরেটরী, বসিয়ে গবেষণা নিয়ে মেতেছিলেন ডক্টর অক্স।

হাতে হাত না দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলেন দুজনে। ধীর স্থির মন্থর পদক্ষেপে সেকেণ্ডে মাত্র তেরো ইঞ্চি এগোতে লাগলেন। এই হল কুইকোয়েনডনবাসীদের স্বাভাবিক চলন। এ শহরে কেউ পথ দিয়ে দৌড়েছে, এমন দৃশ্য কারো মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতে লাগলেন দুজনে। হট্টগোল শূন্য রাস্তার শেষে অথবা শান্ত নিরিবিলি কোনো পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতে লাগলেন পথচারীদের।

পথচারীদের ঈষৎ উত্তেজিত হাবভাব এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল গত রাতের কথা কাটাকাটির সমাচার সারা শহরে জানাজানি হয়ে গেছে। বার্গোমাস্টার যেদিকে চলেছেন, তা দেখেও রীতিমত ভোঁতা কুইকোয়েনডনবাসীও অনুমান করে নিলে নিশ্চয় গুরুতর কর্তব্য সম্পাদন করতে চলেছেন তিনি। কাসটোস আর সুট বৃত্তান্ত নিয়ে মুখে মুখে আলোচনা চলছে সারা শহরে। যদিও কার পক্ষ অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হবে, সে সিদ্ধান্তে এখনও কেউ আসতে পারেনি। অ্যাডভোকেট সুট কখনও মামলা হারেন নি। কারণ, মামলায় বক্তিমে করার মত সুযোগই তিনি পাননি। কেননা, কুইকোয়েনডন শহরে উকিল মোক্তাররা আছেন শুধু ঐতিহ্য রক্ষা করে—কাজ নেই। ডক্টর কাসটোসের পসারে নামডাক আছে। অন্যান্য ডাক্তারদের মতই তিনি সমস্ত রোগীদেরই রোগ নিরাময় করেন—শুধু যারা মারা যায় তাদের ছাড়া। রোগীদের

এ বদভ্যাস অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এবং সর্বকালে সর্বদেশের চিকিৎসক মহল এ জন্যে যৎপরোনাস্তি অসুখী।

"অভিনার্দে গেটে পৌঁছে বিচক্ষণের মত ঘুর পথে এগোলেন বার্গোমাস্টার আর কাউন্সেলর। টাওয়ারের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না পাছে তা মাথায় ভেঙে পড়ে। জায়গাটা পেরিয়ে আসার পর পেছন ফিরে মনোযোগসহকারে টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে রইলেন দুই বন্ধু।

"আমার তো মনে হয় এ টাওয়ার পড়বেই," বললেন ভ্যান ট্রিকসি।

"আমারও তাই মনে হয়," জবাব দিলেন নিকলসি। "ঠেকা দিয়ে রাখলে অবশ্য পড়বে না," বললেন ভ্যান ট্রিকসি। "কিন্তু ঠেকা দেওয়া হবে কিনা, সেইটাই প্রশ্ন।"

"সংক্ষেপে, সেইটাই প্রশ্ন।"

কিছুক্ষণ পরে গ্যাসকারখানার দরজার সামনে পৌঁছোলেন দুজনে।

"ডক্টর অক্স দেখা দেবেন কি?" জিজ্ঞেস করলেন দুই বন্ধু।

শহরের দুই প্রধানের কাছে ডক্টর অক্স সর্বদাই দেখা দেবেন। অতএব তৎক্ষণাৎ দুজনকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হল প্রখ্যাত ফিজিওলজিস্টের ক্যাবিনেটে।

কম করে একঘণ্টা দুই প্রধান বসে রইলেন ডক্টর অক্সের প্রতীক্ষায়। ফলে যা কখনো দেখা যায়নি, তাই এবার দেখা গেল। জীবনে অধীর হননি বার্গোমাস্টার—কিন্তু এবার ধৈর্য হারালেন। নিকলসি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

অবশেষে এলেন ডক্টর অক্স। এসেই এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। গ্যাসমিটারের একটা প্ল্যান অনুমোদন করতে গিয়েই এই দেরী। কয়েকটা যন্ত্রপাতিও সারাতে হল। এসব সত্ত্বেও কাজকর্ম তোফা চলছে! অক্সিজেনের পাইপ ইতিমধ্যেই বসিয়ে ফেলা হয়েছে।

এরপর ডক্টর সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হেতু তাঁর মত দীনের গৃহে আগমন দুই প্রধানের!

"আপনাকে দেখতে এলাম, ডক্টর, আপনাকে দেখতে এলাম," জবাব দিলেন ভ্যানট্রিকসি। "অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তো। কুইকোয়েনডন শহর ছোট্ট, কিন্তু এমন শহরেও খুব একটা বাইরে বেরোই না আমরা। আমরা গুনে গুনে পা ফেলি, মেপেমেপে হাঁটি। অভ্যেসের সমতা যতক্ষণ ঠিক আছে, ততক্ষণ আমরা সুখী।"

বন্ধুর দিকে তাকালেন নিকলসি। একসঙ্গে এত কথা তো বন্ধুবর এর আগে কখনো বলেনি। বললেও, যথেষ্ট সময় নিয়েছেন, প্রতিটি বাক্যের শেষে

প্রচুর বিরতি দিয়েছেন। কিন্তু আজ হল কি? ভ্যান ট্রিকসির মুখে যে কথার খই ফুটছে, যা তাঁর বৈশিষ্ট্য নয় মোটেই। নিকলসি নিজেও কথা বলার একটা অদম্য স্পৃহা অনুভব করলেন।

আর, ধূর্ত চোখে একদৃষ্টে বার্গোমাষ্টারের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডক্টর অক্স।

জীবনে কথা কাটাকাটি করেননি ভ্যান ট্রিকসি। কিন্তু এবার তিনি আরামপ্রদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জানি না, কি, ধরণের স্নায়বিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। উত্তেজনা জিনিসটা ওঁর কুষ্টিতে লেখা নেই। তখনও হাত ছোঁড়া শুরু হয়নি, কিন্তু ভাবসাব দেখে মনে হল, তার আর দেরি নেই। নিকলসি পা ঘসতে ঘসতে ক্রমস উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। শ্বাসপ্রশ্বাস বইছিল মন্থর অথচ দীর্ঘছন্দে। ধীরে ধীরে প্রাণচাঞ্চল্য জাগছিল তাঁর ভঙ্গিমায়। এবং শেষ পর্যন্ত দরকার হলে যে কোন উপায়ে প্রিয় বন্ধু বার্গোমাস্টারকে সমর্থন করার "সিদ্ধান্ত" তিনি নিয়ে ফেলেছিলেন।

চেয়ার ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠে ডক্টরের মুখোমুখী দাঁড়ালেন ভ্যান ট্রিকসি—"আর ক'মাস লাগবে আপনার কাজ শেষ হতে?"

"তিন চার মাস, মঁসিয়ে বার্গোমাস্টার।" জবাব দিলেন ডক্টর অক্স।

"তিন চার মাস—সে তো অনেক সময়!" বললেন ভ্যাস ট্রিকসি।

"মোটের ওপর অনেক সময়!" বললেন নিকলসি। আর বসে থাকতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রলোক।

"কাজটা শেষ করতে এ সময় দরকার" বললেন ডক্টর অক্স। "কুইকোয়েনডন থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাকে। এরা তেমন চটপটে নয়।"

"কি, চটপটে নয়! চীৎকার করে উঠলেন বার্গোমাস্টার—টিপ্পনীটা তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদায় তীরের মত গিয়ে বিঁধেছে।

"না নয়, মঁসিয়ে ভ্যান ট্রিকসি," একগুঁয়ের মত বললেন ডক্টর অক্স। "একজন ফরাসী শ্রমিক একদিনে যা করবে, তা করতে আপনার দশজন শ্রমিক দরকার হবে। জানেন তো, এরা হল খাঁটি ফ্লেমিং।

"ফ্লেমিং!" মুঠি পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্সেলর। "মশায়, শব্দটা কি অর্থে বললেন তা জানতে পারি কি?"

"অবশ্যই জানতে পারেন। যে মিঠে অর্থে সবাই বলে, সেই একই অর্থে," হাসিমুখে জবাব দিলেন ডক্টর অক্স।

ঘরময় পায়চারী করতে করতে বললেন বার্গোমাস্টার—"ডক্টর, এ জাতীয়

ইঙ্গিত আমি পছন্দ করি না। পৃথিবীর অন্যান্য শ্রমিকের মতই সমান কর্মদক্ষ কুইকোয়েন শ্রমিকরা। আদর্শ শ্রমিক সংগ্রহের জন্যে আমাদের লণ্ডন কি প্যারিসে যাওয়ার দরকার নেই। এবার আপনার কাজ নিয়ে বলি। দয়া করে চটপট শেষ করুন। পাইপ বসানোর ফলে রাস্তাঘাটে আর হাঁটা যাচ্ছে না। সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা দিচ্ছে রাস্তার দুর্গতির জন্যে। ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি শীগগিরই শুরু হবে। দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে এ ব্যবস্থা আমি চলতে দিতে পারি না। ধমকাধমকিও করাটা শোভা পায় না—যদিও সেটারই একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।"

জয়তু বার্গোমাস্টার! যে সব শব্দ নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, সেই ব্যবসাবাণিজ্য, সরবরাহ ইত্যাদি শব্দগুলো তুবড়ির ফুলকির মত বেরিয়ে এল তাঁর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে! ব্যাপার কি? কি ক্রিয়া চলছে ওঁর দেহের অভ্যন্তরে?

"তাছাড়া" বললেন নিকলসি। "শহরকে বেশীদিন আলো না জ্বালিয়ে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা যায় না।"

"কিন্তু," প্রতিবাদের সুরে বললেন ডক্টর, "যে শহরে আট ন'শ বছর আলো জ্বলেনি—"

এখন তার দরকার হয়ে পড়েছে," ঝটিতি জবাব দিলেন বার্গোমাস্টার। "অন্য সময়ে অন্য ব্যবস্থা! প্রগতি এগিয়ে চলেছে, আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না। একমাসের মধ্যে শহরে আলো দেখতে চাই আমরা, নইলে প্রতিদিন দেরীর জন্যে মোটা টাকা খেসারৎ গুণতে হবে আপনাকে। অন্ধকারে রাস্তায় যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে যায়, তখন কি হবে বলুন তো?"

"ঠিকই তো," জোর গলায় সায় দিলেন নিকলসি, "ফ্লমিংদের রক্ত গরম করতে একটা স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট!"

"কথা প্রসঙ্গে বলি," বললেন বার্গোমাস্টার! "আমাদের পুলিশ চীফ নগরপাল প্যাসফের কাছে শুনলাম কাল রাতে একটা আলোচনাসভা বসেছিল আপনার ড্রইংরুমে। ডক্টর অক্স, আলোচনাটা যে রাজনীতি সম্পর্কীয় এ খবর কি ভুল?"

"নিশ্চয় না, মঁসিয়ে বার্গোমাস্টার," অতিকষ্টে তৃপ্তিসূচক দীর্ঘশ্বাসটা চেপে নিয়ে বললেন ডক্টর অক্স।

"ডোমিনিকি কাসটোস আর আঁদ্রে সুটের মধ্যে একটা কথা-কাটাকাটি তাহলে হয়েছে?"

"হয়েছে। কিন্তু কথাগুলো তেমন গুরুতর নয়।"

"গুরুতর নয়!" চীৎকার করে উঠলেন বার্গোমাস্টার। "গুরুতর নয়! ওজন করে কথা বলা হচ্ছে না, একথা একজন আরেকজনকে বললে সেটা গুরুতর নয়! কি ধাতুতে আপনি তৈরী হয়েছেন, জানতে পারি কি, মঁসিয়ে? জানেন কি, কুইকোয়েনডন শহরে চরম বিপর্যয় আনতে এর চাইতে বেশী আর কিছু দরকার নেই? আপনি বা আর কেউ যদি একথা আমাকে বলতেন—"

"অথবা আমাকে বলতেন," জুড়ে দিলেন নিকলসি।

এই কথা বলার পর দুই প্রধান ঘুসি পাকিয়ে, হাত ভাঁজ করে, চুল খাড়া করে এমন মারমুখো ভঙ্গীতে ডক্টর অক্সের সামনে দাঁড়ালেন যে এই বুঝি মেরে বসেন। সেই সঙ্গে অগ্নি বিচ্ছুরিত হতে লাগল ক্রোধারক্ত চোখ থেকে।

কিন্তু মুখের একটা পেশীও কাঁপল না ডক্টর অক্সের। "যাইহোক, মঁসিয়ে," আবার শুরু করলেন বার্গোমাস্টার। "আপনার বাড়ীতে যা ঘটেচে, তার জন্যে আপনাকে দায়ী করছি আমি। এ শহরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব আমার। আমি চাই না তা ক্ষুন্ন হোক। কাল রাতে যা ঘটেছে, তা যেন আর না ঘটে। শুনেছেন? শুনে থাকলে জবাব দিন!"

অসাধারণ উত্তেজনায় আর ভীষণ রাগে তারস্বরে চীৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন বার্গোমাস্টার। ভ্যান ট্রিকসির এরকম রুদ্রমূর্তি কেউ কখনো দেখেনি—আর গলাবাজি তো শোনা যাচ্ছিল রাস্তা থেকেও। কিন্তু যখন দেখা গেল ডক্টর অক্স এমন অপমানেরও কোন প্রতিবাদ করলেন না, তখন তিনি বললেন—'আসুন, নিকলসি।"

বলে, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বার্গোমাস্টার। বিক্রমটা দরজার ওপর দিয়ে যাওয়ার ফলে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ীটা।

রাস্তার ওপর বিশ পা এগিয়ে এলেন দুই বন্ধু আর একটু একটু করে শান্ত হয়ে এল তাঁদের মেজাজ। শ্লথ হয়ে এল পদক্ষেপ, অঙ্গভঙ্গীর উত্তাপও ধীরে ধীরে যেন উবে গেল। গ্যাস কারখানা ছেড়ে আসার সওয়া ঘণ্টা পর নরম গলায় নিকলসিকে বললেন ভ্যান ট্রিকসি—"মাটির মানুষ এই ডক্টর অক্স! ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হলে খুশী হব আমি।"

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেছে ফ্রাঞ্জ নিকলসি ও সুজেল ভ্যান ট্রিকসি

পাঠকপাঠিকারা জানেন, বার্গোমাস্টারের সুজেল নামে একটি মেয়ে আছে। কিন্তু তাঁরা যত চতুরই হোন কেন, কল্পনাতেও আনতে পারেন নি, ফ্রাঞ্জ নামে

কাউন্সেলর নিকলসির একটি ছেলে আছে। যদিও বা কেউ তা কল্পনা করে থাকেন, সুজেল যে ফ্রাঙ্কের বাগদত্তা প্রেয়সী, এ সংবাদ কোনক্রমেই কারো কল্পনাতে আনা সম্ভব নয়। সবশেষে আমরা আর একটু জুড়ে দিই। বিধাতা সুজেলকে গড়েছেন কেবল ফ্রাঙ্কের জন্যে এবং ফ্রাঙ্ককে গড়েছেন শুধু সুজেলের জন্য। কুইকোয়েনডনে ভালবাসার রীতি অনুযায়ী দুজনেই দুজনকে ভালবাসে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

সৃষ্টিছাড়া এই দেশে তরুণতরুণীদের হৃদ্‌পিণ্ড উদ্বেলিত হয় না, এমন কথা কেউ যেন ভেবে না বসেন। উদ্বেলিত হয় নিশ্চয়—তবে তা এক বিশেষ ছন্দে। পৃথিবীর অন্যান্য শহরে বিয়ে হয়, এ শহরেও বিয়ে হয়। কিন্তু এখানে বিয়ের আগে প্রচুর সময় নেওয়া হয়। হৃদয় সমর্পণ করার পর বিবাহ নামক ভয়াবহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে তরুণতরুণীরা এদেশে পরস্পরকে পর্যবেক্ষণ করে; এবং এই পর্যবেক্ষণ চলে কম করে দশ বছর ধরে। কলেজেও পড়াশুনার ক্ষেত্রে ব্যয় হয় সমান সময়।

হ্যাঁ, দশ বছর! শুধু প্রাগ্‌বিবাহ অনুরাগ পর্বেই দশ বছর। সারা জীবনের জন্যে যারা বাঁধা পড়তে চলেছে, তাদের কাছে এটা কি খুব বেশী সময়? ইঞ্জিনীয়ার কি ডাক্তার, অ্যাডভোকেট কি অ্যাটর্ণী হতে গেলে দশ বছর পড়তে হবে এবং স্বামী হতে গেলে যে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন, তার জন্যে এর চাইতে কম সময় ব্যয় করা কি সমীচীন? মোটেই নয়। কুইকোয়েনডনবাসীদের মেজাজ আর যুক্তি সম্বন্ধে আমরা যাই বলি না কেন, বিবাহ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ দীর্ঘায়িত করার ব্যাপারে বোধ হয় তারা সঠিক। এ খবর জানার পর, অন্যান্য শহরে কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ের পাঠ চুকিয়ে ফেলা দেখে আমরা নিশ্চয় হাল ছেড়ে দেব এবং চটপট আমাদের ছেলেদের পাঠিয়ে দেব কুইকোয়েনডনের স্কুলে আর মেয়েদের কুইকোয়েনডনের বোর্ডিংয়ে।

গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে এ শহরে মাত্র একটি বিয়েই দু'বছর কোর্টশিপের পর হতে দেখা গেছে এবং সে বিয়ে সুখের হয়নি!

প্রেয়সীকে বিয়ে করার জন্যে দীর্ঘ দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে জেনে যেমনভাবে ভালবাসা দরকার, ঠিক তেমনি ভাবেই সুজেল ভ্যান ট্রিকসিকে ভালবাসত ফ্রাঙ্ক নিকলসি। প্রতি সপ্তাহে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিশেষ একটি সময়ে ফ্রাঙ্ক যেত সুজেলের কাছে এবং দুজনে মিলে হাওয়া খেত 'ভার' নদীর তীরে। মাছ ধরার সরঞ্জাম সর্বদাই রাখত ফ্রাঙ্ক এবং এমব্রয়ডারীর সরঞ্জাম নিতে ভুলতে না সুজেল। চারু হস্তে কত অসম্ভব পুষ্পই যে এমব্রয়ডারীর ক্যানভ্যাসে সৃষ্টি করত সুজেল, তার ইয়ত্তা নেই।

ফ্রাঞ্জ বাইশ বছরের যুবক। পিচ ফলকেও হার মানাত তার কোমল রক্তিম গাল। কণ্ঠস্বর কখনো ওঠানামা করত না, বিভিন্ন স্বরগ্রামে বিচরণ করত না।

সুজেল স্বর্ণকেশী। গোলাপের মত সুন্দর মুখ তার। বয়স সতেরো। মাছ ধরায় তার নাসিকাকুঞ্চন নেই। বঁড়শিতে মাছ গেঁথে তুলতে গেলে রীতিমত ধৈর্য আর দক্ষতা দেখানো সম্ভব এই নেশায়। ফ্রাঞ্জ মাছ ধরতে ভালবাসে, কেন না তার স্বভাবের সঙ্গে বেশ খাপ খায় সখটা। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতো সে। জলের কিনারায় অল্প অল্প কাঁপত ফাৎনা—কিন্তু ফ্রাঞ্জ জানে কি করে সবুর করতে হয়। তারপর, ছ ঘণ্টা বসে থাকার পর যখন শেষ পর্যন্ত একটা মাছ বঁড়শিতে ধরা দিতে রাজি হয়, তখন সুখ আর ধরে না ফ্রাঞ্জের অন্তরে—কিন্তু সে জানে কি করে দমন করতে হয় আবেগকে।

সেই বিশেষ দিনটিতে নদীর তীরে বসেছিল দুজনে। পায়ের কয়েক ফুট নীচে কলকল করে বয়ে চলেছিল শীর্ণ ভার নদী। ক্যানভাসের ওপর শান্ত হাতে ছুঁচের ফোঁড় দিচ্ছে সুজেল। ফ্রাঞ্জের বাঁ হাত থেকে ডানহাতে এবং ডানহাত থেকে বাঁ হাতে যন্ত্রবৎ আনাগোনা করছে ছিপটা। ছোট ছোট বলয় সৃষ্টি করে জলের ওপর খেলা করছে মাছেরা, আনাগোনা করছে ফাৎনার আশপাশ দিয়ে, আর জলের মধ্যে ঝুলছে খাদ্যভর্তি বঁড়শিটা।

চোখ না তুলেই মাঝেমাঝে বলছে ফ্রাঞ্জ—"সুজেল এবার বোধহয় গাঁথল !"

"তাই নাকি ফ্রাঞ্জ ?" মুহূর্তের জন্যে ক্যানভাস নামিয়ে প্রিয়তমের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফাৎনার দিকে তাকায় সুজেল।

"ন্—না," বলে ফ্রাঞ্জ; "ফাৎনাটা যেন বড্ড দুলে উঠল। আমারই ভুল।"

"শীগগিরই গাঁথবে, নরম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে সুজেল। "কিন্তু ঠিক সময়ে টান দিতে ভুলো না যেন। প্রত্যেকবার কয়েক সেকেণ্ড দেরী করে ফেল—সেই ফাঁকে পালায় মাছটা।"

"ছিপটা ধরবে নাকি, সুজেল ?"

"নিশ্চয় ফ্রাঞ্জ।"

"তাহলে তোমার ক্যানভাস নিই আমি। দেখা যাক, ছিপের চাইতে আমি ছুঁচে বেশী ওস্তাদ কিনা।"

অতঃপর কাঁপা হাতে ছিপ বাগিয়ে ধরে বসে তরুণী সুজেল এবং তার প্রিয়তম ছুঁচের কেরামতি দেখায় ক্যানভাসের বুকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে মিঠে মিঠে কথা বলে পরস্পরকে এবং ফাৎনা নড়লেই দুরুদুরু বুকে

তাকায় সেদিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীপাড়ে পাশাপাশি বসে কলকল সঙ্গীত শোনার মত সুখময় অভিজ্ঞতা কি ভোলা যায়?

দ্রুত পশ্চিমদিগন্তে ঝুলে পড়ে সূর্য। সুজেল আর ফ্রাঞ্জের সম্মিলিত নৈপুণ্য সত্ত্বেও একটা মাছও ধরা পড়েনি। মাছেদের মেজাজ নিশ্চয় সেদিন ভাল নয়, তাই মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কেটে গেল দুটি নিরীহ সরল অন্তরকে।

শূন্য বঁড়শি টেনে তুলল ফ্রাঞ্জ। সুজেল বলল—"পরের বার কপাল খুলবে আমাদের।"

"আশা করি খুলবে," জবাব দিল ফ্রাঞ্জ।

তারপর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তারা রওনা হল বাড়ীর দিকে। সামনে প্রলম্বিত জোড়া ছায়ার মতই নীরব কণ্ঠে ফুটল না আর একটি কথাও।

বার্গোমাস্টারের বাড়ী পৌঁছে দরজা খোলার আগেই ফ্রাঞ্জ ভেবে দেখল বিদায় নেওয়ার আগে সুজেলকে কিছু বলা দরকার। তাই বলল—"সুজেল, সেই 'মহাদিন' এসে পড়ল বলে।"

"হ্যাঁ, ফ্রাঞ্জ, আসছে সেদিন," দীর্ঘ পক্ষ্ম নামিয়ে জবাব দিল সুজেল

"আর পাঁচ ছ বছরের মধ্যেই—"

"গুডবাই, ফ্রাঞ্জ," বলল সুজেল।

"গুডবাই, সুজেল," বলল ফ্রাঞ্জ।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। প্রশান্তমুখে নিয়মিত পদক্ষেপে গৃহাভিমুখে রওনা হল তরুণ প্রেমিক।

সঙ্গীত বিভ্রাট ঃ

আঁদাতে হল অ্যালেগ্রো এবং অ্যালেগ্রো ভাইভেস

স্থট এবং কাসটোসের তর্কযুদ্ধের ফলে যে যে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল, আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে এল। গুরুতর ফলাফল কিছুই দেখা গেল না। সাময়িক ভাবে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কুইকোয়েনডনবাসীদের স্বভাবজাত প্রশান্তিতে কিঞ্চিৎ বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, আবার তা ধীরে ধীরে ফিরে এল পূর্বাবস্থায়!

এর মধ্যেই কিন্তু পাইপ বসানোর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শহরের প্রধান প্রধান অট্টালিকাসমূহে অক্সিহাইড্রিক গ্যাস বহন করে নিয়ে যাওয়ার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই। ফুটপাতের তলা দিয়ে প্রধান পাইপ আর তার

শাখাপ্রশাখা এগিয়ে চলেছে গুটিগুটি। কিন্তু বার্ণার এখনো বসানো হয়নি। বার্ণার তৈরী করতে নাকি যে সূক্ষ্ম কারিগরির দরকার, তার অভাব আছে এখানে। তাই এ জিনিস তৈরী হবে বিদেশে। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করছেন না ডক্টর অক্স এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী ইজিনি। শ্রমিকদের ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে দিয়ে গ্যাসমিটারের জটিল কলকব্জা তৈরী শেষ করলেন। শক্তিশালী ইলেকট্রিক কারেন্টের সংস্পর্শে এসে যে মৌলিক পদার্থ চৌবাচ্চা ভর্তি জল বিশ্লিষ্ট করে চলেছে, দিবারাত্র সেই পদার্থ রাশি রাশি ঢালতে লাগলেন জলের মধ্যে। পাইপ বসানো এখনো শেষ হয়নি বটে, কিন্তু এর মধ্যেই গ্যাস উৎপাদন শুরু করে দিয়েছেন ডক্টর। এ তথ্য শুধু আমরাই জানি। সেই কারণেই একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আর বেশী দেরী নেই। শীগগিরই ডক্টর অক্স তাঁর চমকপ্রদ আবিষ্কারের উদ্বোধন করবেন শহরের থিয়েটার হলে এবং তাজ্জব বানিয়ে দেবেন শহরবাসীদের।

কুইকোয়েনডন শহরের থিয়েটার হল দেখবার মত। অট্টালিকার ভেতর আর বাইরে সব রকম স্থাপত্যের নিদর্শনই উপস্থাপিত। বাইজানটাইন গথিক, রোমান, রেনেসাঁ—একই সঙ্গে সবকিছু। অর্ধগোলাকার দরজা, সূচালো জানালা, জলন্ত গোলাপের মত জানালা, সুবিশাল ঘণ্টা-মন্দির। এক কথায়, সব রকম নমুনাই মেলে সেই অট্টালিকায়। আধা পার্থেনন, আধা গ্র্যাণ্ড কাফে অফ প্যারিস। এ থিয়েটার গড়তে সময় লেগেছে সাতাশ বছর এবং যুগে যুগে নতুন নতুন শিল্পকলার সাথে খাপ খাওয়ানো হয়েছে স্থাপত্য অলংকরণ। বিস্ময়বিহ্বল হওয়ার মতই বিশাল সৌধ। এহেন স্থানে অক্সিহাইড্রিক গ্যাসের সঙ্গে খুব বেশী বিরোধ লাগবে না রোমান থাম আর বাইজানটাইন খিলেনের।

প্রায় সব কিছুই অভিনীত হয়েছে কুইকোয়েনডনের থিয়েটারে, বিশেষ করে মঞ্চস্থ হয়েছে অপেরা, লিরিক, কমিক। তবে সঙ্গীতের 'চালচলন' এখানে এমনই বদলে গেছে যে সঙ্গীত রচয়িতা নিজে শুনলেও তা চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

সংক্ষেপে যেহেতু তড়িঘড়ি কিছুই করা হয় না কুইকোয়েনডন শহরে, অতএব নাটকীয় উপাদানকে খাপ খাইয়ে নিতে হয় কুইকোয়েনডনবাসীদের মেজাজের সঙ্গে। সুর বাঁধতে হয় একই সুরে। নিয়মিতভাবে চারটের সময় খোলা হত থিয়েটারের দরজা, বন্ধ করা হত দশটার সময়ে। কিন্তু মধ্যবর্তী ছঘণ্টার মধ্যে একটা ছাড়া দুটো অঙ্ক কোনদিন অভিনীত হয়েছে বলে কারো জানা নেই। এ থিয়েটারে দ্রুত লয়ের সঙ্গীত মন্থর হয়ে যায়। কেন না, সেই রকম সঙ্গীত শুনতেই অভ্যস্ত শহরবাসীরা।

বিদেশ থেকে শিল্পীরা এলেও এ নিয়মের অন্যথা করেননি। মোটা পারিশ্রমিক পেয়ে গানবাজনার এহেন হাল দেখে মেজাজ খারাপও করেনি।

সেই অদ্ভুত গানবাজনা শুনে হাততালি দিয়েছে দর্শকবৃন্দ নিয়মিত ব্যবধানে। একই সাথে তালি পড়েছে প্রত্যেকের হাতে—কিন্তু অনেক পরে পরে। হাততালি দেওয়ার এই অতুলনীয় ধৈর্য দেখে প্রশংসামুখর হয়েছে সংবাদপত্র—'হল নাকি ফেটে পড়েছে ঘন ঘন করতালিতে!'

সপ্তাহে একদিন গানবাজনা অভিনয় হয় থিয়েটারে। ফলে, উৎসাহী ফ্লেমিশ জনগণ খুব বেশী উত্তেজিত হতে পারে না। অভিনেতারাও বাকী কটা দিন বসে পার্ট মুখস্থ করে। মহড়া দেয়। আর, একদিন অভিনয় দেখেই 'বাকী কটা দিন তাই ধীরে-সুস্থে হজম করে কুইকোয়েনডেনবাসীরা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অভিনয় ব্যবস্থাই চলে আসছে থিয়েটারে, এবং চলে যেতো যদি না সুট-কাসটোস ঘটনার দিন পনেরো পরে সম্পূর্ণ অভাবিত এক ঘটনার টাটকা উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠত জনগণ।

সেদিন রবিবার। অপেরার দিন। নতুন আলোক ব্যবস্থা উদ্বোধন করার কোনো আয়োজন সেদিন অবশ্য ছিল না। পাইপ হল পর্যন্ত পৌঁচেছে বটে, কিন্তু ওপরে বর্ণিত কারণে বার্ণার এখনো লাগানো হয়নি। ফলে, সারি সারি জ্বলছে মোমবাতি। নরম আলো পড়েছে অগণিত দর্শকের মুখে। তিলধারণের জায়গা নেই হলে। দরজা খোলা হয়েছিল একটার সময়ে, তিনটার সময়ে অর্ধেক ভর্তি হলো হলঘর। বাইরে দাঁড়িয়ে গেল সুদীর্ঘ 'কিউ'। বোঝা গেল, রীতিমত আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে থিয়েটার মঞ্চে।

সেদিন সকালে বার্গোমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন কাউন্সেলর—"আজ সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাচ্ছেন নাকি?"

"নিশ্চয়। সঙ্গে যাচ্ছে ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি, সুজেল, আর টাটানেমান্সন। গান শুনতে ও বড় ভালবাসে।"

"সুজেল যাচ্ছে?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে আমার ছেলে ফ্রান্তও লাইনে দাঁড়াবে।" বললেন নিকলসি।

"ছেলেটা কিন্তু বেশী উৎসাহী," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ভ্যান ট্রিকসি। "বড় মাথা-গরম! ওর ওপর আমাদের একটু নজর রাখা দরকার!"

"ও যে ভালবাসে, ভ্যান ট্রিকসি, সুন্দরী সুজেলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।"

"বিয়ে তো হবেই। আমরা যখন এ বিয়েতে রাজী হয়েছি, তখন বিয়ে ঠিকই হবে। এর বেশী আর কি চায় সে?"

"আর কিছুই চায় না, ভ্যান ট্রিকাস। কিন্তু ও যাবেই, সবার আগে গিয়ে 'কিউ' দেবে।"

"পাগল! পাগল!" বলতে বলতে বার্গোমাস্টারের মনে পড়ে গেল নিজের অতীতের কথা: "বুঝলে নিকলসি, আমরাও ভালবেসেছিলাম! আমরাও 'কিউ' দিয়েছিলাম! আর আজ! ভাল কথা। ফিওভারানটি বড় দরের শিল্পী। আজ উনি আমাদের কাছে যে হাততালি পাবেন, তা জীবনে ভুলতে পারবেন না।"

তিনহপ্তা ধরে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কুইকোয়েনডনবাসীদের চিত্ত বিনোদন করছেন ফিওভারানটি। 'হিউগুনট্স্' অপেরায় বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন ফিওভারানটি। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 'হিউগুনস্ট্স্' সৃষ্টির পর এত অভিনন্দন বুঝি আর কেউ পানান যেমন পাচ্ছেন ফিওভারানটি। প্রথম অঙ্কটা অবশ্য কুইকোয়েনডনবাসীদের রুচি অনুযায়ী মানিয়ে নিতে হয়েছে। মাসের প্রথম হপ্তার একটা পুরো সন্ধ্যা গেল শুধু প্রথম অঙ্কেই। দ্বিতীয় সপ্তাহের আর একটা পুরো সন্ধ্যা গেল গজেন্দ্রগমন ছন্দের 'আদাতে' বাজাতেই। সেদিন ফিওভারানটি অভিভূত হয়ে গেলেন বিলম্বিত লয়ের 'ঘন ঘন' করতালিতে। এবার চতুর্থ অঙ্কে আবির্ভূত হচ্ছেন ফিওভারানটি। আজ সন্ধ্যায় হলভর্তি অসাহস্রু দর্শকের সামনে শুরু হবে সেই অনুষ্ঠান। রাওল আর ভ্যালেনটাইনের সেই দ্বৈতসঙ্গীত......অহো! দুই কণ্ঠে প্রেমের সেই শ্রুতিমধুর স্তোত্র!... ক্রেসেনডোস, স্ট্রিনজেনডোস আর পাই কেসেনডোস—সব কিছুর অপূর্ব মন্থর সংমিশ্রণ শোনা যাবে আজ সন্ধ্যায়! কি মজা! কি মজা!

চারটের সময়ে হলঘর ভরে গেল। বক্স, অর্কেস্ট্রা, প্যারাকেটে তিলধারণের জায়গা রইল না। ভীড়ের মধ্যে দেখা গেল বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকাসি, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকাসি, এবং মধুর-স্বভাব টাটানেমান্সও বসে রয়েছেন সবুজ বনেট লাগিয়ে। অনতিদূরে বসে কাউন্সেলর নিকলসি, সঙ্গে ডবেলহৃদয় ফ্রাঞ্জ সহ সমগ্র পরিবার। ডক্টর কাসটোস, অ্যাডভোকেট সুট, প্রধান বিচারপতি অনোর সিমট্যাক্স, অ্যাকাডেমির প্রধান জেরোমব্রেশ এবং নগর কোতোয়াল প্রমুখ কতশত গণ্যমান্য নাগরিকের পরিবার যে হলময় বসে তার ইয়ত্তা নেই।

পর্দা না ওঠা পর্যন্ত চুপচাপ বসে কাগজ পড়া অথবা পরস্পরের সঙ্গে ফিসফাস করা কুইকোয়েনডনবাসীদের বহু শতাব্দীর রীতি। মন্থর চরণে তারা প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়ে বসে আসনে, কেউ কেউ ভীরু চোখে তাকায় গ্যালারীতে বসা স্নিগ্ধরূপ সুন্দরীদের দিকে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় প্রেক্ষাগৃহে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পর্দা ওঠার

আগেই এক অস্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দর্শকবৃন্দ! যাঁদের কখনো অস্থির হতে দেখা যায়নি, তাঁরাও নিদারুণ অস্থির। অসাধারণ বেগে ফটাফট শব্দে সঞ্চালিত হচ্ছে মহিলাদের হস্তধৃত হাতপাখা। যেন রীতিমত উত্তেজক কোনো আবহাওয়া আক্রমণ করেছে প্রত্যেকের বুককে, প্রচুর নিঃশ্বেস নিচ্ছে প্রত্যেকে। অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কারো কারো দৃষ্টি। চোখ তো নয়, যেন জোড়া জোড়া মোমবাতি—এমন আলো সে চোখে। মোমবাতিগুলোও আগের চাইতে অনেক উজ্জ্বল আলো বিতরণ করছে গোটা হলে। সবিস্ময়ে সবাই গুনে দেখলে, ঘরের মোমবাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি, অথচ বৃদ্ধি পেয়েছে উজ্জ্বলতা! আহা রে, ডক্টর অক্সের এক্সপেরিমেণ্টটা যদি একবার শুরু করা যেত! কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা শুরুই হল না।

অবশেষে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল অর্কেষ্ট্রার শিল্পীবৃন্দ। প্রথম বেহালা থেকে 'লা' ঝঙ্কারে সচকিত হল অন্যান্য বাদকবৃন্দ। তারের বাজনা, ফুঁ-দেওয়া বাজনা, ড্রাম ইত্যাদি সবই বাঁধা রয়েছে একসুরে। ঘণ্টা বাজলেই হাতের কাঠি নাড়তে শুরু করবেন অর্কেষ্ট্রা লীডার।

ঘণ্টা বাজল। শুরু হল চতুর্থ অঙ্ক। অ্যালেগ্রো অ্যাপাসেনেটোর সেই কামনা-বাসনা জাগানো উন্মাদ যন্ত্রসঙ্গীত শুনে স্রষ্টা নিজেও বিহ্বল হয়ে যেতেন। কুইকোয়েনডনবাসীরা কিন্তু রসিয়ে উপভোগ করতে থাকেন প্রাণমাতানো সেই সঙ্গীত নির্ঝর।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই লীডার দেখলেন, বাদকরা আর তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যদিও তারা খুবই বাধ্য, শান্ত—কিন্তু সেদিন অশেষ চেষ্টা করার পরেও কাউকে বাগে আনতে পারলেন না। ফু-দেওয়া বাদকরা এমন অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাজাতে আরম্ভ করলে যে তাদের সংযত করার জন্যে বাধ্য হয়ে পেছন থেকে হাত টেনে ধরতে হল। তা না বলে, তাদের বাজনা অচিরেই ডুবে যাবে এবং সঙ্গীতেরও দফারফা। কিন্তু প্রত্যেকেই যেন আত্মসংযম হারিয়ে ফেললো সেই সন্ধ্যায়।

ইতিমধ্যে গলা ছেড়ে গাইতে আরম্ভ করে দিয়েছে ভ্যালেনটাইন— কিন্তু বড় দ্রুতছন্দে।

মঞ্চে আবির্ভূত হল রাওল। তারও চলাফেরা অস্বাভাবিক দ্রুত। কুইকোয়েনডনবাসীদের হিসেব অনুযায়ী যে অংশ গাইতে সাঁইত্রিশ মিনিট লাগা দরকার, সেইটাই শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে।

সেণ্ট ব্রিশ, নেভাস, ক্যাভানিস আর ক্যাথোলিক প্রধানরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আবির্ভূত হলো দৃশ্যে। পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে এই সময়ে জাঁকজমক-

পূর্ণ অ্যালেগ্রো পমপোসো সঙ্গীত স্বরলিপির মধ্যে রেখেছিলেন সঙ্গীত রচয়িতা। অর্কেষ্ট্রা এবং অভিনেতার দ্রুতছন্দের অ্যালেগ্রোয় মনপ্রাণ ঢেলে দিলে বটে, কিন্তু পমপোসোর ধার দিয়েও গেল না। দেখতে দেখতে এমন একটা মুহূর্ত এল যে অ্যালেগ্রো নিয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারল না বাদকবৃন্দ। প্রচণ্ড আবেগ ঝঙ্কৃত মাতাল-করা সুরে সাঁভারও আর চেষ্টা করলেন না তাদের ধরে রাখতে। পাবলিকও আপত্তি জানালে না। পক্ষান্তরে, শ্রোতারা নিজেরাও যেন গা ঢেলে দিলে সুরের উন্মাদনায়। মনে হল, এ সুর উঠে আসছে তাদের অন্তঃস্থল থেকে, এ আবেগ যেন তাদের আত্মার, এ চাঞ্চল্য অস্থিরতা যেন তাদের নিজেদেরই অনুপরমাণুর।

তুফান গতিতে এগিয়ে চলে নাটক। আবেগমথিত একটির পর একটি দৃশ্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। বিশেষ একটি মুহূর্তে মঞ্চস্থ অভিনেতারা কোষমুক্ত করে তরবারি এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্কেষ্ট্রা বেজে ওঠে ভয়াল ভয়ংকর অ্যালেগ্রো ফিউরিওয়ো ছন্দে। ক্রোধে চীৎকার করে ওঠে বাদকবৃন্দ।

ঠিক তখনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে দর্শকমণ্ডলী। উত্তেজিত প্রত্যেকেই —বক্সে, গ্যালারীতে, প্যারাকেটে সর্বত্র উদগ্র উত্তেজনার বিপুল বন্যায় অস্থির সকলে। ভাবগতিক দেখে মনে হল এবার বুঝি মঞ্চেই ধাওয়া করবে দর্শকরা। সবার সামনে এসে দাঁড়ায় বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি। অদম্য সংকল্পে কঠিন প্রত্যেকের মুখ। নাটকের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিকেশ করতে হবে হিউগুনটস্‌কে। মুহুর্মুহু করতালিতে, তুমুল হর্ষধ্বনিতে কেঁপে ওঠে কড়িকাঠ! তপ্ত হাতে বনেট আঁকড়ে ধরে টাটানেমান্স। আচম্বিতে প্রচণ্ড দ্যুতি ছড়িয়ে আরো উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে মোমবাতির সারি।

ধীরে ধীরে পর্দা তুলে ধরার কথা রাওলের। কিন্তু নিদারুণ আবেগে এক টানে পর্দা ছিঁড়ে সম্মুখীন হয় সে ভ্যালেনটাইনের।

শুরু হল দ্বৈত সঙ্গীত, বেজে ওঠে অ্যালেগ্রো ভাইভেসের চঞ্চল্য ঐক্যতান। তারপরেই বহু প্রতীক্ষিত সুনিবিড় মুহূর্ত। প্রেমকোমল স্নিগ্ধ আঁদাতে অ্যামোরোসো উধাও হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই—সে জায়গায় বেজে ওঠে সত্যিকারের ভয়াল ভাইভেস ফিউরিয়োসো। রাওল আর সংযত রাখতে পারে না নিজেকে, পারে না ভ্যালেনটাইন। আগুন জ্বলে ওঠে পরস্পরের ধমনীতে।

সবশেষে বেজে ওঠে প্রাণরসে টলমল দ্রুত ছন্দের অ্যালেগ্রো কনমোটো। তারপরেই দুরন্ত বন্য প্রেসটিসিমো। যেন উল্কাগতিতে ধেয়ে চলে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে ভ্যালেনটাইন। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে রাওল।

এসেছে সেই সময়। সত্যি সত্যিই মাতাল হয়ে গিয়ে আর এগুতে পারল না অর্কেস্ট্রা। লীডারের যষ্টি ভেঙে টুটুকরো হয় ছিটকে পড়ে। ছিঁড়ে যায় বেহালার তার, মুচড়ে যায় ঘাড়। চুরমার হয়ে যায় কত বাদ্যযন্ত্র। ফুঁ দিতে গিয়ে একটা রিডই গিলে ফেলে একজন ক্ল্যারিনেট!

আর দর্শকবৃন্দ! হাঁপাতে হাঁপাতে ঘেমে নেয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে সবাই। আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে মুখ—সে আগুন যেন যাদুমন্ত্রবলে জ্বলে উঠেছে প্রত্যেকের দেহের ভেতর। জড়াজড়ি করে, ধাক্কা মেরে প্রত্যেকেই চায় সবার আগে বেরুতে। পুরুষরা ফেলে যায় টুপী, মেয়েরা ম্যান্টল! করিডরে পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে, দরজায় পা মাড়িয়ে, ঝগড়া করে, হাতাহাতি করে বেরিয়ে আসে বাইরে! তখন আর কর্তৃপক্ষ বলে কেউ নেই, বার্গোমাস্টারের অস্তিত্ব নেই। নারকীয় উন্মত্ততায় সমান হয়ে গেছে সকলে।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার কয়েক মুহূর্ত পরে আবার ফিরে আসে স্বভাবজাত প্রশান্তি। বাদ যায় না কেউই। শান্তভাবে ফিরে যায় যে যার বাড়ীতে। মনের মধ্যে থেকে যায় শুধু এক বিমূঢ় স্মৃতি—এক অসম্ভব অভিজ্ঞতা!

আগে হিউগুনটসের চতুর্থ অঙ্ক শেষ হতে সময় লাগত ছ-ঘণ্টা। কিন্তু সে-রাতে তা শুরু হল সাড়ে চারটের, শেষ হল পাঁচটা বাজার বারো মিনিট আগে।

মাত্র আঠারো মিনিটে ঘটে গেল এতগুলি দৃশ্য!

প্রাচীন, পবিত্র, গম্ভীর জার্মান ওয়াল্ট্‌স্‌ সঙ্গীত ঘূর্ণীঝড়ে পর্যবসিত হল

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে প্রথা মত প্রশান্তি ফিরে এল দর্শকবৃন্দের অন্তরে, ফিরে এল তুষ্ণীভাব। ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করল যে যার গৃহে। রইল শুধু একটা অপস্রিয়মান হতবুদ্ধিভাব। ভয়ানক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে প্রত্যেকে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গেছে শতাব্দী সঞ্চিত স্থৈর্য, ধৈর্য, ঢিলেমি। উদ্দাম উল্লাসের পর প্রত্যেকেই অবসন্ন, প্রাণশক্তির মাত্রাধিক অপচয়ের পর প্রত্যেকেই ক্লান্ত। সুতরাং শয্যাগ্রহণ করতে না করতে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিপর্যস্ত কুইকোয়েনডনবাসীরা।

পরের দিন সকালে প্রত্যেকের মনে পড়ে গেল গতরাত্রের ঘটনা। হট্টগোলে কেউ হারিয়েছে টুপী; ধাক্কাধাক্কিতে কেউ ছিঁড়েছে কোট; একজন

ফেলে এসেছে হালফ্যাশানি জুতো আর একজন একটা দামী ম্যান্টল। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ডের সেই ভয়াবহ অবিশ্বাস্য স্মৃতি ফিরে এসে হোমরাচোমরা প্রত্যেকেরই লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়ার উপক্রম হল। ছিঃ, ছিঃ! একি অন্যায় উত্তেজনা! যেন সুরাপানে মত্ত হয়ে যবনদের উৎকট তান্ত্রিক উৎসবে নায়কনায়িকার ভূমিকায় অজ্ঞানের মত অভিনয় করে এল সকলে। এ নিয়ে কেউ আর কথা বলল না, ভাবতেও চাইল না। তবে শহরের একজন ব্যক্তিরই সব চাইতে বেশী অক্কেল গুড়ুম হল। তিনি আমাদের মহাবিচক্ষণ শহর-প্রধান বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি।

পরের দিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি মাথায় হাত দিয়ে পরচুলার সন্ধান পেলেন না। আনাচে-কানাচে কোথাও খুঁজতে বাকী রাখল না লোচ, কিন্তু বৃথাই। রণক্ষেত্রেই রয়ে গেছে পরচুলা। শহরের নকীব জীনমিস্ট্রলকে দিয়ে ঘোষণা করে অবশ্য তা উদ্ধার করা যায়, কিন্তু না, সেটা আরো বিশ্রী হবে। কুইকোয়েনডনের ফার্ষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হবার সম্মান অর্জন করার পর এ ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে পরচুলা উদ্ধার করার চাইতে তা গোল্লায় যাওয়াই শ্রেয়।

চাদর মুড়ি দিয়ে এই সব কথাই চিন্তা করছিলেন ভ্যান ট্রিকসি। সর্বাঙ্গ তাঁর থেঁতলে গেছে, মাথার মধ্যে সীসের মত গুরুভার, জিব হয়েছে পুরু, আর বুকের মধ্যে যেন জ্বলে যাচ্ছে। উঠে বসার কোনো সদিচ্ছাই তাঁর ছিল না। ইচ্ছে যাচ্ছে শুধু শুয়ে শুয়ে ভাবতে। গত চল্লিশ বছরে এরকম ভাবে সক্রিয় হয়নি তাঁর মগজ; আজ সকালের মত এত তৎপরতা, এত চিন্তাশক্তি যে তাঁর মস্তিষ্কে সম্ভব, তা যেন ভাবাও যায় না। দুর্বোধ্য দুঃস্বপ্নের মত গত রাতের অনুষ্ঠানের সব কটা দুর্ঘটনা একে একে ভাবতে লাগলেন মহাজ্ঞানী ভ্যান ট্রিকসি। ডক্টর অক্সের সম্বর্ধনার ঠিক পূর্বের ঘটনার সঙ্গে গতরাতের সব কটা ঘটনার একটা যোগসূত্রও বার করে ফেললেন। এই দুই ক্ষেত্রে শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের শিরায় উপশিরায় এই অত্যাশ্চর্য সংক্রমণের আসল কারণটা কি, তা আবিষ্কার করতে লাগলেন মাথা খাটিয়ে।

"হচ্ছে কি আজকাল?" নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন ভ্যান ট্রিকসি। "এ কোন্ উন্মাদ অশরীরীর উপদ্রব আরম্ভ হল এ দেশে? শান্ত শহর কুইকোয়েনডনে কি শেষে ভূতের ভর হল? না আমরা সবাই পাগল হতে বসেছি, গোটা শহরটাকেই পেল্লায় পাগলা গারদ বানাবার তালে আছি? কাল রাতে আমরা সবাই ছিলাম থিয়েটারে; কাউন্সেলর, জজসাহেব, অ্যাডভোকেট, ডাক্তার, স্কুলমাস্টার—কেউ বাকি ছিল না। আমার স্মরণশক্তি যদি এখনও

ঠিক থাকে, তাহলে এতগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রত্যেকেই একই ভয়ংকর ব্যাধিতে ভুগেছে, একই রকম বাড়াবাড়ি করেছে, একই বিভ্রাটের অংশীদার হয়েছে! তাছাড়া ছিল কি ঐ নারকীয় সংগীতে? অবর্ণনীয়! বলে বোঝানো যায় না! অথচ সুরাপানের মতই সংগীতের উন্মাদনা আমাকে মাতাল করেছে —যা কখনো কুইকোয়েনডনে ঘটতে দেখা যায় নি! এদেশের হাজার মাদক দ্রব্য খেলেও এমন অবস্থা হয় না। তা ছাড়া কাল আমি এমন কি আর খেয়েছিলাম। অধিকন্তু এই শ্লাইস বাছুরের মাংস, কয়েক চামচ চিনি মিশানো শাক, ডিম, একটু বিয়ার আর জল। এতে তো মাথা গরম হওয়া উচিত নয়! উঁহু! এ ছাড়া এমন কিছু আছে, এমন একটা যাচ্ছেতাই রহস্য আছে, যা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে তা জানতেই হবে। শহরের প্রধান হিসেবে তদন্ত আমাকে করতেই হবে। নাগরিকদের কেলেংকারীর সব দায়িত্ব তো আমারই!"

সুতরাং তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিল মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল! কিন্তু বৃথাই! কোনো লাভই হল না। ঘটনা যেমন স্পষ্ট, কারণ তেমনি অস্পষ্ট! ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারবুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল বিদিকিচ্ছিরি এই কাণ্ডের কারণ নির্ণয় করতে। তাছাড়া, প্রশান্তির পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল নগরবাসীদের মনে এবং প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল বিস্মৃতি। দুদিনেই সবাই ভুলে গেল থিয়েটারের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার তিক্ত স্মৃতি। খবরের কাগজ এ ব্যাপার নিয়ে আর বাজার গরম করা সমীচীন বোধ করল না। 'কুইকোয়েনডন মেমোরিয়ালে' অনুষ্ঠানের যে বিবরণী ছাপা হল, তার মধ্যে দর্শকদের মত্ততার কোন উল্লেখও রইল না।

স্বভাবজাত ঢিলেমি কুইকোয়েনডনবাসীদের আচার আচরণে ফিরে এলেও, লক্ষ্য করা গেল কোথায় যেন কিছু বিগড়েছে। আগের মত বাহ্যিক ভাবে ফ্লেমিস থাকলেও, তলায় তলায় একটু একটু করে পালটে যেতে লাগল সবার চরিত্র আর মেজাজ। ডক্টর ডোমিনিক কাসটোসের ভাষায়, "স্নায়ুর উন্মেষ ঘটতে লাগল নাগরিকদের মধ্যে।"

এবার আসুন নিজেদের মধ্যে রহস্যটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। বিচিত্র এই পরিবর্তন বিশেষ কয়েকটা অবস্থায় যে দেখা যেতে লাগল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময়ে অথবা ভার নদীর তীরে বা পার্কে ময়দানে হাওয়া খাওয়ার সময়ে স্বভাবচরিত্র মোটেই পালটালো না কুইকোয়েনডনবাসীদের—আগের মতই রইল নিরুত্তাপ, পদ্ধতিমাফিক। একই অবস্থা ঘটল বাড়ীর মধ্যেও। কেউ ব্যস্ত রইল হাতের কাজে, কেউ মাথার কাজে, কিন্তু কারো দ্বারাই কোন শিল্পকর্ম বা চিন্তাকর্ম সম্পন্ন হল না। ঘরোয়া

জীবনের নিস্পন্দ নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত স্রোতে কোনো ব্যাঘাত ঘটল না। ঠিক আগের মতই। ঝগড়া নেই, ঘরকন্না নিয়ে খিটিমিটি নেই, হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনি বৃদ্ধি নেই, মগজেরও কোনো উত্তেজনা নেই। সেকালের মতই নাড়ীর গড়পড়তা গতি রইল মিনিটে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে।

পারিবারিক পরিবেশে ঘরের মধ্যে কুইকোয়েনডনবাসীরা এতটুকু না পাল্টালেও আশ্চর্যের কথা, সামাজিক পরিবেশে, পাঁচজনের মেলামেশার ক্ষেত্রে বিপুল রূপান্তর ঘটতে দেখা গেল প্রত্যেকের স্বভাবচরিত্রে। অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নেই। ব্যাখ্যার অতীত নিগূঢ় সেই রহস্য। তীক্ষ্ণধী ফিজিওলজিষ্টরাও বোধ করি এমন ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। যেখানে পাঁচজনের মেলামেশা, সেখানেই বর্ণনাতীত সম্পর্ক প্রকাশ পেল পরস্পরের মধ্যে।

নগরপাল প্যাসফ তো বলেই ফেললেন, জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোন অট্টালিকায় সবাই মিলিত হলেই সবাই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, আমূল পাল্টে যাচ্ছে। টাউন হলে, অ্যাকাডেমির মুক্তাঙ্গনে, কাউন্সিল অধিবেশনে এবং বহু সম্মিলনীতে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় অসংযমী হয়ে উঠল উপস্থিত জনগণ। একঘণ্টাও পেরোয় না, তার আগেই পারস্পরিক সম্পর্কের এমন অবনতি ঘটতে লাগল যে কহতব্য নয়। দুঘণ্টার মধ্যেই আলোচনা পর্যবসিত হয় ক্রুদ্ধ বিবাদে। মাথা গরম হয়ে যায় এবং প্রত্যেকেই কথা ছেড়ে হাতের ব্যবহার শুরু করে দেয়। এমন কি গির্জেতেও ঈশ্বরবাক্য শোনাতে শোনাতে ধৈর্য হারিয়ে মঞ্চময় ছোটাছুটি করতে লাগলেন পাদরী সাহেব। বক্তৃতায় এমন কঠোরতা দেখালেন যা কস্মিনকালেও ছিল না তাঁর কথাবার্তায়। শেষকালে অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে কাসটোস স্যুট-এর কেলেঙ্কারীও তুচ্ছ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ হয়ত এ নিয়ে মাথা ঘামাত, কিন্তু বাড়ী ফিরেই তো আবার সবাই যেমন ছিল, তেমনি হয়ে যায়, ভুলে যায় কিছুক্ষণ আগেকার ঘটনা। অপমানাহত হয়েও কিছুই আর মনে থাকে না বাড়ী ফেরার পর। সুতরাং ঔদাসীন্য ঘুচল না কর্তৃপক্ষের।

ভুক্তভোগীরা কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনো সমাধান করতে চেষ্টা করল না, করবার ক্ষমতা ছিল না বলে। তাদের ভেতরে যে কি ক্রিয়া চলছে, তা তারা জানতেও পারল না। একজনই শুধু এ ব্যাপারে একটা সুচিন্তিত মন্তব্য করলেন। তিরিশ বছর ধরে যাঁর আপিস তালাবদ্ধ করে দেওয়ার কথা ভেবে আসছে কাউন্সিল, ইনি সেই মাইকেল প্যাসফ। উনিই বললেন, এই যে উত্তেজনা, এ তো এখনো বাড়ী বাড়ী দেখা যায়নি, দেখা যাচ্ছে শুধু জনগণ

যেখানে জড়ো হচ্ছে সেইসব জায়গায়। কিন্তু যদি এই মড়ক (ঠিক এই শব্দটাই বলেছিলেন ভদ্রলোক) প্রত্যেকের বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে, এবং রাস্তায় নেমে পড়ে, তাহলে পরিণামটা কি হবে তা কল্পনাতীত। তখন তো আর কেউ অপমানকে ভুলে যাবে না, শান্তিও আর থাকবে না; প্রলাপের বিরতিও উধাও হবে। তখন? এক স্থায়ী প্রদাহে ছারখার হয়ে যাবে কুইকোয়েনডন শহর, মানুষে মানুষে লেগে যাবে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব।

আঁৎকে উঠে প্যাসফ নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন—"তখন কি হবে? কিভাবে গ্রেপ্তার করা হবে হিংসা পাগল বর্বরদের? খুঁচিয়ে গরম করা মেজাজকেই বা বাগে আনা যাবে কি করে? তখন আর আমাকে আরামের চাকরী করতে হবে না। কাউন্সিল হয় আমার মাইনে ডবল করে দেবে আর নইলে জনগণের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্যেই নিজেকেই নিজে গ্রেপ্তার করতে হবে।"

আতংকটা যে অমূলক নয়, তা দুদিনেই টের পাওয়া গেল। এক্সচেঞ্জ, থিয়েটার, চার্চ, টাউনহল, অ্যাকাডেমি, বাজার থেকে সংক্রমণ এবার ঢুকে পড়ল গেরস্ত বাড়ীতে এবং এই ভয়ংকর ঘটনা ঘটল হিউগুনটস্-এর ভয়াবহ অনুষ্ঠানের পনেরো দিনের মধ্যেই।

প্রথম লক্ষণ দেখা গেল ব্যাংকার কোলার্টের বাড়ীতে।

কোলার্ট বিলক্ষণ ধনবান। সুতরাং শহরের নামকরা লোকদের নাচের আসরে আমন্ত্রণ করলেন নিজ প্রাসাদে।

সবাই জানেন, ফ্লেমিস নাচগানের পার্টিতে হৈহল্লোড় বড় একটা থাকে না। পবিত্র প্রশান্তি বিরাজ করে সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। বিয়ার আর সিরাপই সেখানকার প্রধান পেয়। আলোচনা হয় আবহাওয়া, শস্য, ফুলের যত্ন, বিশেষ করে টিউলিপ নিয়ে। নাচ হয় অত্যন্ত মন্থর তালে। ঢিমেতালে গানের সঙ্গে স্বল্পপদসঞ্চারী ধীর নৃত্য। মাঝে মাঝে ওয়াল্টস্। তাও জার্মান ওয়াল্টস্। যে নাচে প্রতি মিনিটে মাত্র দেড়বার ঘুরতে হয়। হাত যতখানি বিস্তার করা সম্ভব, ততখানি ছড়িয়ে ধরে থাকতে হয় সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে। এই হোল কুইকোয়েনডন শহরে বলড্যান্স ব্যবস্থা।

শান্তিপূর্ণ এই ধরনের সম্মেলনে বহু তরুণতরুণী মৃদুমধুর অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছে, কিন্তু কদাপি কুপ্রকৃতির কোনো বিস্ফোরণ ঘটেনি কারো অন্তরে। তা সত্ত্বেও কেন সে-রাতে ব্যাংকারের গৃহে সিরাপ রূপান্তরিত হয়ে গেল শিরায়-আগুন-জ্বালানো মদিরায়, টগবগে শ্যাম্পেনে এবং স্ফুলিঙ্গময় মিশ্রিত

সুরায়? কেন রাত অর্ধেক এগোতেই রহস্যজনক এক মত্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন সম্মানীয় অতিথিরা? কেন মন্থর নৃত্য minuet পরিণত হল খেমটা নাচ জিগ-এ? কেন তাল লয় বৃদ্ধি পেল অর্কেস্ট্রার? কেন মোমবাতিগুলো, ঠিক থিয়েটারের দৃশ্যের মতই হু-হু করে জ্বলে উঠল অবিশ্বাস্য উজ্জ্বলতা নিয়ে? এ কোন্ ইলেকট্রিক কারেন্ট আক্রমণ করল ব্যাংকারের ড্রইংরুম? নাচতে নাচতে যুগল-নাচিয়েদের একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়াটা কি করে সম্ভব হল? কেন তারা থরথর উত্তেজনায় আবেগে কামনায় বাসনায় মুচড়ে ধরল পরস্পরের হাত। যে গ্রাম্যগীতি, গোষ্ঠগাথা এতকাল গম্ভীর, মহান, গৌরবময়, নিখুত ছিল, তা হঠাৎ এলোমেলো পদবিক্ষেপের উদ্দাম কোয়াড্রিল নৃত্যে পর্যবসিত হল কেন?

হায় রে! কোন্ ইডিপাস উত্তর দেবে এই প্রহেলিকার? নগরপাল প্যাসফ স্বয়ং হাজির ছিলেন সে-রাতের পার্টিতে। প্রলয়ংকর তুফান যে আসছে, তা তিনি স্পষ্ট টের পেলেন বটে কিন্তু তিনি নিজেও এড়িয়ে যেতে পারলেন না, এড়াতে পারলেন না। সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলেন অদ্ভুত এক মাদকতা সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে। বৃদ্ধি পেল তাঁর দেহের শক্তি, মনের আবেগ টানটান হয়ে উঠল প্রতিটি স্নায়ু। বেশ কয়েকবার দেখা গেল মিষ্টান্ন সম্ভারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গোগ্রাসে থালাথালা মিষ্টি সাবাড় করছেন নগরপাল প্যাসফ—যেন অনেকদিন পেটভরে খাওয়া জোটেনি তাঁর।

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল বলড্যান্সের প্রাণচাঞ্চল্য। সবারই বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘ গুঞ্জন। নাচল সবাই নাচের মত নাচ। ক্রমবর্ধমান উদ্দামতায় অস্থির হল পা। লাল হয়ে গেল মুখ। কার্বাঙ্কলের মত জ্বলতে লাগল চোখ। উচ্চতম পর্দায় পৌঁছোলো প্রত্যেকের স্নায়ুবিপর্যয়!

এর পরেই বজ্রগর্জনের মত শুরু হল অর্কেস্ট্রা—ওয়াল্টস্ আরম্ভ হয়েছে! দ্য ফ্রিশুটার্স! আহা! এ তো ওয়াল্টস্ নয়—এ যে ঘূর্ণীঝড়। দুরন্ত ঘুরপাক, অকল্পনীয় আবর্তন! তার পরেই শুরু হল দ্রুতগামী গ্যালপ নৃত্য—নরক গুলজারের গ্যালপ নৃত্য! ঘণ্টাখানেক ধরে চলল এই নাচ—কেউ রুখতে পারল না, প্রত্যেকেই নাচের ঘূর্ণীপাকে ঘুরপাক খেল, ঘুরতে ঘুরতে হল পেরিয়ে গেল, ড্রইংরুম ছাড়িয়ে গেল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, গেল মদ্য রাখবার চোরাকুঠরীতে অথবা ছাদের চিলেকোঠায়; সব বয়সের, সব ওজনের, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমস্ত অতিথিই যোগ দিল এই দুঃস্বপ্ন-নৃত্যে। ব্যাংকার কোলার্ট, কাউন্সেলরবৃন্দ, ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ, প্রধান বিচারপতি, নিকলসি, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি, বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি এবং নগরপাল প্যাসফ—কেউ বাদ রইলেন

না। নগরপাল তো পরে মনেই করতে পারলেন না ভয়ঙ্কর সেই রাতে কে হয়েছিল তাঁর নৃত্য সঙ্গিনী।

কিন্তু আর একজন ভুললেন না! তারপর থেকেই তাঁর বহু স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন নগরপাল প্যাসফ। দম আটকানো আলিঙ্গনে তাঁকে বেঁধে রেখে দিয়েছেন নগরপাল প্যাসফ! এবং এই 'আর একজন' হলেন—মধুর স্বভাব টাটানেমাস!

ডক্টর অক্স এবং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইজিনি কিছু বলছেন

"কি খবর, ইজিনি ?"

"সমস্ত তৈরী, স্যার। পাইপ বসানো শেষ হয়েছে।"

"এবার! এবার আমরা এক্সপেরিমেণ্ট করব ব্যাপক আকারে—গোটা শহরের লোকজনের ওপর!"

মড়ক শহর আক্রমণ করেছে এবং তার পরিণতি

পরবর্তী কয়েকমাসে অবস্থার উন্নতি দূরে থাকুক, আরো অবনতি ঘটল। রহস্যময় অশুভ শক্তি স্তিমিত তো হলই না, বরং ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। গেরস্ত বাড়ী থেকে মহামারী নেমে এল পথে ঘাটে। শহর কুইকোয়েনডনকে তখন চেনে কার সাধ্য!

এবার আরও অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। এতদিন এ জিনিস ঘটতে দেখা যায়নি। এবার কেবল জীবজগৎ নয়, উদ্ভিদ জগতের ওপরেও এসে পড়ল সেই রহস্যনিবিড় শক্তির প্রভাব।

যেমন চিরকাল হয়ে আসছে, সেইভাবে মহামারী মাত্রই নিজস্ব পদ্ধতি মেনে চলে। মানুষের ওপর যারা হানা দেয়, তারা রেহাই দেয় ইতর প্রাণীদের। আর যারা জন্তুজানোয়ারের ওপর চড়াও হয়, তারা ছেড়ে দেয় গাছপালাদের। ঘোড়ার কখনো বসন্ত হয় না, মানুষের হয় না পশু প্লেগ, আলুর পচনে আক্রান্ত হয় না ভেড়ার পাল। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতির সব বিধানই যেন উল্টে গেল। কেবল মাত্র শহরবাসীদের চরিত্র, মেজাজ আর চিন্তাধারাই পাল্টালো না, গরু ঘোড়া কুকুর বেড়াল গাধা ছাগলের মত গৃহপালিত পশুরাও আক্রান্ত হল

মহামারীর অমোঘ প্রভাবে। পাল্টে গেল প্রত্যেকের স্বভাবজাত ভারসাম্য। গাছগুলো শুদ্ধ একই ধরনের অদ্ভুত সংক্রমণে ভিন্নরূপ ধারণ করল।

বাগানে, পার্কে, ময়দানে—সর্বত্র ভারী আশ্চর্য কতকগুলো লক্ষণ দেখা গেল। পরনির্ভরতা বৃদ্ধি পেল পরভোজী গাছের—ঠেলে উঠতে লাগল দ্রুতবেগে। অসম্ভব বৃদ্ধি পেল ঝুঁটিগাছের ঝুঁটি। আগাছা হল গাছ। বীজ বপন করতে না করতেই সবুজ মাথা তুলিয়ে উঠে এল শস্যচারা এবং অনতি-বিলম্বে ছাড়িয়ে গেল তাদের বিধিনির্দিষ্ট উচ্চতা। কয়েক ফুট লম্বা হয়ে গেল অ্যাসপারাগাস। তরমুজের মত ইয়াবড় হয়ে উঠল ওলকপি। আর তরমুজ হল লাউয়ের মত বিশাল। লাউ হল কুমড়োর মত। আর কুমড়ো হল গির্জের বেলফ্রি ঘণ্টার মত পেল্লায়। মেপে দেখা গেল এক-একটার ব্যাস প্রায় ন'ফুট যা বেলফ্রি ঘণ্টার মাপ! ফুলকপি হল ঝোপঝাড় আর ব্যাঙের ছাতা হল আসল ছাতা।

ফলেরাও পেছিয়ে রইল না। এক-একটা জামফল খাওয়ার জন্য দরকার হল দু'দুটো লোকের এবং চারজনে খেয়ে শেষ করল একটা নাশপাতি।

ব্যতিক্রম ঘটল না ফুলের ক্ষেত্রেও। প্রকাণ্ড আকারের ভায়োলেট সৌরভে ম ম করতে লাগল আকাশ বাতাস। চোখ ধাঁধিয়ে গেল সুবিশাল গোলাপের উজ্জ্বলতম রঙের বাহারে। কয়েকদিনের মধ্যেই অভেদ্য কপ্‌স্ সৃষ্টি করল লিলি। বকচঞ্চু, ডেজি, ডালিয়া, রডোডেনড্রনে ছেয়ে গেল বাগানের পথ—ঘেঁসাঘেঁসিতে যায়-যায় অবস্থা হল প্রত্যেকের। আর টিউলিপ! অহো! ফ্লেমিসদের অতিপ্রিয় লিলিসদৃশ পুষ্পের সেই বাড়-বাড়ন্ত দেখলে না জানি কি খুশীই হত টিউলিপ-প্রেমিকরা! ভ্যান বিসটন একদিন নিজের বাগানে একটা অতিকায় টিউলিপা জেসনোরিয়ানা দেখে মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন। বিশাল আকারের সেই দৈত্য-পুষ্পের কাপটা এত বড় যে রবিন্ পাখীর একটা গোটা পরিবারই মহাআয়েশে বাসা নিয়ে ফেলেছিল তার মধ্যে।

গোটা শহর ভেঙে পড়ল বিচিত্র ফুল সমারোহ দেখতে এবং সেইদিনই নতুন নাম হল ফুলটার—টিউলিপা কুইকোয়েনডনিয়া।

কিন্তু, হায় রে! গাছ, ফুল, ফল দেখতে দেখতে অবিশ্বাস্য আকার ধারণ করল বটে; শাকসব্জী মহাকায় রূপ পরিগ্রহ করল বটে; তাদের রঙ আর সৌরভের চমৎকারিত্ব নাক আর চোখকে মাতাল করে তুলল বটে—কিন্তু সাময়িক ভাবে! দেখতে দেখতে বেড়ে উঠে দেখতে দেখতে ঝরে গেল সব। যে বাতাস গ্রহণ করে এত বাড় সেই বাতাসই দ্রুত নিঃশেষিত করে দিলে তাদের। তাই তারা অচিরেই মরে গেল, বিবর্ণ হয়ে গেল, ঝরে গেল।

শীগগিরই একই ব্যাপার ঘটতে দেখা গেল গৃহপালিত পশুদের ক্ষেত্রেও বাড়ীর কুকুর আর খোঁয়াড়ের শুওর, খাঁচার ক্যানারী আর উঠোনের মুরগী—কেউই রেহাই পেল না! বলা বাহুল্য, অন্য সময়ে এরা ছিল এদের মনিবদের মতই ঢিমেতালের, নির্জীব প্রকৃতির। কোনরকমে দিনযাপন করত কুকুর আর বেড়াল। কোনদিন আনন্দের ল্যাজ নাড়া কি জিঘাংসার দাঁত-খিঁচোনো জাতীয় ব্যাপারে তাদের উৎসাহ দেখা যায়নি। ব্রোঞ্জে তৈরী ল্যাজের পক্ষে যতখানি নড়া সম্ভব, ওদের ল্যাজও নড়ত ঠিক ততখানি। স্মরণাতীতকাল থেকে কুকুর-বেড়ালের আঁচড়-কামড় জিনিসটা দেশ থেকে লোপ পেয়েছিল।

কিন্তু এই ক'মাসের মধ্যে একি বিপুল পরিবর্তনের ঢেউ এল দেশে! নগণ্যতম দু'একটা নমুনা এখানে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব আমরা। দাঁত দেখাতে শুরু করল কুকুর বেড়াল। দু'চারটেকে মারাও হল। এই প্রথম দেখা গেল দাঁত বার করে কুইকোয়েনডনের রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একটা ঘোড়া। সঙ্গী ষাঁড়কে শিংয়ের গুঁতো মেরে শুইয়ে দিলে নিরীহ একটা ষাঁড়। কশাইয়ের ছুরি দেখে দেহমধ্যস্থ কাটলেট রক্ষা করার জন্যে বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়াল একটা ভেড়া—বিশ্বাস করুন, ভেড়া ছাড়া সে আর কিছুই নয়, অথচ......!

কুইকোয়েনডনের রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা সৃষ্টির জন্যে বাধ্য হয়ে বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসিকে নতুন নতুন পুলিশী কানুন সৃষ্টি করতে হল। কানুনগুলো অবশ্য ক্ষ্যাপা কুকুর বেড়াল গরু ভেড়া ঘোড়া সম্পর্কিত।

কিন্তু, হায় রে! জন্তুজানোয়ার ক্ষিপ্ত তো হলই, মানুষেরাও বাদ গেল না। বিষের ছোঁয়া কোনো বয়েসীকেই রেয়াৎ করলে না। দুদিনেই দেখা গেল খোকা-খুকুদের আর সামলানো যাচ্ছে না অথচ ছেলেমেয়ে মানুষ-করার মত সহজ কাজ আর কিছুই ছিল না এদেশে। এবং সেই প্রথম বিচারপতি অনোর সিমট্যাক্স তাঁর প্রাণোচ্ছল বংশধরকে বেতপেটা করতে বাধ্য হলেন।

আর এক ধরনের বিদ্রোহ দেখা গেল স্কুলে। ঘরে বন্ধ থাকা মোটেই পছন্দ করল না ছাত্রছাত্রীরা। পক্ষান্তরে, শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আক্রান্ত হয়েছিল সংক্রামক রোগে। পর্বতপ্রমাণ হোমটাস্ক আর বিপুল শাস্তি দিয়ে ছেলেমেয়েদের চক্ষুস্থির করে দিলেন তাঁরা।

আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে দেখা গেল। বিনয়নম্র কুইকোয়েনডনবাসীদের প্রধান আহার্য ছিল দুগ্ধজাত খাদ্য। আচম্বিতে তারা অতিরিক্ত পানাহার শুরু করে দিলে। রোজকার খাদ্য ব্যবস্থায় আর কুলোলো না। এক-একটা উদর এক-একটা উপসাগর হয়ে গেল এবং প্রচুর উৎসাহে বিবিধ খাদ্যসামগ্রী দিয়ে উপসাগর ভরানোর আয়োজন চলতে লাগল। তিনগুণ বেড়ে গেল

শহরের খাবারের চাহিদা। দুবারের জায়গায় ছবার করে খাওয়া আরম্ভ হল। বদহজমের বিস্তর রিপোর্ট শোনা গেল। কিছুতেই খিদে মিটল না কাউন্সেলর নিকলসির। তৃষ্ণা মেটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল ভ্যান ট্রিকসির পক্ষে। উৎকট আধা-মাতালের অবস্থাটাই শেষ পর্যন্ত কায়েমী হয়ে গেল তাঁর মেজাজে।

সংক্ষেপে, বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা গেল ঘরে ঘরে। দিনে দিনে তা বাড়তে লাগল। রাস্তায় রাস্তায় গড়াগড়ি যেতে লাগল মাতালের দল। এদের মধ্যে অনেকেই আবার উচ্ছৃঙ্খলাভিষিক্ত সম্মানীয় নাগরিক।

পাকস্থলীর গোলযোগ আর স্নায়ুর বিকার নিয়ে এন্তার রুগী ভীড় করতে লাগল ডক্টর ডোমিনিক কাসটোসের চেম্বারে এবং তা থেকেই বোঝা গেল কি পরিমাণে উত্তেজিত হয়েছে জনগণের স্নায়ুমণ্ডলী।

একদা যে সব রাস্তাঘাট মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করত, কুইকোয়েনডনের সেই সব পথেঘাটে এখন কাতারে কাতারে ভীড় জমে রইল দিবারাত্র এবং রোজই বিবাদ আর কথা কাটাকাটির সংবাদ আসতে লাগল। কেউ আর বাড়ীতে থাকতে পারছিল না। দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবৃত্তির জন্যে এবং শহরের শান্তিরক্ষার জন্যে অবশেষে নতুন পুলিশবাহিনী মোতায়েন করতে হল। টাউনহলে বসানো হল একটা কয়েদী খাঁচা। দিনেরাতে সমানে কয়েদী আসায় দেখতে দেখতে আর জায়গা রইল না সেখানে। হতাশ হয়ে পড়লেন নগরপাল প্যাসফ।

যা কখনো হয়নি, শেষ পর্যন্ত তাই হল। মাত্র দুমাসের মধ্যে একটা বিয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, স্কুলমাস্টার রাপ্-এর ছেলে অগষ্টাইন ডি বোভারির মেয়ের পাণিপীড়ন করে বসল। এবং তা সম্পন্ন হল বিয়ের দরখাস্ত পেশ করার মাত্র সাতাশ দিনের মধ্যেই!

আগেকার কালে যে সব বিয়ে সন্দেহ আর আলোচনার বস্তু হয়ে বছরের পর বছর ঝুলে থাকত, ঝপাঝপ পাকাপাকি হয়ে গেল সে-সব বিয়ের। বার্গোমাস্টার টের পেলেন, তাঁর নিজেরই মেয়ে, সুন্দরী সুজেল, বেরিয়ে যাচ্ছে মুঠোর বাইরে।

এমন কি, বিয়ের সাধ নিয়ে নগরপাল প্যাসফকেও বাজিয়ে দেখার মত দুঃসাহস দেখিয়ে ফেললেন টাটানেমান্স। ভেবে দেখলেন, সৌভাগ্য, সম্মান, যৌবনের খাতিরে এ ছাড়া তাঁর সামনে আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই!

অবশেষে এই ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিণামেরও দেরী রইল না—একটা ডুয়েল-লড়াই হয়ে গেল! হ্যাঁ, পিস্তল ছুঁড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ! পঁচাত্তর পায়ের ব্যবধানে ঘোড়া পিস্তল ছুঁড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ! পঁচাত্তর পায়ের ব্যবধানে ঘোড়া

পিস্তল ছুঁড়ে নিষ্পত্তি হয়ে গেল প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের! কাদের মধ্যে? পাঠকপাঠিকা তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

সুবোধ তরুণ ফ্রাঞ্জ নিকলসি আর ধনপতি ব্যাংকারের পুত্র ছোকরা সাইমন কোলার্টের মধ্যে।

ডুয়েলের মূল কারণ বার্গোমাস্টারের মেয়ে। সুজেল ছাড়া যে তার জীবন বৃথা, এ সত্য হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেলল সাইমন এবং একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে প্রিয়তমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতলবে নামল ডুয়েল যুদ্ধে!

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, কি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁচেছে কুইকোয়েনডন শহরের বাসিন্দারা। প্রত্যেকেরই মাথার মধ্যে চলছে খমিরের গাঁজন আর মাতন। কেউ কাউকে আর চিনতেও পারে না। সব চাইতে শান্তিপ্রিয় নাগরিকেরা এখন ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। আড়চোখে কারো দিকে তাকিয়েছেন কি মরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসবে আপনাকে। কেউ কেউ বড় বড় গোঁফ রাখতে আরম্ভ করেছে। কয়েকজন যুদ্ধং দেহি মনোভাবের নাগরিক তো গোঁফের ডগা পাকিয়ে উঁচুতে তুলে দেওয়া আরম্ভ করেছে।

এই তো শহরের অবস্থা। এ অবস্থায় শহর শাসন এবং রাস্তাঘাটের শান্তিরক্ষা করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল। এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযুক্ত সংগঠন তো সরকারী শাসন ব্যবস্থায় নেই। যে বার্গোমাস্টারকে আমরা মূর্তিমান প্রশান্তি-স্বরূপ দেখেছি, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে একান্তই অপারগ ছিলেন, সেই বার্গোমাস্টার একেবারেই অবশ্য একগুঁয়ে হয়ে উঠেছেন। এখন দিবারাত্র তাঁর গলাবাজিতে গমগম করতে থাকে তাঁর ম্যানসন। এখন তিনি দিনে কুড়িটা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, অধস্তন কর্মচারীদের বকাঝকা করছেন, এবং নিজেই শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু করার জন্যে নিত্য নতুন কানুন প্রবর্তন করছেন।

সে কি পরিবর্তন! বার্গোমাস্টারের শান্তিভবনের শান্তি গেল কোথায়? আদর্শ সেই ফ্লেমিস গৃহে এখন যে সব দৃশ্য ঘটতে দেখা যাচ্ছে, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়! ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি এখন কটুভাষিণী, খামখেয়ালী আর কর্কশ-স্বভাবা হয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর পতিদেবতা গলাবাজি করে স্ত্রীকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন, কিন্তু মুখবন্ধ করতে পারছেন না। সব কিছুতেই ইদানীং মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে ভদ্রমহিলার। প্রতিমুহূর্তেই চাকরবাকররা নাকি অপমান করছে তাঁকে। ননদিনী টাটানেমান্সও

সমান খিটখিটে হয়ে গেছেন, কথায় কথায় তিনি মুখ ঝামটা দিতে কসুর করছেন না বৌদিকে। এ সব ক্ষেত্রে যা করা কর্তব্য, তা অবশ্য করেছেন মঁসিয়ে ভ্যান ট্রিকসি! তিনি লোচকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছেন। কিন্তু তাতেও বিরতি নেই, উগ্রস্বভাবা গৃহকর্ত্রী ধারালো রসনায় নিত্যই নতুন দৃশ্যের অবতারণা করছেন স্বামীর সঙ্গে।

সইতে না পেরে প্রায় চেঁচামেচি করেন ভ্যান ট্রিকসি—"আমাদের হলো 'কি বলো তো? কিসের আগুনে এভাবে জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছি আমরা? শয়তান কি কাঁধে চাপল বাড়ীশুদ্ধ লোকের? ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি, তোমার জ্বালায় দেখছি তোমার আগেই আমাকে মরতে হবে। বংশের ধারা না ভেঙে ছাড়বে না তুমি!"

পাঠকপাঠিকা নিশ্চয় এ বংশের বিচিত্র প্রথা বিস্মৃত হননি। বংশপরম্পরায় ভ্যান ট্রিকসিরা বিপত্নীক হবেন এবং আবার বিয়ে করবেন এবং কদাপি ভঙ্গ হবে না বংশের ধারা।

ইতিমধ্যে আরো কিছু বলে নেওয়া যাক। মনের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এমন কয়েকটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া যা উল্লেখ করার মত। এই যে উত্তেজনা, এর আসল কারণ আমরা এখনো জানি না বটে, কিন্তু উত্তেজনাই নিয়ে এল অপ্রত্যাশিত কয়েকটা দেহস্থ পরিবর্তন। যে প্রতিভা আগে কেউ চিনতে পারত না, সেই প্রতিভাই এখন আচম্বিতে চমকে দিল সবাইকে। আগে যারা নেহাৎ সাদামাটা শিল্পী ছিল, তারাই এখন দেখাল তাদের নতুন নৈপুণ্য। রাজনীতিতে যেমন নবাগতের আবির্ভাব ঘটল, তেমনি ঘটল সাহিত্যে। সুকঠিন বিতর্কেও প্রাধান্য বজায় রাখল সুবক্তা এবং বিবিধ সমস্যায় জনগণকে এমনভাবে তাতিয়ে তুলতে লাগল যা কখনো, কল্পনাও করা যায়নি। জনগণও অবশ্য গরম হাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। কাউন্সিল মিটিং থেকে এই আন্দোলন এসে পৌঁছোলো পাবলিক পলিটিক্যাল মিটিংয়ে এবং একটা ক্লাব গড়ে উঠল কুইকোয়েনডনে। কুইকোয়েনডন সিগন্যাল, কুইকোয়েনডন ইম্পারসিয়াল, কুইকোয়েনডন র‍্যাডিক্যাল ইত্যাদি নামের কুড়িটা সংবাদপত্র গরম গরম সম্পাদকীয় লিখে আক্রমণ হানতে লাগল গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ সামাজিক সমস্যার মূলে।

কিন্তু এর শেষ কোথায়? নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন আপনারা। লেখা হল সব কিছু সম্পর্কে অথচ ফলাফল হল শূন্য। লেখা হল অডিনাড্রে টাওয়ার প্রসঙ্গে। কেউ বললে, পড়ো-পড়ো টাওয়ারকে ভেঙে ফেলা হোক। কেউ বলে, ঠেকনা দিয়ে রাখা হোক। কাউন্সিল প্রবর্তিত পুলিশ কানুন নিয়ে

অনেক গোঁয়ার নাগরিক রুখে দাঁড়াতে চাইল। নর্দমা পরিষ্কার নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলল। বলল এই ভাবে। শহরের আভ্যন্তরিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেও রাগ কমল না ক্রুদ্ধ বক্তাদের। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আরো দূরে এগিয়ে গেল তারা এবং উদ্যোগী হল নগরবাসীদের ভয়াবহ যুদ্ধে নামানোর আয়োজনে।

প্রায় আট-ন'শ বছর হল, যুদ্ধ ঘোষণার একটা উৎকৃষ্ট কারণ শিকেয় তুলে রেখেছিল কুইকোয়েনডনবাসীরা। কারণটা যে শেষ পর্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ ছিল না।

এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সেই কারণটিই।

অনেকেই জানেন, শান্ত শহর কুইকোয়েনডন ফ্লানডার্সে এক নিরিবিলি কোণে ছোট শহর ভীরগামেনের পরেই অবস্থিত। দুটো দেশেরই ভূমিখণ্ড গায়ে-গায়ে লাগোয়া।

১১৮৫ খৃষ্টাব্দে, কাউন্ট বডুইনের ক্রুসেড যাত্রার আগে, ভিরগামেনের একটা বেওয়ারিশ গরু স্পর্ধিত পদক্ষেপে কুইকোয়েনডনের মাঠে প্রবেশ করে। যদিও 'জিভ যতখানি লম্বা, পরিমাণে তার তিন গুণ লম্বা' ঘাসও মাঠ থেকে খেতে পারেনি বেচারী গরু। কিন্তু মানহানিই বলুন, অপরাধই বলুন অথবা গায়েপড়া ঝগড়াই বলুন—যা হবার তা তো হয়ে গেল এবং প্রকৃত দোষী যে কে, তাও সাব্যস্ত করা হল।

"যথাসময়ে এ অপমানের প্রতিশোধ আমরা নেব," বললেন নাটালিন ভ্যান ট্রিকসি, এ কাহিনীর ভ্যান ট্রিকসির বত্রিশ-তম পূর্বপুরুষ, "ভিরগামেন-বাসীদের উচিত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ছি না। আজ হোক, কাল হোক—পার পাবে না ওরা।"

আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল ভিরগামেনবাসীদের। অপেক্ষায় রইল তারা। কালক্রমে মানহানির জ্বালা যে ক্রমশঃ ফিকে হয়ে যাবে, এই ভেবেই চুপচাপ রইল। সত্যি সত্যিই তারপর বেশ কয়েকটা শতাব্দী প্রতিবেশী কুইকোয়েনডনবাসীদের সঙ্গে তাদের সখ্যতায় এতটুকু চিড় ধরেনি।

কমসট্রেলেট-এর ক্লাবে অপমানটা মনে পড়ে গেল নির্দয় বক্তা স্নুট-এর। মনে পড়ে গেল, এ অপমান প্রতিটি কুইকোয়েনডনবাসীর, অধিকার-জ্ঞানসম্পন্ন কোন জাতির পক্ষে যা সহ্য করা সম্ভব নয়। স্নুট দেখিয়ে দিলেন, এখনো অস্তিত্ব রয়েছে অপমানটার, এখনও রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে। কুইকোয়েনডন-বাসীদের উপহাস করে এখনো ভিরগামেনের বিশেষ কয়েকজন। বহু শতাব্দী ধরে নাগরিকরা মুখ বুঁজে সহ্য করে এসেছে এই অপমান, কিন্তু আর নয়।

রক্তে আগুন্ ধরিয়ে দিলেন স্থট। বললেন, 'প্রাচীন এই শহরের সন্তানরা এখুনি একটা মোটা ক্ষতিপূরণ দাবী করুক।' সবশেষে আবেদন করলেন 'দেশের সমস্ত সজীব শক্তির কাছে!'

কুইকোয়েনডনবাসীদের কাছে এ জাতীয় কথা একেবারে নতুন। পরিণামে সে যে কি তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হল তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না, অনুমান করে নিতে হবে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে গলা ফাটিয়ে দাবী জানাল, যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই! জীবনে এ রকম সাফল্য লাভ করেননি অ্যাডভোকেট স্থট।

বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর এবং অন্যান্য সমস্ত প্রধানেরা হাজির ছিলেন স্মরণীয় এই মিটিংয়ে। জনগণের এই বিস্ফোরণকে কোনক্রমেই তাঁরা দাবাতে পারতেন না। তাছাড়া, সে রকম ইচ্ছেও তাঁদের ছিল না। বরং তারস্বরে সবার চীৎকার ডুবিয়ে তাঁরাও চেঁচিয়ে উঠলেন সমস্বরে—"চলো ফ্রন্টিয়ার! চলো ফ্রন্টিয়ার!"

ফ্রন্টিয়ার তো কুইকোয়েনডনের প্রাচীর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। কাজেই বিপদের আশংকা দেখা দিল ভিরগামেনবাসীদের। কেননা, তারা একেবারেই অপ্রস্তুত। আর, যে কোন মুহূর্তে চড়াও হতে পারে কুইকোয়েনডনবাসীরা।

ইতিমধ্যে শুধু কেমিস্ট জোসি লিয়েট্রিক্সই মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল এই তুমুল নির্ঘোষের মধ্যে। পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। যুদ্ধ করতে গেলে যে বন্দুক, কামান, সেনাপতির দরকারও আছে, এই জিনিসটাই সঙ্গীদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করতে লাগল সে।

টেবিল চেয়ার চাপড়ে জবাব দিল সঙ্গীরা। দরকার মত সেনাপতি কামান বন্দুক বানিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু দেশপ্রেমিক জনগণকে কোনমতেই আটকে রাখা যাবে না।

এবার মঞ্চে দাঁড়ালেন বার্গোমাস্টার স্বয়ং। আবেগমথিত বক্তৃতায় হাতেনাতে প্রমাণ করে দিলেন, কতিপয় ভীরু ব্যক্তি বিচক্ষণতার নামে নিজেদের ভয় ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে। খাঁটি দেশপ্রেমীর মতই একটানে ছিঁড়ে দিলেন সেই ছদ্ম মুখোশ।

করতালি নির্ঘোষে এবার হল ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। চীৎকার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। "চলো ভিরগামেন! চলো ভিরগামেন!"

সৈন্যচালনা করার দায়িত্ব নিলেন বার্গোমাস্টার। রোমক যুগে যেমন হত, ঠিক তেমনি ভাবে শহরের নাম নিয়ে অঙ্গীকার করলেন, বিজয়লাভ তিনি করবেন, বিজয় মুকুট তিনি আনবেন!

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইজিনির পরামর্শ নাকচ করে দিলেন ডক্টর অক্স

"বলুন, স্যার" পরের দিন সকালে প্রচুর মৌলিক পদার্থ ঠাসা নালীর মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিডের বালতিটা উপুড় করে দিয়ে বললে ইজিনি।

"কেমন, আমি ঠিক বলিনি?" বললেন ডক্টর অক্স। "কি আর বাকী রইল? একটা গোটা জাতির শুধু বাইরের কাঠামোর উন্নতিই হল না, তাদের কর্তব্যবোধ, তাদের আভিজাত্যবোধ, তাদের প্রতিভা, তাদের রাজনৈতিক চেতনা —সব কিছুই তো এল! আর সবই সম্ভব হল শুধু অণুদের কারসাজিতে!"

"কিন্তু স্যার, অবস্থা অনেক দূর গড়িয়েছে। এরপরেও কি বেচারাদের আর উত্তেজিত করা ঠিক হবে?"

"না, না!" জোর গলায় বললে ডক্টর। "না! আমি শেষ পর্যন্ত দেখব।"

"যথা অভিরুচি, স্যার। তবে আমার মনে হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে এক্সপেরিমেণ্ট আর আমার মতে সময় হয়েছে—"

"কিসের?"

"কলটা বন্ধ করার।"

"বটে! চীৎকার করে উঠলেন ডক্টর। "হুঁশিয়ার, নইলে আমিই টিপে ধরব তোমার গলা!"

উঁচুতে উঠলে মানুষের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না

"বলছেন আপনি?" বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি বললেন কাউন্সেলর নিকলসিকে।

"হ্যাঁ, আমি বলছি। একান্তই দরকার এই যুদ্ধের," দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন নিকলসি, "অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ারও সময় এসেছে।"

"আমিও আবার বলছি আপনাকে," কণ্ঠে অম্ল ঢেলে ঝটিতি বললেন ভ্যান ট্রিকসি, "অধিকার কায়েমী করার এই সুযোগের ব্যবহার করতে যদি না পারে কুইকোয়েনডনবাসীরা, তাহলে তাদের গালে চুণকালি পড়বে।"

"আমিও বলি, আর দেরী না করে এক্ষুণি সৈন্য সংগ্রহ করে ফ্রণ্টে রওনা হওয়া দরকার আমাদের।"

"তাই নাকি, মঁসিয়ে, তাই নাকি!" জবাব দিলেন ট্রিকসি। "কথাগুলো কি আমাকে বলা হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই বলা হচ্ছে, মঁসিয়ে বার্গোমাস্টার। যা বলা হয়েছে, তা খাঁটি সত্য, আপনার অপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু সত্য!"

"আপনিও শুনে রাখুন, কাউন্সেলর," পালটা জবাব দিলেন ভ্যান ট্রিকসি, উত্তেজনায় কেঁপে উঠল তাঁর গলা। "কথাগুলো আমার মুখেই শোভা পায়, আপনার মুখে নয়! হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেরী করা মানেই মানসম্মান জলাঞ্জলি দেওয়া! ন'শ বছর অপেক্ষা করেছে কুইকোয়েনডন শহর, অবশেষে এসেছে প্রতিশোধ নেওয়ার সেই মুহূর্ত। আপনি যাই বলুন না কেন, তাতে আপনি খুশী হোন কি না হোন, তাতে কিছু এসে যায় না। শত্রু শহরের দিকে মার্চ আমরা করবই।"

"কথাটা বেশ কায়দা করে বললেন দেখছি," কর্কশকণ্ঠে বললেন নিকলসি। "বেশ, শুনে রাখুন, মঁসিয়ে, যাওয়ার ইচ্ছে যদি আপনার না থাকে, আপনাকে না নিয়েই মার্চ করব আমরা।"

"মঁসিয়ে, বার্গোমাস্টারের জায়গা সবার আগে!"

"কাউন্সেলরেরও।"

"আমার ইচ্ছেয় ব্যাগড়া দিয়ে আমাকে অপমান করছেন আপনি," চীৎকার করে বললেন বার্গোমাস্টার এবং তাঁর উদ্যত মুষ্টি দেখে মনে হল যে কোনো মুহূর্তে তা কামানের গোলার মত ছুটে যেতে পারে সামনে।

"আমার দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করে আমাকেও অপমান করেছেন," নিকলাসিও নিমেষে শক্তিশালী ব্যাটারীতে পরিণত হয়ে গেলেন।

"শুনে রাখুন মঁসিয়ে, দুদিনের মধ্যে কুইকোয়েনডনের সৈন্যবাহিনীর মার্চ শুরু হবে!"

"আমিও আবার বলছি, মঁসিয়ে, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা!"

ওপরের কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দুই বক্তাই একই কথা বলছেন এবং একই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন। দুজনেরই উদ্দেশ্য বিরোধ সৃষ্টি। কিন্তু উত্তেজনার চোটে কথা কাটাকাটি করে চলেছেন, ফলে, নিকলসি ভ্যান ট্রিকসির কথা শুনবেন না এবং ভ্যান ট্রিকসিও কান দেবেন না নিকলসির কথায়। দুজনে যদি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের সমর্থক হতেন, যদি বার্গোমাস্টার চাইতেন যুদ্ধ আর কাউন্সেলর চাইতেন শান্তি, তাহলে ঝগড়াটা এমন প্রচণ্ড হত না। এখন এই দুই পুরোনো বন্ধু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন

দুজনের পানে। দুজনেই যে ঘুসো-ঘুসি করতে প্রস্তুত, তা স্পষ্টই প্রকাশ পেল তাঁদের দ্রুতস্পন্দিত বক্ষ, আরক্ত মুখ, সঙ্কুচিত চক্ষুতারকা, কম্পিত মাংসপেশী এবং কর্কশ কণ্ঠে।

ঠিক যে মুহূর্তে দুজনে দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বেজে উঠল একটা মস্ত ঘড়ির ঘণ্টা। অমনি সামলে নিলেন দুজনে।

"সময় হয়েছে!" সোল্লাসে বললেন বার্গোমাস্টার।

"কিসের সময়?" জানতে চাইলেন কাউন্সেলর।

"বেলফ্রি টাওয়ারে যাওয়ার সময়।"

"মঁসিয়ে, আপনার খুশী-অখুশীর ধার ধারি না, আমিও যাচ্ছি।"

"আমিও।"

"তাহলে চলুন!"

"তাহলে চলুন!"

শেষ কথাগুলো শুনে মনে হবে যেন সংঘর্ষ বেঁধে গেছে। এবং ডুয়েল লড়তে চলেছেন বিবদমান দুই পক্ষ। আসলে কিন্তু তা নয়। ঠিক হয়েছে, শহরের দুই প্রধান কর্তা হিসেবে টাউনহলে যাবেন বার্গোমাস্টার আর কাউন্সেলর এবং উঠবেন সেখানকার সুউচ্চ টাওয়ারের চূড়োয়। এ টাওয়ারে উঠলে সারা কুইকোয়েনডন শহরকে চোখের সামনে দেখা যায়। সেখান থেকে আশপাশের অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে সৈন্যচালনার মোক্ষম সমরকৌশল নির্ধারণ করবেন।

এ ব্যাপারে একমত হওয়া সত্ত্বেও পথ দিয়ে যেতে যেতে ঝগড়া করতে ছাড়লেন না দুজনে। সে কি ঝগড়া! চেঁচামেচিতে গমগম করতে লাগল পথঘাট। কিন্তু গলা ফাটিয়ে কথা বলায় এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে পথচারীরা। তাই দুই নগর প্রধানের হল্লা তাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হল এবং কেউই ফিরে তাকাল না। এ রকম পরিবেশে শান্তশিষ্ট মানুষকে কিন্তু রাক্ষসই বলে বসত সবাই।

বেলফ্রির সন্নিকটে যখন পৌঁছোলেন, তখন বার্গোমাস্টার আর কাউন্সেলের দুজনেই ফুঁসছেন ভয়ংকর রাগে। রাগের চোটে লাল হতে হতে দুজনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। মতৈক্য সত্ত্বেও প্রচণ্ড বাদানুবাদের ফলে দুজনেরই অন্ত্রাদিতে শুরু হয়েছে প্রবল খেঁচুনি। এবং সকলেই জানে, মানুষ যখন রাগতে রাগতে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে, রাগের শেষ সীমা এসে গেছে।

সঙ্কীর্ণ টাওয়ারের পাদদেশে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে সত্যিকারের বিস্ফোরণ ঘটল। কে আগে উঠবে? ঘোরানো সিঁড়ির ধাপে কে আগে পা দেবে? সত্যের খাতিরে বাধ্য হচ্ছি লিখতে যে, ধস্তাধস্তি হয়ে গেল দুই প্রধানের মধ্যে

এবং ঊর্ধ্বতন অফিসারকে যথাবিহিত সম্মান দেওয়ার কথা বিস্মৃত হয়ে শহরের সুপ্রীম ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যান ট্রিকসিকে জোরালো এক ধাক্কায় ঠেলে দিলেন পেছনে। পরক্ষণেই হুড়হুড় করে সবার আগে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে।

উঠতে উঠতে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পরস্পরের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন দুজনে। প্রতি ধাপে চলল এই কেচ্ছা। মাটি থেকে তিনশ সাতান্ন ফুট ওপরে টাওয়ারের শীর্ষে ওঠার পর ভয়ানক একটা ক্লাইম্যাক্স যে দেখা যাবে এ আশংকা করা নিশ্চয় অসমীচীন হবে না।

অচিরেই দম ফুরিয়ে গেল দুই শত্রুর। একটু পরেই অশীতিতম ধাপে পা দেওয়ার পর দুজনেই উঠতে লাগলেন পা টেনে টেনে, ঘন ঘন নিঃশ্বেস ফেলতে লাগলেন বেশ শব্দ করে।

তারপর, দম ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যেই কিনা জানি না, ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেল দুজনের। বন্ধ হল বকবকানি। আর, শুনে অদ্ভুত মনে হবে, যতই শহরের ওপরে উঠতে লাগলেন, ততই যেন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল তাঁদের উত্তেজনা। নীরব হল কণ্ঠ। সে নৈঃশব্দ ছড়িয়ে পড়ল অন্তরেও। শান্ত হয়ে আসতে লাগল তপ্ত মস্তিষ্ক; আগুনের ওপর থেকে কফির পাত্র সরিয়ে আনলে যেমন তা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি। কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। কিন্তু যা খাঁটি সত্য, তাহলো এই: জমি থেকে দুশ ছেষট্টি ফুট উঁচুতে বিশেষ একটা চাতালে পৌঁছানোর পর বসে বসে পড়লেন বিবদমান দুই প্রৌঢ়। দেহেমনে নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে তাকালেন পরস্পরের দিকে। দেখা গেল, রাগের চিহ্নমাত্র নেই কারো মুখে।

"কি উঁচু!" বললেন বার্গোমাস্টার।

"অনেক উঁচু!" বললেন কাউন্সেলর। "জানেন কি, হামবুর্গের সেন্ট মাইকেল চার্চের চৌদ্দ ফুট ওপরে চলে এসেছি আমরা?"

"জানি," জবাব দিলেন বার্গোমাস্টার। স্বরে একটা সবজান্তা ভাব ফুটল বটে, কিন্তু কুইকোয়েনডনের চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তা ক্ষমার্হ।

আবার শুরু হল সিঁড়িভাঙা। দেওয়ালের ফোকর দিয়ে দুজনে কৌতূহলী চোখে তাকাতে লাগলেন বাইরে। এবারের শোভাযাত্রার পুরোধা বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলরের বিনা প্রতিবাদেই। শেষকালে এমন ঘটনাও ঘটল যে তিনশ চার নম্বর ধাপে পৌঁছে বেদম হয়ে পড়লেন ভ্যান ট্রিকসি, তখন পেছন থেকে ধীরে ধীরে তাঁকে ঠেলে নিয়ে চললেন নিকলসি। বাধা দিলেন না বার্গোমাস্টার। টাওয়ারের সর্বোচ মঞ্চে পৌঁছোনোর পর বললেন উদার স্বরে—"ধন্যবাদ, নিকলসি। এর মূল্য আপনি পাবেন।"

একটু আগেই টাওয়ারের পাদদেশে এঁরাই ছিলেন ছুঁচুটো বুনো জানোয়ারের সামিল, রাগে ফুলতে ফুলতে ছিঁড়তে চেয়েছিলেন পরস্পরের টুঁটি। কিন্তু চূড়োয় পৌছোলেন অকৃত্রিম সুহৃদরূপে।

আবহাওয়া ভারী চমৎকার। মে মাস। সব বাষ্পই শুষে নিয়েছে সূর্য। কি বিশুদ্ধ, কি স্নিগ্ধ এখানকার হাওয়া! বিশাল পারাধর মধ্যে ক্ষুদ্রতম জিনিসগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কয়েক মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে ভিরগামেন শহর—রোদ্দুরে ঝকঝক করছে সাদা প্রাচীর, সূচ্যগ্র লাল ছাদ আর ঘণ্টাঘর। আগুন আর লুঠতরাজের বিভীষিকা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সুন্দর এই শহরে।

ছোট্ট একটা পাথরের বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রইলেন বার্গোমাস্টার আর কাউন্সেলর—আত্মিক সম্পর্ক যাদের মধ্যে নিবিড়, তারাই এমনি নীরবে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে পারে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেলেন দুজনে। নিঃশব্দে আশেপাশে তাকিয়ে বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললেন বার্গোমাস্টার—"কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

"সত্যিই অপূর্ব!" বললেন কাউন্সেলর। "বন্ধু, কি মনে হয় আপনার? ভূগোলকের মাটিতে বুকে হাঁটার চাইতে এমন উঁচু জায়গাতেই বসবাসের জন্যেই মানবজাতির সৃষ্টি, তাই নয় কি?"

"আমি একমত, বন্ধু নিকলাস," জবাব দিলেন ভ্যান ট্রিকাসি, "এক মত আমি। প্রকৃতির উর্ধ্বে উঠলেই অনুভূতিকে আরো ভালো ভাবে উপলব্ধি করা যায়। উপভোগ করা যায় সবরকম অর্থে! এমন উঁচুতে এলেই তৈরী হয় দার্শনিকরা! ধরণীর ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা, দৈন্যের এত ওপরে উঠেই সাধনা করা উচিত মুনিঋষিদের!"

"প্ল্যাটফর্মটা এবার ঘুরে দেখা যাক?" জিজ্ঞেস করলেন কাউন্সেলর।

"আসুন, প্ল্যাটফর্মটা এবার ঘুরে দেখা যাক," জবাব দিলেন বার্গোমাস্টার।

এই বলে হাত জড়াজড়ি করে দুই বন্ধু দিকচক্রবালের প্রতিটি অংশ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আগের মতই একটি দুটি কথার পর প্রচুর বিরতি দিলেন এবং আগের মতই বিরতির পর সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আবার বিরতি দিলেন।

"সতেরো বছর আগে শেষবার বেলফ্রি টাওয়ারে উঠেছিলাম আমি," বললেন ট্রিকাসি।

"আমি কখনো উঠেছি বলে মনেই পড়ে না," জবাব দিলেন নিকলাস্। "না ওঠার জন্যে এখন অনুশোচনা হচ্ছে। আহা, তুলনা নেই এই দৃশ্যের! কি মহান এই রূপ! দেখুন, দেখুন, সবুজ মাঠে কেমন ওরা ঘাস খাচ্ছে—ষাঁড়, গরু, ভেড়া!"

"মাঠে মাঠে রওনা হয়েছে শ্রমিকরা! কে বলবে ওরা শুধুই রাখাল—প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ব্যাগপাইপ থাকলেই মানাতো ভাল!"

"আর এই বিস্তীর্ণ উর্বর জমির ওপর সুন্দর নীল আকাশের চন্দ্রাতপ। বাষ্পের মলিনতা নেই কোথাও। অহো, নিকলসি! এমন জায়গায় এলেই কবি হয়ে যেতে হয়!"

ঠিক এই সময়ে সুরেলা ছন্দে বেজে উঠল কুইকোয়েনডনের গির্জের ঘণ্টা। অদ্ভুত মিষ্টি সেই স্বরলহরী। আবেশবিহ্বল চিত্তে শুনতে লাগলেন দুই বন্ধু।

তারপর প্রসন্ন প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন ভ্যান ট্রিকসি—"প্রিয় বন্ধু নিকলসি, কি কারণে যেন টাওয়ারে উঠেছি আমরা?"

"সত্যি কথা বলতে কি," জবাব দিলেন কাউন্সেলর। "কতকগুলো দিবাস্বপ্ন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে শুরু—"

"কি কারণে টাওয়ারে উঠেছি আমরা," পুনরাবৃত্তি করলেন বার্গোমাস্টার।

"আমরা উঠেছি বিশুদ্ধ পবিত্র এই বাতাস দিয়ে ফুসফুস পরিশোধন করতে—এখনও মানুষের হীন দুর্বলতায় কলঙ্কিত হয়নি এখানকার বাতাস।"

"এবার তাহলে নামা যাক, বন্ধু নিকলসি?"

"এবার নামা যাক, বন্ধু ভ্যান ট্রিকসি।"

দিগন্তবিস্তৃত চোখ জুড়োনো আশ্চর্য শোভার ওপর শেষবারের মত বিদায়ী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন দুজনে। তারপর সবার আগে সিঁড়ির ধাপে পা দিলেন বার্গোমাস্টর এবং ধীর হিসেবী পদক্ষেপে নামতে লাগলেন একটু একটু করে। কয়েক ধাপ পেছনে থেকে অনুসরণ করতে লাগলেন কাউন্সেলর। ওঠবার সময়ে যে চাতালে ওঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, নেমে এলেন সেই চাতালে। ইতিমধ্যেই লাল হতে শুরু হয়েছিল দুজনেরই গাল। একটু থমকে দাঁড়িয়েই আবার শুরু হল নামা।

কয়েক মুহূর্তে যেতে না যেতেই ভ্যান ট্রিকসি বললেন নিকলসিকে, তিনি যেন দয়া করে একটু আস্তে হাঁটেন। কেননা, ঘাড়ের ওপর এসে পড়ার ফলে তাঁর অসুবিধে হচ্ছে, মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে।'

মেজাজ একেবারেই বিগড়োলো আরো কুড়িটা ধাপ পেরিয়ে আসার পর। কাউন্সেলরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম করলেন ভ্যান ট্রিকসি—সেই অবসরে খানিকটা এগিয়ে যাবেন তিনি।

কাউন্সেলর মুখের ওপর শুনিয়ে দিলেন যে, বার্গোমাস্টারের চিত্ত বিনোদনের

জন্যে শূন্যে ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, অব্যাহত রইল নীচে নামা।

রুক্ষস্বরে গজরে উঠলেন ভ্যান ট্রিকসি।

নিকলসি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। বার্গোমাস্টারের বয়স নিয়ে অপমানসূচক মন্তব্য করলেন এবং বংশের ধারা অনুযায়ী যে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করাই তাঁর বিধিলিপি, সে সম্বন্ধেও রসালো টিপ্পনী ছাড়লেন।

আরো কুড়িটা ধাপ নেমে এলেন বার্গোমাস্টার এবং সাবধান করে দিলেন নিকলসিকে। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

নিকলসি জবাব দিলেন, বাড়াবাড়ি আগে যেমন হয়েছে পরেও তেমনি হবে—তা সে যাই ঘটুক না কেন। এদিকে জায়গা কম। সুতরাং সঙ্কীর্ণ স্থানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সংঘর্ষ লেগে গেল দুই প্রধানের মধ্যে। দুজনেই দুজনকে গাল পাড়তে লাগল সমানে এবং সব চাইতে মোলায়েম গালি যা শোনা গেল তা হল 'গণ্ডমূর্খ' আর 'হেঁড়েমাথা।'

চীৎকার করে বললেন বার্গোমাস্টার—"বোকা গাধা কোথাকার, আপনাকে দেখে নেবো আমি। দেখব এ যুদ্ধে কি করেন আপনি, কি পদ পান, কি সম্মান পান!"

আপনি যে সম্মান, যে পদ পাবেন—ঠিক তার আগেরটাই পাবো আমি, নিরেট মাথা কোথাকার!" জবাব দিলেন নিকলসি।

এরপরেই শোনা গেল আরো কিছু চীৎকার এবং মনে হল দুটো দেহ গড়াতে গড়াতে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে।

গোলমাল শুনে টাওয়ারের প্রহরী দরজা খুলে ধরল এবং ধরল ঠিক মুহূর্তে—কেননা, থামচাথামচি জড়াজড়ি করতে করতে দুই প্রধান ছিটকে গড়িয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। দুজনেরই দেহ ক্ষত-বিক্ষত। শামুকের মত ঠেলে বেরিয়ে-আসা চোখে পরস্পরের কেশ উৎপাটন করতে করতে প্রহরীর সামনে এসে আছড়ে পড়ল দুই মূর্তি। সৌভাগ্যক্রমে, সে কেশ পরচুলা।

শত্রুর নাকের ওপর ঘুসি নাড়তে নাড়তে তারস্বরে বললেন বার্গোমাস্টার—"এর জবাব আপনাকে দিতে হবে!"

"যখন খুশী চাইবেন, পাবেন!" গর্জন করে বললেন নিকলসি এবং বক্তব্যকে জোরদার করার জন্যে একটা প্রচণ্ড লাথি মারারও উপক্রম করলেন!

প্রহরী নিজেও গরম হয়ে উঠেছিল। কেন, তা বলতে পারব না। তাই দৃশ্যটা তার কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হল। হাতাহাতিতে যোগদান করারও প্রবল বাসনা হল তার এবং সে বাসনা কি জাতীয় উত্তেজনার ফল, তাও আমি

বলতে পারব না। তবে সে সামলে নিলে নিজেকে। ছুটে গিয়ে তল্লাটের সর্বত্র ঘোষণা করে দিলে, বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আর কাউন্সেলর নিকলসির মধ্যে শীগগিরই একটা ডুয়েল হবে।

অবস্থা আরও ঘোরালো, ফলে কুইকোয়েনডনবাসীরা, পাঠক-পাঠিকা এমন কি লেখকও দাবী জানাচ্ছেন অবিলম্বে রহস্যভেদ হোক

শেষ ঘটনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল কি পরিমাণে উত্তেজিত করা হয়েছে কুইকোয়েনডনবাসীদের। অদ্ভুত এই মহামারী শুরু হওয়ার আগে যাঁরা কিনা অতিশয় ভদ্র ছিলেন, শহরের সব চাইতে পুরোনো সেই দুই বন্ধু শেষে এতটা দাঙ্গাবাজ হতে পারলেন! তাও কিনা চূড়োয় পৌঁছে আগেকার পারস্পরিক সহানুভূতি, স্নিগ্ধকোমল প্রকৃতি, চিন্তা করার অভ্যাস ফিরে আসার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই!

খবর-টবর শুনে আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না ডক্টর অক্সের। পরিস্থিতি ক্রমশ সিরিয়াস হয়ে উঠছে দেখে ইজিনি গেছল কথা বলতে, কিন্তু প্রচণ্ড দাবড়ানি দিয়ে তৎক্ষণাৎ তার মুখ বন্ধ করে দিলেন ডক্টর। তা ছাড়া আর পাঁচজনের মত ওঁরাও সংক্রামিত হয়েছিলেন উত্তেজনা-ব্যাধিতে—ফলে চণ্ডমূর্তি ধারণ করছিলেন কথায় কথায়। জনসাধারণের মতো এঁদের উত্তেজনাও চরমে পৌঁচেছিল। তাই বার্গোমাস্টার আর কাউন্সেলরের মত কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে লজ্জা পেলেন না এবং ঝগড়া করলেন প্রচণ্ড বিক্রমে।

একটা সমস্যাই ছাড়িয়ে গেল আর সমস্যাকে। ভিরগামেন সমস্যার আশু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মুলতুবী রইল ডুয়েল লড়াই। দেশ যখন বিপদাপন্ন, তখন প্রতিটি দেশবাসীকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা করতে হবে দেশের স্বার্থ। কাজেই অযথা রক্তপাত করার অধিকার এখন কারোরই নেই।

সমস্ত ব্যাপারটা, সংক্ষেপে, রীতিমত গুরুতর এবং একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।

'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবে রক্ত টগবগ করে ফুটলে কি হবে, আগে থেকে হুঁশিয়ার না করে শত্রুপক্ষের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া সমীচীন বোধ করলেন না বার্গোমাস্টার। তাই ১১৯৫ সালে কুইকোয়েনডম এক্তিয়ারে গুরু অপরাধের মোটা খেসারৎ দাবী করে ভিরগামেনবাসীদের কাছে পাঠালেন তাঁর গ্রাম্য কনস্টেবল হট্টারিং-কে।

বার্তাবহের বার্তা শুনে প্রথমটা তো কল্পনাই করতে পারলেন না ভিরগামেনের কর্তৃপক্ষ। পরে বার্তাবহের সরকারী তকমা থাকা সত্ত্বেও, তাকে অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল ফ্রন্টিয়ারে।

ভ্যান ট্রিকসি তখন পাঠালেন ভারপ্রাপ্ত এক কর্মচারীকে। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে বার্গোমাস্টার নাটালিস ভ্যান ট্রিকসির আদেশে যে দোষসিদ্ধি রচিত হয়েছিল, তারই মূল কপিটি ভিরগামেন কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন ভিরগামেন কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য কনষ্টেবলকে যেভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছেন, সেইভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সীমানা পার করে দিয়ে এলেন।

বার্গোমাস্টার তখন শহরের সকল প্রধানদের সম্মেলন আহ্বান করলেন।

লেখা হল একটা চরমপত্র। বুক-কাঁপানো জ্বালাময়ী ভাষায় খসড়া করা হল সর্বনাশা সেই চিঠির যা অমান্য করলেই যুদ্ধ ঘোষণা অবশ্যম্ভাবী। বিবাদের কারণটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল সেই পত্রে এবং সময় দেওয়া হল চব্বিশ ঘণ্টার। এই সময়ের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী শহর যদি অনুতপ্ত না হয় এবং কুইকোয়েনডনের প্রতি দৌরাত্ম্যের একটা প্রতিবিধান না করে, তা'হলে ছারখার করে দেওয়া হবে ভিরগামেন শহরকে।

চিঠিখানা পাঠানোর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ফেরৎ এলো টুকরো টুকরো অবস্থায়। এ যে অপমানের ওপর অপমান! ভিরগামেনবাসীরা অবশ্য মনে করেছিল আগের মতই ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও নির্বিকার মন নিয়ে দিনযাপন করছে কুইকোয়েনডনবাসীরা। সেই কারণেই তাদের দাবী, তাদের যুদ্ধ ঘোষণার কারণ এবং তাদের চরমপত্র নিয়ে রঙ্গ-পরিহাস শুরু করে দিলে। ভাবল, এও বুঝি একটা নতুন খেলা।

এরপর একটি পথই খোলা রইল এবং তা হলো অস্ত্রধারণ করা, যুদ্ধ-দেবতার আবাহন করা এবং শত্রুপক্ষ তৈরী হওয়ার আগেই প্রুশিয়ান কায়দায় ভিরগামেনবাসীদের ওপর বাজপাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়া।

গুপ্তসভায় মহা আড়ম্বরে এই সিদ্ধান্ত নিল কাউন্সিল এবং চেঁচিয়ে, মুষ্টি পাকিয়ে, দিব্বি গেলে গালাগালি দিয়ে, ভীতিজনক অঙ্গ-ভঙ্গী করে এবং অভূত-পূর্ব প্রচণ্ড রোষ প্রদর্শন করে সমর্থন জানালো যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তকে।

যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত জানাজানি হতে না হতেই দুহাজার তিন শ নিরানব্বই জন যোদ্ধা সংগ্রহ করা হল শহরের দু'হাজার তিন শ তিরানব্বই জন বাসিন্দার মধ্যে থেকে। মেয়েরা, বাচ্চারা, বুড়োরাও এসে যোগ দিলে সক্ষম শক্ত-

পুরুষদের সঙ্গে। জড়ো করা হল শহরের যাবতীয় বন্দুক। পাওয়া গেল পাঁচটা, তার মধ্যে দুটোর ঘোড়া নেই এবং এইগুলোই বিতরণ করা হল পুরোবর্তী প্রহরীদের মধ্যে। সেকেলে 'কালভেরিন' এনে গঠন করা হল গোলন্দাজ বাহিনী। ষোড়শ শতাব্দীর দীর্ঘ সর্পাকার হাতলযুক্ত এই কামানে মরচে পড়েছে গত পাঁচ শতাব্দী ধরে। কুইকোয়েনডন পল্লীনিবাসের হাতে এ আগ্নেয়াস্ত্র আসে ১৩৩৯ সালে কুইসনয়েদের আক্রমণের পর—ইতিহাসে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহারের যে কটি ঘটনা আছে, এটিও তাদের অন্যতম। কামান ছোঁড়ার দায়িত্ব যাদের দেওয়া হল, গোলা দেওয়া হল না তাদের ; ফলে, বাঁচল সবাই। গোলা-বারুদ থাকুক আর না থাকুক, কামানের চেহারা দেখিয়েই তো ঘাবড়ে দেওয়া যাবে দুর্বিনীত শত্রুদের। অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হল প্রাচীন বস্তুর মিউজিয়াম থেকে—পাওয়া গেল চকমকি পাথরের টঙ্ক, শিরস্ত্রাণ, ফ্রান্সিস, রণকুঠার, বর্ম, টাঙ্গী, কিরিচ এবং হরেকরকম আরো কত হাতিয়ার। এ ছাড়াও রইল 'রান্নাঘরের' সেই সব তথাকথিত অস্ত্র। আধুনিকতম কামান আর মেশিনগানের পরিবর্তে রইল সাহস, ন্যায় অধিকার, বিজাতীয় ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহা।

সমাপ্ত হল পলটন পর্যবেক্ষণ। নাম হাজিরা দিতে কোন নাগরিকই ভুলল না। বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর, নগরপাল, প্রধান বিচারপতি, স্কুলশিক্ষক, ব্যাংকার, বিদ্যালয় প্রধান—সংক্ষেপে শহরের যাবতীয় কেষ্টবিষ্টু ব্যক্তি কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে গেলেন পুরোভাগে। মা, বোন, মেয়ে—কেউই একফোঁটা চোখের জলও ফেলল না! স্বামী, বাবা, ভাইদের তারা বরং অনুপ্রাণিত করে তুললে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে, এমনকি তাদের অনুসরণ করে সৈন্যবাহিনীর পেছনে আর একটা বিচিত্র বাহিনী গ. তুললে সাহসিনী ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসির নেতৃত্বে।

শিঙায় ফু দিল শহরের নকীব জঁা মিসটল। পিলে চমকানো হুংকার ছেড়ে আকাশ কাঁপিয়ে অডিনার্দে গেটের দিকে রওনা হল ফৌজ।

শহরের প্রাচীর সবে পেরোতে যাচ্ছে সৈন্যবাহিনীর পুরোধারা, ঠিক এমনি সময়ে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা লোক।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে "থাম! থাম! আহাম্মক উজবুক কোথাকার! নামাও হাতিয়ার! কলটা বন্ধ করতে দাও আমায়। রক্ত তোমাদের পালটায়নি! তোমরা এখনো শান্তিপ্রিয় সৎ সুস্থ নাগরিক! তোমাদের এই উত্তেজনা আমার কর্তা ডক্টর অক্সের দোষে! এ একটা

এক্সপেরিমেন্ট! অক্সি-হাইড্রিক গ্যাস দিয়ে আমাদের রাস্তা ঘাটে আলো জ্বালবার অছিলায় উনি ছেড়েছেন—"

কথাটা আর শেষ করতে পারলে না অ্যাসিস্টান্ট ইজিনি। ডক্টর অক্সের গুপ্ত রহস্য ফাঁস হওয়ার উপক্রম হতেই, ডক্টর নিজেই লাফিয়ে পড়লেন বেচারা ইজিনির ওপর এবং দমাদম ঘুসি মেরে বন্ধ করে দিলেন তাঁর মুখ।

এই তো যুদ্ধ! ইজিনির আচমকা আবির্ভাবে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর এবং অন্যান্য নগর প্রধানেরা। বক্তৃতা শুনে লোম খাড়া হয়ে উঠেছিল সকলের। এখন তাঁরাই ধেয়ে গেলেন দুই আগন্তুকের দিকে এবং দুজনেরই যে কিছু বলার থাকতে পারে, তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না মোটেই। দেরীও করলেন না।

ভ্যান ট্রিকসির আদেশে ডক্টর অক্স এবং তাঁর সহকারীকে পিটিয়ে, চাবকে সবে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোলা বাড়ীতে, এমন সময়—

রহস্যভেদ

এমন সময় মেদিনী কেঁপে উঠল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে। মনে হল যেন আগুন লেগে গেল কুইকোয়েনডনের আবহমণ্ডলে। উল্কার মত মহাশূন্যে ধেয়ে গেল চোখ-ঝলসানো অতি-তীব্র এক অগ্নিশিখা। সময়টা যদি রাত্রি হত, তা'হলে তিরিশ মাইল দূর থেকে দেখা যেত সেই গগনচুম্বী অগ্নিশিখা।

কুইকোয়েনডনের গোটা-সৈন্যবাহিনীই সন্ন্যাসী ফৌজের মত সটান আছড়ে পড়ল ধরিত্রীর ওপর। সৌভাগ্যক্রমে খুব বেশী চোট লাগেনি কারও, সামান্য কিছু আঁচড় আর কালসিটে পড়ল শুধু কয়েকজনের শ্রীঅঙ্গে।

কিন্তু, ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার অতি সহজ এবং অচিরেই তা জানা গেল। গ্যাসের কারখানা উড়ে গেছে। ডক্টর অক্স আর তাঁর সহকারীর অনুপস্থিতিতে অসতর্ক মুহূর্তে কেউ কোন ভুল নিশ্চয় করেছে। কেন এবং কিভাবে যে অক্সিজেন রিজার্ভার আর হাইড্রোজেন রিজার্ভারের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তা জানা গেল না! দুই গ্যাসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিস্ফোরক মিশ্রণের এবং দুর্ঘটনাক্রমে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে তাতে।

ফলে, সব কিছুই ওলোট-পালোট হয়ে গেল। তবে টলতে টলতে যখন আবার উঠে দাঁড়াল সৈন্যবাহিনী, দেখা গেল অদৃশ্য হয়ে গেছেন ডক্টর অক্স এবং তাঁর সহকারী ইজিনি।

শ্রীমান পাঠক এবার দেখবেন লেখকের সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁদের অনুমানই ঠিক

বিস্ফোরণের পরমুহূর্তেই আবার আগের মতই শান্তিপ্রিয়, ঢিলেমিপ্রিয় ফ্লেমিস নগরীতে পরিণত হল কুইকোয়েনডন শহর।

সত্যিকথা বলতে কি, বিস্ফোরণের পর খুব একটা হইচই শোনা গেল না, তেমন সাড়াও পড়ল না। পক্ষান্তরে, যন্ত্রের মত প্রত্যেকেই পা বাড়ালো যে যার বাড়ীর দিকে; কিন্তু কেন, তা কেউ জানল না, বুঝতেও পারল না। বার্গোমাস্টার ভর দিল কাউন্সেলরের বাহুর ওপর, হাত জড়াজড়ি করে এগোলো অ্যাডভোকেট স্থট আর ডক্টর কাসটোস। পরম সুহৃদের মত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ফ্রাঞ্জ নিকলসি আর সাইমন কোলার্ট। প্রত্যেকেই প্রশান্ত, প্রসন্ন এবং নীরব। কি যে ঘটে গেল, সে সম্বন্ধেও আর কেউ সচেতন রইল না, এমন কি মন থেকেও বেমালুম মুছে গেল ভিরগামেন আর প্রতিহিংসা সম্পর্কিত জ্বালাময় স্মৃতি। ভুলল সব কিছুই।

তাই আবার অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠল কুইকোয়েনডন শহর। জীবন-যাপনের পুরোনো ধারা ফিরে এল মানুষের মধ্যে, পশুর মধ্যে, গাছপালার মধ্যে এমনকি বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে পড়ো-পড়ো অর্ডিনাদে টাওয়ারও সিধে হয়ে গেল—এ ধরনের বিস্ফোরণগুলো মাঝে মাঝে আশ্চর্যরকমের হয় তো—তাই ঘটে গেল এই অত্যাশ্চর্য প্রপঞ্চ !

আর তারপর থেকেই—কেউ আর অপরের চাইতে বেশী চেঁচিয়ে কথা বলেনি, কুইকোয়েনডন শহরেও আর কোন আলোচনা সভা হতে দেখা যায়নি। রাজনীতি, ক্লাব, বিচার-প্রহসন এবং কনষ্টেবলের রইল না আর কোন প্রয়োজন! আবার আরামের কাজে পরিণত হল নগরপাল প্যাসফের চাকরী, মাইনে কমানো হল না এই কারণে যে বিষয়টা নিয়ে তখনো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলর।

টাটানেমান্সকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে তিনিও বুঝলেন না কেন প্রায়ই নিশার স্বপনে আবির্ভাব ঘটতে লাগল নগরপাল প্যাসফের।

আর, ফ্রাঞ্জের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সাইমন কোলার্ট অত্যন্ত উদারভাবে সমস্ত দাবী ত্যাগ করল সুন্দরী সুজেলের ওপর এবং সুজেল-প্রিয়তম ফ্রাঞ্জও আর অযথা দেরী না করে এ ঘটনার পাচ বছর পরে বিয়ে করল প্রেয়সীকে।

যথাসময়ে, দশ বছর পরে, মারা গেলেন ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি। বার্গোমাস্টার বিয়ে করলেন তার খুড়তুতো বোন ম্যাডামোয়েসেল পেলাগি ভ্যান

ট্রিকসিকে। পেলাগি উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিলেন এবং বার্গোমাস্টারকে কবরে পাঠিয়ে যে তিনি বিধবা হবেন, এ হিসেবেরও গরমিল হবার আর সম্ভাবনা রইল না।

ডক্টর অক্সের অনুমিতি এবং তার ব্যাখ্যা

রহস্যাবৃত এই ডক্টর অক্স তাহলে কি রহস্যের সৃষ্টি করেছিলেন কুইকোয়েনডন শহরে? ফানটাসটিক একটা এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়া কিছুই করেননি।

গ্যাস পাইপগুলো বসানোর পর তিনি প্রথমে পাবলিক বিল্ডিং, পরে গেরস্তবাড়ী, সবশেষে কুইকোয়েনডনের রাস্তাঘাটে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছাড়লেন প্রচুর পরিমাণে—হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুও ছাড়লেন না রিজার্ভারের মধ্যে থেকে।

অক্সিজেন স্বাদহীন, গন্ধহীন। আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এই গ্যাস। নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করলে নিদারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় মানব-দেহস্থ কলকব্জার মধ্যে। অক্সিজেন-অভিসিক্ত বাতাসে যে থাকে সে উত্তেজিত হয়, ক্ষিপ্ত হয়, জ্বলে যায়!

সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনের স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে আসে। উদাহরণস্বরূপ, বেলফ্রি টাওয়ারের চূড়োয় উঠে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছলেন বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলর। কেননা, আপন ওজনের জন্যেই বাতাসের নীচের স্তরে জমে থাকে অক্সিজেন।

কিন্তু এ রকম পরিবেশে যাকে বাঁচতে হয়, তাকে এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতে হয় এবং ফলে তার শরীর-যন্ত্র ও আত্মারও নিদারুণ রূপান্তর ঘটে, উন্মাদের মতই তাকে মরতে হয় অতি দ্রুত। ত্বরান্বিত হয় তার মৃত্যু!

কুইকোয়েনডনবাসীদের কপাল ভাল, বিধিনির্দেশিত প্রচণ্ড সে বিস্ফোরণে সমাপ্তি ঘটল বিপজ্জনক এক্সপেরিমেণ্টের এবং ধ্বংস হয়ে গেল ডক্টর অক্সের গ্যাস কারখানা।

গল্পের উপসংহারে কি তাহলে এই সত্যেই উপনীত হতে হবে যে সুগুণ, সাহস, প্রতিভা, উপস্থিতবুদ্ধি কল্পনাশক্তি—মগজের এই যে ক্ষমতা অথবা দক্ষতা, সবই নির্ভর করে নিছক অক্সিজেনের কারসাজির ওপর?

ডক্টর অক্সের অনুমিতি তাই; কিন্তু তা মেনে না নিলেও চলবে। আর, আমরা তো তা সর্বদিক থেকে প্রত্যাখ্যান করব—প্রাচীন নগরী কুইকোয়েনডনের রঙ্গমঞ্চে সেই ফ্যানটাসটিক এক্সপেরিমেণ্ট সত্ত্বেও।

[টোয়েণ্টি থাউজাণ্ড লীগ্‌স্‌ আনডার দি সী]

কি এক বিভীষিকা দেখা গিয়েছে সাগরের জলে—তিনশ ফুট লম্বা বিশাল চুরুটের মত গড়নের এক দানব নারহোয়াল—চোখ ধাঁধানো দ্যুতি বেরোয় জলদানবটার গা থেকে,—ভীম গর্জে ধেয়ে ওঠে দেড়শো ফুট উঁচু জলের ধারা—আর সে কি প্রচণ্ড গতি—আমেরিকার বেগবান যুদ্ধজাহাজকেও যে অবহেলে নাজেহাল করে দিনের পর দিন—তারই রাক্ষুসে খপ্পরে পড়ে একটির পর একটি জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে সাগরের জলে—কিন্তু সত্যিই কি এটা দানব নারহোয়াল না অন্য কিছু ?......

১৮৬৭ সালে একটা রহস্যময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় স্কোটিয়া জাহাজ। আমি তখন নিউইয়র্কে ছিলাম। প্যারীর মিউজিয়ামে প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপনা করতাম এবং সেই সূত্রেই উত্তর আমেরিকা গিয়েছিলাম দুষ্প্রাপ্য কিছু উদ্ভিদ এবং প্রাণী সংগ্রহের অভিযানে। ফ্রান্সে ফেরবার পথে নিউইয়র্কে থাকার সময়ে ঘটল এই বিচিত্র ঘটনা।

অতলান্তিক মহাসাগরের মাঝখান দিয়ে দিব্বি তরতর করে জল কেটে ছুটে চলেছিল স্কোটিয়া জাহাজ। আচমকা একটা ছোট্ট ধাক্কা লাগে জাহাজে। ছ ফুট চওড়া একটা বিশাল ফুটো দিয়ে হু হু করে জল ঢুকতে থাকে জাহাজের খোলে। সেই অবস্থাতেই ডুবু-ডুবু হয়ে কোনোরকমে লিভারপুল বন্দরে পৌঁছানোর পর ড্রাই ডকে জাহাজ তোলা হলো। তখনই স্তম্ভিত হয়ে গেল ইঞ্জিনীয়াররা ফুটো দেখে। লোহার পুরু চাদরে পরিষ্কার একটা তেকোণা গর্ত। দেখলেই মনে হয় যেন কোনো যন্ত্র দিয়ে জখম করে দেওয়া হয়েছে জাহাজকে।

হৈ-হৈ পড়ে গেল সারা নিউইয়র্ক শহরে। গত এক বছর ধরে অদ্ভুত খবর আসছিল সাগর যাত্রীদের কাছ থেকে। বিশাল চুরুটের মত লম্বাটে গড়নের

আশ্চর্য একটা জিনিষ নাকি অনেকের চোখে পড়েছে। অন্ধকারেও ঝকমক করতে থাকে জিনিষটা এবং তিমি মাছের চেয়েও তা অনেক দ্রুতগামী। কোনো কোনো নাবিক বললে, জিনিষটা আসলে এক মাইল চওড়া আর তিন মাইল লম্বা। একজন ক্যাপ্টেন ভেবেছিলেন অষ্ট্রেলিয়া উপকূল সংলগ্ন নতুন একটা সাগরে-ডোবা শৈলশ্রেণীই বুঝি আবিষ্কার করে ফেললেন তিনি। তোড়জোড় করে সবে নক্সায় অবস্থান নির্দেশ করতে যাচ্ছেন তিনি, এমন সময়ে প্রচণ্ড বেগে দুটো জলের ধারা 'শৈলশ্রেণী' থেকে বেরিয়ে চকিতে ধেয়ে উঠলো প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, এই জিনিষটার অবিশ্বাস্য গতিবেগ। কেন না এত অল্প সময়ের ব্যবধানে জিনিষটাকে সমুদ্রের এমন দূর দূর অঞ্চলে দেখা গেছে যে প্রচণ্ড গতিবেগ ছাড়া এই দীর্ঘ পথ এত তাড়াতাড়ি পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না কোন ক্রমেই।

পৃথিবীর প্রত্যেকটা খবরের কাগজে ফলাও করে এই রহস্যময় দানবের গল্প ছাপা হতে লাগল। কেউ বললে জানোয়ারটা আসলে একটা অতিকায় সামুদ্রিক সরীসৃপ। বিজ্ঞানীমহলেও হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। তাঁদের মতে ওটা ভাসমান শৈলশ্রেণী তো নয়ই, দ্বীপও নয়। নিশ্চয় একটা দানবিক তিমি, আর না হয় দারুণ শক্তিশালী কোনো সাবমেরিন। আর সাবমেরিনই যদি হয়, তাহলে ভাববার কথা। কেন না, এত গোপনে এরকম যন্ত্র তৈরী করতে গেলে যত টাকার দরকার, তা একমাত্র কোনো দেশের সরকারেরই থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে খবর নেওয়া হলো ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রুশিয়া, স্পেন, ইটালী, আমেরিকা, এমনকি তুরস্কেও। কিন্তু একবাক্যে সবাই বললে এ ডুবোজাহাজ সম্বন্ধে বাস্তবিকই তারা কিছুই জানে না।

আমি নিউইয়র্কে পৌঁছোলে এ প্রসঙ্গে আমার মতামত চাওয়া হলো। 'গভীর সমুদ্রের রহস্য' নামে একটা বই লিখেছিলাম আমি। তাই সবাই ভাবলে এ সম্বন্ধে সত্যিই আমি কিছু আলোকপাত করতে পারব। নিউইয়র্ক হেরাল্ডে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করলাম সবার অনুরোধে। তাতে বললাম, জিনিষটা আসলে একটা অতিকায় নারহোয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য নারহোয়াল ষাট ফুটের বেশী লম্বা হয় বলে জানা নেই আমাদের। কিন্তু এই খুনে-নারহোয়ালটা প্রায় তিনশো ফুট লম্বা। আদিম যুগের দানব-নারহোয়াল হলেও হতে পারে। একমাত্র নারহোয়াল আর সী-ইউনিকর্ণের মাথাতেই ইস্পাত-কঠিন সুদৃঢ় খড়্গ থাকে—যার এক ধাক্কায় লোহার পুরু পাতও ফুটো হয়ে যেতে পারে।

আমার নিবন্ধ পড়ে দারুণ জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো জনসাধারণের মধ্যে।

ইতিমধ্যে আরও জাহাজ-ডুবির খবর আসতে লাগত। ভয় পেয়ে গেল সবাই। ভাবলে খুনে জানোয়ারটাই রয়েছে এ সবের মূলে।

ঠিক এই সময়ে কাগজে পড়লাম সমুদ্রের এই বিভীষিকাকে নিপাত করার জন্যে অভিযান পাঠানো হচ্ছে আমেরিকান নেভী থেকে। বিশাল কামানবাহী যুদ্ধজাহাজটার নাম 'আব্রাহাম লিঙ্কন্'। অভিযান পরিচালনা করবেন কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুট। জাহাজ ছাড়ার যখন মাত্র তিন ঘণ্টা বাকী, ঠিক তখনি হোটেলে একটা চিঠি এসে পৌছোলো আমার নামে!

চিঠিটা লিখেছেন আমেরিকান নেভীর সেক্রেটারী। অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি চিঠির মধ্যে।

এ চিঠি আসার আগে চন্দ্রালোক গমনের মত এই দানব-শিকারে যাওয়ার সম্ভাবনাও স্বপ্নাতীত ছিল আমার কাছে। কিন্তু চিঠিখানা পাওয়ার পরেই মনে হলো, দুনিয়ার সব ঐশ্বর্যের বিনিময়ে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নই আমি।

হাঁক-ডাক দিয়ে আমার একান্ত অনুগত পরিচারক কনসেলকে ডাকলাম। কথার ফাঁকে ফাঁকেই বিদ্যুৎগতিতে জিনিষপত্র গোছানো শুরু হলো। হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে আমার সংগ্রহগুলো প্যারীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। তারপর একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে ঘড় ঘড় শব্দে নিউইয়র্কের রাস্তা কাঁপিয়ে যখন ডকে পৌছোলাম, দেখলাম গল্ গল্ করে কুচকুচে কালো ধোঁয়ার রাশি বেরুচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কনের দু'দুটো বিশাল চিমনি দিয়ে।

জাহাজের ওপরেই আলাপ হলো কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুটের সাথে। এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নড়ে উঠল জাহাজ—শুরু হলো আমাদের বিচিত্র অভিযান।

নদীর মাঝ দিয়ে সাগর অভিমুখে যেতে যেতে দুই তীরে কাতারে কাতারে নর-নারীকে রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে দেখলাম। এমন কি দুই কেল্লার মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সবচেয়ে বড় পাল্লার কামান থেকে তোপধ্বনিও করা হলো আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে।

তিমি শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম মজুদ ছিল জাহাজে। হাতে ছোঁড়ার সাদাসিদে হার্পুন থেকে শুরু করে আধুনিক হার্পুন-বন্দুক—কিছুই আর বাকী ছিল না। আর ছিল নেডল্যাণ্ড। হার্পুন ছোঁড়ার ওস্তাদদের রাজা বলা চলে নেডকে। ছ'ফুট লম্বা অসুরের মত চেহারা তার। কুইবেক তার জন্মস্থান

এবং আমিও ফরাসী। সুতরাং অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। মেরুসমুদ্রে তিমি শিকারের বহু অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী শুনলাম তার কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুট দু'হাজার ডলারের একটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। জানোয়ারটাকে সবার আগে যে দেখতে পাবে, তাকেই দেওয়া হবে এই পুরস্কার। কাজেই সবার উৎসাহ দারুণ বেড়ে গিয়েছিল। দিনরাত প্রত্যেকেই ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো সমুদ্রের অথই জলরাশির ওপরে। কিন্তু কোথায় কি? শুধু প্রতীক্ষাই সার হলো। দানবটার টিকিও দেখা গেল না। ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছে কয়েকটা আমেরিকান তিমি-শিকারী নৌকার কাছে আশাজনক কোন খবর পাওয়া গেল না। তীরবেগে জল কেটে দক্ষিণ আমেরিকার—উপকূল বরাবর এগিয়ে চললাম আমরা। তারপর কেপহর্ণ ঘুরে গিয়ে পড়লাম প্রশান্ত মহাসাগরে।

পুরস্কারের তোয়াক্কা করি না আমি। কিন্তু আমার অদম্য আগ্রহই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখল ডেকের উপর। স্বচক্ষে এই বিভীষিকা দেখতেই হবে। চোখ টন টন করতে লাগল একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকার জন্য। কিন্তু কচিৎ তরঙ্গে আন্দোলিত কালো তিমির বিশাল পিঠ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না।

সাতাশে জুলাই নিরক্ষরেখা পেরিয়ে এলাম আমরা। এগিয়ে চললাম পশ্চিম দিকে, চীনাসমুদ্রের দিকে। কিন্তু নাবিকদের ধৈর্য ফুরিয়ে এসেছিল। শেষকালে চাপে পড়ে কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুটও স্থির করলেন আর তিন দিনের মধ্যে যদি সমুদ্র-দৈত্যকে দেখা না যায়, তাহলে হাল ঘুরিয়ে আমেরিকায় ফিরে যাবেন উনি।

অসহ্য উদ্বেগের মধ্যে কেটে গেল দুটো দিন। লোভ দেখিয়ে জানোয়ারটাকে আকর্ষণ করে আনার জন্যে বড় বড় মাংসের টুকরো ফেলা হতে লাগল জলের মধ্যে। কিন্তু তার ফলে মহাভোজে মেতে উঠল হাঙরগুলো—দানবটার লেজের ডগাও দেখা গেল না কোনো দিকে।

রাত্রি নামল। রাত ভোর হলেই প্রতিশ্রুতিমত কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুট কালকেই রওনা হবেন স্বদেশাভিমুখে। উত্তেজনা এবার চরমে উঠলো। প্রত্যেকেই এসে জড়ো হলো ডেকের ওপরে শেষ মুহূর্তে দানবটার দর্শন লাভের আশায়।

আর, তারপরেই একটা বিকট চিৎকার ছড়িয়ে পড়লো জাহাজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত।

"আহোয়! ঐ তো হোথায়! সেই জিনিষটা!"

নেডের চিৎকার।

চিৎকার শুনেই সচকিত হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকে। নেডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা আগেই ধরা পড়েছে, এবার তা আমাদের প্রত্যেকেরই চোখে পড়ল।

জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে কয়েক ফ্যাদম জলের নীচে অদ্ভুত একটা আলো জলছিল। উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধান এই আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে জানোয়ারটার গা থেকেই।

আর তারপরেই সভয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দানবটা।

চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হট্টগোল উঠেছিল জাহাজময়।

কিন্তু অবিচল কণ্ঠে হুকুম দিয়ে গেলেন কম্যাণ্ডার। বাঁ করে অর্ধবৃত্তাকার পথে আব্রাহাম লিঙ্কন ঘুরে গিয়ে আগুয়ান জানোয়ারটার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। কিন্তু দ্বিগুণ গতিবেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল অদ্ভুত দানবটা। কিছুদূর এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চক্রাকারে জাহাজটাকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিলে। কলে-চলা জাহাজ যাওয়ার সময়ে যেমন ধোঁয়ার রেখা রেখে যায় পেছনে, ঠিক তেমান পুঞ্জ পুঞ্জ আলোর কুয়াশা পেছনে ফেলে আসা উত্তাল জলে মিশিয়ে রেখে অবিশ্বাস্য গতিতে পরিক্রমা সম্পূর্ণ করলো জানোয়ারটা এবং পরমুহূর্তেই উল্কাবেগে ধেয়ে এল জাহাজ লক্ষ্য করে।

"গেল, গেল" রব উঠল জাহাজে। কিন্তু কিছুদূরে এসেই আচমকা মিলিয়ে গেল তীব্র আলোর ছটা। ক্ষণপরেই আলোর দীপ্তি ভেসে উঠলো জাহাজের অপর ধারে। জাহাজের তলা দিয়ে জানোয়ারটা ডুব দিয়ে ওধারে গেল, না, প্রদক্ষিণ করে গেল, রাতের অন্ধকারে তা ধরতে পারলাম না।

ঝপঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে আমাদের জাহাজ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে অবাক হয়ে কম্যাণ্ডারকে শুধোলেন, "ব্যাপার কি?"

উনি বললেন—"প্রফেসর, রাতের আঁধারে জানোয়ারটার সঙ্গে লড়াই করে আমার জাহাজ এবং লোকজনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি না। কাল দিনের আলোয় শুরু হবে আক্রমণ।"

সে রাতে প্রত্যেকের চোখ থেকে ঘুম উড়ে গেল। মাঝরাতে কিন্তু আচম্বিতে অদৃশ্য হয়ে গেল দানবটা। যেন ফস্ করে নিভে গেল কোনো অতিকায় জোনাকি।

রাত ছুটোর সময়ে আবার দেখা গেল আলোটা। আর শোনা গেল জলে লেজ আছড়ানোর প্রচণ্ড শব্দ, শ্বাস-প্রশ্বাসের বিচিত্র আওয়াজ। সকাল হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল আক্রমণ পর্ব। হারপুন বাগিয়ে নেড দাঁড়ালে নিজের জায়গায়। তারপর পুরোদমে চালিয়ে দেওয়া হল ইঞ্জিন।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটার অত্যুগ্র আলোর দীপ্তি নিভে গিয়েছিল। মাইল দেড়েক দূরে ঢেউয়ের গজখানেক ওপরে ভাসছিল তার দীর্ঘ কালো চেহারা। অতিকায় তিমিমাছের মতই জলের ধারা ছুঁড়ে দিচ্ছিল প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে। চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে কম্যাণ্ডার আদেশ দিলেন পুরোদমে জানোয়ারটার দিকে জাহাজ ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য। গল্ গল্ করে ধোঁয়া ছেড়ে ছুটে গেল জাহাজ। কিন্তু ঠিক ততখানি বেগে সরে দাঁড়ালো জানোয়ারটা। মাঝখানেই ব্যবধান রইল সেই একই।

রাগে দাড়ি টানতে টানতে হুংকার দিয়ে উঠলেন কম্যাণ্ডার—"আরও জোরে!"

সব কিছু ছাপিয়ে উঠলো ইঞ্জিনের প্রচণ্ড নির্ঘোষ। থর থর কাঁপতে লাগল জাহাজের প্রত্যেকটা পাটাতন। কিন্তু ঠিক ততখানি বেগে এগিয়ে চলল জানোয়ারটা। যেন খেলার আনন্দে মেতেছে সে।

দাঁত কিড়মিড় করে কামান চালানোর আদেশ দিলেন কম্যাণ্ডার।

কিন্তু মসৃণ চামড়ার ওপর পিছলে গেল গোলাটা—ঠিকরে গিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে।

সারাদিন ধরে চললো এই পিছু নেওয়ার খেলা। সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকারে ঢাকা পড়লো সাগরের জল। অদ্ভুত জানোয়ারটারও আর কোনো হদিশ পেলাম না।

কিন্তু রাত এগারোটার সময়ে আবার মাইল তিনেক দূরে আগের রাতের মতই সমুদ্রের বুকে জ্বলে উঠল চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো, মনে হলো সারা দিনের পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে নারহোয়ালটা।

স্বর্ণ সুযোগ। আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে গেল 'আব্রাহাম লিঙ্কন'। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে ভেসে যেতে লাগল আলোময় কালো দানবটার দিকে। জাহাজ থেকে যখন মাত্র বিশ ফুট দূরে রয়েছে নিশ্চুপ জানোয়ারটা, তখন মাথার ওপর হার্পুন ঘুরিয়ে ভীমবেগে ছুঁড়ে দিল নেডল্যাণ্ড। নারহোয়ালটার গায়ে হাতিয়ারটা আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা ঠং শব্দ ভেসে এল কানে।

চোখের পলক ফেলার আগেই নিভে গেল সেই ইলেকট্রিক আলো। হু'তুটো বিশাল জলের ধারা এসে পড়লো জাহাজের ওপরে। প্রচণ্ড তোড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব কিছু। ছিঁড়ে গেল দড়িদড়া, আছড়ে পড়লো নাবিকেরা। নিদারুণ একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে আমি রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়লাম সমুদ্রগর্ভে।

জলে পড়েই তলিয়ে গিয়েছিলাম। সাঁতারটা ভালই জানতাম, তাই চট করে ভেসে উঠতে পারলাম। উঠেই দেখলাম পূবদিকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কনের আবছা ছায়া।

ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করতে করতে প্রাণপণে হাত-পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম কিছুদূর। কিন্তু তারপরেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, আমি ডুবতে শুরু করলাম, ভিজে পোশাকের বাঁধনে অনড় হয়ে এল আমার হাত-পা।

কয়েক ঢোক নোনাজল খেয়ে যখন তলিয়ে গিয়েছি, ঠিক এই সময়ে শক্ত মুঠিতে আমার পোশাক ধরে যে টেনে তুললে, সে কনসেল।

"কনসেল! তুমি।"

"হাঁ, স্যার আমি। আপনি জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে পড়েছিলাম আপনার পেছনেই।"

"কিন্তু জাহাজটা যে চলে গেল।"

"উপায় নেই, স্যার। জানোয়ারটার দারুণ কামড়ে জাহাজের প্রপেলার আর রাডারের দফারফা হয়ে গেছে। কাজেই অথই জলে নিরুপায় হয়ে ভেসে যাওয়া ছাড়া আব্রাহাম লিঙ্কনের আর কোনো উপায় নেই! জলে পড়ার আগেই ওদের চিৎকার শুনে খবরটা জেনেছিলাম বলেই চেঁচামেচি করছি না আমি।"

"তা'হলে উপায়?" অসহায় স্বরে বলি আমি।

ছুরি বার করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পোশাক কেটে আমাকে ভারমুক্ত করে দিলে কনসেল। নিজের পোশাকও বিসর্জন দিলে সেইভাবে। তারপর শুরু হলো পালা করে একজনের সাঁতার কাটা এবং অপর জনের ভাসমান দেহকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। জানি না এইভাবে কতক্ষণ যেতে হবে, কি-ই বা আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে কিছু তো একটা করা দরকার। তাই 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ' নীতিকে ইষ্টমন্ত্র করে শুরু হলো পালাবদল করে সাঁতার দেওয়া।

এরপর এমন একটা সময় এল যে আমার দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটুকুও নিঃশেষিত হলো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে এল। কয়েক ঢোক নোনা জল

খাওয়ার পর দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, মগজ যখন ঝিমঝিম করছে, ঠিক তখনি আমি ধাক্কা খেলাম একটা কঠিন বস্তুর সাথে। সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ পাওয়ার আগে মনে আছে বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে কে যেন আমাকে জলের ওপরে তুলে নিলে।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দুটি উদ্বিগ্ন মুখকে আমার ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখেছিলাম। একজন কনসেল এবং অপর জন নেড।

ধড়মড় করে করে উঠে উঠে বসে বললাম—"নেড, তুমি ?"

"হ্যাঁ, প্রফেসর, আমি। বাজির টাকাটার মায়া ত্যাগ করতে পারিনি বলে এবার জানোয়ারটার পিঠেই চেপে বসেছি। প্রফেসর, অত জোরে হার্পুন ছোঁড়া সত্ত্বেও তা টং করে লেগে ঠিকরে গিয়েছিল কেন, তা এবার বুঝেছি। ইস্পাতের বর্ম কি হার্পুন ভেদ করতে পারে ?"

"নেড, তুমি বলছো কি ?"

"ঠিকই বলছি, প্রফেসর। আপনি যার ওপর বসে আছেন, তা আসলে একটা অতি কঠিন ধাতু। হাত বুলোলেই বুঝবেন। আর যার পেছনে আমরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে তেড়ে গিয়েছিলাম, সেটা তিমি নয়, নারহোয়ালও নয়—বলুন তো কি ?"

"ডুবোজাহাজ !" বিমূঢ়স্বরে যন্ত্র-চালিতের মত বলে উঠলাম আমি।

ভোরের আলো ফুটে উঠছিল পূবের দিগন্তে। পায়ের তলার ভাসমান বিশাল বস্তুটা এবার নড়ে ওঠে। কিছুক্ষণ প্রচণ্ড শব্দে জলকেটে চলার পর ডুবতে শুরু করল।

লাফিয়ে উঠলাম আমরা সবাই। নেড পাগলের মত দমাদম শব্দে পদাঘাত করতে করতে অর্থহীন চিৎকার করতে লাগল।

আচমকা নিশ্চল হয়ে গেল বিচিত্র জলযানটা। ঘড়াং করে একটা হ্যাচ তুলে বেরিয়ে এল একজন পুরুষ মূর্তি। পরমুহূর্তে অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে আবার সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। এবার পর-পর উঠে এল আটজন মুখোসপরা মূর্তি এবং আমরা বাধা দেওয়ার আগেই বিদ্যুৎগতিতে আমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল সেই রহস্যময় মেশিনের মধ্যে।

পায়ের তলায় অনুভব করলাম লোহার সিঁড়ি। তারপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মিশমিশে অন্ধকারময় একটা ঘরের মধ্যে এবং ঘটাং করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজা।

একটু পরেই দপ করে ইলেকট্রিক আলোর একটা ফানুস জলে উঠল মাথার

ওপর। মসৃণ দেওয়ালের একটা অংশ খুলে গেল দরজায় মত। ভেতরে ঢুকল দুটি মূর্তি।

তাদের মধ্যে একজন যে দলপতি তা বুঝলাম এক পলকেই। মুখ দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত দৃঢ় তার চরিত্র। শান্ত মুখচ্ছবি, কিন্তু বেজায় চটপটে। মুখের পরতে পরতে দুর্জয় সাহসের অভিব্যক্তি। বুক চিতিয়ে সিধে হয়ে গর্বিত শির উঁচিয়ে দাঁড়ালো সে। কালো কালো দুই চোখে গভীর আত্মপ্রত্যয় ঢেলে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল আমাদের পানে। মুখবর্ণ একটু পাণ্ডুর। কিন্তু আভিজাত্যের দ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ছিল তার সর্বাঙ্গ থেকে। দীর্ঘ তনু, চওড়া ললাট আর অল্প-অল্প কম্পমান আঙুলে আবেগের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর তার চোখ? যেন দুটো টেলিস্কোপ। অন্তরের নিগূঢ় অঞ্চল পর্যন্ত সে দৃষ্টি পৌঁছে যায় চকিতে। স্বচ্ছ কিন্তু মর্মভেদী সে চাহনিকে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ নয়।

থমথমে নৈঃশব্দ ভেঙে ফরাসীতে বলতে লাগলাম আমাদের দুরবস্থার কাহিনী। নিঃশব্দে তা শুনে গেল ওরা। দলপতির চোখে মুখে কখনও আগ্রহ আবার কখনও একাগ্রতার ছাপ অন্য সব কিছু ভাবকে ছাপিয়ে উঠলো বটে, কিন্তু আমার বক্তিমের বিন্দু-বিসর্গ বুঝেছে বলে মনে হলো না।

হাল ছাড়লাম না আমি। আমার অনুরোধে নেড একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলো ইংরেজীতে। তারপর কনসেল বললো জার্মানীতে। সর্বশেষে ভাঙা ভাঙা ল্যাটিনও বললাম আমি। কিন্তু ফল হলো আগের মতই। নির্বাক মুখে দুজনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমাদের পানে। তারপর কি এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই বোমার মত ফেটে পড়লো নেড—"কোথাকার বর্বর এরা? পৃথিবীর কোনো সভ্য ভাষাই বোঝে না?"

আবার দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করল একজন ষ্টুয়ার্ড। অন্যান্যের মত এর মাথাতেও সামুদ্রিক ভোঁদড়ের লোমের টুপী, সীলমাছের চামড়ার বুট এবং একজাতীয় অদ্ভুত অচেনা বস্ত্র দিয়ে তৈরী পোশাক! হুবহু সেই রকমই কতকগুলো সামুদ্রিক কোট আর প্যাণ্ট নামিয়ে রাখল সে। পোশাকগুলো যে আমাদের জন্যেই, তা না বললেও বুঝলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিজে পোশাক পরিবর্তন শুরু করলাম তিনজনে।

ইতিমধ্যে টেবিলের ওপর আহার্য সাজিয়ে রেখে গেল ষ্টুয়ার্ড। সারি সারি সাজানো চীনেমাটি আর রূপোর প্লেটে সে সব খাবার দেখে নেড বলে উঠলো—

"দেখুন চেখে, হয়তো কচ্ছপের যকৃত, হাঙরের মাথা আর ডগফিসের মাংস ভাজাই বানিয়েছে তোফা করে!"

কিন্তু এ আশংকা অমূলক। খাবারের মধ্যে কয়েকটা না-জানা মাছ দেখলাম। রুটি আর মদ না থাকায় গজ গজ করতে লাগল নেড। খাবার জলটা কিন্তু বেশ টলটলে পরিষ্কার। রান্না চমৎকার এবং বাস্তবিকই উপাদেয়। অমৃত ভোগের মতই আকণ্ঠ খাওয়ার পর মেঝেতে পাতা মাদুরের ওপর চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম তিনজনে এবং দেখতে দেখতে হারিয়ে গেলাম নিদ্রার অতলে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙার পর দেখলাম নেড আর কনসেল তখনও ঘুমে অচেতন। ঘরের বদ্ধ গুমোট বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। কি উপায়ে এরা অক্সিজেন সরবরাহ করে ঘরের মধ্যে তাই ভাবছি, এমন সময়ে এক ঝলক টাটকা সমুদ্রের হাওয়ায় নিমেষে লঘু হয়ে উঠল ঘরের শ্বাসরোধী বাতাস। ফুরফুরে হাওয়ায় নেড আর কনসেলেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু এই বিচিত্র সাবমেরিনের ততোধিক বিচিত্র জলদস্যু আমাদের আর আদৌ খেতে দেবে কিনা, তা যখন জানিনা তখন বৃথা ছটফট না করে সাত-পাঁচ কথায় ক্ষুধার্ত দুই সঙ্গীকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ক্ষিদের জ্বালায় নেড তখন উন্মাদের মত ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে, দমাদম শব্দে লাথি মারছে দেওয়ালের ওপর আর সমানে মুণ্ডপাত করে চলেছে ডুবোজাহাজের প্রত্যেকের। ওর হাবভাব দেখে বাস্তবিকই শংকিত হয়ে পড়লাম আমি।

যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো। একটু পরেই দরজা খুলে গেল এবং ঘরে প্রবেশ করল একজন ষ্টুয়ার্ড। চকিতে নেড তার ওপরে লাফিয়ে পড়ল বাঘের মত। ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে সে বেচারী ছিটকে পড়লো মেঝের ওপর। বুকের ওপর উঠে বসে দুই হাতে তার টুঁটি টিপে ধরলো নেড। আমি আর কনসেল প্রাণপণে চেষ্টা করছি ওকে টেনে আনার, এমন সময়ে পরিষ্কার ফরাসীতে পেছন থেকে কে বলে উঠল:

"মিঃ ল্যাণ্ড, শান্ত হও। প্রফেসর, দয়া করে আমার কয়েকটা কথা আপনি শুনবেন কি?"

বক্তা ক্যাপ্টেন স্বয়ং। কথাগুলো শুনেই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল নেড। টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর দুই হাত রেখে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিমায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন।

ঘরের সেই অস্বাভাবিক নীরবতা ভঙ্গ করার মত সাহস ছিল না আমার। ক্যাপ্টেনই প্রথম কথা শুরু করলেন বিশুদ্ধ ফরাসীতে—"আমি ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী এবং ল্যাটিনে কথা বলতে পারি। কিন্তু তখন বলিনি বিশেষ কারণে। চার ভাষায় বলা চারটে গল্পই যখন দেখলাম একই, তখন বুঝলাম আপনারা মিথ্যে বলেন নি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছি আমি। তবুও আপনারা এসেছেন আমাকে বিরক্ত করতে…"

"এসেছি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

"সাতসমুদ্র হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে আব্রাহাম লিঙ্কন কি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে? আমার জাহাজ লক্ষ্য করে কামান ছোঁড়া হয়েছে কি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে? এই জাহাজ তাগ্ করে হার্পুন ছোঁড়ার প্রচেষ্টাও কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছিল নেডল্যাণ্ড?" রাগে গম্‌গমে হয়ে ওঠে ক্যাপ্টেনের স্বর। বজ্রগর্ভ কণ্ঠে আবার বলেন উনি—"যাক, আপনারা যুদ্ধবন্দী। দয়া করে আপনাদের জীবন রক্ষা করেছি। জলের তলায় ডুব মেরে আপনাদের ভাসিয়ে দেওয়াই কি আমার উচিত ছিল না?"

"এ রকম ঔচিত্যবোধ কোনো সভ্য মানুষের থাকে না—থাকে বর্বরের।" বললাম আমি।

তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন—"প্রফেসর, আপনাদের তথাকথিত সভ্য মানুষ আমি নই। ব্যক্তিগত কারণে সারা দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমি। সভ্য জগতের কোনো নিয়ম-কানুন আমি মানি না। আপনাকে নিষেধ করছি, ভবিষ্যতে তাদের কথা আমার কাছে আর উচ্চারণ করবেন না।"

ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠেছিল ক্যাপ্টেনের দুই চোখ। বাজের মত সেই হুংকার শুনেই উপলব্ধি করলাম, নিশ্চয় ভয়ংকর একটা ইতিহাস লুকিয়ে আছে মানুষটার জীবনে। আইন উনি মানেন না, সমুদ্রের গভীরে কোনো আইনের রক্তচক্ষুও তাঁকে শাসন করতে অক্ষম। একমাত্র বিবেক আর ঈশ্বর ছাড়া আর কারও অনুশাসনকে ইনি আমলও দেন না।

ইস্পাত-কঠিন স্বরে আবার বললেন ক্যাপ্টেন—"আপনাদের আমি এ জাহাজে স্থান দিতে পারি শুধু কয়েকটি সর্তে। মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটবে, যা দেখবার অধিকার আপনাদের থাকবে না। তখন আপনাদের আমি বন্দী করে রাখবো এই ঘরে। এবং জীবিত অবস্থায় আপনারা আর সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবেন না। আমৃত্যু এইখানেই আমাদের মতই স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবেন আপনারা।"

"অর্থাৎ এ সর্ত মেনে না নিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে ?" বললাম আমি।

"অগত্যা।" গম্ভীরস্বরে বললেন ক্যাপ্টেন।

লাফিয়ে উঠে নেড বললে—"আমি কথা দিতে পারছিনা।"

অবিচল কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললেন—"তোমাকে আমি দিতেও বলছি না।"

সব দিক ভেবে আমি বললাম—"আপনার সর্ত আমি মেনে নিলাম।"

অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে ক্যাপ্টেন বললেন—"প্রফেসর, সমুদ্রের অতল রহস্য সম্বন্ধে আপনার কয়েকখানা বই আমি পড়েছি। কিন্তু আপনার জ্ঞান অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। আমি আর একবার সারা পৃথিবী ভ্রমণ করতে বেরুবো। তখনই সাগরের বিপুল রহস্য স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাবেন আপনি।"

শুধোলাম—"আপনাকে কি নামে ডাকবো, ক্যাপ্টেন ?"

"ক্যাপ্টেন নিমো, আর এই আমার সাবমেরিন—নোটিলস।"

নেড আর কনসেলকে আদের কেবিনে খাবার দেওয়া হয়েছিল। আমাকে নিয়ে সুদীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো এলেন তাঁর ডাইনিং রুমে। বিলাসবহুল আসবাবপত্রে সাজানো কেবিনের পর কেবিন দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। জলের তলায় এ এক অপরূপ ভাসমান দুনিয়া।

বিস্তর খাবার সাজানো ছিল টেবিলের ওপর। আমার চোখে মুখে যে কৌতূহল ফুটে উঠেছিল, তা বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন বললেন—"এ সব খাবারের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, প্রফেসর। তার কারণ যা কিছু দেখছেন, তার সবই সমুদ্র থেকেই এসেছে। এই খেয়েই যথেষ্ট শক্ত সমর্থ রয়েছি আমরা এবং থাকবোও।"

অবাক হয়ে বললাম—"জল থেকে মাছ পেয়েছেন, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এই মাংসগুলো এলো কোত্থেকে ?"

"ওটা কচ্ছপের মাংসভাজা আর এটা ডলফিনের যকৃত, খেতে অনেকটা শুওরের মাংসের মত। আর এই হলো তিমিমাছের দুধ থেকে তৈরী পনীর। নর্থ সী-র সমুদ্র-শৈবাল থেকে তৈরী চিনি দিয়ে মিষ্টি করা হয়েছে এই পনীর। সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-অ্যানিমোন থেকে তৈরী জ্যামটার স্বাদের সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন উৎকৃষ্ট জ্যামের তুলনা চলতে পারে। প্রফেসর, সমুদ্র শুধু আমার আহার্যই জোগায় না, পরিধেয়ও দেয়। আপনি তো জানেন ঝিনুক, শামুক, গেঁড়ি জাতীয় কতকগুলো সামুদ্রিক প্রাণী এক ধরনের রেশমের মত তন্তু দিয়ে পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখে নিজেদের। এই আঁশকে বলা হয় বাইসাস। যে

জামা কাপড় আপনি পরে আছেন, তা বাইসাস থেকে তৈরী। ভূমধ্য সাগরের কয়েকটা কঠিন-ধর্ম প্রাণীর দেহের রক্তে রাঙানো হয়েছে এই পোশাক। আপনার শয্যায় পাতা আছে সমুদ্রের সবচেয়ে নরম উদ্ভিদ। লেখার জন্য পাবেন তিমি-মাছের হাড় দিয়ে তৈরী লেখনী আর কাট্‌ল্‌-ফিসের দেহ-নিংড়োনো কালি।"

"সমুদ্রকে আপনি ভালবাসেন ক্যাপ্টেন?"

"বাসি। পৃথিবীর দশভাগের সাতভাগ জুড়ে রয়েছে এই বিশাল জলধি। সমুদ্র অত্যাচারীর স্থান নয়—তারা হানাহানি করে মরে স্থলের ওপরে, জলের ত্রিশ ফুট নীচে কোনো ক্ষমতাই নেই তাদের। শুধু এই সমুদ্রের মধ্যেই আমি আমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারি!" কথা বলতে বলতে দারুণ উত্তেজিতভাবে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে কয়েকবার পায়চারী করলেন ক্যাপ্টেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"প্রফেসর, আসুন আপনাকে আমার নোটিলস দেখাই।"

পাতার পর পাতা জুড়ে লিখলেও বোধ করি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেদিন এই বিচিত্র জলযানের ভেতরে যে আশ্চর্য ছোট্ট দুনিয়া দেখেছিলাম, তার বর্ণনা। দেখেছিলাম সুবিশাল লাইব্রেরী, থরে থরে সাজানো সেখানে সব রকম রুচিরই কেতাব—তবে বিজ্ঞানেরই বেশী। দেখেছিলাম এমন এক অকল্পনীয় মিউজিয়াম সারা ইউরোপ খুঁজলেও যার সমকক্ষ মেলা ভার। দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছাড়াও এমন সব বস্তু সেখানে সযত্নে রক্ষিত থাকতে দেখেছিলাম, যার সন্ধান এখনও পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী পায়নি। দেখেছিলাম অগুন্তি রত্নরাজি, পায়রার ডিমের চাইতেও বড় বিচিত্র রঙের মুক্তার রাশি।

আর আশ্চর্য হয়েছিলাম ক্যাপ্টেন নিমোর শয়নকক্ষ দেখে। এ যেন সন্ন্যাসীর ঘর। একটা লোহার খাট, কাজ করবার টেবিল আর হাত ধোবার বেসিন ছাড়া আর কিছুই নেই! বিপুল বৈভবের পাশেই এই সুকঠোর তাপসিকতা দেখলেও বিচিত্র ভাবে ভরে ওঠে মনের দুকূল।

এরপর ক্যাপ্টেন নোটিলসের কলকব্জা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। নাবিকদের ব্যবহৃত সব রকম যন্ত্রপাতিই ছিল তাঁর ভাণ্ডারে। জলস্তরের তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার থেকে শুরু করে অতিরিক্ত কয়েকটা পীয়ারও রেখেছিলেন তিনি। নোটিলসের এই দানবিক শক্তির মূল উৎস কিন্তু ইলেকট্রিসিটি। সে সময়ে ইলেকট্রিসিটি সবে আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। ক্যাপ্টেন নিমো কিন্তু সমুদ্রজল থেকে সোডিয়ম নিষ্কাশন করে অতি সস্তায় প্রচুর পরিমাণে বানিয়ে নিতেন বিদ্যুৎ শক্তি। নোটিলসের প্রচণ্ড গতিবেগ এবং আলো আর উত্তাপের মূল উৎসই ছিল এই অফুরন্ত তড়িৎ-শক্তি।

শক্তিশালী পাম্প দিয়ে বাতাস-ঘরে প্রচুর ঘন বাতাস জমিয়ে রাখতেন ক্যাপ্টেন জলতলে দীর্ঘকাল থাকার জন্য। বিদ্যুৎ-চালিত একটা ঘড়ি এবং জাহাজের গতিমাপক একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও আমাকে দেখালেন ক্যাপ্টেন।

নোটিলসের ঠিক মাঝখানে এসে একটা কুয়োর মত খাড়া সুড়ঙ্গ দেখলাম। ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল কুয়োর ওপরে।

আমার কৌতূহলী চাহনি দেখে ক্যাপ্টেন বললেন—"ওপরে আমার নৌকা আছে, প্রফেসর।"

"তাই নাকি? কিন্তু নৌকায় চড়তে হলে নিশ্চয় জলের ওপর ভেসে উঠতে হয় আপনাকে?"

"নিশ্চয় না। নৌকোর ওপরে নীচে দুটো হ্যাচ আছে। নীচেরটা বন্ধ করে বাঁধন খুলে দিলেই ছিপির মতোই নৌকো ভেসে ওঠে জলের ওপর তারপর ডেকের হ্যাচ খুলে মাস্তুল লাগিয়ে পাল তুলে দাঁড় টানতে থাকি।"

"কিন্তু ফিরে আসেন কি করে?"

"আমি আসি না। নোটিলসই যায় আমার কাছে। ইলেকট্রিক তার মারফৎ টেলিগ্রাম পাঠালেই জাহাজ চলে যায় আমার কাছে।"

নোটিলসের আর এক প্রান্তে গিয়ে সমুদ্রের লোনা জলকে পরিশ্রুত করে টলটলে পানীয় জল তৈরী হতে দেখলাম। মোটর-রুমটা ছিল একদম পেছনে। এইখান থেকেই প্রচণ্ড বেগে নোটিলসের প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘণ্টায় পয়তাল্লিশ নট বেগেও চালানো যায় জাহাজকে।

চোখে দেখা সাঙ্গ হলে গ্যালারী রুমে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে শুধোলাম "ক্যাপ্টেন, সবই দেখালেন, কিন্তু এখনও অনেক গোপন তথ্যই রহস্য রয়ে গেল আমার কাছে।"

নির্নিমেষে আমার পানে তাকিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন—"তাও আপনাকে বলবো, মিঃ আরোনা। কেননা, নোটিলস থেকে আমার এই গোপন খবর নিয়ে কোনো দিনই সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবেন না আপনি।"

"মিঃ আরোনা, নোটিলস লম্বায় পঁচাত্তর গজ। সমস্ত জাহাজটা মোড়া রয়েছে দু'দুটো ইস্পাতের খোলে। একটার ওপর আর একটা থাকার ফলে প্রচণ্ড আঘাতও অবলীলাক্রমে প্রতিহত করতে পারে এই ডুবোজাহাজ। জাহাজের ভেতরে আছে বিশাল বিশাল কয়েকটা জলাধার। ডুব দেওয়ার সময়ে ট্যাঙ্কগুলো জলে ভরে নিই পাম্পের সাহায্যে। আবার খুব গভীরে

নামতে হলে কোণাকুণিভাবে জল কেটে পিছনে নেমে যেতে পারি হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যে জলের ট্যাঙ্ক ভর্তি না করেই।"

"বুঝলাম। কিন্তু চালক পথ দেখবে কেমন করে?"

"পোর্ট-হোল বসানো একটা টাওয়ারের মধ্যে থাকে চালক আর হুইল। দেওয়ালের মধ্যে টেলিস্কোপও গাঁথা থাকে। দুপাশ থেকে ইলেকট্রিকের তীব্র আলোয় দিনের মত ঝলমল করতে থাকে সমুদ্রের জল। আর তাই—

"বুঝলাম। কিন্তু এই আলোকেই আমরা নারহোয়ালের গা থেকে বিচ্ছুরিত ফসফরাসের দীপ্তি মনে করেছিলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেন, স্কোটিয়া জাহাজকে খামোকা কেন জখম করলেন বলুন তো?"

"সেদিন আমি জলের এক ফ্যাদম অর্থাৎ প্রায় ছফুট নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাইতেই ঠোক্কর লেগে যায় খোলে।

"আর আব্রাহাম লিঙ্কন?"

"প্রফেসর, ভুলে যাবেন না, আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাই আত্মরক্ষার জন্যই আপনাদের জাহাজকে শুধু অসহায় করে দিয়েছিলাম—ডুবিয়ে দিইনি।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে শুধিয়েছিলাম—"ক্যাপ্টেন, বাস্তবিকই অসীম ক্ষমতা আপনার নোটিলসের।" নোটিলসকে যে আপন সন্তানের মতই ভালবাসেন ক্যাপ্টেন, তা আমি বুঝেছিলাম। তাই আন্তরিক প্রশংসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম—"আচ্ছা ক্যাপ্টেন, এতবড় জাহাজটা এত গোপনে আপনি তৈরী করলেন কোথায়?"

"একটা নির্জন দ্বীপে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আনিয়েছিলাম টুকরো টুকরো অংশগুলো। খোলটা এসেছে ফ্রান্স থেকে, লণ্ডন থেকে প্রপেলারের রড, লিভারপুল থেকে ইস্পাতের বর্ম, গ্লাসগো থেকে প্রপেলার। প্যারিতে বানিয়েছিলাম ট্যাঙ্কগুলো, জার্মানীতে মোটর, সুইডেনে সামনের অংশটা, নিউইয়র্কে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো। প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পাঠিয়েছিলাম নক্সাগুলো। একত্র করেছিলাম এক নির্জন দ্বীপে তারপর জলে ডুব দেওয়ার আগে আগুন দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম সব কিছু।"

"আপনি দারুণ ধনবান, তাই না ক্যাপ্টেন?"

"আমার সম্পদের কোন পরিমাপ নেই, প্রফেসর। ফরাসী জাতীয় ঋণ আমি অনায়াসে মিটিয়ে দিতে পারি নিজের এতটুকু অসুবিধে না করে।"

এমন নির্বিকারভাবে কথাটা বললেন ক্যাপ্টেন যে, বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলাম আমি। ভদ্রলোক কি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন?

ক্যাপ্টেন বললেন "প্রফেসর, আজ নভেম্বরের আট তারিখে দুপুর বেলা শুরু হলো আমাদের সমুদ্রতল অভিযান। আমরা এখন রয়েছি জাপানের উপকূল থেকে প্রায় তিনশো মাইল দূরে। আপনি এখন গ্যালারীতে থাকুন—আমি চললাম ইঞ্জিনরুমে।"

গ্যালারীতে এসে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম এই আশ্চর্য মানুষটির কাণ্ড-কারখানা দেখে। অনেক কিছু জেনেছি, কিন্তু তাঁর বেদনাময় অতীত এখনও রহস্যাবৃতই থেকে গেল আমার কাছে।

টেবিলের ওপর রাখা বড় ভূগোলকটার ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম আমরা এখন রয়েছি কোথায়।

জমির ওপরকার নদীর মত সাগরের জলেও বিস্তর নদী আছে। উত্তাপ এবং রঙ দেখে চিনে নিতে হয় এই বিশেষ স্রোতগুলোকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হলো গাল্‌ফ্‌ ষ্ট্রিম। এই স্রোত ধরেই আমরা এখন ছুটে চলেছি। জাপানীরা এই সমুদ্র-নদীকে বলে কুরো-শিভো অর্থাৎ কালো নদী। অত্যন্ত গাঢ় নীলরঙের এই সামুদ্রিক স্রোতটি বিলক্ষণ উষ্ণও বটে। ভূগোলকের ওপর আঙুল রেখে স্রোতটার গতিপথ দেখছি, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল নেড আর কনসেল।

মিউজিয়াম দেখেই তো তাক্‌ লেগে গেল দুজনের। কিন্তু ও দেখে ভোলবার পাত্র নয় নেড। কি করে এই ইস্পাত কারাগার থেকে সটকান দেওয়া যায় সেই চিন্তাই তখন তার মাথায় ঘুরছে এবং কথাবার্তার মধ্যেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেনে আনছে সেই প্রসঙ্গ।

এমন সময়ে ঝপ করে সব অন্ধকার হয়ে গেল। নিঃসীম তমিস্রায় নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

নেড বললো—"এবার সব শেষ!"

আচমকা গ্যালারীর দুপাশে দেখা গেল আয়তাকার দুটো উজ্জ্বল আলো। ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সাগরের জল। সমুদ্র আর আমাদের মধ্যে ব্যাবধান রইল শুধু দুপাশে দুটি পুরু কাঁচের।

এই কাঁচের ওপারে যে অপরূপ দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তা ইহজীবনে ভোলবার নয়। আলো ঝলমলে প্রকৃতির হাতে গড়া সে এক বিপুল জলাধার—যার মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে খেলা করছে কত বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন দৈর্ঘের মাছ। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে ঝাঁক বেঁধে ছুটে এসেছিল অগুন্তি মাছের দল। আমি যখন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে দেখছি এই অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য দৃশ্য, নেড তখন মহাসমস্যায় পড়েছে এ মাছের মধ্যে কোনটা সুখাদ্য এবং কোনটা অখাদ্য, তাই নিয়ে।

প্রায় দুঘণ্টা একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম জানালার পাশে। তারপর দপ করে জ্বলে উঠল কেবিনের আলো। বন্ধ হয়ে গেল ইস্পাতের জানালা।

কেবিনে ফিরে এসে ডিনার খেয়ে সামুদ্রিক ঘাসের অতি-নরম শয্যায় শুতে না শুতেই রাজ্যের ঘুম এসে নামলো দুই চোখে।

সাতদিন কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না ক্যাপ্টেন নিমোর। আচম্বিতে অন্তরালে চলে যাওয়ার এই বৈশিষ্ট্যটুকুও বুঝি তাঁর রহস্যময় প্রকৃতির আর একটা দিক। তাই এ নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

ছ-দিনের দিন; কেবিনে এসে টেবিলের ওপর একটা চিঠি পেলাম। ক্রেস্‌পো দ্বীপের শিকার অভিযানে বেরুচ্ছেন ক্যাপ্টেন। আমাদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। নেড আর কনসেল তো খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল নিমন্ত্রণ বার্তা পড়ে। বহুদিন পর ডাঙায় নামা যাবে, একি কম আনন্দের কথা!

কিন্তু এ আনন্দ মিলিয়ে গেল পরের দিনই। ক্যাপ্টেনের সাথে খাবার টেবিলে দেখা হল। ওর কাছেই শুনলাম, আমরা ক্রেস্‌পো দ্বীপে যাচ্ছি বটে, কিন্তু দ্বীপের ওপরে নয়, নীচে। জলতলের সেই জঙ্গলের একমাত্র অধীশ্বর ক্যাপ্টেন নিমো এবং সেইখানেই নাকি পায়ে হেঁটে রাইফেল নিয়ে বেরুবো শিকার অভিযানে।

টাটকা মাংসের স্বাদ পাওয়া যাবে না শুনেই তিক্ত-চিত্তে সরে পড়ল নেড। আমি ভাবলাম, ক্যাপ্টেন কি সত্যিই উন্মাদ?

চোখে মুখে প্রতিফলিত আমার মনের ভাবনা ক্যাপ্টেনের অজানা ছিল না। তাই বললেন—"প্রফেসর, আপনি ভাবছেন আমি উন্মাদ।"

"কিন্তু জলের তলায় পায়ে হেঁটে—।"

"আমাদের সঙ্গে থাকবে চাপ দিয়ে ভরা বাতাসের সিলিণ্ডার। কেমিক্যাল থেকেও তৈরী হবে বাতাস। একটা বিশেষ ধরনের ফিলটার দিয়ে এই ঘন বাতাসই পাতলা হয়ে পৌছোবে আপনার নাকে। মাথাটা ঢাকা থাকবে পেতলের বর্তুলে ডুবুরিদের মত। নয় থেকে দশ ঘণ্টা বাতাস সরবরাহ অব্যাহত থাকবে এই বন্দোবস্তে।"

"চমৎকার। কিন্তু জলের তলায় দেখবেন কি করে?"

"বেল্টে বাঁধা থাকবে ইলেকট্রিক বাতি।"

"আর রাইফেল? জলের তলায় আবার রাইফেল কি?"

"প্রফেসর, এ সাধারণ রাইফেল নয়। এর গুলি ছুটে চলে বাতাসের চাপে। বুলেটগুলো ইলেকট্রিক। শিকারের গায়ে লাগলেই ক্ষুদে বোমার মত ফেটে যায়। এক একটা রাইফেলে এরকম কার্তুজ থাকে দশটা।"

খাওয়া শেষ করে মোটর-রুমের পেছনে ডুবুরি-পোশাকের ঘরে গেলাম। ডজন খানেক পোশাক ঝুলছিল দেওয়ালে।

এ পোশাকের পরিকল্পনা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে তাঁর কারিগরি প্রতিভার তারিফ না করে পারা যায় না। তামার পাতের ওপর খুব পুরু রবারের প্রলেপ লাগানো পোশাকের আগাগোড়া কোথাও সেলাই নেই। পা দুটো সরু হয়ে নেমে এসেছে সিসে দিয়ে ভারী করা দুটো পুরু জুতোর মধ্যে। হাতের দস্তানাও লাগাতেও হয় ঐ ভাবে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গীদের সাহায্যে কোন মতে পরলাম এই গুরুভার পোশাক। তারপর মাথায় হেলমেট আঁটার পালা। পেতলের কলারের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়া হলো ভারী হেলমেটটা। তিনটে পুরু কাঁচের জানালা ছিল হেলমেটে। বাতাস নিতেও দেখলাম কোনোরকম অসুবিধা হয় না। প্রত্যেকের কাঁধে ঝোলানো হল এক একটা আজব চেহারার শক্তিশালী বন্দুক।

নড়বার ক্ষমতা ছিল না। আমাকে আর কনসেলকে ওরা ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে পাশের একটা ক্ষুদে প্রকোষ্ঠে। সঙ্গে এলেন ক্যাপ্টেন এবং আরও একজন দানব চেহারার অনুচর। অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা। শিষ দেওয়ার মত সোঁ সোঁ শব্দ শুনলাম এবং অনুভব করলাম পায়ের তলা থেকে একটা ঠাণ্ডা স্রোত উঠে আসছে ওপর দিকে। বুঝলাম, জল ঢুকছে প্রকোষ্ঠে।

দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে গেল ঘরটা। এবার খুলে গেল একটা হ্যাচ। সবুজ রঙের একটা আলো জ্বলছিল। পরক্ষণেই সাবমেরিনের ভেতর থেকে আমরা নেমে এলাম সমুদ্রের তলদেশের ভূমির ওপর।

ক্যাপ্টেনই আমাদের পথ দেখিয়ে নিচে চললেন। মাঝখানে রইলাম আমি আর কনসেল। সবার পেছনে ক্যাপ্টেনের অনুচর। নীলচে আলোয় একশো ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তার ওদিকে নীলাভ কুয়াসার মত আঁধারে অস্পষ্ট ছিল সব কিছু। গুরুভার পোশাক নিয়ে জলের নীচে হাঁটতে এতটুকু অসুবিধে হচ্ছিল না, বরং বেশ মজাই লাগছিল। বেলা তখন দশটা। সূর্যের আলো জলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছিল মসৃণ বালির ওপর থেকে। তারও কিছুক্ষণ পড়ে তেরচা ভাবে সূর্যকিরণ জলের মধ্যে প্রবেশ করতেই বর্ণালীর মতই সাত রঙে ভেঙে গেল তা। রামধনুর মত আশ্চর্য সুষমায় রঙীন হয়ে উঠল জলতলের এই অপূর্ব দুনিয়া। কত বিচিত্র উদ্ভিদ, গুল্ম, কঠিন বর্মাবৃত প্রাণী এবং মাছ যে দেখলাম, তার ইয়ত্তা নেই। বহু পিছনে নোটিলস হারিয়ে গিয়েছিল নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে।

বেলা একটা নাগাদ ক্রিস্পো দ্বীপের ডুবো জঙ্গলে পৌঁছোলাম। বিরাট

বিরাট উদ্ভিদ সিধে উঠে গিয়েছিল ওপরের দিকে। ছোটখাটো গুল্ম থেকে শুরু করে গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোরও এই উর্ধ্বমুখ বৃদ্ধি লক্ষ্য করার মত। জমির ওপর ফুলের মত ছড়িয়ে দিয়েছিল সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-অ্যানিমোন—পাপড়ির মত মেলে-ধরা ডালপালার মধ্যে গুঞ্জনরত পাখীর ঝাঁকের মতই খেলা করছিল কত বিচিত্র রঙের মাছ। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে এইখানেই আমরা শুয়ে পড়লাম এবং দেখতে দেখতে ঘুমের রাশি নেমে এল চোখের পাতায়।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখলাম আমার আগেই ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর, তারপরেই আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে চোখে পড়ল এক গজ উঁচু একটা আতকায় সামুদ্রিক মাকড়শা গনগনে চোখে দুনিয়ার ক্রুরতা নিয়ে তাকিয়ে আমার পানে। ওৎ পেতে থাকার ভঙ্গী দেখেই বুঝলাম পর মুহূর্তেই মূর্তিমান বিভীষিকার মত লাফিয়ে পড়বে আমার ওপর। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে কনসেল আর ক্যাপ্টেনের অনুচরও উঠে পড়লো। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ তাঁর অসুরাকৃতি সঙ্গী রাইফেলের কুঁদো দিয়ে এক প্রচণ্ড আঘাত হানলে বিকট আটপেয়ে-টার ওপর। ঐ এক ঘা! ব্যস, তাতেই কুণ্ডলি পাকিয়ে অস্থির হয়ে পড়ল দানাবক কীটটা!

আবার এগিয়ে চললাম আমরা। জমি এবার ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে; এইখানে এসেই ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। গাঢ় অন্ধকার ঢাকতে উধাও হলো তীব্র আলোক-বর্শার সামনে। এরপরেই সামনে পড়লো খাড়া গ্র্যানাইটের দেওয়াল। বুঝলাম ক্রিসপো দ্বীপের তলদেশে এসে গিয়েছি।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর রাজ্যের সীমায় এসে গেলাম আমরা। এবার ফেরার পালা। ভিন্ন পথে আমাদের নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে ওঠবার পর আচম্বিতে গুল্ম ঝোপের মধ্যে লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়লেন ক্যাপ্টেন। ধড়ফড় করে ছিটকে পড়লো একটা সামুদ্রিক ভোঁদড়। লম্বায় পাঁচ ফুট। রুপোলি আর চেষ্টনাট রঙে রঙীন চামড়াটা নিশ্চয় বিলক্ষণ মূল্যবান। ক্যাপ্টেনের সঙ্গী কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিলে মরা ভোঁদড়টাকে।

আবার বালির ওপর উঠে এলাম। জল এখানে এত কম যে মাঝে মাঝে আমাদের উল্টোনো প্রতিবিম্ব জলের উপরিভাগেও দেখা যাচ্ছিল। দূরে দেখতে পেলাম সাবমেরিনের ক্ষীণ আলো। দেখেই তাড়াতাড়ি এগোতে যাচ্ছি এমন সময়ে এক ঝটকায় আমাকে গুল্মের ওপর ফেলে দিলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর সঙ্গীও জোর করে কনসেলকে শুইয়ে দিলে ঝোপের মধ্যে। হঠাৎ

এই আক্রমণের হেতু কি তা বোঝবার আগেই দেখি আমার পাশেই ক্যাপ্টেন নিজেও মাথা নিচু করে শুয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীরও সেই অবস্থা।

আর তারপরেই যা দেখলাম, তাতে রক্ত হিম হয়ে এল আমার। মাথার ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে যেতে দেখলাম দুটো প্রকাণ্ড আকৃতি। ফসফরাসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এই দানব-চেহারার সামনের দিক থেকে।

হাঙর। কাঁচের মত চকচকে চোখ, ভয়ংকর মুখে সারি সারি ধারালো দাঁত আর রূপোলী উদর নীচে থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য, পাখনা দিয়ে আমাকে আঘাত করে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেখতে পেল না মহাপ্রভুরা।

আধ ঘণ্টা পরে নোটিলসে পৌছোলাম। বাইরের হ্যাচটা তখনও খোলা।

ভেতরে ঢোকার পর হ্যাচ বন্ধ করে একটা বোতাম টিপে দিলেন ক্যাপ্টেন। ঘরের জলে নেমে যেতেই ভেতরকার হ্যাচ খুলে ঘুম-অবশ শরীরটাকে কোন রকমে টেনে টেনে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে।

পরের দিন আঠারোই নভেম্বর সকালে ঘুম ভাঙার পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হলো। হাল্কা মনে ডেকের ওপর উঠতেই শুনলাম ফার্স্ট অফিসারের সেই একঘেয়ে পুরোনো শব্দ কটি।

এর আগে বহুবার সকালে ডেকে ওঠার পর ফার্স্ট অফিসারকে টেলিস্কোপ দিয়ে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করার পর হ্যাচের কাছে গিয়ে এই শব্দ কটি বলতে শুনেছি। অজানা ভাষা! তাই অর্থ বুঝিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন এই শব্দগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবপর অর্থটা জেগে উঠল মনের মধ্যে। "তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না," সমুদ্র পর্যবেক্ষণের পর সম্ভবত এই রিপোর্টই প্রতিদিন হ্যাচের কাছে গিয়ে দিতে হয় ফার্স্ট অফিসারকে।

একটু পরে ক্যাপ্টেনও উঠে এলেন। আমাকে লক্ষ্যই করলেন না। ডেকের চারধারে পাতা জালে অগুন্তি মাছ ধরা। বিশজন নাবিক উঠে এল স্লেইগুলি তুলে নিতে।

দেখে মনে হলো, ডুবো জাহাজের এই নাবিকদের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতের লোকই আছে। আইরিশ, ফ্রেঞ্চ, স্ল্যাভ, গ্রীক সব দেশেরই এক বা একাধিক পুরুষ দেখলাম আমি। কিন্তু সেই বিদঘুটে ভাষায় কথা বলার সময়ে বোঝাই মুস্কিল এদের প্রকৃত জাতিগত পরিচয়।

আবার নেমে গেলাম গ্যালারীতে। দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছুটে চলল নোটিলস।

পয়লা ডিসেম্বর নিরক্ষরেখা পেরিয়ে এলাম আমরা। প্রশান্ত মহাসাগরের অরণ্যে অরণ্যে ছাওয়া পর্বত সমাকীর্ণ কয়েকটা দ্বীপ দেখতে পেলাম। সমুদ্রের এই অঞ্চল চোরা পাহাড়ের বড়ই বিপদসংকুল। জলের তলার দেখলাম কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ, কামানের ওপর শ্যাওলার রাজত্ব। দক্ষিণ সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে আসার সময়ে দেখলাম বহুবছর আগে যে সব জাহাজ তলিয়ে গিয়েছিল, তারই ধ্বংসাবশেষ। পেরিয়ে এলাম প্রবাল সমুদ্র। ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম, অষ্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মধ্যে প্রবাহিত টোরেজ প্রণালী দিয়ে এবার আমরা ভারত মহাসাগরে পৌঁছোবো। চোরা পাহাড় এখানে এত বেশী যে, যেকোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। ক্যাপ্টেন নিজের হাতে হুইল নিলেন। জলের ওপর নোটিলসকে ভাসিয়ে ভোজবাজির মত চোরা পাহাড়ের বিপদসংকুল রন্ধ্র পথে বার করে যেতে লাগলেন অত বড় সাবমেরিনটাকে। একটা দ্বীপের নিকটে হাজির হবার সময়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়লাম আমি।

জাহাজ চোরা পাহাড়ে লেগেছিল এবং খাঁজে আটকে গিয়েছিল। পাঁচদিন পরেই পূর্ণিমা। তখনই জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে জাহাজ। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হতেই শুধোলাম— 'দুর্ঘটনা ?''

—"না, ঘটনা।"

—"এমনই ঘটনা যে ডাঙায় বাস করতে আবার বাধ্য হবেন আপনি ?"

অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নিমো। তারপর মৃদু স্বরে বললেন -"নোটিলসকে এখনো আপনি চেনেননি, প্রফেসর।''

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম – "নেডের আর কনসেলের বড় ইচ্ছে এই কটা দিন জাহাজে আটক না থেকে সামনের দ্বীপটায় ঘুরে আসে। আপনার আপত্তি থাকবে কি ?"

ভেবেছিলাম আপত্তি করবেন। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন—"নিশ্চয় না। আপনিও ইচ্ছে করলে যেতে পারেন।"

তাই রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে পর পর দুদিন পুরোদমে অভিযান চালালাম দ্বীপটাতে। এ সব দ্বীপে চতুষ্পদ শ্বাপদের চাইতে নরখাদকের ভয়ই বেশী। কিন্তু পালকবিহীন চতুষ্পদের অথবা পালকওয়ালা দ্বিপদের মাংসের চপ না খাওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি নেই নেডের। তাই টো-টো করে বনে জঙ্গলে ঘুরে এলোপাথাড়ি শিকার করে, পোড়া মাংসে আর চেনা-অচেনা ফলে পেট ভরিয়ে

দ্বিতীয় দিন রাত্রে সমুদ্র উপকূলে বসে সাজ হলো আমাদের অতি উপাদেয় ডিনার পর্ব।

খুশী-উচ্ছল স্বরে কনসেল বললে—"আজ রাতে আর জাহাজে যাচ্ছি না!"

"কোনো দিনই যাচ্ছি না!" সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল নেড।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নুড়ি এসে পড়ল আমাদের পায়ের গোড়ায়।

জঙ্গলের দিকে তাকালাম আমরা। আবার একটা পাথর এসে পড়লো কনসেলের হাতের ওপর। এবার রাইফেল বাগিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম সবাই।

"বাঁদরের বাঁদরামো নাকি?" শুধোলে নেড।

"জংলী।" বললে কনসেল।

"চটপট নৌকায় চলো" বলেই দৌড়োতে লাগলাম আমি।

আচম্বিতে তীর-ধনুক নিয়ে জঙ্গলের কিনারায় আবির্ভূত হলো জনাকুড়ি জংলী। আমরা ততক্ষণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়োচ্ছি নৌকো লক্ষ্য করে। নেড তার ফল আর মাংসের সংগ্রহ আনতে ভোলে নি। আরও কয়েকটা পাথর এসে পড়লো এদিকে-সেদিকে। ঝপাঝপ করে দাঁড় টেনে বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম নোটিলসে।

নৌকো তুলে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে গ্যালারীতে গিয়ে দেখি অর্গানের সামনে তন্ময় হয়ে স্বরের ইন্দ্রজাল রচনা করছেন ক্যাপ্টেন।

প্রথম বার ডেকে কোনো সাড়া পেলাম না! তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন উনি।

শুধোলেন—"কি ব্যাপার?"

"জংলী! দ্বীপের ওপর তাড়া করেছিল আমাদের। নোটিলসের দিকেও তেড়ে আসছে ওরা!"

"ওঃ! এতে উদ্বিগ্ন হবার কি আছে? নোটিলসের গায়ে আঁচড় কাটবার ক্ষমতা কারও নেই।" বলে আবার অর্গানের ওপর ঝুঁকলেন ক্যাপ্টেন। আমার অস্তিত্বই ভুলে গেলেন।

পরের দিন কাতারে কাতারে পাপুয়া জংলীরা দূরে দূরে থেকে নোটিলসকে ঘিরে ধরলো, কিন্তু জাহাজের ওপর উঠতে বা কাছাকাছি আসার মত সাহস হলো না কারুরই।

তার পরের দিন ডেকের ওপর উঠতেই দেখলাম বিশটা ফাঁপা গাছের ক্যানো জলে ভাসিয়ে বিস্তর পাপুয়া যোদ্ধা এগিয়ে আসছে নোটিলস লক্ষ্য

করে। আমাকে এবং কনসেলকে দেখেই বিকট রণহুংকার দিয়ে উঠল সবাই। তারপরেই এক ঝাঁক তীর এসে পড়লো আশেপাশে।

এবার আর রক্ষে নেই। হন্তদন্ত হয়ে নীচে গিয়ে খবর দিলাম ক্যাপ্টেনকে। নির্বিকারভাবে আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন হ্যাচটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন, প্রফেসর। আপনাদের যুদ্ধ জাহাজের কামানের গোলা যদি নোটিলসের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তাহলে কয়েকশো পাপুয়া কি-ই আর করবে বলুন?"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন, কালকে বাতাস নেওয়ার জন্য আপনাকে হ্যাচ তো খুলতেই হবে?"

"হ্যাঁ, তা, খুলবো বইকি।"

"তখন তো জংলীরা ঢুকে আসবে?"

তুহিন-শীতল কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললেন—"প্রফেসর আরোনা, হ্যাচ খোলা থাকলেও নোটিলসের ভেতরে ঢোকাটা কি এতই সহজ? যাক সে কথা, আগামী কাল ২-৪০ মিনিটে নোটিলস জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে।" এ নিয়ে আর দ্বিতীয় কথাটি বললেন না ক্যাপ্টেন। ওঁকে আমি চিনেছিলাম এই ক'দিনে। তাই আর না ঘাঁটিয়ে গেলাম নিজের কেবিনে।

কিন্তু সে রাত্রে ঘুমের খুব ব্যাঘাত ঘটলো জংলীদের উৎপাতে। সারারাত তারা নোটিলসের ওপর দাপাদাপি করলে উন্মাদের মত। আর সে কি রক্ত-জমানো চীৎকার!

পরের দিন দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময়ে ক্যাপ্টেন আমায় নিয়ে গেলেন ডেকে ওঠার সিঁড়ির কাছে। কনসেল আর নেডও দাঁড়িয়েছিল সেখানে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে হ্যাচটা খুলে দিলে কয়েকজন নাবিক।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আঁকিবুকি কাটা একটা বীভৎস মুখ দেখা গেল রন্ধ্র পথে এবং পরমুহূর্তে সে হাত রাখলে সিঁড়ির রেলিংয়ে।

আর তৎক্ষণাৎ কানফাটা আর্ত চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল হতভাগা। আরও কয়েকজন দুঃসাহসীর সেই একই হাল হতে দারুণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল ডেকের ওপরে। কনসেল তো হেসেই লুটোপুটি। নেডের কৌতূহল এবং বুকের পাটা দুটোই একটু বেশী, তাই সে-ও সিঁড়ির রেলিংয়ে হাত দিতে না দিতেই বিকট চীৎকার করে ছিটকে এল আমাদের পানে।

"বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! বাজ পড়েছে আমার ওপর!"

ওর চীৎকার শুনতেই রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। ক্যাপ্টেন

ইলেকট্রিসিটির চার্জ দিয়েছেন সিঁড়ির রেলিংয়ে—এমন মাত্রায় দেওয়া যে প্রবল ঝাঁকুনি ছাড়া আর কোনো ক্ষতিই হবে না; কিন্তু তাইতেই কাজ হলো। আতংকে উন্মাদের মত পাপুয়ারা পালাতে লাগল। দেখতে দেখতে ওদের চাৎকার মিলিয়ে গেল দূরে।

ঠিক দুটো চল্লিশ মিনিটের সময়ে জোয়ারের জলে নোটিলস ভেসে উঠলো। আবার শুরু হলো প্রপেলারের ঘূর্ণন। দেখতে দেখতে বিপজ্জনক টোরেজ প্রণালীকে পশ্চাতে ফেলে এলাম আমরা।

১৮ই জানুয়ারী ভোরবেলা ডেকের ওপর উঠতেই আগের মতই ফার্স্ট অফিসারকে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করতে দেখলাম। অপেক্ষা করছিলাম সেই একঘেয়ে শব্দগুলি পুনরাবৃত্তির। কিন্তু সেদিন শুনলাম নতুন কয়েকটা শব্দ।

তৎক্ষণাৎ ডেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন নিমো। চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন দূরদিগন্তের পানে।

বেশ কয়েক মিনিট বিশেষ একটা দিকে একটানা তাকিয়ে থাকার পর টেলিস্কোপ নামালেন ক্যাপ্টেন। তাঁর শান্ত সংহত মূর্তি দেখে কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু কিছুতেই উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না ফার্স্ট অফিসার। ধীর স্থির পায়ে ডেকের ওপর পায়চারী করতে লাগলেন ক্যাপ্টেন—মধ্যে মধ্যে দুই হাত কপালে রেখে তাকিয়ে রইলেন দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটিতে। ফার্স্ট অফিসারও টেলিস্কোপ দিয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন। তার পরেই থমকে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন কয়েকটি নির্দেশ দিলেন ফার্স্ট অফিসারকে।

আমার আর ধৈর্য রইল না। গ্যালারীতে নেমে গিয়ে একটা টেলিস্কোপ এনে চোখে লাগালাম। এমন সময়ে এক হ্যাঁচকা টানে তা খসে পড়ল হাত থেকে।

পেছন ফিরে দেখলাম ক্যাপ্টেন নিমোর আর এক মূর্তি। এ মূর্তি দেখে তাঁকে যেন চেনা যায় না। ঘনকুঞ্চিত ললাট, শক্ত চোয়াল আর উন্মুক্ত দাঁতের সারির ভয়াবহতায় ক্রুর ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল সারা মুখখানা। দুই হাতের মুঠি পাকিয়ে থমথমে মুখে আড়ষ্ট দেহে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মুখের পরতে ফুটে উঠেছিল আতীব্র ঘৃণা।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এমন কি অপরাধ আমি করলাম যে চকিতের মধ্যে এ রকম উন্মত্ত ক্রোধে এভাবে ভয়াল হয়ে উঠতে পারেন উনি? কিন্তু তারপরেই বুঝলাম, উনি আমার দিকে তাকিয়ে নেই। ওঁর দৃষ্টি প্রসারিত রয়েছে দূর-দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটিতে।

ক্ষণপরেই আত্মস্থ হলেন ক্যাপ্টেন। ফার্স্ট অফিসারকে স্বল্প কথায় কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে ফিরলেন।

"প্রফেসর, এ জাহাজে আশ্রয় নেওয়ার আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করার সময় এসেছে।"

"কি বলছেন, বুঝলাম না, ক্যাপ্টেন।"

"আপনাদের তিনজনকেই এখন আমি ঘরে আটক রেখে দেব।"

"আপনি প্রভু, যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"একটাও না।"

আর কিছু বলবার রইল না। নীচে আসতেই চারজন নাবিক আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেল সেই ঘরটিতে যেখানে সর্বপ্রথম আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। টেবিলটার ওপর লাঞ্চ সাজানোই ছিল। প্রথম প্রথম খানিকটা তর্জন-গর্জন করে নেড তাই গোগ্রাসে খেতে শুরু করে দিলে। খামোকা রাগ না দেখিয়ে আমি আর কনসেলও হাত লাগালাম। খাওয়া শেষ হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই অকাতরে মেঝের ওপর ঘুম লাগালো নেড আর কনসেল। ওদের এই আচমকা ঘুমের কারণ বুঝলাম না। আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিল। আর তখনই চকিতে বুঝলাম, খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। নোটিলস আর দুলছিল না। সম্ভবত জলের তলায় ডুব দিয়েছে। তারপর ওষুধের প্রভাব আর কাটাতে পারলাম না। গাঢ় নিদ্রা লুপ্ত করে দিল আমার সব চেতনা।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে দেখলাম আশ্চর্যরকমভাবে পরিষ্কার বোধ হচ্ছে মাথাটা। আরও অবাক হলাম নিজেকে আমার কেবিনের মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখে।

শয্যাত্যাগ করে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। আমি তাহলে স্বাধীন।

করিডোরে বেরিয়ে হ্যাচ খোলা দেখে ডেকের ওপরে গেলাম। নেড আর কনসেলও সেখানে ছিল। দিগন্তবিস্তারী সমুদ্রের দিকে দিকে কোনো উপদ্রবের চিহ্ন দেখলাম না, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রসারিত আকাশে বাতাসে···এই শান্ত পরিবেশের মধ্যেই নোটিলস ভাসমান তার নিগূঢ় রহস্য নিয়ে। নীচে নেমে এলাম। নোটিলসও জলতলে ডুব দিল, আবার ভেসে উঠলো। বার কয়েক এইভাবে ওঠানামা করলো ডুবোজাহাজটা—যেন কিছুতেই সে স্থির থাকতে পারছে না।

বেলা দুটোর সময়ে গ্যালারীতে বসে লিখছি, ক্যাপ্টেন ভেতরে এলেন।

আমার শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তরে সামান্য মাথা হেলালেন, কোনো কথা বললেন না। অবসাদের চিহ্ন পরিস্ফুট তাঁর সর্বশরীরে—লাল দুই চোখ, যেন সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন তিনি। দু'চারটে যন্ত্র পরীক্ষা করলেন, কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম, যন্ত্রের দিকে তাঁর মন নেই। বার কয়েক সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। তার পরেই আবার উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। অবশেষে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

"প্রফেসর আরোনা, আপনি কি ডাক্তার ?"

প্রশ্নটা এমনই আকস্মিক যে কিছুক্ষণ নিরুত্তরে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলাম।

আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি—"আপনি কি ডাক্তার ? আমি জানি আপনার কয়েকজন সতীর্থ মেডিক্যাল ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন।"

"নিশ্চয় আমি ডাক্তার। মিউজিয়ামে যোগদান করার আগে কয়েক বৎসর প্র্যাকটিসও করেছি আমি।"

"বেশ। আমার একজন লোককে আপনি একটু দেখবেন কি ?"

"কেন দেখবো না ? চলুন।"

ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু ছোট্ট একটা প্রকোষ্ঠে গিয়ে সেদিন দেখলাম মৃত্যু-পথের যাত্রী তাঁর এক অনুচরকে। কি এক ভোঁতা হাতিয়ারের মারাত্মক আঘাতে দুফাঁক হয়ে গিয়েছিল তার করোটি—ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মগজটা। রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ খোলার সময়ে এতটুকু কাতরোক্তি শোনা গেল না লোকটার মুখে। ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে রইল আমার পানে। মুখ দেখে মনে হলো জাতিতে সে ইংরেজ।

লক্ষণ দেখেই বুঝলাম, মৃত্যু এর অবধারিত। হাত-পা ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছিল।

ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে শুধোলাম—"এরকম সাংঘাতিক চোট লাগল কি করে ?"

"তা জেনে আপনার দরকার কি ? হঠাৎ দারুণ ঝাঁকুনিতে একটা মোটরের লিভার ভেঙে গিয়েছিল। লাফিয়ে গিয়ে চোটটা সম্পূর্ণভাবে নিজের মাথায় নিয়ে ও বাঁচিয়ে দিয়েছে সঙ্গীর জীবন। অবস্থা কি রকম দেখলেন ?" আমি ইতস্তত করতে আবার বললেন উনি—"আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, ও ফরাসী জানেনা।"

"দুঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে।"

"কোনভাবেই কি বাঁচানো যায় না ?"

"না, কোনমতেই না…"

ক্ষিপ্রের মত দুই হাতের মুঠি পাকিয়ে ধরলেন ক্যাপ্টেন…চোখ উপচে গড়িয়ে পড়ল কয়েক বিন্দু অশ্রু।

আরও কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থেকে দেখলাম কি ভাবে একটি বুদ্ধিমান মুখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে জীবনের আলো।

সে রাতে ঘুম হলো না আমার। বার বার ঘুম ভেঙে গেল কান্নার মত করুণ সঙ্গীতে। পরের দিন সকালে সমুদ্র তরঙ্গের অনেক নীচে প্রবাল কবরে সমাহিত করা হলো তার নিষ্প্রাণ দেহকে। আরও অনেক কবর দেখলাম সেখানে। ক্রমবর্ধমান প্রবাল পুষ্পস্তবকের মতোই ছড়িয়েছিল সমস্ত কবরস্থান জুড়ে। আমিও গিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে। ফিরে আসার পর মাথার হেলমেট খুলে শুধিয়েছিলাম ক্যাপ্টেনকে—"হাঙরের আওতা থেকে অনেক দূরে বাস্তবিকই সুরক্ষিত আপনাদের এই প্রবাল-কবরস্থান, ক্যাপ্টেন!"

গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন—"সত্যিই তাই। হাঙর এবং মানুষ এই দুইয়ের কাছ থেকেই সুরক্ষিত এই কবরস্থান।"

পরের দিন ভোর চারটের সময়ে ষ্টুয়ার্ড এসে ডেকে নিয়ে গেল আমাকে। সাগরের নীচে মুক্তাক্ষেতে বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করলেন ক্যাপ্টেন।

লোভনীয় প্রস্তাব। নেড আর কনসেল তা শুনেই তো আনন্দে নেচে উঠলো। ডুবুরির ধড়াচূড়ো এঁটে শুধু ছুরি সম্বল করে শুরু হলো আমাদের অভিযান। যাবার সময়ে একটা হার্পুন নিয়ে যেতে ভুললো না নেড।

পথিমধ্যে অনেক সামুদ্রিক প্রাণী দেখলাম। তাদের মধ্যে দানবিক চেহারার একটা কাঁকড়াকে মনে রাখার মতো!

অনেকক্ষণ হাঁটবার পর সকাল সাতটা নাগাদ পৌছোলাম মুক্তা-ক্ষেতে। ক্ষেতই বটে। বিস্তর ঝিনুক পড়েছিল এখানে-সেখানে। পাথরের সাথে বাদামী তন্তুর বাঁধনে তাদের নড়বার উপায় ছিল না। লক্ষ লক্ষ এই ঝিনুকের বাইরের বর্মটা খুবই অসমতল এবং কতকগুলো লম্বায় প্রায় ছ'ইঞ্চি। নেড তো দুহাতে লুঠ শুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে বোঝাই হয়ে গেল তার থলি।

এবার ক্যাপ্টেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন একটা বিশাল গুহায়। বেশ বুঝলাম সমুদ্রতলের এই বিরাট গুহার ঠিকানা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। বড় বড় থামের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল গুহার ছাদটা। আনাচে কানাচে বিচিত্র মাছেরা আর প্রাণীরা অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল

আমাদের পানে। একখানে থমকে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। তর্জনী নির্দেশে যা দেখালেন, তা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম আমি।

কুয়োর মত গভীর স্থানে নেমেছিলাম আমরা। এই কুয়োর একদম তলদেশে স্থির হয়ে পড়েছিল একটা বিশাল ঝিনুক। লম্বায় চওড়ায় ছ'ফুটেরও বেশী এত বড় ঝিনুক নোটিলসের মিউজিয়ামেও দেখিনি। স্থির শান্ত জলে বছরের পর বছর ধরে নিরুপদ্রব পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই ঝিনুকের খবর ক্যাপ্টেন যে আগে থেকেই জানতেন, তা বুঝলাম চকিতে। বিশাল ডালা দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল। ক্যাপ্টেন তাঁর ছোরাটা তাড়াতাড়ি ফাঁকে রাখতেই ডালাদুটো আর পুরোপুরি বন্ধ হতে পারলো না। আর, এই ফাঁকের মধ্য দিয়ে ভেতরের জিনিষটি দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমাদের।

নারকেলের মত বড় একটা পেল্লায় আকারের মুক্তো দেখলাম ঝিনুকটার গহ্বরে। নোটিলসের গ্যালারীতেও এত বড় মুক্তো আমি দেখিনি। হাত বাড়িয়েছিলাম—কিন্তু বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। ছোরাটা টেনে নিতেই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল ঝিনুকটা।

চলে এলাম সেখান থেকে। বছরের পর বছর ধরে এইভাবে বড় হয়ে চলবে মুক্তোটা। তারপর একদিন ক্যাপ্টেনই তা সংগ্রহ করে নিয়ে সাজিয়ে রাখবেন তাঁর সংগ্রহশালায়।

মুক্তো-ক্ষেতের মধ্যে এদিকে সেদিকে ঘুরছি, এমন সময়ে ক্যাপ্টেন আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন পাহাড়ের আড়ালে।

কিছুদূরেই একটা সঞ্চরমান ছায়া দেখলাম। হাঙর নাকি? না, হাঙর নয়। মানুষ। সিংহলী মুক্তা ডুবুরি। কয়েক ফুট ওপরেই ভাসমান তার ক্যানোর তলদেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। দুপায়ের ফাঁকে পাথর বেঁধে লোকটা একবার নেমে আসছিল তলদেশে, হাঁটু গেড়ে বসে দ্রুত হাতে ঝুলি ভর্তি ঝিনুক নিয়েই উঠে যাচ্ছিল ওপরে। আবার নেমে আসছিল নীচে।

আচম্বিতে দারুণ চমকে উঠলো সে। মাথার ওপর ভেসে এল একটা বিশাল ছায়া। মস্ত একটা হাঙর। উন্মুক্ত দাঁতের সারি আর চকচকে চোখ দেখেই ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল আমার। প্রথম আক্রমণটা কায়দা করে লোকটা কাটিয়ে গেল বটে, কিন্তু, লেজের ধাক্কায় উলটে পড়লো জমির ওপর। চকিতে ঘুরে গিয়ে তেড়ে এল হাঙরটা—আর, কয়েক সেকেণ্ড—তারপরেই সারি সারি বর্শার ফলার মত দাঁতের ফাঁকে দু'টুকরো হয়ে যাবে হতভাগ্য লোকটা···

ঠিক এই সময়ে পাশ থেকে এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। নতুন শত্রু দেখেই তাঁর পানে তেড়ে এল হাঙরটা। খোলা ছোরা নিয়ে অপেক্ষা

করতে লাগলেন উনি। রাক্ষুসে মাছটা কাছাকাছি আসতেই চট করে একপাশে সরে গিয়ে সোজা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন ছোরাটা।

ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। লাল হয়ে গেল সমুদ্রের খানিকটা অংশ। তারপর জল পরিষ্কার হয়ে যেতেই দেখলাম হাঙরটার একটা পাখনা আঁকড়ে ধরে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে চলেছেন ক্যাপ্টেন। তারপরেই এক ঝটকায় ছিটকে পড়লেন তিনি জমির ওপর—হাঙরটার গুরুভারে নড়তেও পারছিলেন না। খুলে গেল দানোটার ভয়াল চোয়াল··· এই বুঝি সব শেষ!

কিন্তু অসমসাহসিক নেডই সে যাত্রা রক্ষা করলে ক্যাপ্টেনের জীবন। চকিতে লাফিয়ে গিয়ে হার্পুনটা আমূল বিঁধিয়ে দিলে মাছ দানোটার হৃৎপিণ্ডে।

অক্ষত অবস্থায় উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। সিংহলী ডুবুরীর পায়ে দড়ি কেটে পাথরটা ফেলে দিলেন। তারপর তাকে নিয়ে ভেসে উঠলেন জলের ওপর। ক্যানোর ওপরে উঠে অল্প চেষ্টাতেই জ্ঞান ফিরে এল তার। পিতলের হেলমেট আঁটা এতগুলো বিদঘুটে মাথাকে তার ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে আঁৎকে উঠে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো বেচারী। ক্যাপ্টেন তাকে এক থলি মুক্তা উপহার দিলেন—

নোটিলসে ফিরে আসার পর হেলমেট খুলেই প্রথমে ক্যাপ্টেন বললেন—"ধন্যবাদ নেড।"

"ধন্যবাদ আপনিও নিন আমার কাছে," বললো নেড।

দুনিয়া থেকে যিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন, কেন যে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সামান্য একজন সিংহলীর জীবন বাঁচাতে গে[illegible]ন, আমার এই বিস্ময়ের উত্তরে ক্যাপ্টেন আমাকে পরে বলেছিলেন—"ও যে-দেশের মানুষ, সে দেশ নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত! আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন ওরা আমার ভাই!"

জানুয়ারী মাসের উনত্রিশ তারিখে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল সিংহল। আমরা চলেছিলাম পারস্য উপসাগরের দিকে। পারস্য উপসাগর থেকে তো বেরোবার পথ নেই। সুতরাং কেন যে ছুটে চলেছি, তা বুঝিনি। কিছুদিন লক্ষ্যহীনভাবে এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করার [illegible] নোটিলস এডেন উপসাগর দিয়ে লোহিত সাগরে প্রবেশ করল।

ফেব্রুয়ারী মাসের নয় তারিখে ডেকে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে একটা সিগার দিলেন। সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে তৈরী এই সিগার তাঁর

কাছে এর আগেও নিয়েছি। তামাক-পাতা থেকে বিশেষ কোনো তারতম্য ধরা যায় না এ সিগার টানলে।

একথা সেকথার পর হাসিমুখে ক্যাপ্টেন বললেন—"প্রফেসর, লোহিত সাগরের রঙ লাল কেন, তা জানেন তো?"

"হ্যাঁ, জানি। মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখা যায় এমনি অ্যালজি অথবা সামুদ্রিক উদ্ভিদের জন্যেই এরকম রক্ত-রঙ লোহিত সাগরের।"

"এই লোহিত সাগর ছেড়েই পরশু দিন আমরা ভূমধ্যসাগরে পৌঁছোবো।"

"তাহলে হাওয়ার বেগে নোটিলসকে ছুটতে হবে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসার জন্যে।"

"উত্তমাশা অন্তরীপের কথা কে বললো আপনাকে?"

"তবে কি ডাঙার ওপর দিয়ে নোটিলস চলবে?"

"ডাঙার নীচ দিয়ে দিয়েও তো যেতে পারে?"

"কি বলছেন আপনি।"

মৃদু হাসলেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"সুয়েজ খাল এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু সুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত মাটির নীচেই একটা সুড়ঙ্গ আছে, আমি তার নামকরণ করেছি আরব সুড়ঙ্গ।"

"জয় ভগবান! এ সুরঙ্গ কি হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন আপনি?"

"সামান্য সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে আবিষ্কার করেছি।"

"কি ভাবে তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

"সারাজীবনের জন্য যারা এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে, তাদের মধ্যে কোনো তথ্যই গোপন থাকা উচিত নয়। মাছেদের লক্ষ্য করেই সুড়ঙ্গের সন্ধান পাই আমি এবং একমাত্র আমি ছাড়া এর হদিশ আর কেউ জানে না। আমি লক্ষ্য করেছিলাম একই ধরনের কতকগুলো মাছ ভূমধ্যসাগরেও দেখা যায়, আবার লোহিতসাগরেও দেখা যায়। তাইতেই ভাবনা শুরু হয় আমার। এরকম কোনো সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিতসাগর থেকেই তা উত্তরদিকেই থাকবে, কেননা লোহিতসাগরের উচ্চতা তো বেশী। রাশি রাশি মাছ ধরে লেজে পেতলের আংটি বেঁধে ছেড়ে দিলাম সাগরে। কয়েকমাস পরে সিরিয়ার কাছে খুঁজে পেলাম এইসব আংটি বাঁধা মাছগুলোই। তাইতেই প্রমাণিত হলো আমার সিদ্ধান্ত। তারপর একদিন সাহস করে নোটিলস নিয়ে সন্ধান চালালাম, পেলামও। আপনিও শীগগিরিই দেখতে পাবেন এই সুড়ঙ্গ!"

নির্দিষ্ট দিনে রাত্রে ডেকের ওপর থেকে মাইলখানেক দূরে দেখতে পেলাম সুয়েজের আলো।

এর পরেই ডুব দিল নোটিলস। ক্যাপ্টেন আমাকে নিয়ে এলেন তাঁর হুইল হাউসে। ছফুট চৌকো একটা ঘর। চাকাটা রয়েছে ঠিক মাঝখানে। চারদিকের দেওয়ালে চারটে পোর্ট-হোল। ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু পেছনের টাওয়ারের আলোয় ঝলমল করছিল সাগরের কালো জল।

ভেতরে ভেতরে স্কুলের ছেলের মতই দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি।

"এবার সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে বার করতে হয়," বলে মোটর-রুমে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। একটা সুইচ টিপে দিতেই গতি কমে গেল অনেকটা।

চোখের সামনে দেখলাম আলোক-উদ্ভাসিত খাড়া পাথুরে দেওয়াল। ক্যাপ্টেন কম্পাশের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে নির্দেশ দিতে লাগলেন চালককে।

রাত দশটা পনেরো মিনিটের সময়ে ক্যাপ্টেন নিমো নিজেই চাকা ধরলেন। বিশাল কালো একটা গর্তের মুখ দেখতে পেলাম সামনে। সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ল নোটিলস। বিপুল কল্লোল তুলে সুড়ঙ্গের গায়ে প্রতিহত হয়ে ধেয়ে চলেছিল সাগরের ফেনায়িত জল। এই প্রবাহ পথেই তীরের মতই ছুটে চলল আমাদের সাবমেরিন। বিপুল জলোচ্ছ্বাস ছাপিয়ে মোটরের প্রচণ্ড নির্ঘোষ প্রবল হয়ে উঠছিল মাঝে মাঝে।

আলোর তির্যক রেখায় মধ্যে মধ্যে পাথুরে দেওয়াল দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল নোটিলসের পানে, আর উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল আমার বক্ষ স্পন্দন।

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে চালকের হাতে চাকা ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"ভূমধ্যসাগর।"

বিশ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে—সুয়েজ যোজক অতিক্রম করে এল নোটিলস।

চোদ্দই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেলাম গ্যালারীতে। কিন্তু তাঁর নিশ্চুপ ভাবসমাহিত মূর্তি দেখে কথা বলা সঙ্গত মনে করলাম না। আমরা তখন ক্রীট দ্বীপের পাশেই রয়েছি বলেই একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরছিল। আব্রাহাম লিঙ্কনে আমি যখন আমেরিকা ত্যাগ করি, তখন ক্রীটের অধিবাসীরা বিদ্রোহ শুরু করেছিল তাদের তুর্কী শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে। এ বিদ্রোহ কতখানি সফল হয়েছে, জানতাম না। ক্যাপ্টেন জানেন কিনা, ওঁকে দেখামাত্র এই প্রশ্নই মনে এলেও জিজ্ঞেস করাটা এখন সমীচীন হবে না জেনে চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে জানালাগুলো খুলে দিয়ে বাইরের জলের পানে তাকিয়ে

রইলেন উনি। মাঝে মাঝে এ জানালা থেকে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলেন ও জানালায়।

আচম্বিতে জলের মধ্যে একজন ডুবুরিকে দেখা গেল। প্রচণ্ড বেগে সাঁতার কাটছিল লোকটা, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে ভেসে উঠছিল জলের ওপর। তারপরেই আবার ডুব দিয়ে নেমে আসছিল জানালার কাছে।

ক্যাপ্টেন অপর জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমার চীৎকারে ধীরপদে এসে দাঁড়ালেন এ জানালার সামনে। ডুবুরিটা আরও কাছে এগিয়ে এল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, কাঁচের এপার থেকে কি একটা ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। উত্তরে লোকটা হাত দুলিয়ে উঠে গেল ওপরে। আর ফিরে এল না। এবার আমার দিকে ফিরলেন ক্যাপ্টেন। বললেন—ঘাবড়াবেন না। ওর নাম নিকোলাস। মাটাপন অন্তরীপে ওকে সবাই মাছ বলেই ডাকে। আশপাশের সবকটা দ্বীপ ওর নখদর্পণে। দারুণ সাহসী ডুবুরি।"

"আপনি ওকে চেনেন?"

"চিনি বৈকি। বলে, গ্যালারীর পোর্ট জানালার কাছে দাঁড় করানো একটা সিন্দুকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। মেঝের ওপর লোহায় মোড়া একটা বাক্স দেখলাম। ডালার ওপরে তামার পাতে জাহাজের নাম খোদাই করা ছিল। সিন্দুকটা খুলে ফেললেন ক্যাপ্টেন। থরে থরে সোনার বার সাজানো ছিল ভিতরে। আমার অস্তিত্বই যেন ভুলে গেলেন উনি। একটার পর একটা বার নামিয়ে বাক্সটা বোঝাই করতে লাগলেন আপন মনে। আর এই বিপুল বৈভব দেখে আমার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল কোটরের বাইরে।

বাক্সটা বোঝাই হয়ে গেলে তালা লাগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ডালার ওপর আধুনিক গ্রীক অক্ষরে লিখলেন ঠিকানাটা। তারপর একটা বোতাম টিপতেই চারজন অনুচর এসে অতি কষ্টে টেনে টেনে বাক্সটাকে নিয়ে গেল বাইরে। লোহার সিঁড়ি দিয়ে গুরুভার বাক্সটাকে টেনে তোলার শব্দও ভেসে এল কানে।

ফিরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"কিছু বলছিলেন?"

"না, কিছু না।"

"তাহলে শুভরাত্রি রইল।"

"আমিও ফিরে এলাম আমার কেবিনে। কুবের সম্পদকে ঐভাবে হেলায় টেনে নিয়ে যেতে দেখে মাথা ঘুরছিল আমার। আরও রাত্রে নোটিলাস জলের ওপর ভেসে উঠল। ডেকের ওপর আওয়াজ শুনে বুঝলাম নৌকো নামানো হয়েছে। গুরুভার বস্তু টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দও ভেসে এল কানে।

ছঘণ্টা পরে ফিরে এল নৌকোটা। বুঝলাম, ঠিকানামত জায়গায় পৌঁছে গেল সোনা ভরা বাক্সটা।

সম্ভবত ক্যাপ্টেন নিমোর অতীতের দুঃখময় বহু স্মৃতিতে আচ্ছন্ন ছিল ভূমধ্যসাগরের জল, তাই তিনি উদ্দামবেগে পেরিয়ে এলেন এই অঞ্চল। কিন্তু জাহাজের গতি মন্থর করতে হলো সিসিলি আর টিউনিস উপকূলের মধ্যবর্তী জলমধ্যস্থ সুবিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণী পেরোনোর সময়ে। এক সময়ে আফ্রিকা আর ইউরোপ মহাদেশের সংযোগস্থল ছিল এই অঞ্চলটাই। সাবধানে এই পর্বতবাধা পেরিয়ে আসার পরেই আবার গতিবেগ বৃদ্ধি পেল নোটিলসের। জিব্রাল্টার প্রণালীর জল তোলপাড় করে ছুটে চললাম আমরা। যাবার সময়ে চকিতে দেখে নিলাম জলে ডোবা হারকিউলিসের সুপ্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। আর, তারপরেই আমরা এসে পড়লাম অতলান্তিক মহাসাগরের জলে।

রাত আটটা! স্পেন উপকূলকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে রেখে জলের ষাট ফুট তলা দিয়ে ধীর গতিতে ছুটে চলেছে নোটিলস।

আর মাত্র এক ঘণ্টা। ঠিক নটার সময়ে নোটিলস থেকে সরে পড়ার ফন্দি এঁটেছে নেড। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হতে হয়েছে আমাকে।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। এই কদিন ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎ পাইনি। আমার পাশের ঘরেই ক্যাপ্টেনের ঘর। মাঝের দরজাটা দেখলাম সামান্য ভেজানো।

ভেতর থেকে কোনো শব্দ পেলাম না। সাহস করে একটু ঠেলা মারতেই খুলে গেল পাল্লা দুটো।

সন্ন্যাসীর সাদাসিদে ঘরের মতই নিরাভরণ এ ঘর আমি আগেও দেখেছি। দেওয়ালে কয়েকজন পৃথিবীবিখ্যাত মহামানুষের ছবি দেখলাম। দেখলাম পোল্যাণ্ডের বীর নায়ক Kosciusko-র ছবি, আয়ার্ল্যাণ্ডের ড্যানিয়েল ও'কনেল, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং জন ব্রাউন। এঁরা প্রত্যেকেই দেশবাসীদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। ক্যাপ্টেন নিমোর রহস্যের সূত্র কি তবে এই ছবিগুলি? ইনিও কি দুর্ভাগা জাতি, পদদলিত দেশ আর পরাধীন মানবের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন? আমার মনে হলো সাম্প্রতিক গুপ্ত বিপ্লবের মূলে নিশ্চয় এঁরও হাত আছে। এমনও হতে পারে যে ইনি আমেরিকার যুদ্ধেরও একজন নায়ক।

নিজের কেবিনে ফিরে এলাম। অসহ্য হয়ে উঠেছিল এই প্রতীক্ষা। ধীরে ধীরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বক্ষস্পন্দন।

আর, ঠিক এই সময়ে নোটিলসের ইঞ্জিনের নির্ঘোষ মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ থমথমে স্তব্ধতার পর ছোট্ট একটা ধাক্কা অনুভব করলাম। নোটিলস সমুদ্রের নীচে নেমে পড়েছে।

আচম্বিতে নিদারুণ আতংকে অবশ হয়ে উঠল আমার সর্বশরীর। তবে কি আমাদের পলায়ন পরিকল্পনা আর গোপন নেই···!

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

"এই যে প্রফেসর, আপনাকেই খুঁজছিলাম। স্পেনের ইতিহাস আপনি জানেন তো?"

আমি তখন কথা বলবো কি, বজ্রাহতের মত শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম তাঁর পানে।

আবার জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন—"স্পেনের ইতিহাস আপনি জানেন নাকি?"

"খুব বেশী জানিনা!" আমতা আমতা করে কোনমতে বললাম আমি।

"একেই বলে বিজ্ঞের অজ্ঞতা! আসুন, গ্যালারীতে বসা যাক। স্পেন ইতিহাসের একটা আশ্চর্য ঘটনা আপনাকে শোনাবো।"

স্পেন যুদ্ধের এক দীর্ঘ কাহিনী সেদিন শুনেছিলাম তাঁর কাছে। ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড আর অষ্ট্রিয়ার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে রাজা চতুর্দশ লুইয়ের নায়কত্বে ফ্রান্স জোট পাকালে স্পেনের সাথে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অনেক টাকার দরকার। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের কুবের সম্পদ ছিল। অনেকগুলো স্পেনীয় জাহাজ বোঝাই করা হলো ইণ্ডিজদের সোনা আর রূপোয়। তেইশটা যুদ্ধজাহাজের পাহারায় যাত্রা শুরু হলো ক্যাডিজের দিকে। কিন্তু ইংরেজ নৌবাহিনী ক্যাডিজ অবরোধ করে বসে ছিল। কাজে কাজেই ফরাসী অ্যাডমিরাল আর স্পেনীয় ক্যাপ্টেন পরামর্শ করে সম্পদ নিয়ে চললেন ভিগো উপসাগরে। কিন্তু কোন কারণে জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে দেরী হয়ে গিয়েছিল ওদের। ইতিমধ্যে ইংরেজদের বাহিনী এসে চড়াও হলো এদের ওপর। দারুণ যুদ্ধ হলো সমুদ্রের ওপর। কিন্তু ফরাসীদের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল ইংরেজদের যুদ্ধজাহাজ। ফরাসী অ্যাডমিরাল যখন দেখল যুদ্ধে জেতার আর কোন আশাই নেই, তখন তিনি আদেশ দিলেন সোনা রূপো ভরা স্পেনের জাহাজগুলোর ওপর গোলা বর্ষণ করে তা ডুবিয়ে

দিতে। শত্রুর হাতে এই বিপুল সম্পদ যাওয়ার চাইতে তা জলের তলায় পাঠানোই ভাল।

গল্প শেষ হলো। কিন্তু আমি বুঝলাম না এত আয়োজন করে এ কাহিনী বলার মানেটা কি।

"তারপর?" শুধোলাম আমি।

"মিঃ আরোনা, আমরা এখন এই ভিগো উপসাগরেই নেমে পড়েছি।" বলে উঠে দাঁড়ালেন নিমো। গ্যালারীর জানালার কাছে দাঁড়ালেন। খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম ডুবুরি পোশাক পরে তাঁর অনুচরেরা বালি খুঁড়ে উদ্ধার করছে প্রায়-বিনষ্ট চোঙা আর ভাঙা বাক্স। বিস্তর জাহাজের কালো কালো ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। ভাঙা আধার থেকে ছত্রাকার হয়ে পড়ত লাগল সোনা আর রূপোর মোটা মোটা বাট, পুরোনো আমলের স্পেনীয় মোহর ডাবলুন আর মূল্যবান রত্নরাশি। জোরালো আলোয় অগুন্তি নক্ষত্রের মতই ঝকমক করছিল বালির ওপর ছড়িয়ে থাকা এই অকল্পনীয় সম্পদ।

বুঝলাম সব। শূন্য সিন্দুক আবার ভরে নেওয়ার জন্যে ক্যাপ্টেন ফিরে এসেছেন এখানে—ইস্পাদের ডুবে-যাওয়া কুবের বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী এখন তিনিই।

হাসিমুখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন।

বললেন—"এখন বুঝতে পারছেন তো কি করে কোটিপতি হয়েছি আমি?"

"বুঝলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে এত টাকায় শুধু ছাতাই পড়ছে, কোনো কাজে আসছে না।"

আহত বিস্ময়ভরা চোখ মেলে তাকালেন ক্যাপ্টেন—"ছাতা পড়ছে!" পরমুহূর্তে কণ্ঠে ঘৃণার গরল ঢেলে বলে উঠলেন উত্তেজিতভাবে—"আপনি কি মনে করেন এত কষ্ট করে এ সম্পদ উদ্ধার করছি শুধু নিজের ভোগের জন্যে? দুনিয়ার কোথায় কোথায় মানুষ অত্যাচারিত, পদদলিত, কত অসুখী হতভাগ্যকে সান্ত্বনা দিতে হয়, প্রতিহিংসার আয়োজন করতে হয়—আপনি কি মনে করেন আমি তার কোন খবরই রাখি না? এখনও কি বুঝতে পারছেন না—?" হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম, বিপ্লবের অনল আচ্ছন্ন ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে কোন্ ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন তিনি সেই সোনার বাক্সটি—।

পরের দিন রাত এগারোটার সময়ে হঠাৎ আমার সাথে দেখা করতে এলেন ক্যাপ্টেন।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, আমি ক্লান্ত কিনা। আমি না বলতেই কাজের কথা পাড়লেন উনি।

বললেন—"প্রফেসর, রাতের অন্ধকারে এর আগে কোনো দিন সমুদ্রের তলায় তো বেড়াননি। চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক।"

প্রস্তাব শুনেই লাফিয়ে উঠলাম আমি। ডুবুরি-ঘরে যাওয়ার পর পোশাক পরলাম শুধু আমি এবং ক্যাপ্টেন—আর কেউ নয়। সঙ্গে নিলাম লোহার টুপী পরানো লাঠি। আলো না নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে শুধু বললেন—"তার দরকার হবে না।"

রাত বারোটার সময়ে আমরা পা দিলাম সমুদ্রতলে। বহুদূরে একটা লালাভ দ্যুতির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন। তারপর সিধে এগিয়ে চললেন সেই দিকে।

সামুদ্রিক গুল্মে কতবার পা হড়কে গেল আমার, হাতের লাঠি দিয়ে সামলে নিলাম প্রতিবারেই। পায়ের তলায় পাথুরে জমিটা মনে হলো বেশ একটা বাঁধাধরা প্যাটার্ণ নিয়ে বিস্তৃত। মধ্যে মনে হলো যেন রাশি রাশি হাড় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আমার সিসেভরা জুতোর তলায়। তারপর একসময়ে ক্ষীণ হয়ে এল বহু পেছনে নোটিলসের আলো—আর ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল সামনের লালাভ দীপ্তিটা। আরও কিছুদূর এগানোর পর মনে হলো আলোটা আসছে একটা পাহাড়ের চুড়ো থেকে। রাত প্রায় একটার সময়ে পাহাড়ের ঢালে পৌছোলাম। এবং এইখানে থেকেই একটা বিশাল অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোতে লাগলেন ক্যাপ্টেন। পথঘাট যেন সব তাঁর নখদর্পণে। দুপাশে তাকিয়ে যা দেখলাম, তা বাস্তবিকই জঙ্গল। বিরাট বিরাট পচা গাছ, না আছে পাতা, না আছে কিছু। সুউচ্চ সেই পাইন গুলো কয়লার খনির মতই সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনও জমির ওপরে ; শাখা-প্রশাখার মধ্যে মনের আনন্দে সাঁতার দিচ্ছিল রঙ-বেরঙের মাছ।

চূড়োটার শ'খানেক ফুট নীচে শেষ হলো জঙ্গলের সীমা। এবড়ো-খেবড়ো পাথর ধরে ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা। আনাচে-কানাচে, অন্ধকারময় রন্ধ্রে দেখলাম কত সমুদ্র-দানবের জলজলে চোখ, স্পষ্ট শুনতে পেলাম তাদের নড়াচড়ার শব্দ। অতিকায় চিংড়ি আর কাঁকড়া কতবার সরে গেল পায়ের তলা থেকে। ক্যাপ্টেন কিন্তু কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে সিধে এগিয়ে চললেন চূড়োর দিকে।

পাহাড়ের একদম মাথায় পৌঁছোবার পর যে আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম, তা কোনোদিনই ভোলবার নয়। দেখলাম সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো রয়েছে অগুন্তি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—সবই মানুষের কীর্তি। সী-অ্যানিমোন এবং গুল্মে আচ্ছন্ন প্রাসাদ এবং মন্দিরগুলো চিনতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। মানে কি এ সবের? এ কোন্ জনপদ আশ্রয় নিয়েছে সমুদ্রের জঠরে? কোন দেশের মানুষরা গড়েছিল এই বিশাল স্মৃতি সৌধগুলো?

উদগ্র কৌতূহলে অস্থির হয়ে ক্যাপ্টেনের হাত আঁকড়ে ধরলাম আমি। উনি মাথা নেড়ে আরও এগিয়ে চললেন সামনে। কয়েক মিনিট পরে আরও উঁচু একটা চূড়োর ওপর ওঠার পর সেই লালাভ দ্যুতির উৎস চোখে পড়ল আমার।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে দেখলাম একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। লাল উত্তপ্ত লাভার স্রোত বেরিয়ে আসছিল ভেতর থেকে। কিন্তু কোনো শিখা ছিল না। অক্সিজেন না থাকলে শিখা থাকবে কি করে। গনগনে তরল লাভাস্রোতই যেন আগুনের আকারে গড়িয়ে পড়ছিল জলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে।

জলন্ত লাভার আলোয় দেখতে পেলাম বহুদূরবিস্তৃত সমতল ভূমিতে এক শহরের ধ্বংসস্তূপ। ছাদ, মন্দিরের চূড়ো এবং বড় বড় থামগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে হেথায়-সেথায়। আরও দূরে একটা মস্তবড় বন্দরের নিদর্শনও দেখলাম। এক সময়ে কত সওদাগরী জলযানই না জানি আশ্রয় পেয়েছিল সেখানে। এ কোথায় এলাম আমি? ক্ষিপ্তের মত মাথার হেলমেট খুলে ফেলে এই প্রশ্নই করতে চেয়েছিলাম ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন আমার হাত ধরে বাধা দিলেন। মেঝে থেকে একটা চকখড়ি তুলে মসৃণ দেওয়ালের ওপর লিখলেন, "অ্যাটল্যান্টিস।"

চকিতে পরিষ্কার হয়ে গেল জলমগ্ন নগরীর রহস্য। হারকিউলিসের থামের ওদিকে প্রাচীন কিংবদন্তীর সেই বিখ্যাত মহাদেশের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। শৌর্যে-বীর্যে একদিন তারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, প্রাচীন গ্রীকদের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পেছপা হয়নি। তারপর, একদিন আর এক রাতের মধ্যেই প্রলয়ংকর ভূমিকম্পের ফলে সমস্ত দেশটি তলিয়ে গেল সাগরের তলে।

উন্মাদের মত বিস্ফারিত চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম এই লুপ্ত মহাদেশের গৌরব কীর্তিগুলো। আর, ক্যাপ্টেন নিমো পাথরের গায়ে পাথরের মতই নিশ্চল দেহে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সর্বক্ষণ।

ঘণ্টাখানেক ছিলাম সেখানে। অগ্ন্যুৎপাতের ধমকে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে

উঠতে লাগল পায়ের তলার মাটি। তারপর জলের ওপর কাঁপতে কাঁপতে উঠে এল পাণ্ডুর চাঁদ। আমরা ফিরে চললাম নোটিলসের দিকে।

ভোরের আলো তখন ফুটি ফুটি করছে পূবদিগন্তে। ক্লান্ত দেহটাকে কোনমতে টেনে নিয়ে প্রবেশ করলাম নোটিলসের ডুবুরি প্রকোষ্ঠে।

সমুদ্র-নদী গাল্ফ্ স্ট্রীমের মূল স্রোতটা ফ্লোরিডা থেকে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ঘুরে স্পিট্স বার্জেন পর্যন্ত প্রবাহিত থাকলেও মাঝামাঝি অঞ্চলে একটা শাখা-স্রোত মূল-স্রোত থেকে বেরিয়ে এসে যাত্রা করেছে আজোর্স দ্বীপপুঞ্জের দিকে এবং সেখান থেকে আফ্রিকার উপকূলের দিক দিয়ে ঘুরে এসে আবার মূল-স্রোতের সাথে মিশেছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে। ফলে সমুদ্রের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে একটা বিচিত্র সরোবর। ডিমের মত আকৃতি এই সমুদ্র-লেকের চারদিকে বারোমাস ছুটে চলেছে উষ্ণ জলের খর-প্রবাহ। এই হলো সারগাসো সাগর।

গাল্ফস্ট্রীম বাহিত ভাসমান উদ্ভিদ এসে জমা হয় এই অঞ্চলেই এবং তা এমনই পুরু হয়ে জমে থাকে যে তা ভেদ করে কোনো জাহাজের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। জলের কয়েক গজ নীচ দিয়ে যেতে যেতে আমরা ভাসমান গাছের গুঁড়ি থেকে শুরু করে বিধ্বস্ত জাহাজের বহু ভাঙাচোরা অংশ জমাট বেঁধে ভাসতে দেখলাম সেখানে।

তেরই মার্চ আর একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। গভীর সমুদ্রে ডুব দেওয়ার ক্ষমতা নোটিলসের বাস্তবিকই কতখানি আছে, পরীক্ষা করা হলো সেদিন। অতলান্তিক মহাসাগরে গভীরতম অঞ্চলে আমরা পৌঁচেছিলাম। ক্যাপ্টেন শুধু ট্যাঙ্কগুলোই জলে ভরে ক্ষান্ত হলেন না, দুপাশের হাইড্রোপ্লেন দুটিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণে রেখে পুরোদমে মোটর চালিয়ে কোণাকুণি-ভাবে সাগরের গভীরে প্রবেশ করতে লাগলাম আমরা।

গ্যালারীর কাঁচের জানালা খোলাই ছিল। প্রায় ৭৫০০ ফ্যাদম নামার পর দেখলাম বিশাল বিশাল পর্বতের চূড়া। সম্ভবত তাদের উচ্চতা হিমালয় বা আল্পসের মতই।

তীরের মত আরও নীচে নেমে চলল নোটিলস। নিদারুণ চাপ পড়তে লাগল জাহাজের ওপর। অনুভব করলাম ইস্পাতের ছাদ দুমড়ে নেমে আসতে চাইছে নীচে। প্রচণ্ড চাপে ঝন ঝন করতে লাগল সংযোগস্থলগুলো। কিন্তু অসীম ক্ষমতা এই নোটিলসের; কারিগরি প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন; তা না'হলে ঐ প্রচণ্ড জলচাপে বাদামের মতই ফট্ করে ফুটি ফাটা হয়ে যেতো

গোটা জাহাজটা। ৮৩০০ ফ্যাদাম নীচে জীবনের আর কোনো লক্ষণ দেখলাম না। জাহাজের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তখন ২৪০০ পাউণ্ড চাপ পড়ছে!

আনন্দে বিস্ময়ে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম—"ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, এ কোথায় এলাম! মানুষ যেখানে কোনো দিন পদার্পণ করেনি, সেখানে আমরা নেমেছি—এ যে অবিশ্বাস্য গালগল্পের মতই মনে হবে পরে!"

মৃদু হেসে ক্যাপ্টেন আদেশ দিলেন নোটিলসকে স্থির ভাবে দাঁড় করানোর। তারপর ক্যামেরা বার করে জানালা দিয়ে আলো ঝলমলে সমুদ্রের ছবি তুললেন শুধু আমাকে উপহার দেওয়ার জন্যে।

এর পর ওপরে ওঠবার পালা। ক্যাপ্টেন হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন—তবুও আচমকা আমি চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম মেঝের ওপর। ক্যাপ্টেনের আদেশে ঠিক ছিপির মতই সিধে ওপর দিকে জল ছিন্নভিন্ন করে উঠতে শুরু করেছে নোটিলস। চার মিনিটের মধ্যেই ৮।৭ মাইল জলপথ পেরিয়ে শূন্যে ছিটকে উঠলাম অতিকায় উড়ন্ত মাছের মতই এবং পরক্ষণেই মেঘ গর্জনের মত ঝপাং শব্দে আছড়ে পড়লাম অতলান্তিকের জলে।

ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে লাগল নোটিলস। পঞ্চাশ অক্ষরেখার কাছে এসে বিস্তর বরফ ভাসতে দেখলাম জলের ওপর। দিনের আলো এইসব আইসবার্গ অর্থাৎ বরফের পাহাড়ের ওপর ঠিকরে গিয়ে বর্ণালীর মতই বহু রঙে অপরূপ করে তুলেছিল সমুদ্র দৃশ্যকে।

ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোনোর পথ বন্ধ। মহাসমুদ্র যেন এইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে—তারপরেই শুরু হয়েছে ধূ ধূ বরফের রাজ্য। মহা মুস্কিল! ক্যাপ্টেন কিন্তু দমবার মানুষ নয়। খুঁজে খুঁজে একটা সরু পথ বার করে তার ভেতর দিয়েই আশ্চর্য কৌশলে নোটিলসকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। চারধারে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই; নিথর নিস্তব্ধ এই শূন্যতার সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো কিছুরই। গরম ফারে সর্বাঙ্গ আবৃত থাকা সত্ত্বেও ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। যদিও ইলেকট্রিক ষ্টোভে দিন রাত জাহাজের ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ক্যাপ্টেন।

৬ই মার্চ দক্ষিণ মেরুরেখা পেরিয়ে এলাম আমরা। বলিহারি যাই ক্যাপ্টেনের সাহসের। নির্বিকার মুখে ভাসমান বরফের চাঁইয়ের মধ্যে দিয়ে কি ভাবে পথ বের করে নিয়ে অব্যাহত রাখলেন নোটিলসের অগ্রগতি, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। অস্বাভাবিক নৈঃশব্দের মধ্যে বরফে বরফে ধাক্কা লাগার নির্ঘোষ ভেসে আসছিল, কখনও শোনা যাচ্ছিল বরফের চাঁই ধ্বসে যাওয়ার ক্ষীণ আওয়াজ। মাঝে মাঝে এমন তুহিন-প্রাচীর সামনে দেখলাম

যে মনে হলো এইবার বুঝি শেষ হলো যাত্রা। কিন্তু বেপরোয়া ক্যাপ্টেন হটবার পাত্র নন। পাতলা বরফের স্তর দেখলেই নোটিলসের প্রচণ্ড ধাক্কায় তা ভেঙে চুরমার করে এগিয়ে চলতে লাগলেন তো লাগলেনই। যে পথ দিয়ে এলাম, সে পথ কিন্তু দেখতে দেখতে বরফ জমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল।

১৮ই মার্চ কিন্তু আর কোনো ক্রমেই সামনে যাওয়া সম্ভব হলো না নোটিলসের পক্ষে। বিশাল বিশাল বরফের পাহাড়ে পথ একেবারে বন্ধ। তাপমাত্রাও নেমেছে শূন্য থেকেও পাঁচ ডিগ্রী নীচে!

চারদিকে কঠিন বরফের মধ্যে এবার সত্যি সত্যি বন্দী হলাম। মনে মনে ভাবলাম, ক্যাপ্টেনের গোঁয়ার্তুমির জন্যে এবার শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া আর বুঝি কোনো উপায় নেই।

এই সময়ে ক্যাপ্টেন এসে শুধোলেন—"কি প্রফেসর, ভাবছেন কি?"

"ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তো বন্ধ হলোই, পেছনে যাওয়ার পথেরও চিহ্ন দেখছি না।"

ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ-তরল হাসি টেনেএনে ক্যাপ্টেন বললেন—"আমার নোটিলসকে এতখানি অসহায় মনে করবেন না, প্রফেসর। আমার তো মতলব রয়েছে একেবারে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে তবে আমি থামব।"

"তাহলে এক কাজ করুন। নোটিলসের দুপাশে এক জোড়া ডানা লাগিয়ে উড়ে চলুন," না বলে থাকতে পারলাম না আমি।

অবাক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"বরফের ওপর দিয়ে যেতে যাবো কেন? নীচ দিয়ে গেলেই তো হয়?"

"নীচ দিয়ে?"

"তাইতো যাবো। বরফের এক ফুট জলের ওপর ভাসলে তিন ফুট নীচে ডুবে থাকে। সামনের বরফ পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উঁচু হয়, তাহলে জলের তলায় নশো ফুট পর্যন্ত নেমে রয়েছে এই বরফ। তার নীচ দিয়ে গেলেই তো হলো।"

"তাও তো বটে।"

"শুধু একটা অসুবিধা আছে। কতদিন জলের নীচে থাকবো, তা জানি না। সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাওয়ার পরও যদি দক্ষিণ মেরুতে ওপরে ওঠার পথ না পাই, তাহলে সবাইকেই দম আটকে মরতে হবে।"

শুরু হলো নশো ফুট নীচে নামার আয়োজন। দশজন নাবিক কুড়ুল দিয়ে নোটিলসের চারদিকের বরফ কাটতে লাগল এবং চাড় দিয়ে পথ করে একটু একটু করে নিচের দিকে নামতে লাগল জাহাজ। নশো ফুট নামার পর

সমুদ্রজলে পড়লাম। কিন্তু আরও নীচে নামতে লাগল নোটিলস। ২৪০০ফুট নীচে নামার পর আবার শুরু হলো সামনে এগিয়ে চলা।

পরের দিন ১৯শে মার্চ। জাহাজের গতি কমে এসেছিল। বুঝলাম নোটিলস এবার ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। আচম্বিতে একটা দারুণ ধাক্কায় ঝনঝন্ করে কেঁপে উঠল সমস্ত জাহাজটা। বুঝলাম বরফের সঙ্গে টক্কর লাগল নোটিলসের। দ্রুত হয়ে উঠল আমার বক্ষস্পন্দন। তিন হাজার ফুট বরফের স্তর ভেদ করে ওপরে ওঠার ক্ষমতা তো নোটিলসের নেই। আরও দক্ষিণে চলার পর আবার একটা ধাক্কা। আবার! আবার! এইভাবে ধাক্কা মারতে মারতে এগিয়ে চলল জাহাজ, আর ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসতে লাগল মাথার ওপরকার বরফ স্তর। দুশ্চিন্তায় সারারাত ভালো ঘুম হলো না। পরের দিন সকালে শয্যা ত্যাগ করার পর আমার কেবিনে এলেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি!"

এক দৌড়ে ডেকের ওপর গিয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস নিয়ে আশপাশের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শান্ত সুন্দর সমুদ্র। ছোট ছোট ভাসমান বরফ খণ্ড। বহু পেছনে ফেলে আসা বরফের সুউচ্চ প্রাচীর। বাইরে থেকে দেখে কে বুঝবে যে প্রাচীরের আড়ালে এমন দেশটি লুকিয়ে আছে? জলে খেলা করছে বিস্তর মাছ। মাথার ওপর দিয়ে কূজনে আকাশ বাতাস মুখরিত করে উড়ে চলেছে কত শত পাখী। প্রাণের সাড়া সর্বত্র ছিল বলেই এত বেশী অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

দশ মাইল দূরে একটা দ্বীপ দেখতে পাওয়া গেল। নৌকোয় করে ক্যাপ্টেন আমাদের নিয়ে গেলেন সেখানে। কনসেল আগে দ্বীপের ওপর নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললাম—"ক্যাপ্টেন, আপনি আগে নামুন। এ দ্বীপে সর্বপ্রথম পদার্পণ করার কৃতিত্ব আপনারই প্রাপ্য।"

লাফিয়ে নেমে পড়লেন ক্যাপ্টেন। আমরাও নামলাম। লালাভ মাটি আর ফাটলের মধ্যে গন্ধকের ধোঁয়া দেখে বুঝলাম অগ্ন্যুৎপাত থেকে সৃষ্টি এই দ্বীপের।

সেদিন অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করারপর জাহাজে ফিরে এলাম আমরা। পরের দিন বেলা নটা নাগাদ যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আমরা পা দিলাম দ্বীপের ওপর। বেলা বারোটার সময়ে আকাশের মাঝখানে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল সূর্যের আবছা লালাভ-দ্যুতি। ক্রনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি—"দুপুর বারোটা"

"দক্ষিণ মেরু!" টেলিস্কোপটা আমার হাতে তুলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন ক্যাপ্টেন।

তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—"১৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে বহু দেশের অভিযাত্রীরা দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। আর আজ, ১৮৫৮ সালের ২১শে মার্চ, আমি, ক্যাপ্টেন নিমো, দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে পৃথিবীর মহাদেশগুলোর ছ'ভাগের এক ভাগ এই বিশাল মহাদেশকে অধিকার করলাম।"

"কার নামে, ক্যাপ্টেন?"

"আমার নিজের নামে," বলে, এক ঝটকায় একটা কালো নিশান খুলে ডাণ্ডাটা পুঁতে দিলেন মাটির ওপর। কালোর পটভূমিকায় সোনার 'N' হরফটি জলজল করতে লাগল অশান্ত হাওয়ায়।

এবার সূর্যের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"বিদায় সূর্য! এবার তুমি ডুব দিতে পার সাগরের তলায়। আমার অধিকৃত এই নতুন মহাদেশে নেমে আসুক ছয়মাসব্যাপী রাত্রির রাজত্ব।"

পরের দিন ২১শে মার্চ। সকাল ছটা বাজতে না বাজতেই ফেরার আয়োজন শুরু হলো। নিদারুণ ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আকাশে অদ্ভুত দীপ্তি ছড়িয়ে ঝলমল করছিল তারকারাশি। হু-হু করে বৃদ্ধি পেতে লাগল হাওয়ার বেগ। সীলমাছ আর মর্সগুলোকে তখনও নির্বিকারভাবে বরফের ওপর শুয়ে থাকতে দেখলাম। দেখতে দেখতে কুয়াশার ঘন পর্দা আর তুষারপাতে অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক।

ট্যাঙ্ক ভর্তি করে জলের তলায় ডুব দিল নোটিলস। এক হাজার ফুট নীচে নেমে ফিরে চলল উত্তর দিকে।

রাত প্রায় তিনটার সময়ে একটা ভয়ংকর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সামলাতে না পেরে গড়িয়ে মেঝের ওপর ঠিকরে পড়েছিলাম আমি। কোনোরকমে দেওয়াল ধরে ধরে গ্যালারীতে পৌঁছে দেখি, আগের মতই সিলিংয়ের আলো জলছে বটে, কিন্তু সব কিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। দেওয়ালের ছবিগুলো ঝুলছে ট্যারচা হয়ে, আসবাবপত্র ছত্রাকার। দেখেই বুঝলাম নিশ্চয় কাৎ হয়ে রয়েছে নোটিলস। বাইরে চেঁচামেচি শুনলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেনের দেখা পাওয়া গেল না।

গভীরতা পরিমাপক যন্ত্রতে দেখলাম, তখনও এক হাজার ফুট নীচে রয়েছি আমরা।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন ঘরে এলেন। চোখমুখ দেখে দারুণ উদ্বিগ্ন মনে হলো তাঁকে।

শুধোলাম—"নিছক ঘটনা; তাই না ক্যাপ্টেন?"

"না, এবার দুর্ঘটনা।" একটা ভাসমান বরফের পাহাড় উল্টে যাওয়ার সময়ে নোটিলসের ওপর এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে পাহাড়টা। সেই সাথে নোটিলসকেও তুলে ধরছে একটু একটু করে। সেই কারণেই এখন বরফের ওপর কাৎ হয়ে রয়েছে। ট্যাঙ্ক খালি করে ফেলে নাবিকরাও প্রাণপণে চেষ্টা করছে নোটিলসকে মুক্ত করতে। কিন্তু যন্ত্রে চোখ রেখে দেখলাম একটু একটু করে কমছে গভীরতা অর্থাৎ নোটিলসকে তুলে ধরছে বরফের পাহাড়টা। এই তুলে ধরা কোনোমতেই যদি বন্ধ না করা যায়, তাহলে অচিরেই ওপর নীচে বরফের মধ্যে থেঁৎলে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে অভিনব এই ডুবোজাহাজ।

আচম্বিতে টলমল করে উঠল নোটিলস। আর, তারপরেই ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়ালো দেওয়ালগুলো। দশ মিনিটের মধ্যে আগের মতই জলের মধ্যে ভাসতে লাগল জাহাজ।

জানলা খুলতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তা ইহজীবনে ভুলবো না। দুপাশে এবং ওপরে-নীচে বরফের অবরোধের মধ্যে এতটুকু সঙ্কীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে আমাদের জাহাজ। তীব্র আলো ধবধবে বরফের ওপর ঠিকরে পড়ে আরও উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো রঙে রঙীন করে তুলেছে সব কিছু। এ তো শুধু বরফ নয়; লক্ষ লক্ষ মরকত মণি, নীলকান্ত মণি, আর হীরের টুকরো যেন অবিশ্রান্ত দীপ্তি নিয়ে জ্বলছে বরফের গায়ে।

সামনের দিকে চলতে শুরু করল নোটিলস। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র দ্যুতিতে চোখ অন্ধ হয়ে এল। নোটিলস গতিশীল হওয়ার ফলে অযুত আলোক-কণিকাগুলো সারিবদ্ধ হয়ে যেন কোটি বিদ্যুৎ-আভায় অসাড় করে তুললে দৃষ্টি স্নায়ুমণ্ডলী। জানালা বন্ধ করে দেওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ চোখ রগড়ালাম দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে।

ভোর পাঁচটার সময়ে সামনের দিকে একটা ছোট সংঘর্ষ অনুভব করলাম। বুঝলাম, বরফের সঙ্গে আবার ধাক্কা লাগল নোটিলসের। পরক্ষণেই পেছনের দিকে ছুটে চলল জাহাজ।

সকাল আটটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত এইভাবে পিছিয়ে চলল নোটিলস। তারপর আবার একটা ধাক্কা লাগল পেছন দিকে।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন ঘরে ঢুকলেন।

"দক্ষিণে যাওয়ার পথ বন্ধ তো?" শুধোলাম আমি।

"হ্যাঁ, প্রফেসর। আমরা আটকা পড়েছি।"

নেড আর কনসেল ঘরেই ছিল। ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতে না হতেই দড়াম করে টেবিলের ওপর এক ঘুসি বসিয়ে দিলে নেড। কনসেল কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করলো না। আর আমি নির্বাক মুখে তাকিয়ে রইলাম ক্যাপ্টেনের পানে। ছুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে অভ্যাস মত ধীর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন উনি।

কিছুক্ষণ পরে নিজেই কথা শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। বললেন—"বর্তমান পরিস্থিতিতে দুভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে আমাদের। প্রথম, চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে মরা। দ্বিতীয়, বাতাসের অভাবে দমবন্ধ হয়ে মরা। অনাহারে মরার সম্ভাবনা বাদ দিলাম এই কারণে যে খাবার-দাবারের অভাব নেই আমাদের।"

বললাম—"বাতাসেরই বা অভাব হবে কেন? বাতাসের ট্যাঙ্ক তো ভর্তি রয়েছে।"

"এক ট্যাঙ্ক বাতাসে ছুদিন চলে। কিন্তু ছত্রিশ ঘণ্টা হলো আমরা জলের তলায় রয়েছি একটানা। আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের বাতাসের ভাঁড়ারও ফুরোবে।"

"তা'হলে যেমন করেই হোক এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।"

"ইতিমধ্যে সে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি, প্রফেসর। এই বদ্ধ সুড়ঙ্গের মেঝে খুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।" বলে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

আস্তে আস্তে নোটিলস নেমে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো বরফের উপর।

গ্যালারীর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম জনা-বারো ডুবুরি কুড়ুল হাতে নেমে পড়েছে বরফের ওপর। ক্যাপ্টেনও রয়েছেন তাঁদের সাথে! এমন কি নেডও এই বিপদে এগিয়ে গিয়েছে কুড়ুল হাতে। এখানকার বরফ প্রায় তিরিশ ফুট পুরু। নোটিলসের আকারের একটা বিরাট গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে দিয়ে জাহাজ গলিয়ে দিতে হলে প্রায় ৭০০০ ঘন গজ বরফ সরানো দরকার।

শুরু হলো বরফ কাটা। এক একটা চাই মূল স্তূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠতে লাগল ওপরের দিকে। সে এক দৃশ্য বটে।

ঘণ্টাছুয়েক পরে নেড এবং অন্যান্য সবাই ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল বিশ্রামের জন্যে। এবার যাদের পালা পড়লো, তাদের মধ্যে আমি আর কনসেলও রইলাম। বিশ্রামের জন্যে ছুঘণ্টা পরে জাহাজে ফিরে এসে হেমলেট খোলার

পর স্পষ্ট বুঝলাম কার্বনডায়-অক্সাইড গ্যাসে ভারী আর দূষিত হয়ে উঠছে নোটিলসের বাতাস।

কিন্তু এভাবে কাজ করে কিছু হবে বলে মনে হলো না। প্রথম সমস্যা পাঁচরাত চারদিন সমানে পরিশ্রম করলে তবে সফল হতে পারি আমরা। কিন্তু বাতাস ফুরিয়ে যাচ্ছে দুদিনের মধ্যেই। দ্বিতীয় সমস্যা, দারুণ ঠাণ্ডায় খোঁড়া অংশের জলই অল্পক্ষণের মধ্যে জমে বরফ হয়ে যেতে লাগল।

পরের দিন বাতাসের অভাবে রীতিমত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলো। আর সেই সাথে লক্ষ্য করলাম আরও একটা ভয়ংকর জিনিষ।

বরফের ছাদ এবং দুপাশের দেওয়াল পুরু হয়ে উঠেছে এবং অনেকখানি এগিয়ে এসেছে নোটিলসের দিকে। জাহাজের সাম্‌নে আর পেছনেও দশ ফুটের বেশী জল নেই।

উর্বর মস্তিষ্ক খাটিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করে ফেললেন ক্যাপ্টেন। নোটিলসের বড় বড় বয়লারে জল গরম করে, সেই ফুটন্ত জল পিচকিরির মত ছড়িয়ে দিতে লাগলেন চার পাশের দেওয়ালে।

দেখতে দেখতে বৃদ্ধি পেতে লাগল উত্তাপ। সেই রাতেই তাপমাত্রা উঠে এল শূন্যাংকের এক ডিগ্রী নীচে। শূন্যাংকের দু'ডিগ্রী নীচে না গেলে জল জমে বরফ হয় না। সুতরাং ক্রমশ পুরু হয়ে ওঠে বরফের দেওয়ালের চাপে পিষে মরার সম্ভাবনা আর রইল না।

কিন্তু অতি তীব্র হয়ে উঠল শ্বাসকষ্ট। ২৭শে মার্চ পায়ের তলার মাত্র চার গজের মত বরফ খোঁড়া বাকী রইল। আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে খাটলে তবে এই বরফের মধ্যে ছিদ্র করা সম্ভব। কিন্তু বাতাস তো আর থাকছে না। বেলা তিনটের সময়ে সামান্য একটু তাজা বাতাসের জন্যে খাবি খেতে খেতে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লাম আমি।

পুরোদমে কাজ চললো। আর যখন দু'গজ বরফ বাকী, তখন তো প্রত্যেকেরই একই অবস্থা। মাথা ঘুরছে, শিরা-উপশিরাগুলো প্রচণ্ড বেদনায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, মাঝে মাঝে চোখের সামনে অন্ধকার দুলে উঠছে, আর গলার মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রীর মত অন্তিম ঘড়ঘড়ানি শোনা যাচ্ছে।

ছ'দিন হলো এইভাবে আবদ্ধ রয়েছি আমরা। ক্যাপ্টেন কিন্তু এখনও অবিচলিত! এবার তিনি মরিয়া হয়ে শেষ স্তরটুকু নোটিলসের গুরুভার দিয়ে চাপ মেরে ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার মতলব আঁটলেন। জলের ট্যাঙ্কগুলো একটু খালি করে নোটিলসকে ভাসিয়ে তুলে এনে রাখলেন আমাদের খোঁড়া গর্তের ওপর। তারপর শুরু হলো ট্যাঙ্ক ভর্তি করা। হু-হু করে জল ঢুকতে

লাগল আধারগুলোয়। আর, নিদারুণ উত্তেজনায় উদ্বেগে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম আমরা। থমথমে নৈঃশব্দের মধ্যে শুনতে পেলাম মড় মড় করছে নীচের বরফ আরও জল ঢুকতে থাকে ট্যাঙ্কে, আরও ভারী হয়ে উঠতে থাকে নোটিলস।

আর তার পরেই একটা প্রচণ্ড চড় চড় চড়াৎ শব্দে দুভাগ হয়ে ফেটে গেল বরফের স্তর—ফাঁক দিয়ে ভারী সিসের টুকরোর মত গলে নেমে পড়ল নোটিলস।

বাড়তি. জল বার করে দেওয়ার জন্যে সব কটা পাম্প চালু করে দিলেন ক্যাপ্টেন। নীচে নামা স্থগিত হতেই উল্কাবেগে ছুটে চললাম উত্তরদিকে।

কিন্তু কতক্ষণ এইভাবে যাবো আমরা? আরও একটা দিন কি? কিন্তু তার আগেই নিভে যাবে আমার আয়ুর দীপ। লাইব্রেরী ঘরে নিশ্চল হয়ে শুয়েছিলাম আমি। ঠোঁট নীল হয়েছিল অক্সিজেনের অভাবে। বেশ বুঝলাম, আমি মরছি···

ঠিক এই সময়ে এক ঝলক তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরে উঠলো আমার। একটা টিউবের মধ্যে খানিকটা বাতাস অবশিষ্ট ছিল। নেড আর কনসেল আমার নাকের কাছে তাই ধরেছে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও। চেষ্টা করলাম নলটা সরিয়ে দিতে, কিন্তু পারলাম না। নোটিলস তখন ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ নট গতিবেগে তীরের মত বরফ জল তোলপাড় করে ছুটে চলেছে।

গভীরতা পরিমাপক যন্ত্রে দেখলাম মাত্র বিশফুট বরফের নীচে রয়েছি আমরা। জাহাজের পেছন দিকটা এবার হেলে পড়লো, মাথা ওপরের দিকে করে প্রচণ্ড বেগে দুরমুশের মত গিয়ে আছড়ে পড়ছে বরফের ছাদে। পিছিয়ে এল নোটিলস এবং আবার ধেয়ে গেল ভয়ংকর বেগে। এবার আর সেই বিপুল সংঘর্ষে চোট সামলাতে পারলো না বরফ-ছাদ—বিরাট ফাটলের মধ্যে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল গোটা জাহাজটা।

হ্যাচ খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে জাহাজের মধ্যে ঢুকে পড়ল ফুরফুরে টাটকা বাতাস।

এপ্রিলের বিশতারিখে নেড আর কনসেলকে নিয়ে গ্যালারীতে বসেছিলাম। কাঁচের ওপারে দেখতে পাচ্ছিলাম বিস্তর অতিকায় সমুদ্র-বৃক্ষ।

দারুণ আলোড়ন জেগেছিল গাছগুলোর মধ্যে! তাই দেখে আমি বললাম—"এই ধরনের বিরাট বিরাট সামুদ্রিক উদ্ভিদের মধ্যেই তো বংশবৃদ্ধি

করে অক্টোপাস। কাজেই এখন যদি এরকম সমুদ্র-রাক্ষস দু'একটা চোখে পড়ে যায়, তাহলে মোটেই অবাক হবো না আমি।"

"কালিমাছ তো?" শুধোলো কনসেল।

"না, খুব বিশাল চেহারার কাট্‌ল্‌ মাছ। কিন্তু চোখে তো পড়ছে না।"

কনসেল বললে—"শুনেছি আটপেয়ে এই দানবগুলো নাকি বড় বড় জাহাজকেও জড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের তলায় টেনে নিয়ে যায়?"

নেড বলে উঠল—"ওসব আজগুবি কাহিনী। ওরকম জানোয়ার আবার আছে নাকি?" জোর বিতর্ক চললো কিছুক্ষণ এই প্রসঙ্গ নিয়ে। আমি বললাম, "এ জাতীয় কাট্‌ল্‌-মাছের দেহটা হয় প্রায় ছ'ফুট লম্বা; আর এক একটা শুঁড় হয় সাতাশ ফুট লম্বা।"

"কত লম্বা বললেন?" শুধোলো নেড।

"শরীরটা ছ'ফুট বললেন না?" কনসেল জিজ্ঞেস করে। জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে ছিল ও।

"ঠিক তাই।" জবাব দিলাম আমি।

"মাথা থেকে সাপের মত আটটা শুঁড় বেরিয়ে থাকে তো?"

"তা তো থাকেই।"

"আর, বড় বড় চোখ?"

"হ্যাঁ।"

"আর, কাকাতুয়ার মত চঞ্চু?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কনসেল।"

"তা'হলে, দয়া করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাবেন কি?"

এক দৌড়ে কাঁচের সামনে হাজির হলো নেড।

তারপরেই এক চিৎকার—"এ কি কদাকার জানোয়ার!"

আমারও চোখে পড়ল কুৎসিত প্রাণীটা। প্রচণ্ড বেগে ভয়াল চেহারার একটা দানব ছুটে আসছিল নোটিলসের দিকে। বিশাল কাঁচের মত চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই দিকেই। গর্গনের সর্প-কুণ্ডলের মত মাথা থেকে বেরোনো আটটা পা কিলবিল করছিল জলের মধ্যে। শুঁড়গুলো কাঁচের ওপর লেপটে যেতেই তলার দিকে সারি সারি শোষক-প্রত্যঙ্গ দেখতে পেলাম। কঠিন চঞ্চুটা ঘন ঘন খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল—ফাঁক দিয়ে লক লক করে বেরিয়ে পড়ছিল কয়েক সারি ধারালো দাঁতের অস্ত্রে সজ্জিত একটা কঠিন জিভ। কম করে বিশটন ওজন হবে দানবটার। রেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের রঙ পালটে যাচ্ছিল তার। ধূসর আভার জায়গায় ফুটে উঠছিল লালচে বাদামী রঙ।

ডুবোজাহাজটার আকস্মিক আবির্ভাবে যে অক্টোপাসটা রীতিমত চটে গিয়েছিল, তা বুঝতে দেরী হলো না আমাদের কারোরই। শত চেষ্টাতেও ইস্পাত মোড়া নোটিলসের ওপর এতটুকু আঁচড় কাটতে না পেরে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার ক্রোধ। এ সব জানোয়ারের জীবনীশক্তি কিন্তু অনেক বেশী! তার কারণ এদের তিনটে হৃদযন্ত্র থাকে। আর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানি ঘটলে আবার তা নতুন করে গজিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও সৃষ্টিকর্তা এদের দিয়েছেন।

এত কাছ থেকে জানোয়ারটাকে এরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ আমি নষ্ট করলাম না। চট করে কাগজ পেন্সিল জোগাড় করে বসে গেলাম ছবি আঁকতে। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা দানব এসে জড়ো হলো নোটিলসের চার পাশে। সাতটা পর্যন্ত গুনতে পারলাম আমি। জাহাজের পাশে পাশেই সাঁতারে চললো ওরা দল বেঁধে। ইস্পাতের ওপর ওদের চঞ্চুর কড়াং কড়াং ঠোক্করও শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা।

আচম্বিতে থর থর করে কেঁপে উঠল নোটিলস এবং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে গেল জাহাজ।

"ধাক্কা লাগলো নাকি?" শুধোই আমি।

ক্ষণপরেই ফার্স্ট অফিসারকে নিয়ে হন হন করে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন।

অনেক দিন পর দেখলাম তাঁকে। চোখ মুখের ভাব খুব গম্ভীর। আমাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে, এমন কি আমাদের লক্ষ্য না করেই, সিধে এগিয়ে গেলেন জানলার সামনে। অক্টোপাসগুলোর দিকে তাকিয়ে কয়েকটা নির্দেশ দিলেন ফার্স্ট অফিসারকে। ফার্স্ট অফিসার বেরিয়ে গেলেন গ্যালারী থেকে। বন্ধ হয়ে গেল জানলার আবরণ।

আমার জিজ্ঞাসুদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন—"এই অক্টোপাসগুলোর সঙ্গেই এবার হাতাহাতি যুদ্ধ করতে হবে আমাদের। প্রপেলার বন্ধ হয়ে গেছে সম্ভবত ওদের শুঁড়-টুঁড় জড়িয়ে যাওয়ার জন্যে।"

"কিন্তু হাতাহাতি যুদ্ধ কেন?" সভয়ে বলি আমি।

"তার কারণ ওদের মাংস এমনই নরম যে আমার ইলেকট্রিক বুলেটও ফাটবে না জোরালো ধাক্কা না লাগার জন্যে। কাজেই কুড়ুল দিয়ে কাজ সারতে হবে।"

"আর হারপুন?" লাফিয়ে উঠে বলল নেড।

"নিশ্চয়" বললেন ক্যাপ্টেন।

দল বেঁধে সবাই গেলাম মাঝখানের সিঁড়ির কাছে। নোটিলস জলের ওপর ভেসে উঠেছিল। একজন নাবিক ওপরে উঠে গিয়ে খুলে দিল হ্যাচটা—

সঙ্গে সঙ্গে হড়াৎ করে সিঁড়ি বেয়ে কিলবিলিয়ে নেবে এল একটা ইয়া মোটা সাপের মত শুঁড়। মাথার ওপর আরো গোটা কুড়ি দুলতে লাগল বীভৎস ভঙ্গিমায়। কুড়ুলের এক মোক্ষম ঘায়ে শক্তিশালী বাহুটা দু'টুকরো করে দিলেন ক্যাপ্টেন।

ডেকের ওপর উঠতে যাচ্ছি সবাই, এমন সময়ে একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল। আচম্বিতে একটা শুঁড় সিঁড়ির ডগায় দাঁড়িয়ে থাকা নাবিকটিকে পাকে পাকে বেঁধে নিয়েই হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে গেল বাইরে। চীৎকার করে উঠে বিদ্যুৎবেগে পেছনে পেছনে চোখের আড়ালে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। আমরাও উঠে এলাম পিছু পিছু।

ভয়াবহ সে দৃশ্য ভোলবার নয়। শুঁড়ের কুণ্ডলিতে বেঁধে ফেলে হতভাগ্য লোকটাকে শূন্যে দোলাচ্ছিল একটা অতি-কদাকার অক্টোপাস। দম আটকে আসছিল লোকটার। সেই অবস্থাতেই চীৎকার করে উঠল সে—"বাঁচান! বাঁচান!" ফরাসী ভাষায় সেই কাতর চীৎকার শুনেই চমকে উঠলাম আমি। নোটিলসে তাহলে আমি একাই ফরাসী নই, একজন স্বদেশবাসীও রয়েছে!

কিলবিলে শুঁড়ের অরণ্যে হারিয়ে গেল লোকটা। উন্মাদের মত ধেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। কুড়ুলের এক ঘা বসিয়ে দিলেন জানোয়ারটার একটা বাহুতে। অন্যান্য বাহুগুলোর সঙ্গে আত্মহারা হয়ে যুঝতে লাগলেন ফার্স্ট অফিসার। আমরা তিন জনেও ঝপঝপ কোপ মারতে লাগলাম নরম মাংসের ওপর। একবার মনে হলো, এইবার বুঝি ফিরিয়ে আনা গেল বেচারীকে। সাতটা বাহু কেটে ফেলেছিলাম আমরা। শুধু একটা বাহুই মানুষকে তখনও নির্মমভাবে আন্দোলিত করছিল শূন্যে। ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট অফিসার একসাথে কুড়ুল তুলে এই শেষ বাহুটার দিকে তেড়ে যেতেই অক্টোপাসটা পেটের থলি থেকে কালোরঙের একরকম কালি পিচকিরির মত ছুঁড়ে দিলে আমাদের মুখের ওপর! কিছুই আর দেখতে পেলাম না আমরা। তারপর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসার পর আর দেখতে পেলাম না সেই এক বাহু জানোয়ারটাকে। হতভাগ্য স্বদেশবাসীকে নিয়েই জলতলে ডুব দিয়েছে দানবটা!

গোটা দশ বারো অক্টোপাস কিলবিল করছিল জাহাজের ডেক আর খোলের ওপর। রাগে অন্ধ হয়ে আমরা একসাথে আক্রমণ চালালাম এদের ওপর। রক্ত আর কালো কালির স্রোত হয়ে গেল। বড় বড় চোখ দেখলেই প্রচণ্ড বেগে হারপুন ঢুকিয়ে দিচ্ছিল নেড। হঠাৎ পেছন থেকে একটা অক্টোপাস

ছিটকে ফেলে দিলে ওকে। তারপরেই যখন চঞ্চুটা খুলে গেল ওর দেহের ওপর আমি লাফিয়ে গেলাম ওকে বাঁচাতে। কিন্তু আমার সামনে ছিলেন ক্যাপ্টেন। তিনি চকিতে তাঁর কুড়ুলটা বসিয়ে দিলেন উন্মুক্ত বিশাল চঞ্চুর ঠিক মাঝে! সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে জানোয়ারটার হৃদপিণ্ডের মধ্যে হারপুন চালিয়ে দিল নেড।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই শেষ হয়ে গেল লড়াই। বাকী কটা দানব রণে ভঙ্গ দিয়ে ডুব দিলে ঢেউয়ের তলে। যে সমুদ্র গ্রাস করে নিল তাঁর একজন অনুচরকে, সেই সমুদ্রের পানে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন।

আর, নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর কঠোর কপোল বেয়ে।......

পয়লা জুন ধীরে ধীরে ভেসে উঠল নোটিলস। অল্প অল্প দুলছিল জাহাজ। এমন সময়ে আচম্বিতে মেঘগর্জনের মত একটা শব্দ শুনলাম।

ডেকের ওপর গিয়ে দেখি নেড আর কনসেল আগেই হাজির হয়েছে সেখানে। দুজনেই তাকিয়ে রয়েছে পুব দিকে।

ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করতেই চোখে পড়ল জাহাজটা। মস্তবড় একটা ষ্টীমের জাহাজ। পূর্ণ গতিতে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে জাহাজটা। ছ'মাইল দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল গল্ গল্ করে কালো ধোঁয়ার রাশি উঠছে দু'দুটো চিমনি থেকে।

নেড বললে—"কামান ছোঁড়ার আওয়াজ।"

"কি জাহাজ?"

"যুদ্ধ জাহাজ বলেই তো মনে হচ্ছে। আহা রে, ওরা যদি এই জঘন্য নোটিলসকে ডুবিয়ে দিতে পারতো!"

"কোন দেশের জাহাজ?"

"তা বলতে পারব না। কোন নিশান নেই।"

আরও কাছে এগিয়ে এল জাহাজটা। বেশ জোরে ছুটে আসছে আমাদেরই লক্ষ্য করে—কিন্তু নিশানের কোন হদিশ পেলাম না!

নেড বলে উঠল—"নোটিলসের এক মাইল দূর দিয়ে গেলেও আমি সাঁতরে গিয়ে উঠবো জাহাজটায়। আপনারাও আসবেন আমার সাথে?"

কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম জাহাজটার দিকে। ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান অথবা রাশিয়া যে কোন জাতিই হোক না কেন ওরা—একবার যদি উঠতে পারি ওদের ডেকে, তা হলেই নিশ্চিন্ত। আচম্বিতে

জাহাজটার গলুয়ের কাছে ফস্ করে জেগে উঠল খানিকটা সাদা ধোঁয়া। কয়েক সেকেণ্ড পরেই কি একটা জিনিষ বিপুল শব্দে ঝপাস করে আছড়ে পড়ল সাবমেরিনের পাশেই জলের ওপর। তারপরেই বিস্ফোরণের দারুণ আওয়াজ ভেসে এল কানে।

"সর্বনাশ! ওরা তো কামান ছুঁড়ছে আমাদেরই ওপর!" চীৎকার করে উঠি আমি।

"ভালই তো। সাবাস!" বলে উঠল নেড।

"কিন্তু ডেকের ওপর আমাদের দিকে চোখ পড়ছে না ওদের?"

"খুব সম্ভব তা দেখেই ছুঁড়েছে!" শক্ত চোখে তাকিয়ে বলল নেড।

সত্যিই তাই। সারা পৃথিবী নিশ্চয় এতদিন জেনে গেছে এই সাবমেরিনের অস্তিত্ব। আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নেড যে হারপুন ছুঁড়েছিল, সে হারপুন নোটিলসের ইস্পাত বর্ম ভেদ করতে পারেনি এবং কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুটও নিশ্চয় তখন বুঝেছিলেন কিসের পেছনে দিনরাত ছুটে চলেছিলেন তিনি। পৃথিবীর সব নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজগুলোই নিশ্চয় এতদিনে তৎপর হয়ে উঠেছে এই আশ্চর্য ডুবোজাহাজের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য।

কিছুই অন্যায় করছে না। বিশেষ করে প্রতিহিংসা সাধনের জন্যে অভিনব এই সাবমেরিনকে যদি কাজে লাগাতে পারেন ক্যাপ্টেন নিমো, তা'হলে তারাই বা কামান ছুঁড়বে না কেন? সেই রাতে ক্যাপ্টেন আমাদের ঘরে বন্ধ করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন ওষুধ খাইয়ে নিশ্চয় এই রকমই একটা জাহাজকে আক্রমণ করবেন বলে। যুদ্ধের ফলেই অমন সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছিল তাঁর সেই অনুচর।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির মত কামানের গোলা এসে পড়ছিল চারিদিকে। কিন্তু কোনটাই সাবমেরিনের গায়ে লাগছিল না। মাইল তিনেক দূরে এসে গেছে জাহাজটা, কিন্তু তখনও ক্যাপ্টেনের পাত্তা নেই।

হঠাৎ নেড চেঁচিয়ে উঠলো—"আসুন, ওদের ইসারা করি। যে ভাবেই হোক, সরে পড়তে হবে এ জাহাজ থেকে।" বলে, পকেট থেকে রুমাল বার করে সবে নাড়তে যাচ্ছে ও, এমন সময়ে লৌহ কঠিন হাতের এক ধাক্কায় ওর মত জোয়ান শক্তিমান পুরুষও ছিটকে গড়িয়ে পড়ল ডেকের ওপর।

"দুশমন! শয়তান!" প্রচণ্ড রাগে বাজের মত হুংকার দিয়ে ওঠেন ক্যাপ্টেন। "নোটিলসের খড়্গ দিয়ে ঐ জাহাজটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করার আগে তুমি কি চাও আগে তোমাকেই গেঁথে ফেলি?" নিঃসীম ক্রোধের সেই ভয়ংকর রূপ দেখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। সারা মুখ রক্তহীন সাদা;

হয়ে গিয়েছিল, সূচ্যগ্র হয়ে উঠেছিল অক্ষি-তারকাদুটি, দুই হাতে নেডের কাঁধ খামচে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে সেকি বজ্র-হুংকার! তারপর, আচম্বিতে নেডকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন যুদ্ধ জাহাজটার দিকে। উপর্যুপরি গোলা এসে পড়তে লাগল তাঁর চার পাশে।

মেঘমন্দ্র কণ্ঠে গর্জে উঠলেন জাহাজকে উদ্দেশ করে "তুমি তা'হলে জানো কে আমি—জানো যে একটা অভিশপ্ত জাতির জাহাজ এই নোটিলস! কোনো নিশান নেই তোমার, তবুও আমি চিনি তোমাকে! কিন্তু এই ছাখো আমার নিশান!

বলেই, দক্ষিণ মেরুতে যে নিশান উড়িয়েছিলেন তিনি, হুবহু সেইরকম একটা উড়িয়ে দিলেন নোটিলসের ওপর। দারুণ শব্দে একটা গোলা এসে পড়ল ইস্পাত বর্মের ওপর, পড়েই ছিটকে গিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের পাশ দিয়ে। পড়লো সাগরে জলে। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার পানে ফিরলেন উনি।

বললেন—"আপনার বন্ধুদের নিয়ে নীচে যান।"

উদ্বিগ্নস্বরে শুধোলাম—"ক্যাপ্টেন, জাহাজটাকে কি আপনি আক্রমণ করবেন?"

"আমি ওকে ডুবিয়ে দেব এখুনি।"

"না, না, আপনি তা কখনই করতে পারেন না!"

"আমি তা করবই।" তুহিন শীতলস্বরে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। "এ নিয়ে আপনাকে কোনো মতামত দিতে হবে না। এ ব্যাপার আপনার এখতিয়ারে পড়ে না। আমাকে আক্রমণ করছে ওরা, আমার পালটা আক্রমণ হবে অতি-ভয়ংকর। ডেক খালি করে দিন।"

"কোন দেশের জাহাজ ওটা, তা কি জানতে পারি?"

"আপনি জানেন না? ভাল, ভাল! কোন দিনই তা জানতে পারবেন না। যান, নীচে যান!"

এ হুকুম অমান্য করার উপায় ছিল না। জনা বারো নাবিক নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছিল জাহাজটার অগ্রগতি—উদগ্র ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাদের চোখের তারায় তারায়। নীচে নামতে নামতে শুনলাম আরও একটা গোলা দড়াম করে আছড়ে পড়ল সাবমেরিনের ইস্পাত-বর্মের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের চীৎকারও শুনলাম—"চালাও! চালাও! যত পারো নষ্ট করো কামানের গোলা! ক্ষমতায় যা কুলোয়, তাই করো! কিন্তু জেনে রেখো, নোটিলসের খড়্গ এড়ানোর ক্ষমতা তোমাদের নেই!"

কেবিনে ফিরে এলাম আমি। ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট অফিসার ডেকের ওপরেই রইলেন। দুলে উঠল নোটিলস, তারপর সরে এল কামানের পাল্লা থেকে। পিছু পিছু ছুটে আসতে লাগল যুদ্ধ জাহাজটা—কিন্তু সমান ব্যবধান রেখে সরে সরে যেতে লাগল নোটিলস। বেলা প্রায় চারটের সময় উদ্বেগ উত্তেজনায় অধীর হয়ে হাজির হলাম ডেকের ওপর। বন্য শ্বাপদের মতই ডেকের ওপর পায়চারী করছিলেন ক্যাপ্টেন—দুই চোখের অঙ্গার-দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পাঁচ ছয় মাইল দূরের জাহাজটার ওপর। রকম সকম দেখে মনে হলো আক্রমণকারী জাহাজটাকে এখনও বোধ হয় চরম আঘাত করার জন্য মন স্থির করে উঠতে পারেন নি তিনি। তাই ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পূর্ব দিকে। একটু ভরসা এল মনে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টায় সবে মুখ খুলতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এক হুংকারে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন উনি।

"আমিই বিচার, আমিই মানুষের অধিকার। আমি নির্যাতিত, আর ঐ দেখুন নির্যাতক। যা কিছু ভালবাসতাম আমি, স্বদেশ, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাবা মা—সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে ওদের নিগ্রহে। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি যা ঘৃণা করি, তা হলো ঐ! চুপ করে থাকুন আপনি!"

শেষবারের মত পুরোদমে ছুটে আসা জাহাজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীচে নেমে এলাম আমি। নেড আর কনসেলকে খুঁজে বার করে বললাম—"আর নয়, এবার সরে পড়া যাক এ জাহাজ থেকে!"

"চমৎকার! কোন দেশের জাহাজ ওটা?" শুধোল নেড।

"তা জানি না। কিন্তু ভোর হওয়ায় আগেই ক্যাপ্টেন ডুবিয়ে দিচ্ছেন জাহাজটাকে।"

"রাত্তির হতে দিন। সুযোগ একটা মিলবেই।"

নেমে এল রাতের অন্ধকার। নিবিড় প্রশান্তি ছড়িয়ে ছিল নোটিলসের মধ্যে। আমাদের মতলব ছিল, জলের ওপর দিয়েই নোটিলস যখন ধেয়ে যাবে জাহাজটার দিকে, তখনই জলে লাফিয়ে পড়বো আমরা। চাঁদের আলো ছিল। কাজেই ভয় নেই।

রাত তিনটার সময়ে আবার ডেকে উঠলাম। ক্যাপ্টেন তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন ডেকের ওপর পাথরের মূর্তির মত। পত-পত শব্দে কালো নিশানটা উড়ছিল মাথার কাছে। মাইল দুয়েক দূরে শান্ত সমুদ্রের জল তোলপাড় করে জাহাজটা সমানে ছুটে আসছিল আমাদের পিছু পিছু। জাহাজের লাল-সবুজ-সাদা আলো, এমন কি চিমনি দিয়ে ছিটকে ওঠা আগুনের ফুলকিগুলোও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

ভোর ছটা পর্যন্ত রইলাম ডেকের ওপর। কিন্তু একবারও আমাকে লক্ষ্য করলেন না ক্যাপ্টেন। দিনের আলো ফুটে উঠতেই মাইল দেড়েক দূর থেকে আবার শুরু হলো গোলাবর্ষণ। এবার সরে পড়ার সময় এসেছে। নীচে নামতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কয়েকজন লোক নিয়ে ফার্স্ট অফিসার ওপরে এলেন। রেলিং সরিয়ে ফেলা হলো; হুইল-হাউস আর লাইট-টাওয়ার খোলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে মসৃণ করে ফেলা হলো নোটিলসের ইস্পাত বর্ম। গ্যালারীতে ফিরে এসে দেখলাম গতি কমে এসেছে আমাদের। কামান গর্জন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে—জলের মধ্যে দিয়ে শিষ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে গোলাগুলো।

ঠিক এমনি সময়ে হ্যাচ বন্ধ করার শব্দ শুনলাম এবং পরক্ষণেই কানে ভেসে এল ট্যাঙ্কে জল ঢোকার শব্দ। নোটিলস জলে ডুব দিচ্ছে। আক্রমণটা তা'হলে নীচ থেকেই হবে, ওপর থেকে নয়। পালাবার সুযোগ হাতে এসেও এই ভাবে ফস্কে যেতে আমাদের মনের যা অবস্থা হলো তা বলবার নয়। নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আতংকে আড়ষ্ট হয়ে কেবিনে বসে রইলাম তিনজনে। প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগলাম একটা গগন-বিদারী বিস্ফোরণের শব্দ।

অনুভব করলাম, গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে নোটিলসের। সারা জাহাজটা এবার কাঁপতে লাগল থর থর করে। আচমকা চীৎকার করে উঠলাম আমি। বাস্তবিকই একটা ঝাঁকুনি লাগল জাহাজে—কিন্তু ভয়াবহ কিছু নয়। ইস্পাতের সংঘর্ষে ইস্পাত গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার মড়মড় শব্দ ভেসে এল কানে, আর কাপড়ের মধ্যে দিয়ে ছুঁচ চলে যাওয়ার মতই যুদ্ধ জাহাজ ভেদ করে সিধে বেরিয়ে গেল নোটিলস।

আতংকে উন্মাদের মত ছুটে গিয়েছিলাম গ্যালারীতে। দেখেছিলাম, নিঃশব্দে পোর্ট জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপ্টেন। থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, কি ভাবে আস্তে আস্তে ডুবছে অতবড় জাহাজটা। যন্ত্রণা-দৃশ্যের সবটুকুই যাতে উপভোগ করতে পারেন, তাই জাহাজটার সঙ্গে সঙ্গেই নামতে লাগল নোটিলস। দশ গজ দূরে দেখতে পেলাম জাহাজটার একপাশে একটা বিরাট ফোকর। দুই সারি কামানও চোখে পড়ল। ডেকের ওপর কালো কালো অনেকগুলি মূর্তি ছুটোছুটি করছিল দিশেহারা হয়ে, জল যতই উঠতে লাগল ওপরে, ততই তারা মাস্তুল ইত্যাদি বেয়ে উঠে চেষ্টা করতে লাগল সমুদ্রের করালগ্রাস থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার।

বেদনায় বোবা হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম এই শোচনীয়

দৃশ্য। জানলার সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার মত মনোবলও আমার তখন ছিল না।

আস্তে আস্তে ডুবতে লাগল বিশাল রণপোতটি। আচমকা একটা বিরাট বিস্ফোরণে উড়ে গেল গোটা ডেকটা। থর থর করে কেঁপে উঠল নোটিলস। এবার আরো দ্রুত তলিয়ে যেতে লাগল জাহাজটা। দেখতে দেখতে লোকজন সমেত তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সমুদ্রের ওপর থেকে।

চোখ ফেরালাম ক্যাপ্টেনের পানে। তখনও দুই চোখে প্রতিহিংসার অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে ঘৃণা-নিষ্ঠুর দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছিলেন তিনি এই অন্তিম মুহূর্ত। সব যখন শেষ হয়ে গেল, উনি ফিরে এলেন নিজের কেবিনে। দেওয়ালে ঝুলোনো সারি সারি মহাবীরদের ছবির নীচে দেখলাম আরও একটি ছবি। একজন তরুণী মহিলার দুই পাশে ছোট ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে। কিছুক্ষণ অপলকে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন, তারপর দুই হাত তাদের দিকে প্রসারিত করে নতজানু হয়ে বসে পড়ে কাঁদতে লাগলেন অঝোরধারে।

ঝপাঝপ করে নিভে গেল সবকটা আলো। বন্ধ হয়ে গেল গ্যালারীর জানালা। তীরবেগে এই ভয়ংকর স্থান ছেড়ে ছুটে চলল নোটিলস একশো ফুট জলের তলা দিয়ে।

এগারোটার সময়ে আলো জ্বলে উঠল। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতই কখনো জলের ওপর দিয়ে, কখনও নীচে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে চলল নোটিলস।

দিন পনেরো কুড়ি ধরে একটানা এইভাবে আমরা ছুটে চললাম উত্তর দিকে। মাঝে মাঝে বাতাস নেওয়া হতো জলের ওপর ভেসে। হ্যাচ বন্ধ হয়ে গেলেই আবার ডুব দিয়ে অবিরাম বেগে ছুটে চলত নোটিলস। এই সময়ের মধ্যে ক্যাপ্টেন, ফার্স্ট অফিসার, এমন কি কোনো নাবিককেও দেখতে পেলাম না আমরা।

রহস্য আর বিভীষিকা ভরা নোটিলসে আর কোনো রাতই ভাল করে ঘুমোতে পারিনি আমি। এমন এক দুঃস্বপ্ন রাত ভোর হওয়ার পর ঘুম ভেঙে যেতে দেখলাম নেড ঝুঁকে রয়েছে আমার মুখের ওপর।

চোখ মেলতে ফিস ফিস করে বলে ওঠে ও—"আজই আমরা পালাচ্ছি।"

উঠে বসে শুধোলাম—"কখন?"

"রাত্রে। পাহারা সরিয়ে নিয়েছে ওরা।"

"আমরা এখন কোথায়?"

"কুয়াশার মধ্য দিয়ে এই মাত্র কুড়ি মাইল পূবে তীরভূমি দেখতে পেয়েছি আমি।"

"ঠিক আছে আজ রাতেই। যা থাকে কপালে।"

সন্ধ্যা ছটায় ডিনার শেষ করে নিলাম। সাড়ে ছটায় নেড এসে জানিয়ে গেল রাত দশটায় চাঁদ ওঠার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়বো আমরা।

গ্যালারীতে গিয়ে দেখলাম ভয়াবহ বেগে ছুটে চলেছি আমরা দেড়শো ফুট জলের তলা দিয়ে। শেষবারের মত ঘরের সম্পদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি। তারপর কেবিনে ফিরে এসে পরলাম সবচেয়ে পুরু পোশাক, জ্যাকেটের মধ্যে ঠেসে নিলাম এতদিন ধরে লেখা দিনপঞ্জীটা। হৃৎপিণ্ড উত্তাল হয়ে উঠেছিল নিদারুণ উত্তেজনায়। জানিনা ক্যাপ্টেন কি করেছেন। পাশের কেবিনেই শুনলাম ঘরের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করছেন তিনি। যেন কোনো সমুদ্র দেবতা।

সাড়ে নটার সময়ে শুনলাম অর্গান বাজাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। বড় করুণ কোমল সুর—অখণ্ড নৈঃশব্দের মধ্যে দিয়ে যেন ঝরে ঝরে পড়ছে অতি তীব্র বেদনা।

ক্যাপ্টেন তা হলে গ্যালারীতে রয়েছেন। কি সর্বনাশ! এই গ্যালারী পেরিয়েই তো বেরোতে হবে আমাকে। আর দেরী করা যায় না। সাহসে বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। গ্যালারীর দরজা ফাঁক করে দেখলাম ভেতরে মিশমিশে অন্ধকার। তখনও বেজে চলেছিল অর্গান—ক্যাপ্টেন তা হলে আমাকে দেখতে পান নি। সম্ভবত দিনের আলোতেও আমাকে দেখতে পেতেন না—সে সময়ে অন্য দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন উনি। পা টিপে টিপে কার্পেট মোড়া গ্যালারী পেরিয়ে লাইব্রেরীর ঘরে পৌছাতে লাগল পুরো পাঁচ মিনিট। সবে দরজাটা খুলতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলাম। লাইব্রেরী ঘরের দরজা দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছিল। দেখলাম উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নিঃশব্দে, বুকের ওপর দুই হাত ভাঁজ করে রেখে, প্রেতের মতই এগিয়ে এলেন আমার দিকেই। তারপরেই শুনলাম তাঁর ফুঁপিয়ে ওঠা এবং এই কয়েকটি কথা:

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! অনেক তো হল! আর কেন?"

শেষ বারের মত এই কথা কটিই শুনেছিলাম তাঁর মুখে। শুনে মনে হয়েছিল, এ যেন তাঁর অনুতাপের দহন।

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল আমার। তীর বেগে লাইব্রেরীর মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরের প্যাসেজে—দেখলাম নৌকোটা আছে। হ্যাচের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখলাম নেড আর কনসেল আগে থেকেই হাজির রয়েছে সেখানে।

"আর দেরী নয়—বেরিয়ে পড়ো!" রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম আমি।

"না আর দেরী নয়।" জবাব দিলে নেড। বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচগুলো। যে ছিটকিনি দিয়ে নৌকাটা সাবমেরিনের গায়ে আটকানো থাকে, তার স্ক্রু খুলছে কনসেল, এমন সময়ে একটা গোলমাল শুনলাম জাহাজের ভেতরে। দারুণ উত্তেজনার হট্টগোল। আমাদের অন্তর্ধান কি ওরা ধরে ফেলেছে? নেড একটা ছোরা গুঁজে দিলে আমার হাতে।

আর, তার পরেই শুধু একটি শব্দই বার বার ভেসে এল আমার কানে "মেলষ্টর্ম! মেলষ্টর্ম!"

নিঃসীম আতংকে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল আমার। শেষকালে নরওয়ের উপকূলের ভয়াবহ ঘূর্ণিপাকে পড়লাম নাকি? কুখ্যাত মেলষ্টর্মের কবল থেকে কোনো জাহাজও যে নিষ্কৃতি পায় না! বুঝতে পারলাম, ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে নোটিলস। স্ক্রুর মত ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে কেন্দ্রের দিকে।

নেড বলে উঠলো "স্ক্রুগুলো এঁটে দাও। জাহাজের ভেতর থাকলে আমরা বেঁচে গেলেও যেতে পারি···"

কিন্তু কথা শেষ হতে না হতেই খুলে গেল স্ক্রুগুলো। জ্যা নিক্ষিপ্ত তীরের মতই ছিটকে বেরিয়ে গেল নৌকাটা। ইস্পাতের ফ্রেমে দারুণ ভাবে ঠুকে গেল আমার মাথা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম আমি।

চেতনা ফিরে পাওয়ার পর লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জে একজন জেলের কুঁড়ে ঘরে শুয়ে থাকতে দেখলাম নিজেকে। নেড আর কনসেল ঝুঁকে ছিল আমার ওপর। কি করে সেই ভয়ংকর ঘূর্ণি থেকে রক্ষা পেলাম, তা আমরা কেউই জানিনা। জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকার সময়ে লিখে ফেললাম আমার এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

কিন্তু নোটিলসের কি হলো? মেলষ্টর্মের মরণ-পাক থেকে কি বেরিয়ে যেতে পেরেছিল নোটিলস? ক্যাপ্টেন নিমো কি এখনও বেঁচে আছেন? আশা করি, তিনি জীবিত আছেন আর তাঁর অতি প্রিয় সাগরে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন আগের মতই এবং ঘৃণার অতি তীব্র অনল নিভে গিয়ে শুদ্ধ সুন্দর হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তঃকরণ।

সম্পাদকীয় পুনশ্চঃ

মেলষ্টর্মের খপ্পর থেকে নোটিলস আদৌ রেহাই পেয়েছিল কিনা, কোন বিপর্যয়ের ফলে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সাগরতলে বাসা নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নিমো, বিশেষ একটি জাতির যুদ্ধ জাহাজের প্রতি কেন তাঁর অত বিদ্বেষ এবং ক্যাপ্টেন নিমো কে—এ সবের উত্তর রয়েছে জুল ভের্ণ রচনাবলীর অন্যখণ্ডে প্রকাশিত আশ্চর্য উপাখ্যান "মিষ্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড" যে।

ক্যাপ্টেন নিমোর চরিত্র আঁকতে গিয়ে ভের্ণ নিজেকে ধরা দিয়েছেন। নিমোর মতই ভের্ণ প্রচারবিমুখ, শোষকের শত্রু, শোষিতের বন্ধু। নিমোর মতই তিনি গান ভালবাসেন, স্বাধীনতা ভালবাসেন, সমুদ্র ভালবাসেন। নিমোর মতই তিনি সমাজ থেকে দূরে থাকতে চান, অথচ বিজ্ঞানের প্রগতি নিয়ে মাথা ঘামান সমাজেরই মঙ্গলের জন্যে।

সমুদ্রকে এত ভালবাসেন বলেই জুল ভের্ণ এই উপন্যাসে উদগ্র উৎসাহে অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে সমুদ্র এবং সামুদ্রিক প্রাণীকুলের এমন তথ্যাবলী উপস্থাপিত করেছেন যা নিবন্ধের সামিল। বর্তমান অনুবাদে সেগুলির অনুপস্থিত কাহিনীর উত্তেজনাকে আরো বৃদ্ধি করেছে—সব সায়ান্স-ফিকশনের প্রথমেই যা থাকা দরকার।

এমন শোনা যায় যে ভের্ণ নাকি ডুবোজাহাজের 'আবিষ্কারক'; এই উপাখ্যান লেখার আগে নাকি সাবমেরিন বস্তুটা কারো কল্পনায় আসেনি! প্রকৃতপক্ষে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ডুবোজাহাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে; ভের্ণের সময়ে তাঁরই স্বদেশবাসী পেটিট কিভাবে সাবমেরিন সমেত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন—তা ভোলবার নয়।

সাবমেরিন 'আবিষ্কার' না করলেও সাবমেরিন জিনিসটা যে বাস্তবে সম্ভব হতে পারে—তিনি তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন তাঁর অতুলনীয় কাহিনীর মধ্যে—যেমনটি করেছেন হেলিকপ্টার আর মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে। সাবমেরিনের উদ্ভাবকরা নোটিলসের কাছে কতখানি ঋণী, তা বলা মুস্কিল। তবে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ সালে স্যার জর্জ হিউবার্ট উইলকিন্স যে সাবমেরিনে সুমেরু অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তার নাম ছিল 'নোটিলস'। তারপরেও, পারমাণবিক শক্তিচালিত প্রথম মার্কিন সাবমেরিন গিয়েছে মেরু অঞ্চলে—তারও নাম 'নোটিলস'।

পৃথিবী থেকে চাঁদে

[ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন]

"গান-ক্লাবের দুঃসাহসী সভ্যেরা স্থির করলেন চাঁদের ওপর গোলা ফেলা হবে! তৈরী করতে হবে নশো ফুট লম্বা কামান!...তারপরেই শুরু হলো অবিশ্বাস্য চন্দ্র অভিযান! এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মত দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি সুবিশাল ক্লাসিক সায়েন্স-ফিকৃশন্ উপন্যাস!"

ঃ প্রথম খণ্ড ঃ

১॥ গান-ক্লাব

যুক্তরাষ্ট্রে তখন নিজেদের মধ্যে জোর লড়াই চলছে। এই সময়ে মেরিল্যাণ্ডে বাল্টিমোর শহরে একটা নতুন ধরনের ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। আমেরিকানরা লড়াইয়ের গন্ধ একবার পেলে হয়! সামরিক ব্যাপারে জাহাজ-মালিক, দোকানদার, যন্ত্রবিদ—প্রত্যেকেরই সমান নেশা। দেদার টাকা খরচ করে গোলা-বারুদের উন্নতি সাধনে সবারই সমান আগ্রহ সে-দেশে।

একটা ব্যাপারে ইউরোপীয়ানদেরও টেক্কা মেরেছিল আমেরিকানরা। কামান-বন্দুক নির্মাণ শিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল তারা। কামান-বন্দুক চালানোর ব্যাপারে এবং নির্ভুল লক্ষ্যভেদে ফরাসি, ইংরেজ, প্রুসিয়ানদের নতুন কিছু শেখার আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তাদের কামান, হাউইটজার আর মর্টার আমেরিকানদের ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে পকেট পিস্তল ছাড়া কিছুই নয়।

এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইয়াঙ্কিরা হল বিশ্বের প্রথম যন্ত্রবিদ্—জন্মসূত্রে ইটালিয়ানরা যেমন সঙ্গীত বিশারদ এবং জার্মানরা দার্শনিক—

আমেরিকানরাও তেমনি জন্মসূত্রে ইঞ্জিনীয়ার। সুতরাং প্রতিভাটাকে কামান বন্দুক নির্মাণে প্রয়োগ করবে আমেরিকানরা, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কোনো আমেরিকানের মাথায় কোনো আইডিয়া একবার উঁকি দিলে হয়। তৎক্ষণাৎ আরেকজন আমেরিকানকে তা শোনানো চাই। তিন মাথা এক হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের একজন হবে প্রেসিডেণ্ট, বাকী দুজন সেক্রেটারী। চতুর্থ জন থাকলে কাগজপত্র রাখার জন্যে তাকে দরকার হবে। পঞ্চম জন হাজির হলে সাধারণ সভা ডাকা হবে। তারপরেই গড়ে উঠবে ক্লাব। বাল্টিমোরেও তার অন্যথা হল না। নতুন ধরনের একটা কামানের আবিষ্কারক কামানের জন্য দুই কারিগরের সঙ্গে মিলেমিশে 'গান-ক্লাব'য়ের পত্তন করলেন। একমাস যেতে না যেতেই ক্লাবের মূল সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ১৮৩৩ এবং ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখল ৩০,৫৭৫ জন।

ক্লাবের সদস্য হওয়ার সর্ত শুধু একটিই। কামানের নক্সা আবিষ্কারের কৃতিত্ব থাকা চাই। অন্য আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের এলেম থাকলেও চলবে। তবে রিভলবারের মত ছোটখাট অস্ত্র ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

আমেরিকার সেই বিখ্যাত গান-ক্লাবের মস্ত হলঘরে কয়েকজন জমায়েত হয়েছিল তেসরা অক্টোবর সন্ধ্যের দিকে। প্রত্যেকেই অবশ্য গান-ক্লাবেরই সদস্য। উপস্থিত প্রত্যেকের চেহারায় একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এতই স্পষ্ট যে তা কারোরই চোখ এড়ায় না। এতগুলি লোক, কিন্তু আশ্চর্য! কারোরই শরীর আস্ত নয়। কারও হাত আছে, কিন্তু পা নেই। কারও দুটো পা-ই রয়েছে বটে, কিন্তু হাত দুটোর কোন পাত্তা নেই। আবার কারও আছে হাত, আছে পা—কিন্তু নেই একটা চোখ, কি একটা কান। কেউ লাগিয়েছে কাঠের হাত, কারও বা কাঠের পা। আবার কারও অক্ষি-গহ্বরে শোভা পাচ্ছে কাঁচের চোখ। এক কথায়, অধিবেশন কক্ষে এমন একটি লোকও নেই, যার দেহ নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অঙ্গহানি হয়েছে।

ক্রাচ, কাঠের পা, নকল হাত, ইস্পাতের আঁকশি, রবারের চোয়াল, রুপোর খুলি, প্লাটিনাম নাক—গান-ক্লাবের সদস্যদের অঙ্গের শোভা যেন!

গান-ক্লাবের সদস্যদের একমাত্র কাজই হলো কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ তৈরী করা। সংঘের নামটা 'গান-ক্লাব' হয়েছে ঐ কারণেই। সদস্যদের প্রত্যেকেই পাকা গোলন্দাজ। দেশ-বিদেশে এই কারণেই নাম ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের। কিভাবে কামান বানালে বিশাল বিশাল গোলাগুলোকে অনেক দূরে পাঠানো যায়, কিভাবে এই দূর পাল্লার কামানের গোলা সেকেণ্ডের

মধ্যে লক্ষ্যবস্তুর বেশ খানিকটা জায়গা ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে পারে, 'গান-ক্লাব'-এর প্রতিটি নামকরা সদস্যর ধ্যান-ধারণার বস্তু ছিল শুধু তাই। আর এই সব এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়েই, কামান-বন্দুক-গোলা-বারুদের কার কত শক্তি, তা পরখ করতে গিয়েই প্রত্যেকেই কিছু না কিছু চোট পেয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছে। কিন্তু এর জন্যে কোন রকম খেদ ছিল না ওদের মনে। এই অঙ্গ-হীনতাই যেন ওদের ক্ষমতার, ওদের ধীশক্তির বিজয়টীকা—অন্তত ওরা তাই ভাবত। কি করলে আরও বেপরোয়াভাবে সবকিছু ধ্বংস করা যায়, চোখের নিমেষে মানুষকে পরলোকের পথ দেখিয়ে দেওয়া যায়—এই ধরনের নতুন নতুন পরিকল্পনা অহরহ গজাত ওদের উর্বর মগজে এবং পরিকল্পনাগুলোকে কোন রকমে সফল করে তুলতে পারলেই ওরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করত।

কিন্তু দুঃসময় প্রত্যেকেরই জীবনে একবার না একবার আসে। 'গান-ক্লাবে'র এ হেন সভ্যদের অদৃষ্টেও লেখা ছিল এই দুর্দিন। হেথায় হোথায় যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল, সে সব আচমকা বন্ধ হয়ে গেল! রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে হাঁপিয়ে উঠেছিল আমেরিকার মানুষ। তাই তারা এতদিন দেশের যতকিছু লড়াইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে। 'শান্তি চাই।' অবাক কাণ্ড! সত্যি সত্যিই একদিন সবরকম শক্তি-পরীক্ষাই থেমে গেল। আমেরিকায় তো বারোমাসই একটা না একটা গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকতো। সেগুলো গেল বন্ধ হয়ে। 'গানক্লাবে'র সদস্যরা এবার চোখে সর্ষেফুল দেখলো। মাথায় আচমকা বাজ পড়লেও বুঝি এত-বিমূঢ় হতো না ওরা। সদস্যদের জমায়েৎ ঘটতো না ক্লাবের বিশাল হলঘরটায়। নতুন কোন অধিবেশন-এ বসতো না। নতুন কোন জনপদবিধ্বংসী হাতিয়ার আবিষ্কার করার পর যে তুমুল হুল্লোড়, উল্লাস, জয়ধ্বনি—তাও আর শোনা যেত না। সদস্যরা এসে করবেই বা কি? অধিবেশন, করেই বা কি লাভ? নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করার আর কোনো প্রয়োজনই তো ছিল না। দু'একজন হোমরা-চোমরা সভ্য ছাড়া ক্লাবের ধারে কাছে তাই আর কেউ আসতো না। দেশ-বিদেশের কত ম্যাগাজিন টেবিলের ওপর গাদা হয়ে পড়ে থাকত, কিন্তু একটারও মোড়ক ছিঁড়ে পাতা ওল্টানোর লোকও মিলত না ক্লাব রুমে।

যে গান-ক্লাব গমগম করত সদস্য সমাবেশে, এখন সেখানে চাকররা বসে বসে ঢোলে, ঘরগুলো খাঁ খাঁ করে, কেউ কেউ অন্ধকার কোণে লম্বা হয়ে নাক ডাকায়; অন্যান্যরা মুখে কুলুপ এঁটে বিপর্যয়কারী শান্তির মুণ্ডপাত করে মনে মনে।

আক্ষেপের সুরে হাণ্টার বললেন—"কপাল বড়ই খারাপ যাচ্ছে হে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে থাকতে কুঁড়ের বাদশা হয়ে যাচ্ছি। অথচ একদিন আমাদের ঘুম ভাঙতো কামানের ধমকে। ঘুম আসতো কামানের গর্জন শুনতে শুনতে। কি সুন্দর সেই দিনগুলো! দুর্বিষহ এই জীবন। আর কি সেদিন ফিরে আসবে?" অতীতের কথা বলতে বলতে এমনই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হাণ্টার যে তাঁর কাঠের পা-খানা চুল্লির আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোনো খেয়ালই রইল না।

বিলসবি বললেন—"আর এসেছে সেদিন! মাথা তোমার খারাপ হয়েছে নাকি? অতীত তো এখন স্বপ্ন বলেই মনে হয়। সে সব দিনে একটা কামান তৈরী হতে না হতেই শুরু হয়ে যেত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা। তারপর তাঁবুতে ফিরে এলে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সে কি হৈ-চৈ! একদিন যদি কোনো কামান বেশী মানুষ সাবাড় করতো, সেদিন তো উল্লাসের সীমা-পরিসীমা থাকতো না ক্যাম্পে। ওদিন আর কি ফিরে আসবে হে? না, না, আর আসবে না।"

ম্যাসটনের হাতটা ইস্পাতের আঁকশি দিয়ে তৈরী। এঁদের কথা শুনে আঁকশি দিয়ে গাটাপার্চা খুলি চুলকোতে চুলকোতে ক্ষোভের সুরে বলে উঠলেন —"বরাৎ। সবই বরাৎ। আগামী দিনগুলোতে আবার যে যুদ্ধ বাধবে সে রকম কোনো সম্ভাবনাই তো দেখছি না আমি। নিষ্কর্মা হয়ে সকালে বসেছিলুম। তখনই একটা নতুন ধরনের কামানের নক্শা এঁকে ফেলেছি। এমন কি মাপজোপ, ওজনও হয়ে গেছে। এ কামান যদি যুদ্ধে লাগানো যেত, তা'হলে দেখতে লড়াইয়ের চেহারাটাই আমূল পালটে যেত।"

"না, না! কি যে বলেন! তাও কি সম্ভব?" বিখ্যাত ম্যাসটনের কথা শুনে কিন্তু টম হাণ্টারের মন আপনা হতেই উড়ে গেছে বিগত দিনের স্মৃতিতে। জেঁটি ম্যাসটনের একটি মাত্র আবিষ্কারের প্রথম পরীক্ষাতেই একদা তিনশ সাঁইত্রিশজন মানবকে যমের দক্ষিণ দুয়োর দেখানো গিয়েছিল।

ম্যাসটন বললেন—"যা সত্যি, তাই বললাম! কিন্তু লাভ কি এত কষ্ট, এত মেহনৎ, এত অসুবিধেকে কব্জায় এনে নতুন আবিষ্কারের? খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট! 'নতুন দুনিয়া' এখন শান্তি নিয়ে মশগুল। এদিকে 'ট্রিবিউন' কাগজ লিখেছে এই হারে জন সংখ্যা বেড়ে চললে কেলেংকারীর একশেষ হবে—শীগগিরই সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দেবে।"

কর্ণেল ব্লুমসবি বললেন—"তা'হলে এক কাজ করা যাক। চল, আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে যাই। তারপর কোনরকমে ওদের ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই

কেল্লা ফতে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসবে। নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে খুব সচেতন ওখানকার দেশগুলো।”

বিলসবি বলে উঠল—“কি সব আবোল-তাবোল বকছো? আমেরিকার মাটিতে জন্মে কি না শেষ পর্যন্ত বিদেশীর জন্যে কামান তৈরী করবো?”

রেগে গেলেন কর্ণেল ব্লুমসবি।

বললেন—“আরে গেল যা! নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার চাইতে তো ভাল। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে যা জানতাম, তাও তো ভুলে যেতে বসেছি।”

ম্যাসটন বললেন—“ওহে কর্ণেল, বিদেশে যাওয়াব পরিকল্পনা নাকচ করো। বিশেষ করে ইউরোপে তো নয়ই। জাতির উন্নতি কিভাবে হয়, তা বুঝতে দেখছি তোমার এখনও ঢের দেরি! কোথায় আমেরিকা আর কোথায় ইউরোপ। এ দুটো দেশের মধ্যে কোনদিনই বনিবনা ঘটবে না। ওদের ধারণা, আগে পতাকাবাহী নাকি সেনাধ্যক্ষ হওয়া যায় না।”

“হাস্যকর!” বিমর্ষ মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হাণ্টার। বললেন- “তবে আর কি! এস, এবার নেমে পড়া যাক ক্ষেত-খামারে তামাক চাষ নিয়ে। আর না হয়, তিমি মাছ শিকার করে তার চর্বি জ্বাল দিই। যত্তো সব রাবিশ কথাবার্তা।”

এবার ম্যাসটন একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

বলেন—“অতটা না করলেও চলবে—তোমার কি মনে হয় চিরকাল ‘শান্তি, শান্তি’ করে কাটবে এ দেশের? সবুর করো দুদিন, তারপর দেখবে আবার লেগেছে যুদ্ধ। আরে, ভুল করেও কি ফ্রান্স আমাদের দু’একখানা জাহাজ ডুবিয়ে দেবে না? দু’চারটে খুনে আমেরিকানকে ইংল্যাণ্ড কি আর ফাঁসিতে লটকাবে না? একটু ধৈর্য ধরো, যুদ্ধ বাধলো বলে। একটা শুধু অছিলা চাই।”

“কিন্তু ম্যাসটন, তুমি ভুলে যাচ্ছ আমেরিকার চামড়া এখনও গণ্ডারের মতই সুরু। দু’চারটে আলপিনের ঘা-য়ে কি আর তার সাড়া জাগে? বৃথাই অত আশা করছো। আমরা আর মানুষ নেই ভাই, একদম জাহান্নামে গেছি। তা না হলে এতদিনে একটা ছোটো-খাটো যুদ্ধও বেধে যেত।” বললেন ব্লুমসবি।

“আচ্ছা, আমেরিকা কি একদিন বৃটিশদের ছিল না?” ম্যাসটন বললেন।

“তা অবশ্য ছিল। কিন্তু তাতে কার কি?” টম হাণ্টার রেগেমেগে ক্রাচ ঠুকে সায় দিলেন।

“কার কি? আরে তাই যদি হয়, তাহলে ইংল্যাণ্ডটাই আমাদের দেশ হবে না কেন শুনি?”

বিলসবির চারটে দাঁত ভাঙা ছিল। সেই ভাঙা দাঁতেই কিড়মিড় করে বলে উঠলেন—"কথাটা প্রেসিডেণ্টের কাছেই একবার বলে ছাখো না, কত ধানে কত চাল হাড়ে হাড়ে টের পাবে।"

"আমি তো এবার আর ওঁকে ভোট দেব না।" বললেন ম্যাসটন।

সবাই বললেন—"আরে দিচ্ছেই বা কে ?"

শেষকালে সবাই এই বিষয়ে একমত হলো এবং আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেণ্টকে আর ভোট দেওয়া হবে না। বেজায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সদস্যরা।

ম্যাসটন বললেন—'আমার নতুন মর্টার যদি রণক্ষেত্রে পরখ করতে না পারি, তা'হলে কিন্তু আমি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চাষ-বাস শুরু করব !'

"আমরাও ?" সমস্বরে বললেন বাকী সদস্যরা।

সোজা কথায় গান-ক্লাব উঠে যাওয়ার উপক্রম হল। কিন্তু উঠতে উঠতেও অসাধারণ ক্লাবটা টিঁকে গেল অকস্মাৎ একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটায়।

হৃদয়বিদারক এই সব কথাবার্তার পরেই ক্লাবের সব সদস্যের হাতে পৌছোলো সীলমোহর করা একটি বিজ্ঞপ্তি :

বাল্টিমোর, অক্টোবর ৩

'গান-ক্লাবের সভাপতি সবাইকে জানাচ্ছেন যে, আগামী পাঁচই অক্টোবর রাত আটটার সময়ে তিনি একটা দারুণ আশ্চর্য খবর শোনাবেন সংস্থার সদস্যদের। আশা করি, সেইদিন প্রতিটি সদস্য অন্যান্য কাজকর্ম ছেড়ে অধিবেশন কক্ষে হাজির থাকবেন। সবাইকে আবার জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেদিনকার সভাটি।'

'ইম্পে বার্বিকেন, প্রেসিডেণ্ট, গান-ক্লাব।

২॥ প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন যা বললেন

পাঁচই অক্টোবরের রাত্রি। এর মধ্যেই কাতারে কাতারে সদস্য এসে জড়ো হয়েছে গান-ক্লাবের অধিবেশন কক্ষে—তিলধারণের স্থানও আর নেই। গান-ক্লাবের মোট সদস্যসংখ্যা তিরিশ হাজারেরও বেশী। ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রত্যেকটা ট্রেনে তবুও লোক আসার বিরাম নেই। শেষকালে অতবড় হলঘরটা লোকের মাথায় কালো হয়ে যাবার পর রাস্তার মোড়গুলোতেও অপেক্ষা করতে লাগল উত্তেজিত সদস্যরা। গেটে দারোয়ান মোতায়েন করা হলো। সঙ্ঘের সভ্য ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার রইল না।

মিটিং শুরু হবে রাত আটটায়। সেদিন কিন্তু গান-ক্লাবের সদস্য ছাড়া

কোনো আগন্তুককে কোনোক্রমেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না একুশ নম্বর ইউনিয়ন স্কোয়ারে—গান ক্লাবের অধিবেশন কক্ষে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়েও পাত্তা পাচ্ছে না কেউ। শহরের কেষ্টবিষ্টুরাও সাধারণ লোকের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অধিবেশনের খবর শোনবার জন্যে।

বিশাল হলঘরের দৃশ্য দেখবার মত! মস্ত মস্ত খিলানকে ধরে রেখেছে বিশাল কামানের থাম—থামগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট মর্টারের ওপর। গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র শোভা পাচ্ছে ঘরের দেওয়ালে। গ্যাসের আলোয় ঝকঝক করছে অগুন্তি রিভলবার, শামাদানের আলোয় চিকমিক করছে একসাথে বাঁধা পিস্তল আর মাস্কেট-বন্দুকের গোছা। কামানের মডেল, ব্রোঞ্জের ছাঁচ, গোলার খোল—কিছুরই অভাব নেই।

সভাপতির আসন পাতা ছিল হলঘরটার এক কোণায় একটা উঁচু মঞ্চের ওপর। রাশি রাশি আলোয় দিনের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল অতবড় ঘরটা। আসনটা বসানো হয়েছিল একটা কামান-বওয়া গাড়ীর ওপর। আসনের সামনে ছিল একটা টেবিল। সদস্যদের বসবার জন্যে গ্যালারীটা তৈরী হয়েছিল এই টেবিলের সামনেই। চারজন সেক্রেটারীর আসন ছিল মঞ্চের ওপরেই। প্রেসিডেন্টের হাতের কাছে অদ্ভুত ধরনের একটা ঘণ্টা। তুমুল বাগ-বিতণ্ডার সময়ে এই ঘণ্টা বাজালে পিস্তল নির্ঘোষের মত আওয়াজ শোনা যায়।

সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। ধীর, স্থির স্বভাব। ক্রনোমিটারের কাঁটার মতই চলে তার প্রতিটি কাজ। যে কাজ অন্যের কাছে রীতিমত কঠিন বার্বিকেনের কাছে তা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। সদস্যদের মধ্যে নিখুঁত শরীর ছিল শুধু তাঁরই! অথচ নিত্য নতুন গোলাবারুদ কামান বন্দুক আবিষ্কার করার মত প্রতিভা তিনি যা দেখিয়েছেন, তেমনটি আর কেউ দেখাতে পারে নি।

বার্বিকেন খাঁটি ইয়াঙ্কি। কাঠের গোলার ব্যবসা করে ভদ্রলোক বেজায় বড়লোক হয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়ে গোলন্দাজ বাহিনীর ডিরেক্টর হয়ে উদ্ভাবনী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ওঁর চিন্তা ভাবনা অতীব বলিষ্ঠ, গবেষণাও তাই। সেদিনের সভাতেও তিনি নীরবে আপন চিন্তায় তন্ময় হয়ে বসেছিলেন হাতলওলা চেয়ারে।

আটটা বাজতে তখনো দেড় মিনিট বাকি। কালো রেশমের একটা টুপি মাথায় দিয়ে মঞ্চের ওপর উঠলেন ইম্পে বার্বিকেন। ঘড়িতে আটটা বাজার প্রথম ঘণ্টা বাজতেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন বার্বিকেন—"আমার সাহসী বীর সতীর্থরা। যে অসহ্য কর্মহীনতার মধ্য দিয়ে

কালক্ষেপ করছেন বিখ্যাত গান-ক্লাবের নামকরা সদস্যরা তা বাস্তবিকই দুঃসহ! আর কেই বা জানবে বলুন যে আচমকা যুদ্ধ-বিগ্রহ সব থেমে গিয়ে সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে? আপোষ হয়েছে হোক, কিন্তু তা যে এতদিন দীর্ঘস্থায়ী হবে, এইটাই ছিল কল্পনাতীত। এই দীর্ঘদিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা প্রতীক্ষা করেছি নতুন কিছু লড়াইয়ের। ব্যর্থ হয়েছি দিনের পর দিন এবং সেইজন্যে শীগগিরই যে যুদ্ধ বাধবার কোন সম্ভাবনাই নেই, সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত হয়েছি। কিন্তু তাই বলে কি চুপচাপ বসে বসে শুধুই হাই তুলে তুড়ি বাজাবো আমরা? গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক এবং আরও কতশত হাতিয়ারের কোনো উন্নতিই হবে না?

"আপনারাই বলুন, যুদ্ধ যদি আর নাই হলো, তা'হলে কি মূর্খের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে আমরা এই কথাই প্রমাণ করবো যে আমরা এই উনবিংশ শতাব্দীর একদম অযোগ্য? আপনারাই বলুন, যে গান-ক্লাবের নাম সারা দুনিয়া জানে, সেই গান ক্লাব তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে নতুন ধরনের কোন কিছুই কি করতে পারবে না?"

সদস্যরা বুঝল প্রেসিডেণ্ট এবার কাজের কথায় আসছেন।

হাজার হাজার গলার কোরাস শোনা গেল—"গান-ক্লাব নতুন কিছু করতে চায়।" বার্বিকেন কথার খেই তুলে নিয়ে বলে চললেন—"ফ্রেণ্ডস! অনেক ভেবে আমি দেখলাম, এমন কোনো কিছু আমাদের করা দরকার, যা শুধু এই আমাদের পক্ষেই শোভা পায়—শুধু গান-ক্লাবের নয়, আমেরিকারও মান-মর্যাদা যাতে রক্ষা পায়। দুনিয়ার প্রতিটি লোক যে কথা শুনলে তাজ্জব বনে যাবে, এমন কাজই দরকার আমাদের।"

সারা হলঘর জুড়ে নিদারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল এই কথায়।

আবার হাজার হাজার গলা চেঁচিয়ে উঠল একসাথে—"কি সেই কাজ? বলুন, বলুন।"

বার্বিকেন প্রশান্ত মুখে চেয়ে রইলেন। টুপি ঠিক করে নিয়ে বললেন:

"আপনারা সকলেই পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদকে দেখেছেন। অন্তত দেখে না থাকলেও, চাঁদের কথা তো শুনেছেনই। আমাদের পরবর্তী অভিযান হবে এই চাঁদের দেশেই-চন্দ্রালোক আবিষ্কার করে দ্বিতীয় কলম্বস হতে চাই আমরা। বর্তমানে ছত্রিশটি রাজ্য রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। গান-ক্লাব তার যথাসাধ্য প্রয়োগ করে আরও একটি রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। চাঁদের দেশ যে আমাদের অধিকারে আসবেই, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

বিকট চীৎকার করে উঠল সদস্যরা "থি্রু চিয়ার্স ফর দি মুন!"

এই হট্টগোলের মধ্যে থেকেই গুরুগম্ভীর গলায় বলে চললেন বার্বিকেন—"বন্ধুগণ, চাঁদের দেশ নিয়ে যে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেছে, তা আপনাদের অজানা নয়। চাঁদ কতদূরে আছে, তার ওজন, গতি আর ঘনত্ব কতখানি, এমন কি তার আসল আকারটাই বা কি রকম—সবই আজ আমাদের জানা। সৌরজগতে চাঁদের কাজটাই বা কি, তা-ও আমাদের অজানা নেই। চাঁদ সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর গল্প নিশ্চয় আপনারা পড়েছেন, চন্দ্রালোকে পাড়ি দেওয়ার অনেক বিস্ময়কর পরিকল্পনাও নিশ্চয় শুনেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজ পর্যন্ত এই দুরূহ কাজে কেউই বুক ঠুকে এগোতে পারে নি। কাজে কাজেই এখনও চাঁদ অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে।

বিস্ময় আর কৌতূহলের গুঞ্জনধ্বনি যেন দমকা হাওয়ার মতই আছড়ে পড়ল বক্তার ওপর।

বার্বিকেন বলে চললেন—"কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের এই উপগ্রহর রহস্যভেদ কর.. চেষ্টা করেছেন যাঁরা তাদের সম্বন্ধে দু'চারকথায় কিছু বলার অনুমতি দিন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডেভিড ফেব্রিসিয়াস নামে এক ভদ্রলোক দারুণ বড়াই শুরু করে দিয়েছিলেন; তিনি নাকি স্বচক্ষে চাঁদের বাসিন্দাদের দেখেছেন!

"১৬৪৯ সালে জঁ। বোদোই নামে এক ফরাসি একটা গল্পকথা ছাপেন। বইটার নাম 'ডোমিনগো গোনজালেজের পৃথিবী হতে চাঁদে অভিযান।' ডোমিনগো নাকি স্পেন দেশের এক দুঃসাহসী ব্যক্তি!

"একই সময়ে সিরানো ডি বারজারাক ছাপলেন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ—'জার্নিজ ইন দি মুন'—অর্থাৎ 'চন্দ্রাভিযান'। তার কিছু পরেই ফনটেনেলি নামে আর এক ফরাসি লিখলেন চাঁদ নিয়ে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী।

"১৮৩৫ সালে 'নিউইয়র্ক আমেরিকান'য়ে একটা প্রবন্ধ বেরুলো। স্যার জন হার্সচেল উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়ে নতুন ধরনের দূরবীন দিয়ে চাঁদকে না কি মাত্র আট গজ দূরে এনে ফেলেছেন! ফলে তিনি যা যা দেখেছেন, তার মধ্যে আছে বড় বড় গুহার মধ্যে চড়ছে হিপোপটেমাসের দল; সবুজ পাহাড় ঘিরে যেন সোনালী বর্ডার দেওয়া রয়েছে; হাতীর দাঁতের মত শিংওলা ভেড়া ঘুরছে মাঠে-ঘাটে; সাদাটে হরিণ ছুটছে; বাদুড়ের মত ডানাওলা চন্দ্র-জীবরা সবকিছুর মালিক হয়ে বসে আছে!

"আর একটা কাহিনী শোনাই। রোটারডামের হান্স ফাল একটা বেলুনে চেপে শূন্যে উড়েছিল। হাইড্রোজেনের চাইতে সাঁইত্রিশ গুণ হাল্কা একরকম

গ্যাস নাইট্রোজেন থেকে নিষ্কাষণ করে বেলুনে ভরা হয়েছিল। তাই মাত্র উনিশ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদে পৌঁছে গেল বেলুন। কাহিনীটা অন্যান্য কাহিনীর মতই বিলকুল কল্পনাপ্রসূত এবং অতি অদ্ভুত এই কাহিনী লিখেছিলেন সুবিখ্যাত মার্কিন লেখক—এডগার পো।"

"জয় হোক এডগার পো'র!" প্রেসিডেন্টের কথায় তড়িৎস্পৃষ্টের মত গর্জন করে উঠল শ্রোতারা।

"এতক্ষণ যা বললাম, তা হল কাগজ কলমের এক্সপেরিমেণ্ট—'রাতের রানী'র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে নেহাতই অপ্রতুল। কিন্তু হাতে-কলমে যাঁরা এক্সপেরিমেণ্ট করেন, এমনি ক'জন প্রতিভাধরের দুঃসাহসের কথা এবার বলা যাক। বছর কয়েক আগে একজন জার্মান জ্যামিতিবেত্তা সাইবিরিয়ার বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর থেকে একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানের প্রস্তাব করেছিলেন। ধূ-ধূ প্রান্তরে প্রকাণ্ড জ্যামিতিক নক্সা আঁকা হবে এমন কায়দায় যা থেকে আলো প্রতিফলিত হবে এবং ঝলমল করবে। যে-কোনো বুদ্ধিমান জীব সেই নক্সা দেখলেই তার মানে ধরে নেবে। সত্যি যদি চাঁদে ধীমান জীব থাকে, তারা তক্ষুনি জবাব দেবে পাল্টা নক্সা এঁকে। এইভাবে পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে জ্যামিতিক 'অক্ষরে' চিঠির আদান-প্রদান চলবে।

"জার্মান জ্যামিতিবেত্তার অভিনব এই প্রস্তাব-মাফিক কোনো কাজ অবশ্য এগোয় নি এবং আজ পর্যন্ত চাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা আমেরিকানরা, আমাদের বাস্তব প্রতিভা নিয়ে এতদিনের স্বপ্নকেই সম্ভব করে তুলতে চাই। আমার প্রস্তাবের মূলকথা হল এইটাই।"—সভ্যদের তুমুল হট্টগোলে বাকী কথাটা চাপা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চেঁচামেচি একটু কমলে আবার বলতে শুরু করলেন বার্বিকেন "আপনারা অনেকেই হয়তো মনে করছেন অসম্ভব প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তিমে দিচ্ছি আমি। কিন্তু মোটেই তা নয়—বরং খুবই সোজা হবে এই অভিযান। গত কয়েক বছরের মধ্যে কামানের পাল্লা যে কতখানি প্রসারিত হয়েছে, কতদূর পর্যন্ত কামান-নিক্ষিপ্ত গোলা ধেয়ে যেতে পারে এবং বিস্ফোরকেরও যে কতখানি উন্নতি হয়েছে, তা নিশ্চয় আপনাদের কারোরই জানাতে বাকি নেই। ওস্তাদ গোলন্দাজদের হাতে পড়লে বারুদ যে কতখানি শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর বৃদ্ধি পায় কামানের পাল্লা—সে তথ্যও আপনাদের অজানা নয়। এইসব কারণেই আমি ভাবছিলাম, চাঁদের বুকে আমাদের কামান থেকে একটা গোলা ফেলতে পারলে কোন দোষ আছে কি? তাতে আমাদের কামানের ক্ষমতাটাও পরখ করে নেওয়া যাবে আর চন্দ্রালোক অধিকারও সহজতর হয়ে উঠবে।"

মূক অভিনন্দনের যেন ঝড় বয়ে গেল অভিনব এই প্রস্তাব শুনে। বক্তার বাচনভঙ্গীতে প্রতিটি শ্রোতা উদ্বেলিত হল, রোমাঞ্চিত হল, অনুপ্রাণিত হল, বিস্মিত হল এবং স্তম্ভিত হল।

বেশ কিছুক্ষণ অভিভূতের মত নির্বাক হয়ে রইল সবাই। আর তারপরেই, সামলে নিয়ে প্রত্যেকেই যেভাবে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল যে থর থর করে কাঁপতে লাগল সমস্ত হলঘরটা। আরও একবার কথা বলবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন বার্বিকেন। এই হট্টগোলের মধ্যে কথা বলার চেষ্টা করাও নিছক পাগলামো। দশ মিনিট পরে উত্তেজনা কমে এলে শান্ত হলো সদস্যরা। তখন হলঘরের মধ্যে আবার ধ্বনিত হলো ইস্পে বার্বিকেনের জোরালো দরাজ কণ্ঠস্বর—"আর একটা কথা আমি বলতেই চাই। এই কটা দিন হিসেব করে আমি দেখেছি, সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ গতিসম্পন্ন কোনো গোলাকে যদি চাঁদকে টিপ করে ছোঁড়া যায়, তাহলে তা চাঁদে পৌঁছোবেই। সেই জন্যেই আপনাদের কাছে বিনীতভাবে শুধু এইটুকুই আমি অনুরোধ করি যে, সামান্য এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামান আপনারা।"

৩॥ সভাপতির ভাষণের প্রতিক্রিয়া

সভাপতির শেষ ক'টি কথা শেষ না হতেই যে কাণ্ড ঘটল, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমেরিকান ভাষায় উল্লাসকে প্রকট করার জন্যে যে কটা শব্দ আছে, সব উচ্চারিত হল নিমেষ মধ্যে। চীৎকার, হট্টগোল, হুর্‌রে ধ্বনি, গলাবাজি—কিছুই আর বাকি রইল না। যুগপৎ হতভম্ব আর উল্লসিত হলে যে দৃশ্য দাঁড়ায়—এ হল তাই। চেঁচিয়ে, হাততালি দিয়ে, হলঘরের মেঝেতে পা ঠুকে প্রত্যেকে নিজের নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলে। ক্লাব-মিউজিয়ামের সবকটা অস্ত্র একসঙ্গে দেগে দিলেও এত জোর আওয়াজ হত কিনা সন্দেহ। এতে অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। কয়েকজন কামানবাজ কামানের চাইতেও বেশী ডাক ছাড়তে পারে দরকার হলে।

আনন্দ উল্লাসের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন বার্বিকেন। সতীর্থদের আরো দু'এক কথা বলার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু কে কার কথা শোনে তখন। হাত তুলে থামাতে বলেও যখন কাজ হল না, উনি ওঁর অদ্ভুত ঘণ্টাধ্বনি করলেন। ঘন ঘন পিস্তল নির্ঘোষের মত সেই আজব ঘণ্টাধ্বনিও চাপা পড়ে গেল সদস্যদের আনন্দোচ্ছ্বাসে। আনন্দের চোটে শেষকালে তাঁকে আসন থেকে মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল সদস্যরা।

তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল উৎসব। বেরোলো শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা, নাচ-গানের হৈ-হুল্লোড়ে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। এ যেন এক জাতীয় উৎসব। মেরীল্যাণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেতে উঠল সেই কল-কল্লোলে।

'ভিভা', 'হুররে', 'ব্রাভো' ইত্যাদি ইয়াঙ্কি বচনমালায় রাস্তাঘাট যখন মুখরিত, মশালধারীদের শোভাযাত্রায় পথ আলোকিত ঠিক তখন যেন তাগ বুঝে গগনে আবির্ভূত হল চাঁদামামা। শহরের আলোকে ম্লান করে দিয়ে ঝরে পড়ল তার রূপোলী কিরণধারা! মুগ্ধ চোখে চাঁদের সেই রূপের দিকে চেয়ে রইল ইয়াঙ্কিরা। রাত আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত চাঁদ দেখবার জন্যে শুধু অপেরা গ্লাস বিক্রী করেই বড়লোক হয়ে গেল জোন্‌স-ফল স্ট্রীটের একজন চশমার দোকানদার।

মাঝরাতের ফুর্তি কমল না। সুরাপানের হিড়িক পড়ে গেল যেন। জিন-হুইস্কি শেরী গিলে আনন্দে নাচতে লাগল মেরীল্যাণ্ডের সর্বশ্রেণীর লোক।

দু'জন লোকের দেখা সাক্ষাৎ হলেই অমনি শুরু হলো চাঁদের কথা। রাস্তায়, দোকানে, রেস্তোরায়, অফিসে, বন্দরে, মাঠে, ঘাটে মুখোমুখি হলেই চন্দ্রালোকের কথা কইতেই হবে। চন্দ্রালোকে কামানের গোলা পাঠানো সম্বন্ধে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল আমেরিকার হাজার হাজার খবরের কাগজে। রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই আলোচনা করতে লাগল বার্বিকেনের এই চমকপ্রদ অভিযানপ্রস্তাব নিয়ে। আর সবার শেষে একটা বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত হলো। প্রত্যেকেই বললে, গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন যা বলছেন, তা নাকি মোটেই অসম্ভব নয়, আজগুবি নয়। আমেরিকানরা পারে না, এমন কিছু আবার আছে নাকি? ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার এত ব্যবধান তো এই কারণেই।

রাত দুটো নাগাদ উত্তেজনায় ভাঁটা শুরু হল। বাড়ী পৌছোলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন সারা গায়ে কালসিটের দাগ নিয়ে। জনতা তাঁকে নিয়ে থে তলেছে, দলাইমলাই করেছে—তাদের আনন্দের ঠেলায় প্রেসিডেণ্টের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনেকটা মিশরের ম্যমীর মত। স্বয়ং হারকিউলিসও এরকম তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। জনতা ক্রমশঃ সরে গেল চৌমাথা, চত্বর আর রাস্তা থেকে। স্টেশন থেকে লোকেরা রেলগাড়ীতে চেপে ফিরে গেল ওহিও, সাসকুইহানা, ফিলাডেলফিয়া এবং ওয়াশিংটনে। যুক্তরাষ্ট্রের চারকোণে জনতা ছড়িয়ে যেতেই শান্ত হল বাল্টিমোর।

পরের দিন টেলিগ্রাফের দৌলতে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচশ খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে ফলাও করে ছাপা হল খবরটা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক,

দ্বি-মাসিক—সব ধরনের কাগজেই আলোচনা আরম্ভ হল বার্বিকেনের প্রস্তাব নিয়ে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চন্দ্রাভিযান নিয়ে পর্যালোচনা করা হল। আবহাওয়া, শরীর, অর্থনীতি, বিবেক থেকে আরম্ভ করে রাজনীতি এবং সভ্যতা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ল এই একটি ব্যাপার নিয়ে।

কাগজে-কাগজে লেখালেখি অনেক হল বটে, কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত হল সবাই। বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় কাগজওলারা একবাক্যে প্রস্তাবটার বিবিধ সুবিধে মেনে নিলে। ফলে, সারাদেশ থেকে গান-ক্লাবের নামে অভিনন্দনসহ অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসা শুরু হল।

সেইদিন থেকে ইম্পে বার্বিকেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে নামজাদা নাগরিকে পরিণত হলেন।

দিন কয়েক পরে বাল্টিমোর থিয়েটারে একটা ইংরেজ থিয়েটার-গ্রুপ 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া' নাম দিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করার মতলব আঁটল। এ-নাটক মঞ্চস্থ হওয়া মানে বার্বিকেনের সম্মান হানি হওয়া—সুতরাং নাগরিকরা কাতারে কাতারে থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে এমন হামলা শুরু করল যে ভয়ের চোটে থিয়েটার গ্রুপ 'যথা অভিরুচি' নামে অন্য একটা নাটক মঞ্চস্থ করল এবং বহুদিন ধরে বেশ কিছু পয়সা লুটে নিলে।

৪॥ কেমব্রিজ মানমন্দিরের জবাব

একটি মাত্র প্রস্তাব শুনিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলেও ইম্পে বার্বিকেনের নির্বিকার মুখে তেমন কিছু উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গেল না। আমেরিকানরা যখন কল্পনায় নিত্য নতুন পরিকল্পনা ফাঁদছে চাঁদে যাওয়ার, বার্বিকেন তখন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বসে এবং অনেক রকম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চন্দ্রালোকে যাওয়ার পথ সুগম করে তুলছিলেন।

উনি প্রথমেই সতীর্থদের আহ্বান জানালেন গান-ক্লাবের বোর্ডরুমে। আলাপ আলোচনার পর ঠিক হল, সবার আগে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের মতামত নেওয়া দরকার। যান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে ভাবা যাবে তার পরে।

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ম্যাসাচুসেট্‌স্-য়ে। বিশেষ কয়েকটি প্রশ্ন পর পর সাজিয়ে সেখানকার কেম্‌ব্রিজ মানমন্দিরে চিঠি লিখলেন বার্বিকেন। জবাব এল দুদিন পরেই। চিঠিখানা সংক্ষেপে এই :

"কেমব্রিজ মানমন্দিরের ডিরেক্টর লিখছেন গান-ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে।

কেমব্রিজ, অক্টোবর ৭

আপনি ছটি প্রশ্ন করেছেন। যথা—

১। চাঁদে গোলা নিক্ষেপ সম্ভব?

২। পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে সঠিক দূরত্ব কত

৩। কদ্দিনে গোলাটা চাঁদে পৌছোবে? কখন কামান দাগতে হবে?

৪। কোন্ সময়ে চাঁদ খুব কাছাকাছি থাকবে যাতে গোলাটা সহজেই সেখানে পৌছোতে পারে?

৫। গগনের কোন দিকে টিপ করে গোলা ছোঁড়া হবে?

৬। গোলার রওনা হওয়ার সময়ে চাঁদ কোন অবস্থায় থাকবে?

প্রথম প্রশ্ন – চাঁদে গোলা নিক্ষেপ সম্ভব?

জবাব—হ্যাঁ, সম্ভব।

প্রতি সেকেণ্ডে কোনো কামানের গোলা যদি বারো হাজার গজ পাড়ি দিতে পারে, তাহলে তা অক্লেশে চাঁদে হাজির হবে। সেক্ষেত্রে মহাকর্ষের জোরালো কানুনকে অনায়াসেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবে কামানের গোলাটা। অভিকর্ষের কোনো জারি-জুরিই আর খাটবে না তার ওপর এবং তাকে পৃথিবীর ওপর আবার টেনে নামাতেও পারবে না। ছুটতে ছুটতে মহাকাশের এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌছোবে গোলাটা যেখানে পৃথিবীর টানের চেয়ে অনেক বেশী জোরালো হয়ে উঠবে চাঁদের আকর্ষণ। ফলে বৃদ্ধি পাবে গোলাটার গতি এবং তা আরো জোরে ধেয়ে যাবে চাঁদের মাটি লক্ষ্য করে। সারাটা পথ একই গতিতে অর্থাৎ বরাবর সেকেণ্ডে বারো হাজার ফুট যেতে পারলে চাঁদে পৌছোতে কয়েক ঘণ্টার বেশী লাগতো না গোলাটার। কিন্তু তাতো আর সম্ভব নয়। মহাকর্ষের পিছুটান আছে, বাতাসের তুমুল বাধা আছে—ফলে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে গোলাটার গতি। অনেক আঁক-জোক করে বিজ্ঞানীরা বললেন যে জায়গাটায় পৃথিবীর আকর্ষণ শেষ হয়েছে আর শুরু হয়েছে চাঁদের আকর্ষণ—সেখানে পৌছোতেই গোলাটার তিরাশি ঘণ্টা বিশ মিনিট লেগে যাবে। সেখান থেকে চাঁদে পৌছোতে লাগবে আরও তেরো ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট বিশ সেকেণ্ড।

অর্থাৎ চাঁদে যে সময়ে গোলা ফেলতে হবে, তার ৯৭ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড আগে কামান্ দাগতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে সঠিক দূরত্ব কত?

জবাব—

চাঁদ যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, তা তো আপনারা জানেনই। কিন্তু এই ঘোরাটা বৃত্তাকার পথে হয় না। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে

পৃথিবীর কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে যায় চাঁদমামা, তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের ব্যবধান থাকে দু লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বাহান্ন মাইল! আবার যখন পৃথিবীর খুব কাছে আসে, তখনও পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব থাকে দু লক্ষ আঠারো হাজার ছশো সাতান্ন মাইল। কাজে কাজেই, পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যখন চাঁদ পৌছোয়, কামান ছোঁড়া দরকার ঠিক তখনি।

তৃতীয় প্রশ্ন—কদ্দিনে গোলাটা চাঁদে পৌছোবে? কখন কামান দাগতে হবে?

জবাব—প্রথম প্রশ্নের শেষ ক'লাইনে দেখুন।

চতুর্থ প্রশ্ন—কোন সময়ে চাঁদটা খুব কাছাকাছি থাকবে যাতে গোলাটা সহজেই সেখানে পৌছোতে পারে?

জবাব—প্রতি মাসেই একবার পৃথিবীর খুবই কাছে আসে চাঁদ। কিন্তু সব মাসে Zenith অর্থাৎ খমধ্য ছাড়িয়ে যায় না। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটা লাইন যদি আপনার মধ্যে দিয়ে টানা হয়, তবে সেই লাইনটা মাথার ওপরকার আকাশকে যেখানে স্পর্শ করবে, তাকেই বলা হয় খমধ্য বা সুবিন্দু বা জেনিথ। অনেক বছর পর পর চাঁদ এইভাবে একবার মাত্র পৃথিবীর খুবই কাছে আসে। বিজ্ঞানীরা বার্বিকেনকে বললেন, সামনের বছর ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে, বহু বছর পরে এই অবস্থায় পৌছোবে চাঁদ।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রশ্ন—গগনের কোন দিকে টিক করে গোলা ছোঁড় হবে? গোলা রওনা হওয়ার সময়ে চাঁদ কোন অবস্থায় থাকবে?

জবাব—আগের প্রশ্নের জবাব পড়ুন। তারপর—কিন্তু এই অবস্থায় আসার আগেই পয়লা ডিসেম্বর রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের সময়ে চাঁদ তাগ করে কামান ছুঁড়তে হবে। এই সময়ে নাকি পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আরও কয়েক মাইল কমে যাবে। ঠিক ঐ সময়ে কামান ছুঁড়তে না পারলে আরও আঠারো বছর এগারো দিন চুপ করে বসে থাকতে হবে। কেন না, তার আগে পৃথিবীর অত কাছে আর চাঁদ আসবে না। কামান দাগতে হবে দক্ষিণ বা উত্তর অক্ষরেখার শূন্য ডিগ্রী থেকে আঠাশ ডিগ্রীর মধ্যকার কোনো জায়গা থেকে। অন্য কোনো জায়গা থেকে কামান দাগলে গোলার গতিটা নাকি আস্তে আস্তে বেঁকে যাবে এবং তা চাঁদ থেকে সরে যাবে অনেক—অনেক দূরে। বিজ্ঞানীরা আরও বললেন, প্রত্যেকদিন তেরো ডিগ্রী দশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড পথ চলে চাঁদ। সুবিন্দু থেকে যখন চৌষোট্টি ডিগ্রী দূরে থাকবে চাঁদ, চাঁদকে লক্ষ্য করে কামানটা ছুঁড়তে হবে ঠিক তখনি!

অভিনন্দন জানবেন। ইতি—জে, এম, বেলফাষ্ট; কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের ডিরেক্টর।

৫॥ যুক্তরাষ্ট্রে অজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের দৌড় প্রতিযোগিতা

'রাতের রাণী' চাঁদকে নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হল বার্বিকেনের ঘোষণার পর। কত জন কত কথা যে বলল, তার ইয়ত্তা নেই। গোটা আমেরিকাটা যেন চাঁদ-পাগল হয়ে গেল রাতারাতি। চাঁদ-বাতিকে পেয়ে বসল সবাইকে।

কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের চিঠি বিজ্ঞানসম্পর্কিত ম্যাগাজিনে ছাপা হল এবং একবাক্যে সবাই মেনে নিলে চিঠির বক্তব্য।

চাঁদ সম্পর্কে যেন কেউ কিছুই জানে না, এই রকম একটা ভাব নিয়ে নতুন করে, চন্দ্র-অধ্যয়ন সুরু হল। কি করে চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব মাপা হয়, তা জানা গেল। আরও জানা গেল, গড়পড়তা দূরত্ব ২,৩৫,৩৪৭ মাইল তো বটেই—৭০ মাইল কম বেশী থাকাটাও বিচিত্র নয়। চন্দ্র মাসে কেবল একটি দিন এবং একটি রাত। ৩৫৪½ ঘণ্টা লম্বা দিন—রাতও তাই। চাঁদের একটা দিক সব সময়ে পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে—সেখানে যেন চোদ্দটা চাঁদের ঔজ্জ্বল্য একসাথে দেখা যায়। চাঁদের আর একটা দিক তারার আলোয় আলোকিত—সেদিক মানুষ কোনোদিন দেখেনি।

চাঁদ ডিমের মত কক্ষপথে পৃথিবীর চারধারে ঘুরছে বলে একবার পৃথিবীর খুব কাছে আসে চাঁদ—আবার দূরে সরে যায়।

কেউ-কেউ বললেন, চাঁদ নাকি এককালে ধূমকেতু ছিল। সৌরজগতে ঢুকে পৃথিবীর কাছে আসতেই আটকে গেছে তার আকর্ষণে। তাই তো ঐ পোড়া-পোড়া চিহ্ন দেখা যায় চাঁদের ওপর। আর একদল সঙ্গে সঙ্গে নস্যাৎ করে দিলেন উদ্ভট এই থিওরী। বললেন, ধূমকেতুর বায়ুমণ্ডল থাকে। চাঁদের কিন্তু বায়ুমণ্ডল নেই, থাকলেও না থাকার সামিল।

আর একদল বললেন, খলিফাদের আমলে নাকি শোনা গিয়েছিল চাঁদের গতি অল্প অল্প করে কমছে। তাই যদি হয়, তাহলে তো চাঁদ একদিন গতিবেগ হারিয়ে পৃথিবীতে মুখ থুবড়ে পড়বে! অপর দল অট্টহাস্য করে পাল্টা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, সে সম্ভাবনা সুদূর ভবিষ্যতেও নেই।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞলোকেরা অন্যান্য কথা বললে। তাদের মতে চাঁদ নাকি প্রতিটি মানুষের প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিটি চন্দ্রমানব নাকি প্রতিটি পৃথিবী-মানবের সঙ্গে সহানুভূতির সূত্রে বাঁধা রয়েছে। এই গুপ্ত-রহস্যের ওপরেই নির্ভর করছে মানুষদের ভাগ্য।

এমনি কত আজগুবি গল্পকথা যে শোনা গেল, তার হিসেব নেই। ইয়াঙ্কিরা কিন্তু গোঁ ধরে রইল চাঁদে সর্বপ্রথম যে পতাকা উড়বে—তা হবে যুক্তরাষ্ট্রের। মহাশূন্যের নতুন মহাদেশকে মুঠোয় আনবেই আনবে আমেরিকার মানুষ।

৬॥ কামানের-গোলা পর্ব

কেম্‌ব্রিজ মানমন্দিরের স্মরণীয় চিঠিতে ছিল কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাবার্তা। যান্ত্রিক সমস্যার সুরাহা তখনো হয়নি।

দেরী করলেন না প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন। গান-ক্লাবের কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করলেন। কমিটির উপর ন্যস্ত হল তিনটে মূল সমস্যার সমাধান-দায়িত্ব, কামান, কামানের গোলা এবং বারুদ। কমিটিতে রইলেন বার্বিকেন, জেনারেল মরগ্যান, মেজর এলফিনস্টোন এবং সেক্রেটারী হিসেবে জে, টি, ম্যাসটন। অক্টোবর মাসের আট তারিখে তিন নম্বর রিপাবলিক ষ্ট্রীটে প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের বাড়ীতে বসল কমিটির অধিবেশন।

এই বৈঠকে স্থির হলো, গোলাটা ঢালাই লোহার হলে চলবে না। তা'হলে দারুণ ভারী হয়ে যেতে পারে। কেবলমাত্র অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে যদি তৈরী করা যায় গোলাটাকে, তা'হলেই নিস্তার পাওয়া যেতে পারে এই বিপুল ওজনের হাত থেকে। গোলার ব্যাস ১০৮ ইঞ্চি রাখা দরকার। ওর চাইতে ছোট হলে দুনিয়ার সব চাইতে শক্তিশালী দূরবীণ এঁটেও সে গোলা দেখা যাবে না। গোলাটা ফাঁপা রাখতে হবে। ভেতরে কয়েকটা জিনিষের নমুনাও পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ন'ফুট ব্যাসের ফাঁপা এই গোলাটার মোট ওজন দাঁড়াবে ১৯,২৫০ পাউণ্ড। কিন্তু গোলাটা যদি অ্যালুমিনিয়ামের না হয়ে লোহার তৈরী হয়, তাহলেই ওজনটা একলাফে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৬৭,৪৪০ পাউণ্ডে। এই কারণেই সকলে একমত হলেন যে অ্যালুমিনিয়াম দিয়েই তৈরী করতে হবে গোলাটাকে। অনেক হিসেব-টিসেব করে দেখা গেল গোলাটা বানাতে গেলে খরচ হবে প্রায় তিয়াত্তর হাজার পঞ্চাশ ডলার।

গোলাটা অ্যালুমিনিয়ামের হবে এবং বারো ইঞ্চি পুরু হবে। অ্যালুমিনিয়ামের অনেক গুণ; রুপোর মত সাদা, সোনার মত ক্ষয়হীন, লোহার মত মজবুত, পেতলের মত দ্রবণীয় এবং কাঁচের মত হাল্কা। সহজেই ছাঁচে ফেলা যাবে এবং লোহার চাইতে এক তৃতীয়াংশ হাল্কা হবে—বললেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন।

বাকি সবাই একমত হলেন তাঁর সঙ্গে!

৭ ॥ কামান পর্ব

বাইরের জনতা যখন শুনল ২০,০০০ পাউণ্ডের গোলা ছোঁড়া হবে চাঁদের বুকে, আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল তাদের। সর্বনাশ! সে-রকম কামান বানানো যাবে তো?

সেই সমস্যার সমাধান করার জন্যেই পরের সন্ধ্যায় ফের মিটিং বসল কমিটির। কামানের গোটা ইতিহাসটাই এসে গেল আলোচনার মধ্যে। ঐতিহাসিক কামান এবং তাদের প্রক্ষেপণ ক্ষমতার নজীর তুলে বক্তৃতা দিলেন সদস্যরা। ম্যাসটন বীজগণিতের অংক কষে কামানের মূল্য নির্ধারণও করে ফেললেন।

সংক্ষেপে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মিটিংয়ে:

গোলার গড়ন, আয়তন, ওজন সবই যখন ঠিক হলো, তখন এই বিপুল ওজনের ন-ফুট ব্যাসসম্পন্ন অতিকায় গোলা ছোঁড়বার উপযুক্ত কামানটা কি ধরনের হবে, এই নিয়ে শুরু হলো চিন্তা। কি উপায়ে গোলাটার গতিবেগ সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ তোলা যায়—এ সমস্যা নিয়েও আলোচনা শুরু হলো তখনি।

গোলা যখন ছোঁড়া হয়, তখন তিনটে শক্তি কাজ করে তার ওপর। বাতাসের ধাক্কা, পৃথিবীর টান আর প্রক্ষেপণের ধাক্কা। বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করা যাক এইভাবে:

কোনো গোলা যখন ছোঁড়া হয়, তখন তা শূন্যপথে বায়ুস্তর ছিন্নভিন্ন করে ধেয়ে চলার সময়ে যুগপৎ বাধা পায় বায়ু এবং মহাকর্ষের কাছ থেকে। বায়ু তাকে আটকে রাখবার চেষ্টা করবে এবং মাধ্যাকর্ষণ তাকে নিচের দিকে টেনে নামাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারুদের কাছ থেকে পাওয়া শক্তির জোরেই প্রচণ্ড বেগে সে এগিয়ে চলবে সব বাধাকেই টেক্কা মেরে। পৃথিবীর চল্লিশ মাইল ওপরে উঠলে আর কোন বায়ুস্তরের দেখা মিলবে না। কাজেই সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ গতিবেগে ছুটতে ছুটতে যে গোলা কিছুক্ষণের মধ্যেই এই বায়ুস্তর কাটিয়ে ওপরে উঠে যাবে, তার পক্ষে তারপর আর কোন বায়ুস্তর বাধা কাটানোর প্রশ্নই উঠে না। বায়ুস্তরের বাধা আর না থাকলেও তখনও থাকছে মহাকর্ষের আকর্ষণ। মহাকর্ষ কি কি নিয়মকানুন মেনে চলে সেই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান বলছে, কোনো জিনিস যতই ওপরের দিকে উঠবে ততই তার ওজনও কমতে থাকবে দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে। কাজে কাজেই গোলার বেগ সেই মত বাড়াতে পারলেই মহাকর্ষের আকর্ষণকে অনায়াসেই

ছুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। এখন, এই যে দারুণ গতিবেগ, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে কামানের চোঙা কতখানি লম্বা তার ওপর এবং বারুদের শক্তির ওপর। তা'হলে সোজা কথায় এই দাঁড়াচ্ছে যে, কামানটাকে বেজায় লম্বা করতে হবে, গোলার পেছনে বারুদের গ্যাসও জমবে সেই অনুপাতে। আর তা'হলেই বৃদ্ধি পাবে গোলার গতিবেগ।

অনেক বাগবিতণ্ডার পর বার্বিকেন বললেন—"কামানটা হবে লম্বায় নশ ফুট, ভেতরকার ব্যাস হবে ন'ফুট, চোঙাটা হবে ছ'ফুট পুরু। ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরী হবে কামান। কেননা ঢালাই লোহা ব্রোঞ্জের চাইতে দশগুণ কম সস্তা, সহজে ঢালাই করা সম্ভব।"

"কিন্তু ঢালাই লোহা দারুণ ভঙ্গুর", বললেন মর্গ্যান।

"কিন্তু ঢালাই লোহার প্রতিরোধের শক্তি অনেক বেশী," জবাব দিলেন বার্বিকেন। "সেক্রেটারী ম্যাসটনকে অনুরোধ করব কামানটার ওজন কত হবে যেন হিসেব করে দেন।"

"এখুনি দিচ্ছি।" দু'মিনিটও গেল না; বীজগণিতের অংক কষে ওজন বার করে ফেললেন ম্যাসটন।

বললেন—"কামানের ওজন হবে ৬৮,০৪০ টন। পাউণ্ড পিছু দু সেন্ট দাম ধরা হলে, কামানের দাম দাঁড়াচ্ছে—২৫,১০৭০১ ডলার।"

দাম শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ সদস্যদের—বার্বিকেন ছাড়া।

তিনি বললেন—"টাকার অভাব হবে না। আজ মিটিং এখানেই শেষ হল। কাল সন্ধ্যায় ফের বসা যাবে।"

৮ ॥ বিস্ফোরক পর্ব

কামানের গোলার সমস্যা মিটেছে, কামানের মাপজোকও ঠিক হয়ে গেছে। জনগণ এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বারুদ সমস্যা নিয়ে। অতবড় কামানে কত বারুদ লাগবে?

পরের মিটিংয়ে এই নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হল।

অনেক হিসেব করে বার্বিকেন জানালেন, ষোল লক্ষ পাউণ্ড বারুদ লাগবে এ কাজের জন্যে। শুনে তো আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল সদস্যদের। কেন না, ষোল লক্ষ পাউণ্ড বারুদ রাখতে গেলে বাইশ হাজার ঘন ফুট জায়গা দরকার। এ ছাড়াও বারুদ পুড়ে যে গ্যাস হবে তার জায়গা রাখতে হবে, গোলাটা রাখার জায়গা রাখতে হবে।

গান-ক্লাবের সেক্রেটারী ম্যাসটন বলেছিলেন—"ষোল লক্ষ পাউণ্ড বারুদ

রাখতেই তো দরকার বাইশ হাজার ঘনফুট জায়গা। কিন্তু ন'শো ফুট লম্বা আর ন'ফুট ব্যাসের কামানের মধ্যে যে জায়গা আছে তার পরিমাণ হবে কম বেশী চুয়ান্ন হাজার ঘনফুট। তার প্রায় অর্ধেক জায়গাই যদি বারুদ রাখতেই লেগে যায় তো বারুদ পুড়ে যে গ্যাস, সেটা থাকবে কোথায়? এ রকম ঠাসাঠাসি থাকলে গোলা ছুটবে কি করে?"

"তাতো বটেই," সায় দিলেন বার্বিকেন। "১৬,০০,০০০ পাউণ্ড বারুদ পুড়ে ৬,০০০,০০০,০০০ লিটার গ্যাস তৈরী হবে।

"তা'হলে উপায়?" আঁতকে উঠলেন জেনারেল।

বার্বিকেনের গলা এতটুকু কাঁপলো না। উনি বললেন—"গাছপালায় কোষ থাকে, এ তথ্য আপনাদের কারোরই জানতে বাকি নেই। কিন্তু সব চাইতে বিশুদ্ধ কোষ উপাদান থাকে তুলোয়। ঠাণ্ডা নাইট্রিক অ্যাসিডে তুলো মিনিট পনেরো চুবিয়ে রেখে শুকিয়ে নিলেই দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরী করা যায়। বারুদ যখন জ্বলতে থাকে, তখন তার তাপমাত্রা হয় দুশো চল্লিশ ডিগ্রী। কিন্তু এই বিস্ফোরক তুলো জ্বলবে মাত্র একশো সত্তর ডিগ্রী উষ্ণতায়। এ ছাড়াও সাধারণ বারুদের চারগুণ বেশী শক্তি থাকবে এই তুলোর। অর্থাৎ ষোল লক্ষ পাউণ্ড বারুদের বদলে আমাদের লাগবে মাত্র চার লক্ষ পাউণ্ড তুলো। খুব চাপের মধ্যে রাখলে পাঁচশ পাউণ্ড তুলো মাত্র সাতাশ ঘনফুট জায়গা দখল করে থাকে। কাজে কাজেই যতখানি তুলো আমাদের দরকার, তার সবটুকুই অনায়াসে একশো আশি ঘনফুটের মধ্যে চেপেচুপে রাখা যাবে। তা হলেই ন'শো ফুট লম্বা কামানে যতখানি গ্যাসের দরকার, তার কোনো অভাবই হবে না। বরং ১০০ ঘনফুট জায়গা থেকে যাবে ৬,০০০,০০০,০০০ লিটার গ্যাসের জন্য।"

বার্বিকেন আরো বললেন—"তুলো থেকে তৈরী এই বিস্ফোরকের অনেক গুণ। এর নাম পাইরোক্সিল বা ফালমিনেটিং কটন। আর্দ্রতায় এ বারুদ স্যাঁতসেতে হয়ে যায় না—কাজেই বেশ কয়েকদিন ধরে কামানে বারুদ ঠাসলেও বারুদ নষ্ট হয়ে যাবে না।"

সব সমস্যার সমাধান হওয়ার পর শেষ মিটিং।

৯॥ একজন শত্রু বনাম আড়াই কোটি বন্ধু

সারা আমেরিকা যখন উদ্বেলিত প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের অভিনব অভিযানের প্রস্তুতি-পর্ব শুনে, ঠিক তখনি ঘটল নীচের ঘটনাটা:

দুনিয়ায় শুধু একজনের সমালোচনাকেই পরোয়া করতেন ইম্পে বার্বিকেন—

আর কেউ তাঁর কাজকে খারাপ বলেছে কি ভাল বলেছে, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতেন না। বার্বিকেনের সাথে এই মানুষটির রেষারেষি চিরকালের ; অথচ তাঁরই মত তিনিও কঠোর পরিশ্রমী, বেপরোয়া এবং অকুতোভয়। মানুষটির নাম ক্যাপ্টেন নিকল। একটুকু ইতস্তত না করে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারতেন তিনি। মরণকে এক হাত দূরে দেখলেই আতঙ্কে শিউরে উঠে কোনদিনই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করতেন না। সারা যুক্তরাষ্ট্রে ইম্পে বার্বিকেনের প্রশস্তি যখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে, ক্যাপ্টেন নিকল তখন ফিলাডেলফিয়ায়। ঈর্ষায় তাঁর বুক জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল।

কোন রকম আলাপ-পরিচয় ছিল না ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকলের মধ্যে। জীবনে কোনোদিনই সাক্ষাৎকার হয়নি দুজনের। অথচ কোনো কিছুতে বার্বিকেন ব্যর্থ হলে আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকতো না ক্যাপ্টেন নিকলের। বার্বিকেন হয়তো দারুণ শক্তিশালী একটা কামান বানালেন। নিকলও অমনি উঠে পড়ে লেগে তার চাইতেও সুদৃঢ় বর্ম বানিয়ে ফেললেন। পৃথিবীর যা কিনা সব চাইতে কঠিন আর দুর্ভেদ্য পদার্থ—তাকেই কামানের গোলায় ঝাঁঝরা করে তুলতে চাইতেন বার্বিকেন। আর নিকল চাইতেন ঠিক তার উল্টো। তাঁর লক্ষ্য ছিল যে ভাবেই হোক বার্বিকেনের পরিকল্পনাকে বানচাল করা। দুজনের এই বিরামবিহীন রেষারেষিতে কামান আর বর্মের কিন্তু বেজায় উন্নতি হয়েছিল। দুই প্রতিযোগীর মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠ তাও বলা সম্ভব হয় নি এই কারণেই। তবে দুজনে যে দুজনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না কারো।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ থেমে গেল ধাঁ করে। যেদিন থামল, সেইদিনই নিকল একটা দারুণ বর্ম বানানো শেষ করেছিলেন। ইস্পাতের সেই চাদর ফুটো করার সাধ্য ছিল না বার্বিকেনের।

যুদ্ধ থেমে যেতে মহা ফাঁপরে পড়লেন নিকল। বার্বিকেন তাঁর 'যুদ্ধং দেহি' ভাবকে আমল দিলেন না। বর্মকে ছেঁদা করার জন্যে নতুন অস্ত্র বানানোর জন্যে মাথা ঘামালেন না! বার্বিকেনকে তাতানোর অনেক চেষ্টা করলেন নিকল—পারলেন না। না পেরে ভীষণ রেগে রইলেন তাঁর ওপর। এতবড় স্পর্ধা বার্বিকেনের নিকলকে উপেক্ষা করে...

ঠিক এই সময়ে সারা আমেরিকায় হৈ-চৈ পড়ে গেল বার্বিকেনের নশ ফুট লম্বা কামানের সিদ্ধান্ত শুনে। গোটা দেশটা বার্বিকেনের পেছনে দাঁড়াল— একজন ছাড়া - ক্যাপ্টেন নিকল।

ইম্পে বার্বিকেনের পরিকল্পনা মাফিক নয়া কামানের চোঙাটাই হবে নশো ফুট লম্বা আর গোলার ওজন হবে মোট ৩০,০০০ পাউণ্ড—এ খবর যখন ক্যাপ্টেন নিকলের কানে পৌছল, তখন মাথা ঘুরে গেল ক্যাপ্টেন নিকলের, হতাশায় বুক ভেঙে গেল তাঁর। কাণ্ড শুনে এমনই হতভম্ব হয়ে গেলেন যে এরপর কি করা উচিত তাও ভেবে পেলেন না। একনাগাড়ে চিন্তা করতে লাগলেন কি করে এক দুর্ভেদ্য বর্ম বানিয়ে ভেস্তে দেওয়া যায় বার্বিকেনের চন্দ্রালোক যাত্রা কিন্তু ঐ ভাবনাই সার; আশার আলো কিছুই দেখলেন না। বেশ বুঝলেন, সারা জীবন ধরে ভাবলেও ঐ ভয়ঙ্কর গোলাকে ঠেকানোর মত বর্ম তৈরী করা একেবারেই অসম্ভব।

ভেবে ভেবে যখন কোনো দিশে পেলেন না, তখন হিংসের আগুনে আরও বেশী ছটফট করতে লাগলেন উনি—রীতিমত খেপে গেলেন। এন্তার অঙ্ক কষে, নানা রকম যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করে উনি প্রমাণ করে দিতে চাইলেন, গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেনের এই অভিনব পরিকল্পনাটি আসলে একটা উন্মাদের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। মাথা একেবারে খারাপ না হলে এই রকম উদ্ভট কল্পনা কেউ করতে পারে? এ সব শুনে দমে যাওয়া দূরের কথা, আরও উঠে পড়ে বার্বিকেন লাগলেন কামান তৈরীর আয়োজনে। ঐ উৎসাহ আর তোড়জোড় দেখে ক্যাপ্টেন আরও খেপে গেলেন। এবার তিনি সিধে আর্জি জানালেন গভর্ণমেণ্টকে। বললেন, বার্বিকেন গুরুতর আইন বিগর্হিত কাজ করতে চলেছেন। এভাবে কামানের শক্তি পরীক্ষা করা মোটেই নিরাপদ নয়। কামান দাগার সময়ে নলচে যদি ফেটে যায়, তা হলে বহু লোক মারা যাবে। কামানটা যে অঞ্চলে ফাটবে, সে জায়গাটাও একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমনও ত হতে পারে, চন্দ্রালোক-অভিযানের অছিলায় শান্তিভঙ্গের অভিসন্ধি নিয়ে কামান তৈরী করছেন বার্বিকেন?

গভর্ণমেণ্ট কিন্তু কর্ণপাত করল না ক্যাপ্টেন নিকলের কথায়। কোন রকম উচ্চবাচ্য না করায় ঘুরিয়ে সমর্থন জানান হল বার্বিকেনের পরিকল্পনাকে। ব্যাপার দেখে ত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন নিকল। বার্বিকেনের আদ্যশ্রাদ্ধ করে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে চললেন বিভিন্ন খবরের কাগজে। উদ্দেশ্য ছিল জনমতকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা, পাবলিককে খেপিয়ে তোলা—কিন্তু এ উদ্দেশ্যও হল ব্যর্থ। কেউই কোন গুরুত্ব দিল না তাঁর প্রবন্ধে। তখন তিনি রিচমণ্ডের একটা খবরের কাগজের মারফৎ খোলাখুলি বাজি ধরলেন বার্বিকেনের সঙ্গে:

(১) গান-ক্লাবের এই অভিনব পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে যে পরিমাণ

টাকার দরকার, তা কোনদিনই সংগ্রহ করা যাবে না। বাজি : এক হাজার ডলার।

(২) নশো ফুট লম্বা কামান ঢালাই করা সম্ভব নয়। বাজি : দু হাজার ডলার।

(৩) এ সব বাধা কাটিয়ে যদিও বা কামান বানানো যায়, সে কামানে বারুদ ঠাসা একেবারেই অসম্ভব। কেন না, গোলার চাপ পড়লেই তা আপনা থেকে জ্বলে উঠবে। বাজি : তিন হাজার ডলার।

(৪) বারুদে আগুন ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে গোটা কামানটা। বাজি : চার হাজার ডলার।

(৫) কামানটা ফেটে টুকরো-টুকরো যদি নাও হয়, তা হলেও চাঁদে পৌঁছনো ত দূরের কথা, ছ মাইল পথও পেরুতে পারবে না কামানের গোলাটা। বাজি : পাঁচ হাজার ডলার।

অর্থাৎ কামানের গোলা যদি ছ মাইল পথও পেরোতে পারে, তাহলেই আইনত এবং ন্যায়ত আমি ইম্পে বার্বিকেনকে পনেরো হাজার ডলার দিতে বাধ্য থাকব।

কয়েকদিন পরেই গান-ক্লাবের সীলমোহর করা একটা খাম পেলেন ক্যাপ্‌টেন নিকল। ভেতরে একটা চিঠির কাগজে লেখা ছিল শুধু একটি লাইন :

বাল্টিমোর, অক্টোবর ১৯—

"আমি বাজি ধরলাম।—বার্বিকেন, সভাপতি, গান-ক্লাব।"

১০॥ ফ্লোরিডা আর টেক্সাস

সব তো হল, এখন ঠিক করতে হবে কামানটা বসানো হবে কোথায়। কেম্‌ব্রিজ মানমন্দিরের সুপারিশ অনুযায়ী জায়গা নির্বাচন করতে হবে। সুতরাং বিশে অক্টোবর ক্লাবের সাধারণ সভা আহ্বান করলেন বার্বিকেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট ম্যাপ খুলে শুরু করলেন আলোচনা।

অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হলো চাঁদে গোলা ছুঁড়তে হবে হয় টেক্সাস আর না হয় ফ্লোরিডা—এই দুটো জায়গার যে কোন একটি থেকে। ঝগড়া লেগে গেল ফ্লোরিডা আর টেক্সাসে। টেক্সাস জানিয়ে দিলে, "চন্দ্রালোকে প্রথম গোলা ফেলার কৃতিত্বটুকু আমরাই নেবো।" অমনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ফ্লোরিডা বললে—"ভাল রে ভাল। চাঁদের সঙ্গে প্রথম কুটুম্বিতা পাতানোর গৌরবটিকা পড়ুক আমাদেরই ললাটে।" দলে দলে টেক্সাসের বাসিন্দারা

এল বাল্টিমোরে বার্বিকেনের সাথে দেখা করতে। ফ্লোরিডাও বসে রইল না। সেখান থেকেও কাতারে কাতারে লোক এল ক্লাবে। দু-দলের কথা কাটাকাটি শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গান-ক্লাবের সদস্যরা। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। হট্টগোলের চোটে কানের পর্দা ফাটারও উপক্রম হলো। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান হলো না।

শেষকালে ব্যাপার এতদূর গড়ালো যে রাস্তায় ফ্লোরিডার লোকেদের দেখতে পেলেই মারপিট করতে লাগল টেক্সাসের বাসিন্দারা। ফ্লোরিডা তো রেগে টং হয়ে সরকারীভাবে টেক্সাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আয়োজন শুরু করলে। কাণ্ড দেখে বার্বিকেন ঘোষণা করলেন, "টেক্সাসে সবশুদ্ধ এগারোটা শহর আছে, কিন্তু ফ্লোরিডায় আছে মাত্র একটি। তাই ফ্লোরিডাকেই কামান দাগার জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া উচিত। তা না হলে টেক্সাসের এগারোটা শহরেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যাবে। প্রত্যেকেই চাইবে তাদের শহর থেকেই কামান ছোঁড়ার তোড়জোড় করা হোক।"

১১॥ টাকার জোগাড়

বার্বিকেন এবার কোমর বেঁধে লাগলেন চাঁদা তোলার ব্যাপারে। দুনিয়ার সবার কাছে আবেদন জানালেন তিনি। চাঁদার খাতা খোলা হল যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে।

তিন দিন পরে দেখা গেল চল্লিশ লক্ষ ডলার চাঁদা এসেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের পকেট থেকেই!

চাঁদা দিল না কেবল ইংলণ্ড। বার্বিকেনের প্রস্তাবকে সেখানে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাকচ করা হল এবং একটা ফার্দিংও এল না সে দেশ থেকে!

ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে পাওয়া গেল, ১৪,৪৬,৬৭৫ ডলার। সব মিলিয়ে গান-ক্লাবের তহবিলে জমা পড়ল ৫৪,৪৬,৬৭৫ ডলার!

বিশে অক্টোবর নিউইয়র্কের গোল্ডস্প্রিং কোম্পানীকে কামান ঢালাই করার ভার দেওয়া হল। কামান তৈরী শেষ করতে হবে সামনের বছর ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে।

ক্যাপ্টেন নিকল তাঁর প্রথম বাজি হারলেন!

১২॥ স্টোন্‌স্‌হিল

সময় নষ্ট করা ধাতে নেই বার্বিকেনের। তাই কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দিলেন উপযুক্ত টেলিস্কোপ বানানোর জন্য।

আলবানির একটা কোম্পানীকে অ্যালুমুনিয়াম গোলা তৈরীর ভার দিলেন। তারপর ম্যাসটন, এলফিনস্টোন আর গোল্ডস্প্রিং কোম্পানীর ম্যানেজারকে নিয়ে ফ্লোরিডা গেলেন কামান ঢালাই করার জায়গা খুঁজতে।

অনেক খুঁজে পাওয়া গেল মনোমত জায়গা। আদিবাসীরা বন্দুক হাতে ঘোড়ায় চড়ে হানা দেয় সে অঞ্চলে। জঙ্গলে ঘেরা একটা পাহাড় দেখে মনে ধরল বার্বিকেনের। পাহাড়ের নাম স্টোনসহিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উঁচু। ট্যাম্পা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে।

অশ্বারোহী বর্বরেরা বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে দূর থেকে অনেক ভয় দেখালে চারজনকে—কিন্তু অটল রইলেন বার্বিকেন।

১৩॥ শাবল-গাঁইতি কোদাল

দেড় হাজার কুলি নিয়ে ষ্টোনসহিলে গিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন। এতদিন খাঁ-খাঁ করত যে স্টোনসহিল, গান-ক্লাবের দৌলতে আজ তা গমগমে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হল। জাহাজ থেকে হরেক রকম মেশিন নামাতেই গেল কয়েকটা দিন। এল নানা রকম কলকব্জা, ক্রেন, বয়লার, চুল্লি, রেল লাইন—এমন কি লোহার তৈরী ছোট ছোট ঘরও নামানো হল ট্যাম্পা বন্দরে। ট্যাম্পা বন্দর থেকে মাইল পনের গেলেই স্টোনসহিল। ঠিক দুদিনের মধ্যে রেল লাইন পাতিয়ে ফেললেন বার্বিকেন এই পনের মাইল পথে।

পয়লা নভেম্বর ট্যাম্পা থেকে স্টোনসহিলে এলেন বার্বিকেন। এসে দেখলেন, এই কয়েকদিনের মধ্যেই সারি সারি বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে। স্থপতি মজুর এবং অন্যান্য কারিগররা আস্তানা গেড়েছে এইসব ঘরে। কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে সদ্য গড়ে ওঠা শহরটিকে। ইলেকট্রিসিটি তৈরীর কারখানাও খাড়া করা হয়েছে। ৪ঠা নভেম্বর কুলি কারিগরদের সভা আহ্বান করলেন বার্বিকেন। বললেন, ফ্রেণ্ডস, নিশ্চয় জানো তোমরা যে নশো ফুট লম্বা একটা কামান তৈরী করে খাড়াইভাবে মাটির ওপর বসাতে চাই আমরা। সাড়ে উনিশ ফুট পুরু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকবে কামানটা। কাজে কাজেই এমন একটা খাদ আমাদের খুঁড়তে হবে যেটা লম্বায় হবে নশো ফুট এবং চওড়ায় হবে ষাট ফুট। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ আর এত মেহনৎ সার্থক হবে যদি এই বিরাট কাজটা ৮ মাসের মধ্যে শেষ করতে পারি আমরা। প্রতিদিন দু হাজার ঘনফুট মাটি খুঁড়তে পারলেই কাজটা শেষ করতে পারব আমরা। আমাদের এখন একমাত্র ভরসা তোমরা—তোমাদের নিষ্ঠা আর

কর্মশক্তির ওপর নির্ভর করে রয়েছি। যে প্ল্যান অনুসারে তোমাদের কাজ করতে বলেছেন ইঞ্জিনীয়ার মার্চিসন, তোমরা যদি টুঁ শব্দটি না করে সেইমত কাজ করে যাও মুখ বুঁজে, তা'হলে জেনো যত বিরাট হোক না কেন এই পরিকল্পনা, তা সফল হবেই। তারপর চাঁদের বুকে পাড়ি দেওয়ার প্রথম অভিযানের গৌরবময় ইতিহাসের পাতায় তোমাদের নামও সোনার অক্ষরে লিখে রেখে দেওয়া হবে।"

সকাল আটটায় প্রথম গাঁইতির ঘা পড়ল মাটিতে। শুরু হল পঞ্চাশজনের কুলির একনাগাড়ে মাটি কাটা।

দারুণ পরিশ্রম করতে লাগল সবাই। পাথরের দেওয়ালটা তৈরী হতে লাগল একটা মস্ত চাকার ওপর। বেজায় শক্ত এই চাকাটা ওক কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল। মাটি কাটার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে চাকাটা নামতে লাগল নীচের দিকে। কাজটা বাস্তবিকই অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডানপিটে মজুরদের কেউ কেউ জখম হল, কেউ কেউ এ পারের মায়া কাটাল, কিন্তু তবুও বলিহারি ওদের দুঃসাহসকে—কেউই এতটুকু দমল না। দিনে রাতে সমানে কাজ চলতে লাগল। অহোরাত্র মেশিন চলার আওয়াজের বিরাম নেই, বিরাম নেই ইঞ্জিনের গুঞ্জনধ্বনির। হাজার হাজার বলিষ্ঠ হাত দিবানিশি লেগে রইল এই সাংঘাতিক কাজে। মুহূর্তের জন্যও বিরতি দেওয়া হল না একটানা প্রোগ্রামে।

ঠিক তিন মাসের মধ্যে শেষ হল তিনশো ছত্রিশ ফুট গভীর খাদ কাটা। নশো ফুট নীচে কুয়োটা নামল দশই জুন তারিখে। সেদিন আনন্দে আটখানা হয়ে রইল গান-ক্লাবের সদস্যেরা।

১৪॥ ঢালাই পর্ব

দু মাইল পরিধির ওপর তিন ফুট ব্যবধানে নশো ফুট গভীর খাদকে কেন্দ্রে রেখে ছ'শো গজ দূরে বারশো বিরাট বিরাট চুল্লি তৈরী করা হয়েছিল। কামানটা বানানোর দায়িত্ব নিয়েছিল গোল্ড স্প্রিং কোম্পানী। আটষট্টিখানা জাহাজে ঠেসে-ঠুসে শুধু লোহাই আনল ওরা ১৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। একবার এই লোহাকে গলিয়েছিল কোম্পানী। গলিয়ে ঢেলেছিল কয়লা আর বালির মধ্যে। কিন্তু কাজে লাগাতে গেলে ঐ লোহাকেই আরও একবার গলানো দরকার। গলিত লোহার স্রোতকে কড়া থেকে সরাসরি বারশো চুল্লি সংলগ্ন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে নশো ফুট গভীর খাদে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

খাদ কাটা সাঙ্গ হওয়ার পরের দিন থেকে পাথরের কুয়োর ঠিক মাঝখানে নফুট ব্যাসের নশোফুট লম্বা কামানের চোঙা তৈরীর কাজ আরম্ভ করলেন বালি কাদা মাটি আর খড় দিয়ে। এই চোঙা আর পাথরের দেওয়ালের মাঝে যে ফাঁকা জায়গা ছিল, গলিত লোহা ঢেলে সেই জায়গাটুকু ভরিয়ে দিয়ে কামান তৈরীর সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল। ইংরাজীতে এর নাম বোর-মোল্ড।

যেদিন লোহা ঢালা হবে, সেদিন সকাল থেকেই যেন দাবানল জ্বলতে লাগল চারদিকে। লকলকে আগুনের জিহ্বা আকাশের দিকে বারে বারে ছুঁড়ে দিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল বারশো চুল্লি। চিমনি দিয়ে গল গল করে বেরুনো ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে গেল। আগুনের সোঁ-সোঁ আওয়াজে আর সব শব্দই ঢাকা পড়ে গেল। ঠিক হল কামান থেকে একবার মাত্র তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে সবকটা কড়া থেকে একসাথে গলানো লোহার বারশো স্রোত ছুটিয়ে দেওয়া হবে খাদের ভেতরে। উৎকণ্ঠিত প্রত্যেকেই। তরল লোহার ধাক্কায় বালিমাটির বোর-মোল্ড ভেঙে গেলেই সর্বনাশ!

দুপুর বারটা। ছোট্ট একটা ঢিবির ওপর গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন দাঁড়িয়েছিলেন। বারটার শেষ ঘণ্টা ঢং করে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে তোপ দাগা হল। সঙ্গে সঙ্গে বারশো সুড়ঙ্গ দিয়ে আগুনের শিখা নাচিয়ে ছুটে এল তরল লোহা। হু-হু করে নেমে চলল বারশো তরল আগুনের ধারা, বিকট শব্দে ঢেকে গেল সব কিছু, থর থর করে মাটি কাঁপতে লাগল, আগুনের অসংখ্য ফুলকি উড়ল আকাশে বাতাসে—যেন অকস্মাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল কোন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।

৬৮০০০ টন কয়লা পুড়িয়ে ষাটহাজার টন লোহা গালানো হল। লালচে ধোঁয়া উঠল হাজার ফুট ওপর পর্যন্ত। গলিত ধাতুর নায়গ্রা ঝরে পড়ল যেন নশ ফুট গভীরে!

১৫॥ কামানের নাম কলাম্বিয়াড

শেষ হল ঢালাই পর্ব। কিন্তু দিন পনেরো পরেও দেখা গেল তখনও আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠছে কামানের চোঙা দিয়ে দিয়ে। গেল আরও সাতটা দিন। কিন্তু তখনও বিরতি নেই নলচে যে আগুনের ঝলকানি উঠে আসার। স্টোনসহিলের ২০০ ফুটের মধ্যে যায় কার সাধ্য—আগুনের মারাত্মক আঁচে ঝলসে যায় সর্বাঙ্গ। কিন্তু আর তো ধৈর্য সয় না। এতবড় কামানটা কি রকম হল, তা দেখার জন্যে প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠিত। কামানটা

যদি নিখুঁত না হয়, তা'হলেই পরিকল্পনার দফা-রফা হয়ে গেল। আগামী আঠারো বছরের মধ্যে পৃথিবীর এত কাছে আর ত চাঁদ আসবে না! উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় প্রত্যেকেরই বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। ছটফট করতে লাগলেন কামানটা দেখার জন্যে। বার্বিকেনও নিশ্চয় উতলা হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনের ভাব অনুমান করার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও আছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। আগে থেকে কেউই ত জানত না নলচেটার চারদিকের মাটি এ রকম সাংঘাতিকভাবে গরম থাকবে এতদিন ধরে। হুকুম জারী হয়ে গেল স্টোনসহিলে কেউ আর ঢুকতে পারবে না। কড়া পাহারা বসল প্রতিটি ফটকে।

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। কামানটার দিকে সামান্য কয়েক গজ এগোতে পারলেন বার্বিকেন। তখনও থেকে থেকে ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠছিল মাটি, আগের মতই আগুনের হলকা আর গরম বাষ্প উঠছে মাটি থেকে। আবার শুরু হল প্রতীক্ষা। তারপর অনেক-অনেক দিন পর, আগষ্ট মাসের শেষাশেষি ঠাণ্ডা হয়ে এল মাটি। আর এতটুকু সময় বাজে ভাবে নষ্ট করলেন না বার্বিকেন—পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেল। লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছিল বালিমাটির ছাঁচটা। অনেক কষ্টে ক্রেন দিয়ে তুলে এনে সরানো হল তা। তারপর কামানের ভেতর দিকটা ঘসে মেজে মসৃণ করার কাজ শুরু করে দিলেন বার্বিকেন।

সেপ্টেম্বর মাসের বাইশ তারিখে দেখা গেল গোলা ছোঁড়ার উপযুক্ত হয়েছে কামানটা। তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে গেল সে খবর। ক্যাপ্টেন নিকলের কানেও পৌঁছল খবরটা! দু'নম্বর বাজি হেরে গিয়ে তাঁর মেজাজটা কতখানি তিরিক্ষে হয়ে গেল, তার বর্ণনা এখানে না দিলেও চলবে।

এই সময়ে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন ম্যাস্টন। উদগ্র কৌতূহলে কামানের গভীরতা দেখতে গিয়েছিলেন উঁকি মেরে; কর্ণেল ব্লুমসবি হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে না আনলে ম্যাস্টন ছাতু হয়ে যেতেন সেইদিনই। পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন তিনি।

পরের দিন সেপ্টেম্বর মাসের তেইশ তারিখে—স্টোনসহিলের ফটক থেকে পাহারা সরিয়ে নেওয়া হল। ফটক খুলে যেতেই পঙ্গপালের মত পিলপিল করে ভেতরে ঢুকে পড়ল প্রতীক্ষারত জনতা। বড় বড় সবাক চাহনি মেলে সবাই দেখলে মাটির নিচে বসানো সেই অতিকায় কামানকে। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল—"সত্যি সত্যিই তা'হলে চাঁদের দেশে গোলা ফেলার কামান তৈরী হল!"

যুক্তরাজ্যের সমস্ত লোকই যেন পালে পালে আসতে লাগল স্টোনসহিলে

এই আজব কামান দেখবার জন্যে। ওপর-ওপর কামান দেখে কেউই তৃপ্ত হল না, তাই নশো ফুট নীচে নেমে তলা পর্যন্ত দেখে এল তারা। দর্শকদের সুবিধের জন্যে বিরাট বিরাট কপিকলের আয়োজন করলেন বার্বিকেন। নরম কুশনগুলা আসন বসালেন সেইসব কপিকলে। হাজার হাজার মানুষ টিকিট কেটে সেই কুশনে আয়েস করে বসে নশো ফুট নীচে নেমে দেখে আসতে লাগল সেই অতিকায় কামান। পরে হিসেব করে দেখা গেল, শুধু টিকিট বিক্রী করেই ৫ লক্ষ ডলার রোজগার করেছে গান-ক্লাব। টিকিটের দাম ধার্য করা হয়েছিল মাথাপিছু পাঁচ ডলার। বাষ্পচালিত ক্রেনে ঝোলানো বেতের ঝুড়িতে বসে তারা নেমে গেল কামানের তলা পর্যন্ত!

নশো ফুট নীচে পাতাল গহ্বরে কামানের তলায় একদিন এক বিচিত্র ভোজসভার আয়োজন করলেন গান ক্লাবের সদস্যরা। ইলেকট্রিক আলোয় ঝলমল করতে লাগল পাতালপুরী। আকণ্ঠ পানাহারের পর সভ্যরা জয়ধ্বনি করলেন গান-ক্লাব আর আমেরিকার দীর্ঘজীবন কামনা করে। ওঁদের সেই বজ্রনির্ঘোষ নশো ফুট চোঙা বেয়ে উঠে এসে কামান গর্জনের মতই কাঁপিয়ে তুলল চারিদিক: মাটির ওপর হাজার হাজার কণ্ঠে প্রত্যুত্তর জাগল এই আকাশ কাঁপানো জয়ধ্বনির—"দীর্ঘজীবি হোক গান-ক্লাব। দীর্ঘজীবি হোক আমেরিকা।"

আনন্দে ডগমগ হয়ে ম্যাস্টন বলে উঠলেন—"কুবের সম্পদ আর গোটা দুনিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার সুযোগ এলেও এ জায়গা ছেড়ে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। কেউ যদি এখন বারুদ ঠেসে গোলা ঢুকিয়ে দেয় এই অতিকায় কামানে, তা'হলেও এ জায়গা ছেড়ে নড়ব না আমি।" বলে, একটু থামলেন ম্যাস্টন। তারপর 'হুররে' করে এমনভাবে চিৎকার করলেন যে আরও একবার কামান দাগার বিকট গর্জন উঠল সমবেত গলায়।

১৬॥ টেলিগ্রাম

ভোজসভা ছেড়ে বার্বিকেন যখন উঠে এলেন ওপরে, তখন আনন্দে চিকমিক করছে তার দুই চোখ। ৩০শে সেপ্টেম্বর একটা টেলিগ্রাম এল তাঁর নামে। ভাবলেন, নিশ্চয় আরো একটা অভিনন্দন এসে পৌঁচেছে তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য।

খাম খুলে চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর খুশি-খুশি রক্তিম মুখ। অসাধারণ আত্ম-সংযম সত্ত্বেও চোখে ধোঁয়া দেখলেন বার্বিকেন।

টেলিগ্রামটা এই :

প্যারিস, ফ্রান্স।
সেপ্টেম্বর ৩০, ভোর।

ইম্পে বার্বিকেন॥ ট্যাম্পা॥ ফ্লোরিডা॥ যুক্তরাষ্ট্র

চাঁদে পাঠানোর জন্যে যে গোলাটা আপনি তৈরী করছেন, সেটাকে গোল না করে অনুগ্রহ করে ছুঁচোলো চোঙার আকারে ফাঁপা করে তৈরী করুন। আমি এই গোলার মধ্যে বসে চন্দ্রালোকে যাব। আমি আসছি। আজই 'এস, এস, আটলান্টা' জাহাজে লিভারপুল ছাড়ছি। —মাইকেল আর্দা।

যেন হাওয়ায় ভর করে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পথে ঘাটে, দোকানে-হোটেলে, স্কুলে-কলেজে, জাহাজঘাটায় রেল স্টেশনে সব জায়গাতেই ঐ একই কথা—চাঁদে নাকি মানুষ যাচ্ছে! দুনিয়ার কোন খবরই যারা রাখে না, তারা ঝটিতি বললে, আরে ধেৎ, মাইকেল আর্দা নামে কোন মানুষই নেই। ওটা স্রেফ ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ কেউ বললে, ফরাসিদের পাগলামীর আরও একটা নমুনা এই চন্দ্রালোক অভিযান। পৃথিবী ছেড়ে কি কেউ চাঁদে যেতে পারে? বাতাস কোথায়? নিঃশ্বাস নেবে কি করে? বারুদের আগুনে গনগনে গোলার মধ্যে ত পিঁপড়ের মতই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে মানুষটা! আর যদিও বা কোন গতিকে চাঁদে পৌছোয় ত ফিরবে কেমন করে শুনি? অসম্ভব! গাঁজাখুরি আইডিয়া নিয়ে মগজকে ব্যস্ত রাখতে মহা ওস্তাদ এই ফরাসিগুলো। জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কিছু নয়।

বার্বিকেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাম পাঠালেন লিভারপুলের জাহাজ আফিসে। জবাব এসে গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই: "লিভারপুল ছেড়ে ট্যাম্পার দিকে রওনা হয়েছে আটলান্টা। জাহাজের প্যাসেঞ্জার লিষ্টে পৃথিবী বিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দার নাম আছে।"

খবর এসে পৌছলে পর বিচিত্র আলোয় ঝিকমিক করে উঠল বার্বিকেনের দুই চোখ। শক্ত হয়ে এল অস্থির চঞ্চল হাতের মুঠি দুটি। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা না বলে যে কোম্পানী গোলা তৈরীর দায়িত্ব নিয়েছিল, তাদের খবর পাঠালেন, "আবার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গোলা তৈরীর কাজ যেন বন্ধ থাকে।"

১৭॥ আটলান্টার প্যাসেঞ্জার

আমেরিকার প্রতিটি লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল মাইকেল আর্দার নাম। কেউ বললে, আহা রে, এত বড় একজন বিজ্ঞানী কিনা শেষ পর্যন্ত

পাগল হয়ে গেল!" গোলা তৈরীর কাজ বার্বিকেন বন্ধ রেখেছেন শুনে অনেকে বললে—"বার্বিকেনও শেষে উন্মাদ হয়ে গেল? চাঁদে মানুষ যাবে কি? ঐ সব গাঁজাখুরি প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামালে আমেরিকার গোলা আর কোন দিনই পৌছবে না চাঁদের দেশে।"

পথে-ঘাটে দোকানে-হোটেলে প্রত্যেকের মুখে একই প্রশ্ন—"কবে এসে পৌচচ্ছেন মাইকেল আর্দা? জাহাজঘাটার কর্মচারীরা ত হিমশিম খেয়ে গেল 'এস. এস. আটলাণ্টা' কবে এসে পৌচচ্ছে যে খবর জানাতে জানাতে। একটা অতি-তৎপর ধড়িবাজ খবরের কাগজ জাহাজ আসায় তারিখটা কাগজে ছেপে বিস্তর টাকা কামিয়ে ফেলল।

অক্টোবর মাসের কুড়ি তারিখে সকালের দিকে অনেক দূরে দিগ্‌রেখার ওপরে চিমনির ধোঁয়া দেখা গেল। এস. এস. আটলাণ্টার ধোঁয়া। হাজার হাজার লোক তখন থেকেই দূরবীন এঁটে বসে রইল পাড়ে। মানুষের অরণ্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল সাগরের তীরে। তাই হট্টগোলের চোটে কান পাতা দায় হল সেখানে।

এক একটা মুহূর্ত এক একটা বছরের মত লম্বা মনে হতে লাগল। মাইকেলকে কখন দেখা যাবে, এই আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে কেউই আর নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না। তারপর এক সময়ে শেষ হল এই প্রতীক্ষার। জেটির গায়ে 'এস. এস. আটলাণ্টা' এসে লাগতেই ৫০০ নৌকো চারদিক থেকে ঘিরে ধরল জাহাজটাকে। কোন রকমে পথ করে নিয়ে অনেক চেষ্টার পর সবার আগে জাহাজের ওপর উঠে এলেন ইম্পে বার্বিকেন। উঠেই যাত্রীদের উদ্দেশ্য করে শুধোলেন—"মাইকেল আর্দা?"

একজন যাত্রী এগিয়ে এসে বললেন—"এই তো আমি এসেছি।"

সব রকম পরিবেশে নির্বিকার থাকার এত দিনকার সুনাম সেদিন হারালেন গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন। বড় বড় চোখে মাইকেল আর্দার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। এমনই হতভম্ব হয়ে গেছলেন উনি যে কথা বলা ত দূরের কথা, নিঃশ্বাস ফেলতেও বোধহয় ভুলে গেছলেন।

ইনিই সেই পৃথিবী বিখ্যাত অকুতোভয় ফরাসি বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দা? আর্দার বয়স খুব জোর বিয়াল্লিশ, সবল সুঠাম দীর্ঘ তনু, চওড়া ললাট, দেহের তুলনায় মাথাটা একটু বড়, সমুদ্রের পাগল হাওয়ায় উড়ছিল ধোঁয়াটে চুলের গোছা। বেড়ালের মত গোঁফ, ধারালো নাক, বুদ্ধির আলো ঝিকমিক করছে চোখের মণি দুটোতে। বলিষ্ঠ দুই বাহু। আর প্রতি পদক্ষেপে পৌরুষের অভিব্যক্তি। বেশ পরিপাটি পোষাক পরিচ্ছদ! দেখলেই মনে হয় ধী-শক্তি

যেন মূর্ত হয়ে নেমে এসেছে চোখের সামনে। এই অসামান্য মানুষটিই তাহলে মাইকেল আর্দা ?

ছোট্ট করে বলতে গেলে এই হল মাইকেল আর্দার পরিচয়।

বার্বিকেন আর আর্দা—দুজনের ধাত দুরকম। প্রথমজন ধীরস্থির আত্মস্থ; দ্বিতীয় জনের ভেতরে যেন নিরন্তর কর্মশক্তির আগুন জ্বলছে। দুজনেই কিন্তু দুদিক দিয়ে নেশায় ডানপিটে।

আশে-পাশের জগৎ ভুলে গিয়ে অনন্যমনা হয়ে বিশ্ববরেণ্য এই বিচিত্র বিজ্ঞানীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন বার্বিকেন। চমক ভাঙল সহস্রকণ্ঠের মাইকেল আর্দার দীর্ঘজীবন কামনায়। চোখ তুলে দেখলেন জাহাজের ডেক ছেয়ে গেছে অগুন্তি লোকে। অত লোকের ভারে এস. এস. আটলাণ্টার তখন ডুবুডুবু অবস্থা। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেছল দর্শনকামীদের মধ্যে মাইকেল আর্দার সঙ্গে করমর্দন করার জন্যে। ক্রমাগত হাত ঝাঁকানি দিতে দিতে বেদম হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, তবুও নিস্তার নেই তাঁর। শেষকালে কাণ্ড দেখে ভদ্রলোক তাঁর কেবিনে সেঁধিয়ে গেলেন। চুম্বকের টানে লোহার ছুটে যাওয়ার মত বার্বিকেনও তাঁর পিছন পিছন গিয়ে ঢুকে পড়লেন কেবিনের মধ্যে।

কেবিনে ঢুকে কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে। তারপর বার্বিকেনই শুধোলেন প্রথমে—"মঁসিয়ে আর্দা, আপনার চাঁদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি সত্য?"

গুরু গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন মাইকেল আর্দা,—"সত্য।"

"কোন রকমেই কি ত্যাগ করা যায় না এ সংকল্প?"

শান্ত গলায় মাইকেল আর্দা বললেন—"না। আমার সংকল্পের তিলমাত্র নড়চড় হবে না। গোলা নতুন করে বানাচ্ছেন তো?"

"আপনার পথ চেয়ে গোলা তৈরী বন্ধ রেখেছি। কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন কতখানি মারাত্মক এই সংকল্প?"

"এত ভাবনার কি আছে, তা ত আমি বুঝছি না। এ রকম জলের মত সোজা আর সাদাসিদে ব্যাপার নিয়ে ভেবে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। যখনি আমার কানে এল যে চাঁদের দেশে কামানের গোলা পাঠাচ্ছেন আপনি তৎক্ষণাৎ ভাবলাম, এই সুযোগে চন্দ্রালোক ঘুরে নিলে কেমন হয়? জিনিসটা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে অহোরাত্র তাই নিয়ে ভাবতে হবে। তাছাড়া, সংকল্প যখন করেছি, তখন আমি যাবই।"

"যাওয়ার একটা পরিকল্পনাও নিশ্চয় ভেবে রেখেছেন আপনি? জানতে পারি কি সেই পরিকল্পনা?"

"পরিকল্পনা একটা অবশ্যই করেছি। না করে ত আর ডুম করে চাঁদে পাড়ি জমাবার সংকল্প করিনি। তবে প্রত্যেককে আলাদা করে অত কথা বলার সময় আমার নেই। আপনি বরং কালকেই একটা জনসভার ব্যবস্থা করুন। ইচ্ছে করলে শুধু আমেরিকা কেন, সারা পৃথিবীকে আপনি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন সেই সভায়। আমার বক্তব্য আমি সেই সভাতেই বলব। এ প্রস্তাবে রাজি আছেন আপনি?"

দম দেওয়া পুতুলের মতই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন বার্বিকেন।

সেদিন রাত্তির প্রায় বারটা পর্যন্ত ইম্পে বার্বিকেনের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিল মাইকেল আর্দার। কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল, তা অবশ্য সঠিক করে কেউই বলতে পারে নি। তবে রাত বারোটার সময়ে জাহাজ থেকে যখন নেমে এলেন ইম্পে বার্বিকেন, তখন তাঁর মুখ দেখে বোঝার উপায় ছিল না গত কয়েক দিন কি নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে তার প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে। সংক্ষেপে, খুশীতে ঝলমল করছিল তাঁর মুখ।

জাহাজ থেকে আগেই ঘোষণা করেছিলেন বার্বিকেন পরের দিন সকালে পাবলিক মিটিংয়ে চন্দ্রালোক অভিযান সম্পর্কে এক বিস্ময়কর বক্তৃতা দেবেন পৃথিবী বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আর্দা।

১৮॥ বিরাট জনসভা

ট্যাম্পায় এত লোক ধরবে না বুঝে একটা বিরাট মাঠের মধ্যে সভার আয়োজন করেছিলেন বার্বিকেন। একুশে অক্টোবরের সকালে মিটিং শুরু হওয়ার আগে আর পা রাখবার মত জায়গা রইল না মাঠে। সভা শুরু হলে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বার্বিকেন অনুমান করলেন, কম করে তিন লক্ষ লোক এসেছে মাইকেল আর্দার বিবৃতি শুনতে।

জাহাজঘাটার দৌলতে বিরাট বিরাট তেরপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল গোটা মাঠটা। তিন লক্ষ উৎসাহী শ্রোতা কড়া রোদ থেকে মাথা বাঁচিয়ে গরমে আইঢাই করতে লাগল তার তলায়।

বেলা তিনটার সময়ে মাইকেল আর্দা গান-ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে হাজির হলেন।

জনতা তো নয়। যেন কালোটুপির সমুদ্র! আর্দা তা দেখে ঘাবড়ালেন না। প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল ভঙ্গিমায় উঠে গেলেন মঞ্চে। জনসমুদ্র ঘোর হর্ষধ্বনি করল তাঁকে দেখে।

উঁচু একটা মঞ্চের ওপর বসেছিলেন মাইকেল আর্দা আর ইম্পে বার্বিকেন। সভা শুরু হলে নিথর জনসমুদ্রের পানে তাকিয়ে ধীর শান্ত মেঘমন্দ্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন মাইকেল আর্দা।—জেণ্টেলমেন! কিভাবে আমি চাঁদে যেতে চাই, তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই ডাকা হয়েছে আজকের মিটিং। যদিও ব্যাখ্যার কোন দরকার আছে কি না, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে আমার। তাই প্রথমেই জানিয়ে রাখি, নিন্দা বা প্রশংসাতে এতটুকু বিচলিত হব না আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শীগগিরই চাঁদে যাওয়ার একটা ভাল বন্দোবস্ত হবেই হবে। আপনারা যারা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা জানেন, এ জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানীরা বলেন পরিবর্তনশীল এই জগতের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রগতি। সীমা নেই মানুষের শক্তির। তাই বুদ্ধি দিয়ে বস্তু জগতের অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারে সে। অবশ্য এখনও অনেক কাণ্ড-কারখানার কোন ব্যাখ্যা সে করতে পারে নি, কিন্তু অচিরেই যে তা করা সম্ভব হবে, আমি তা বিশ্বাস করি। দুনিয়ার যা কিছু আজব সৃষ্টি, তার মূলে আছে মানুষের এই অসীম বুদ্ধির পরিচয়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি কথাটা। মানুষ প্রথমে তার যানবাহনের সমস্যা মিটিয়েছিল জন্তু-জানোয়ারকে দিয়ে। পরে এল মেশিন। প্রথমে গরুর গাড়ী, তারপর ঘোড়ার গাড়ী, তারপর মোটর, রেল। আগে দাঁড়-পালের নৌকো, পরে কলের জাহাজ। আমার বিশ্বাস, আগামী যুগের মানুষরা কামানের গোলার ভেতরে চেপে যাতায়াত করা অনেক সুবিধেজনক বলে মনে করবে। এতে সময় অনেক কম নষ্ট হবে, মেহনৎও তেমন কিছু হবে না। আপনারা হয়ত ভাবছেন, উল্কাবেগে ছুটে-চলা গোলার মধ্যে বসে থাকাটাই ত অসম্ভব। কিন্তু এই ভাবনার মধ্যে কি কোন যুক্তি আছে? সারা পৃথিবীটাকে মানুষ দখলে এনেছে। কিন্তু মহাকাশের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর গতিবেগই ত কম করে ঘণ্টায় তিরিশ হাজার মাইল। অনেকে হয়ত বলবেন, পৃথিবীর বাইরে বেরোনোর শক্তি মানুষের নেই, এ গ্রহ ছেড়ে অন্যান্য গ্রহে পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতা তার কোনোদিনই হবে না। কিন্তু এই বিশ্বাস যে কতদূর ভুল, তা না বললেও চলবে। আজকে অনায়াসেই পেরিয়ে যাচ্ছি মহাসমুদ্র। মহাকাশ কি তার চাইতেও দুস্তর? আমি তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি নীল আকাশকেও দখল করে বসেছে পৃথিবীর মানুষ। এই গ্রহের অর্ধেক লোক হাওয়া বদলানোর জন্যে পাড়ি জমাচ্ছে চাঁদের দেশে।'

"আবার বলি, ক্ষেপণ বাহন ভবিষ্যতের বাহন; এই বাহনে চেপেই গ্রহে-গ্রহে ছুটে যাবো আমরা অদূর ভবিষ্যতে।

"এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে যদি চাঁদে রওনা হই, কদিন লাগবে জানেন? মাত্র তিনশ দিন! দূরত্ব এমন কিছু বেশী নয়—পৃথিবীর পরিধির ঠিক তিনগুণ। পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে আসা যদি অসম্ভব না হয় তো মাত্র ৯৭ ঘণ্টার যাত্রাপথ অসম্ভব হবে কেন?

"সৌরজগতে ভরা এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মত শুনলে কিন্তু আপনারা বুঝবেন দূরত্ব শব্দটা আসলে একটা ফাঁকা কথা। দূরত্বর কোনো অস্তিত্বই নেই। যে কোনো ধাতুর মধ্যে অণুগুলো যেভাবে পাশাপাশি থাকে, সৌরজগতের গ্রহগুলোও সেইভাবে পাশাপাশি রয়েছে। গোটা সৌরজগৎটা প্রকৃত পক্ষে একটা অখণ্ড জগৎ—গ্রহে-গ্রহে যে ব্যবধান, যে শূন্যতা—তা অণুতে অণুতে ব্যবধানের সামিল!

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব এমন কিছু বেশী নয়। আজ থেকে বিশ বছর পরে পৃথিবীর বহু মানুষ চাঁদ ঘুরে এলেও অবাক হব না।"

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন মাইকেল আর্দা। অমনি বার্বিকেন শুধোলেন—"কিন্তু অন্যান্য গ্রহতে কী জীব আছে?"

আবার শুরু করলেন মাইকেল আর্দা—"প্রেসিডেণ্ট জিজ্ঞেস করছেন, অন্যান্য গ্রহে প্রাণীর বাস আছে কিনা। আমি বলব আছে। পৃথিবী একটা গ্রহ। এখানে যে কত শ্রেণীর প্রাণী আছে, তার সঠিক হিসাব বোধকরি আজও হয় নি। প্লুটার্ণ, সুইডেনবর্গ, বার্নাডিন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা অনেক আলাপ-আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, জন্তু-জানোয়ার সব গ্রহেই আছে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে জটিল যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন তা আপনাদের সামনে হাজির করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আমি শুধু বলব, অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে প্রাণী আছে কিনা, সে সম্বন্ধে আমার মত অল্প বুদ্ধি লোকের বিশেষ কিছু বলা সাজে না। আছে কিনা, তা দেখার জন্যেই তো চাঁদে যেতে চাইছি আমি।"

একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"কিন্তু অন্যান্য গ্রহে বসবাস আদৌ সম্ভব কিনা, এ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত বিস্তর আছে। ধরুন দারুণ ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারি, অথবা সাংঘাতিক গরমে ঝলসে যেতে পারি।"

আর্দা বললেন—"খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। আমি যদি প্রকৃতিবিদ হতাম, তা'হলে বলতাম, বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নানারকম অবস্থায় বসবাসের অসংখ্য নজীর এই পৃথিবীতেই দেখিয়েছেন। মাছ যে অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়,

প্রাণীর পক্ষে তা মারাত্মক, উভচর প্রাণীদের দ্বৈত-জীবনের ব্যাখ্যা খুবই কঠিন ; কিছু কিছু সামুদ্রিক প্রাণী এত গভীরে বাস করে যে অন্য প্রাণী সেখানে থেঁতলে কাগজের মত চ্যাপ্টা হয়ে যেত ; কিছু জলচর প্রাণী উষ্ণ প্রস্রবনে থাকতে যেমন অভ্যস্ত, মেরু অঞ্চলের গরম জলে থাকতেও তেমনি অভ্যস্ত।

"আমি যদি রসায়নবিদ হতাম, তা'হলে বলতাম, উল্কাদেহে কার্বনের চিহ্ন পাওয়া গেছে ; উল্কার উৎপত্তি পৃথিবীর বাইরে ; তাদের গায়ে যদি কার্বন লেগে থাকে তো বুঝতে হবে জীব-জগতের অস্তিত্ব সেখানে এক সময়ে ছিল। রাইকেনবাক এ-তত্ত্ব প্রমাণ করে দিয়েছেন।

"আমি যদি ব্রহ্মবিদ্ হতাম তা'হলে বলতাম ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাণের বিকাশ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আছে এবং থাকবে। সারা ব্রহ্মাণ্ড প্রাণময়।

"কিন্তু আমি ব্রহ্মবিদ নই, কেমিস্ট নই, প্রকৃতিবিদ নই, ব্রহ্মাণ্ডের জটিল নিয়ম-কানুনের কিছুই আমি জানি না। তাই নিজে গিয়ে দেখে আসতে চাই, পৃথিবীর বাইরে জীব-জগৎ আছে কি না!"

এই কথা বলতে না বলতেই দারুণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল চারদিকে। সোরগোল একটু কমলে মাইকেল আর্দাঁ আবার বলতে শুরু করলেন—"গ্রহ-উপগ্রহে যে জন্তু-জানোয়ার আছে, এ তথ্যের অনেক প্রমাণ হাজির করা যায়। কিন্তু আমি তা প্রমাণ করার জন্যে এখানে আসিনি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বসবাস করার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই সৌরজগৎ। তাঁদের আমি শুধু জিজ্ঞেস করব, আমাদের এই পৃথিবীটা যে বসবাস করার পক্ষে চমৎকার জায়গা তার কি প্রমাণ তাঁরা হাজির করতে পারেন? আপনারা ত জানেনই আমরা যেখানে চলেছি, সেই চাঁদ পৃথিবীরই একটা উপগ্রহ। এমন অনেক গ্রহ আছে, যাদের উপগ্রহের সংখ্যা একেরও বেশী। তবুও সেসব গ্রহ বাসযোগ্য নয়। আর পৃথিবীটাই বসবাস করার প্রকৃষ্টতম স্থান এ ধরনের যুক্তি কি বিশ্বাস করা চলে? পৃথিবীর ওপরে এতগুলো ঋতুর আনাগোনা কি রকম জটিল, তা একবার ভেবে দেখুন ত? কখনও মাটিফাটা গরমে প্রাণ আইঢাই করছে, আবার কখনও বরফজমা ঠাণ্ডায় শরীরের রক্তও জমে যেতে চাইছে। দিন আর রাতে এত পার্থক্য, এতগুলো ঋতুর এমন সমারোহ, আর প্রতিবার ঋতু পরিবর্তনের সময় অসুখ-বিসুখের পালা—এসব হয় শুধু একটি কারণে এবং তা হল অক্ষরেখার ওপর সামনে বেঁকে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহকে ভাবুন ত। খুব সামান্যভাবে মেরুদণ্ডের ওপর বেঁকে রয়েছে বৃহস্পতি গ্রহ, এত সামান্য যে সেখানে এ রকম ঋতু-বৈচিত্র্য দেখা যায় না, একটা ঋতু থেকে আর একটা ঋতুর

মধ্যে এতটা পার্থক্য থাকে না, অসুখ-বিসুখের ঝামেলাও নিশ্চয় তাই অনেক কম। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, বসবাস করার কথাই যদি ওঠে, তা'হলে পৃথিবীর চাইতে অনেক দিক দিয়ে ভাল গ্রহ হল এই বৃহস্পতি।

"বৃহস্পতি গ্রহের মত রাজার হালে থাকতে গেলে আমার তো মনে হয় পৃথিবী যে অক্ষরেখায় আবর্তিত হচ্ছে, তা যেন কক্ষপথের দিকে বেশী ঝুঁকে না থাকে। এই ঝুঁকে থাকার দরুণ দিনরাতের অসমতা, ঋতুতে ঋতুতে রকমফের বাত, কাশি, সর্দি লেগেই আছে। যদি পারতাম, অক্ষরেখাকে সিধে করে দিতাম—পৃথিবীর চেহারা ফিরিয়ে দিতাম।"*

১৯॥ কথার লড়াই

পটাপট পটাপট হাততালির আওয়াজে ডুবে গেল মাইকেল বিজ্ঞানীর বক্তৃতা। একটু পরে জনতার উৎসাহ একটু কমলে ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"অনেক কল্পকথাই তো শুনলাম, এবার আসল কথায় এলে ভাল হয় না? কল্পনা ছেড়ে বাস্তব নিয়ে আলোচনা করুন মশায়।"

তিনলক্ষ লোকের ছলক্ষ চোখ একসাথে ফিরল বক্তার দিকে। লোকটার গলায় বেশ দৃঢ়তা আছে। চিবুকে ছাগল-দাড়ি; শুকনো খটখটে চেহারা। ভীড়ের ঠেলায় সে এগিয়ে এসেছে একদম সামনের সারিতে। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে রেখে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে দণ্ডায়মান নায়কের দিকে। ছ'লক্ষ চোখ যে তাকে দেখছে তা নিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কথার জবাব না পেয়ে আবার সে বলে উঠল জোরালো গলায়—"আমরা চাঁদ নিয়ে কথা বলতে এসেছি, পৃথিবী নিয়ে নয়।"

"ঠিক বলছেন", সায় দিলেন আর্দাঁ—"কথায় কথ অন্যদিকে চলে গেছলাম। এবার আসুক চাঁদ প্রসঙ্গ।"

"আপনি তা'হলে বলতে চান সেলেনাইট অর্থাৎ চাঁদে প্রাণী আছে? যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয় শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কোন ঝামেলা তাদের নেই। কেননা, চাঁদে ত বাতাস নেই।"

কঠোর কণ্ঠে মাইকেল আর্দাঁ শুধোলেন—"তাই নাকি? চাঁদে বাতাস নেই আপনি জানলেন কি করে?"

* অভিনব এই আইডিয়া নিয়ে তিরিশ বছর পরে ভের্ণ লিখেছিলেন বিদ্রূপ কাহিনী "দি পারচেজ অফ দি নর্থ পোল"। এই রচনাবলীর অন্য খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে 'উত্তর মেরু নীলামে উঠল' নামে।

"বিশেষজ্ঞরা বলছেন চাঁদে বাতাস নেই।"

"বটে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।"

"কোন তথ্যকে যাঁরা চোখে দেখে, কানে শুনে, নানাভাবে যাচাই করে নেন, তাঁদেরই শ্রদ্ধা করা যায় বিদ্বান বিশেষজ্ঞ হিসেবে। কিন্তু বিন্দু-বিসর্গ না জেনে যাঁরা নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করেন, তাঁদের আমি ঘৃণা করি। আপনি কোন শ্রেণীর পণ্ডিতদের কাছে শুনেছেন যে চাঁদে বাতাস নেই?"

"যাঁদের নাম করব, তাঁদের মতামত তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"তা'হলে আপনার কাছে অনেক শেখার আছে বলুন? আমার কিন্তু অত জ্ঞান নেই।"

"জ্ঞান নেই তো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"আমার দুর্বলতার জন্যে, অবশ্য আমার শক্তির ভিত হল এই দুর্বলতা। আমি জানতে চাই, শিখতে চাই, দেখতে চাই।"

"আপনার দুর্বলতা মূর্খতার নামান্তর।"

"মূর্খতা নিয়েও যদি চাঁদে যেতে পারি, মন্দ কি?"

বার্বিকেন এবং তাঁর অন্যান্য সহযোগীরা বিস্ফোরিত চোখে শুনছিলেন কথা কাটাকাটি।

ছাগল-দাড়ি লোকটা এবার বললে—

"চাঁদে বাতাস না থাকার বিস্তর জোরাল প্রমাণ আমার হাতেই আছে। নিশ্চয় জানেন আপনি, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো আসবার সময় সামান্য বেঁকে যায়। চাঁদ যখন কোন নক্ষত্রকে আড়াল করে দাঁড়ায়, তখন নক্ষত্রের আলো চাঁদের পাশ দিয়ে সিধে পথে চলে আসে, এতটুকু বেঁকে যায় না। এ থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে, চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই।"

আর্দাঁ বললেন—চাঁদের কৌণিক ব্যাস যদি সঠিক জানা থাকত, তা'হলেই আপনি যা বললেন তা সত্য হত। কিন্তু তা এখনো নির্ভুলভাবে জানা যায়নি। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন। চন্দ্রপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব স্বীকার করেন?"

"করি; তবে মরা—সজীব নয়।"

"এক সময়ে সজীব ছিল তো?"

"ছিল। কিন্তু সজীব থাকার জন্যে যে-অক্সিজেনের দরকার, আগ্নেয়গিরির মধ্যে থেকেই পাওয়া যেত। এ-থেকে প্রমাণ হয় না যে চাঁদে বাতাস ছিল।"

"পরোক্ষ প্রমাণ ছেড়ে চাক্ষুস প্রমাণে আসা যাক। ১৭১৫ সালে

জ্যোতির্বিজ্ঞানী লুভিলে আর হেলি মে মাসের তিন তারিখে চন্দ্রগ্রহণ দেখতে গিয়ে আশ্চর্য একরকম আলোকছটা দেখেছিলেন। ঠিক যেন বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বইছে চাঁদের ওপর।"

শ্লেষ ফুটে ওঠে আর্দাঁর কণ্ঠে—"বটে?" আরও প্রমাণ আছে নাকি?"

গম্ভীর গলায় ভদ্রলোক বললেন "আছে। ১৭১৫ সালে সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী লুভিলে আর হেলি চন্দ্রগ্রহণের সময়ে চাঁদে এক বিচিত্র আলো দেখেছিলেন। উল্কার আলোকেই ওঁরা চাঁদের আলো বলে ভুল করেছিলেন।"

"ও কথা থাকুক। ১৭৮১ সালে হারসেলও চাঁদে আলো দেখেছিলেন।"

"কিন্তু সে আলো যে কিসের, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বিয়র বা মদল্লার-এর মত বিজ্ঞেরাও স্বীকার করেছেন চাঁদে বাতাস নেই।"

এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন মাইকেল। বললেন "ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী মঁসিয়ে লসেদতের নাম শুনেছেন? শুনে থাকলে তাঁর পর্যবেক্ষণকে আপনি শ্রদ্ধা করেন।"

"আমি তা করি।"

"কিন্তু উনি ত কোন দিনই বলেন নি যে চাঁদে বাতাস নেই। বরং ওঁর বিশ্বাস, চাঁদে নিশ্চয় বায়ুমণ্ডল আছে।"

"তা ঠিক। থাকলেও তা খুবই হাল্কা। মানুষের উপযুক্ত নয়।"

"যত হাল্কাই হোক না কেন, একজনের পক্ষে তা যথেষ্ট। তাছাড়া, একবার চাঁদে গিয়ে পৌঁছলে আমি না হয় কম নিঃশ্বেস নেব।" হো-হো করে হেসে উঠল শ্রোতারা। "চাঁদে বাতাস আছে যখন স্বীকার করেছেন, তখন জলও যে আছে, তাও আপনাকে মেনে নিতে হবে। জল না থাকলে বাতাস থাকবে কি করে?"

তিনলক্ষ শ্রোতা একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল আর্দাঁর অকাট্য যুক্তিতে। সেই সঙ্গে তুমুল হট্টগোল শুরু হল সভার মধ্যে।

"যথেষ্ট হয়েছে! এবার কাটুন!"

"ঘাড় ধরে বার করে দিন না!"

"মারতে মারতে তাড়িয়ে দিন বাচাল লোকটাকে!"

স্পষ্ট বক্তার আরো কিছু বলার ছিল, কিন্তু চেঁচামেচিতে বলতে পারল না। নিজের জায়গা ছেড়েও একচুল নড়ল না। শক্তমুঠিতে মঞ্চ চেপে ধরে চেয়ে রইল আর্দাঁর পানে।

হাতের ইসারায় ক্ষুব্ধ শ্রোতাদের থামিয়ে শুধোলেন আর্দাঁ—"আপনার আরো প্রশ্ন আছে?"

"এক হাজার প্রশ্ন আছে। আপাততঃ একটা করছি। "আপনি দেখছি—"

"দারুণ ডানপিটে, কেমন ?"

"আরে মশায়, কামান দাগার সময়েই তো ছাতু হয়ে যাবেন।"

"এতক্ষণে একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন করেছেন। তবে আমেরিকানদের প্রতিভায় আমার আস্থা আছে। একটা উপায় বেরোবেই।"

"বেশ, মেনে নিলাম আপনার কথা। কিন্তু গোলাটা যখন বায়ুমণ্ডল ছিন্ন-ভিন্ন করে ওপরে উঠবে, তখন বাতাসের সেই প্রচণ্ড ঘর্ষণের ফলে তাপ—"

আর্দা বলে উঠলেন—"সেই সাংঘাতিক তাপে আমি পুড়ে ছাই হয়ে যাব, এই ত ? যদি এই আশংকাই করে থাকেন, তা'হলে ত দেখছি বিরাট ভুল করেছেন আপনি। কেন না, বায়ুস্তর পেরিয়ে যেতে আর কটা সেকেণ্ডই বা লাগবে বলুন ? তাছাড়া গোলাটার আবরণও খুব মোটা রাখা হবে।"

"খাবার-দাবারের কি ব্যবস্থা করবেন শুনি ?"

"বছরখানেকের মত রসদ সঙ্গে নিয়ে যাব। চারদিনই ত পৌছে যাব চাঁদে। তারপরের ব্যবস্থা তখনই ভাবা যাবে'খন।"

"কিন্তু যাবার সময়েও ত নিঃশ্বাস নেওয়ার মত অক্সিজেন আপনার দরকার ? সেটা পাচ্ছেন কোথায় ?"

"বানিয়ে নেব বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়।"

"চাঁদে গোলাটা আদৌ পৌছবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। আর পৌছলেও ঐ প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে চাঁদের বুকে আছড়ে পড়লে—"

"পৃথিবীতে ঐ অবস্থায় যতটা জোরে পড়তাম, তার অন্তত ছ'গুণ কম আঘাত লাগবে চাঁদের ওপরে।"

"আরে মশাই, ঐ ছ'গুণ কম আঘাতেই ত কাঁচের মত পাউডার হয়ে যাবেন আপনি।"

"না, হব না। ইচ্ছে করলেই নীচে নামার গতিবেগ আমি কমিয়ে নিতে পারব। কয়েকটা জোরাল হাউই নিয়ে যাচ্ছি আমি। সময় বুঝে একটা একটা হাউই ছেড়ে গতিবেগ সৃষ্টি করব গোলাটার বিপরীত দিকে। কাজেই এই বিপরীত গতি দিয়ে পতনের বেগ আমন্ত্রণ করে অনায়াসেই চাঁদের মাটিতে নেমে পড়তে পারব আমি।"

—"ধরে নেওয়া গেল সুস্থ শরীরেই চাঁদে পৌছলেন। তারপর ? পৃথিবীতে ফিরবেন কি করে ?"

হো হো করে হেসে উঠলেন আর্দা—"আমি যে ফিরব, এ কথা কারু

কাছে শুনলেন আপনি? আর ত ফিরে আসব না আমি! আমি চাঁদে বসে পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে বড় বড় অক্ষর লিখে পৃথিবীতে খবর পাঠাবো— পৃথিবী থেকে দূরবীণ দিয়ে পাথরের অক্ষর পড়ে নেবেন আপনারা!"

কথাটা যাদের যাদের কানে পৌঁছল, তারাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বজ্রাহতের মত নিশ্চুপ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। এই ডানপিটে বিজ্ঞানী বলেন কি? যে ভদ্রলোক এতক্ষণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছিলেন, তিনি এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন—"আবার বলছি, নশো ফুট লম্বা কামানের চোঙা থেকে অতবড় একটা গোলাকে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ছুঁড়ে দেবে চাঁদের দিকে তার এক ধাক্কাতেই গোলার মধ্যে থেকেও তালগোল পাকিয়ে হাড়মাসের পিণ্ড হয়ে যাবেন আপনি।"

চিন্তার ছায়া পড়ল বিজ্ঞানীর মুখে। বললে—"আমিও আবার বলছি, এ সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার বন্ধুই এ সমস্যার সমাধান করে দেবেনখ'ন।"

"জানতে পারি কি কার ঘটে এত বুদ্ধি আছে?"

তিনি গান-ক্লাবের খ্যাতনামা প্রেসিডেন্ট ইম্পে বার্বিকেন।"

"ওহো! সেই আহম্মকটা, যার কথায় গোটা দুনিয়াটা এখন উজবুকের মত নাচছে।"

কথাটা যে বার্বিকেনকেই লক্ষ্য করে বলা হল, তা বুঝতে কারোরই বাকী রইল না। বার্বিকেনের আর ধৈর্য রইল না। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লোকটাকে পাকড়াও করার জন্যে এগোতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই গোটা মঞ্চটা হঠাৎ জমি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল!

আর্দার এই ভয়ংকর সংকল্পর উন্মাদনা ততক্ষণে সংক্রামিত হয়ে গেছল ঐ বিপুল জনতার মধ্যে। বার্বিকেনকে আর মঞ্চ থেকে মাটিতে নামার অবসর না দিয়ে গোটা মঞ্চটাকেই বার্বিকেন এবং মাইকেল সমেত কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে তারা মহা সোরগোল করতে করতে এগিয়ে চলল জেটির দিকে। কাঠের প্ল্যাটফর্মটাকে কাঁধে নেওয়ার জন্যে দারুণ ছুটোপুটি শুরু হয়ে গেল— মঞ্চের নীচে কাঁধ লাগানোই যেন এক মহাপুণ্যের কাজ।

প্রশ্নে প্রশ্নে বিজ্ঞানীকে যিনি নাস্তানাবুদ করার উপক্রম করেছিলেন, সেই ভদ্রলোকটি কিন্তু চম্পট দেন নি। ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে তিনিও এসেছিলেন জাহাজঘাটায়। প্ল্যাটফর্মটা কাঁধ থেকে নামানোর পরেই বার্বিকেন আর আর্দা নেমে দাঁড়াতেই লোকটাকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন বার্বিকেন। দেখেই বার্বিকেনের ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল প্রচণ্ড রাগে

অতিকষ্টে মেজাজ শান্ত রেখে লোকটাকে ডাকলেন উনি—"কথা আছে, এদিকে একটু আসবেন ?"

নির্বিকার মুখে নীরবে বার্বিকেনের পিছু পিছু গেলেন ভদ্রলোক ! আড়ালে গিয়ে কড়া স্বরে শুধোলেন বার্বিকেন—"আপনার নাম জানতে পারি কি ?"

"লোকে আমাকে ক্যাপ্টেন নিকল বলেই জানে।"

"ক্যাপ্টেন নিকল ! আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"হ্যাঁ।"

নীলআকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়লেও এতটা চমকাতেন না বার্বিকেন ! বললেন—"এই প্রথম দেখা হল আমাদের।"

"হ্যাঁ। আমি নিজেই এলাম দেখা করতে।"

"আজ আমাকে যথেষ্ট অপমান করেছেন আপনি।"

"ইচ্ছে করেই করেছি—সবার সামনেই করেছি।"

"এ অপমানের শোধ তুলতে চাই আমি।"

"ভাল কথা। এখুনি মিটিয়ে ফেলা যাক সে পর্ব। আমি তৈরী।"

"এখন সময় নেই আমার। গোপনে হোক এ মীমাংসা। টম্পা থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জঙ্গল আছে। আপনি চেনেন ?"

"চিনি।"

"কাল ভোর পাঁচটায় সেখানে যাওয়ার সুবিধে হবে কি আপনার ?"

নিশ্চয় হবে। দয়া করে ডুয়েল লড়ার জন্যে যদি তৈরী হয়ে আসেন, তবেই হবে।"

আপনার বন্দুকটা আনতে ভুলবেন না।"

ক্যাপ্টেন নিকল ততোধিক শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—"আপনি না ভুললেই হল।"

তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ছেড়ে ফিরে এলেন বার্বিকেন।

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না বার্বিকেন। এ নিদ্রাহীনতা পরের দিনের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের উত্তেজনার জন্যে নয়; কামান থেকে গোলা ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে গোলার গায়ে যে বিপুল ধাক্কা লাগবে, কি করে তা কাটিয়ে ওঠা যায়, সেই চিন্তাতেই ছটফট করে কাটালেন সারাটা রাত।

২০॥ ফরাসির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

বাইশে অক্টোবর ভোর হওয়ার আগেই হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন ম্যাসটন। এসেই দমাদম শব্দে ধাক্কা মারতে লাগলেন আর্দার শোবার ঘরের দরজায়। প্রথম প্রথম কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। শেষে পাগলের মত লাথি মারতে মারতে চেঁচাতে লাগলেন ম্যাসটন—"মঁসিয়ে আর্দা, ঈশ্বরের দোহাই, দরজা খুলুন এক্ষুনি। বিষম বিপদ—আর দেরী করবেন না।"

ভোরের আলো তখনও ফুটে ওঠে নি। ঘুপসি অন্ধকারকে বাগে আনার জন্যে তখনও টিমটিম করে বাতি জ্বলছে রাস্তায় রাস্তায়। ধড়মড় করে শয্যাত্যাগ করে দরজা খুলতে না খুলতেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ম্যাসটন। ঢুকেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"কালকে মিটিংয়ে যে ভদ্রলোক অপমান করেছিলেন বার্বিকেনকে আজকে তাঁকে ডুয়েল লড়তে চ্যালেঞ্জ করেছে বার্বিকেন। বার্বিকেনের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি—ক্যাপ্টেন নিকল। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হবে আজ ভোরেই—একটু পরেই। এবং শেষ পর্যন্ত নিকল আর বার্বিকেনের মধ্যে একজনকে ধরাধাম থেকে বিদায় নিতেই হবে! বার্বিকেন নিজেই আমাকে বলে গেছেন, পৃথিবীটা এতই ছোট যে তাঁদের দু'জনের এখানে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়, তাই একজনকে ওপারের পথে রওনা হতেই হবে। কিন্তু এ ডুয়েল যেমন করেই হোক্ বন্ধ করতে হবে, মঁসিয়ে আর্দা। এই সময়ে বার্বিকেনকে কোনমতেই হারাতে পারি না আমরা।"

চটপট জামা কাপড় পরতে পরতে মাইকেল আর্দা বললেন, "আপনাদের দেশে দেখছি খুন-জখমটা নেহাৎই অকারণে হয়। মিষ্টার বার্বিকেন এখন আছেন কোথায়?"

"সঠিক বলতে পারব না। ডুয়েলের নির্দিষ্ট জায়গায় বোধ হয় পৌঁছে গেছেন এতক্ষণে।"

"সে জায়গাটা কোথায়?"

"শহরের মাইল তিনেক দূরে একটা জঙ্গলে।"

আর একটা সেকেণ্ডও অযথা নষ্ট না করে দু'জনে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলেন সেই জঙ্গলের দিকে। বাঁধানো সড়ক দিয়ে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় মাঠ-ঘাট-প্রান্তর পেরিয়ে দৌড়লেন জঙ্গল লক্ষ্য করে। ছুটতে ছুটতে বার্বিকেনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলের দীর্ঘদিনের মনোমালিন্যের কথা

খুলে বলল ম্যাসটন। জঙ্গলের মুখেই দেখা হয়ে গেল এক কাঠুরিয়ার সাথে। আর্দা হাঁপাতে হাঁপাতে শুধোলেন—"কোন শিকারীকে দেখতে পেয়েছ?"

"শিকারী? তা, হ্যাঁ, বন্দুকওয়ালা একটা লোককে দেখেছি বটে।"

"কখন?"

"একটু আগে। প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে।"

"ঘণ্টাখানেক!" একই সাথে চেঁচিয়ে উঠলেন ম্যাসটন আর আর্দা। তা'হলে তো সব শেষ এতক্ষণে। বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ-টাওয়াজ শুনেছ তুমি?"

"না ত!"

"একবারও না?"

"না।"

"শিকারীর সঙ্গে কোন্ দিকে দেখা হয়েছে?"

জঙ্গলের গহন অঞ্চলটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল কাঠুরিয়া। ম্যাসটনকে টান দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটলেন আর্দা।

কি ঘন জঙ্গল! সূর্যের আলো কোনদিন এ অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পেয়েছে বলে মনে হয় না। গাছপালার বুনুনি বিশেষ করে এই দিকটায় এমনই নিরেট যে কয়েক হাত দূরের মানুষকেও দেখবার উপায় নেই।

ম্যাসটন ঘুরে ঘুরে হয়রান্ হয়ে গিয়ে বললেন—"সর্বনাশ, লড়াই হয়ত শেষ হয়ে গিয়েছে এবং একজন মারা গিয়েছে।"

"কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ তো শোনা যায়নি," বললেন বিজ্ঞানী। আবার শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা। নিকল আর বার্বিকেনকে চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে ঢুকে পড়লেন আরও গভীর জঙ্গলে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ম্যাসটন। বললেন—"ও কি?"

"একজন মানুষ।"

"জীবিত না মৃত? কই নড়ছে না ত? হাতে বন্দুকটাই বা কোথায়? গাছপালার মধ্যে দিয়ে মুখটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।"

"তবে চলুন, কাছে যাওয়া যাক।"

আরও একটু এগোতেই লোকটাকে চিনতে পারলেন ম্যাসটন: ক্যাপ্টেন নিকল। রাগে-দুঃখে আগুন জ্বলে উঠল তাঁর দুই চোখের মণিকায়! দাঁতে দাঁত পিষে শুধু বললেন—"ক্যাপ্টেন নিকল দেখছি।"

"ক্যাপ্টেন নি-কল-ল!" মৃদুস্বরে নামটা আর একবার আওড়ালেন আর্দা। "ক্যাপ্টেন নিকল!" কথাটা বলতে গিয়ে বুক মুচড়ে উঠল আর্দার।

পায়ে পায়ে নিকলের কাছে এগিয়ে গিয়ে দুজনে দেখলেন বিষধর মাকড়শার

জালে আটকে ছটফট করছে একটা সুন্দর পাখী। আলতো করে পরম যত্নে এই পাখীটিকেই জালের ফাঁদ ছাড়িয়ে দিচ্ছেন নিকল। বন্দুকটা পড়ে রয়েছে পায়ের কাছে। জাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উনি উড়িয়ে দিলেন সুন্দর পাখীটিকে। ডানা পত-পত করে কাছের একটা ডালে গিয়ে বসল পাখীটি। নরম সুন্দর চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন! এই কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলেন আর্দাঁ। ভাবলেন, এত কোমল যার অন্তর, কি করে নিষ্করুণ নির্মম খুনে হয় সে? আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে উনি ডাকলেন "ক্যাপ্টেন নিকল। বাস্তবিকই বীরের মতই বিশাল আপনার অন্তর। শুধু বীর নন, বড় নরম আপনার মন। আপনি দয়ালু।"

সচমকে তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন নিকল। বললেন, "আরে! মঁসিয়ে আর্দাঁ দেখছি! এখানে, এত সকালে?"

"আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এই ডুয়েল বন্ধ করতে এসেছি, ক্যাপ্টেন নিকল। মিছিমিছি রক্তপাত করে কিছু লাভ আছে কি? অকারণে একটা অমূল্য জীবন নষ্ট করে কি লাভ? এ যুদ্ধে হয় আপনি মরবেন, আর না হয় বার্বিকেন।"

বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন নিকল "কি, কি বললেন? বার্বিকেন? দু' ঘণ্টা হল তাঁকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম আমি।"

"কোথায় লুকিয়েছে বার্বিকেন?"

'আঁর্দা' বললেন—"নিকল! এটা কিন্তু সৌজন্য হল না। প্রতিপক্ষকে সম্মান করা উচিত আপনার। বার্বিকেন এখনো বেঁচে আছেন যখন, তখন আমরা তাঁকে খুঁজে পাবোই। উনিও নিশ্চয় আপনাকে খুঁজছেন। তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই। বার্বিকেনের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হবে আমাদের। তবে এটাও ঠিক যে আপনাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধটিও আর হবে না।"

"দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হবেই। দু'জনের একজনকে আজ মরতেই হবে।" দৃঢ়স্বরে বললেন নিকল।

ম্যাসটন বলে উঠলেন, "ক্যাপ্টেন নিকল। আমি বার্বিকেনের শুধু বন্ধু নয়, তাঁর ডান হাতও বলতে পারেন। আজকে একটা মানুষ মারারই যদি একান্তই সখ হয়ে থাকে আপনার, তবে আমার ওপর গুলি চালান। আমাকে মারলেই বার্বিকেনকে মারা হবে।" বলে ক্যাপ্টেন নিকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন ম্যাসটন।

বিপদ বুঝে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে আর্দাঁ বলে উঠলেন—"আরে করছেন কি? খামাকা খুন-জখম করাটা একদম বরদাস্ত করতে পারি না আমি।

ক্যাপ্টেন নিকল, আপনার সামনে এমন একটা প্রস্তাব আমি হাজির করব যা শুনলে খুন-টুন করার নেশা আপনার ছুটে যাবে।"

সন্দিগ্ধভাবে বন্দুক নামিয়ে নিকল বললেন, "বটে, বটে, এমন চমকপ্রদ প্রস্তাবটা শুনতে পারি কি ?"

"একটু পরে তা জানাব আপনাকে। প্রস্তাবটা বার্বিকেনের সামনেই করা দরকার।"

"তা'হলে চলুন, তাঁকেই আগে খুঁজে বার করা যাক।"

"চলুন।"

বার্বিকেনের খোঁজে এবার তিনজনেই এগোলেন একসাথে। কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ম্যাসটন। আঙুল তুলে যেদিকে দেখালেন, সেদিকে তাকাতেই বাকী দুজন দেখলেন মস্ত একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বার্বিকেন দাঁড়িয়ে আছেন।

"মিঃ বার্বিকেন, মিঃ বার্বিকেন," বলে ডাকতে ডাকতে আর্দা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত নিশ্চল নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন বার্বিকেন, এত ডাকাডাকি তাঁর কানে ঢুকছে বলে মনেই হল না। কাছে গিয়ে আর্দা দেখেন কি নিজের আঁকা কয়েকটা জ্যামিতিক নক্সার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন উনি। ধ্যানমগ্ন ঋষির মতই ভুলে গেছেন আশপাশের জগৎ। পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে বন্দুকটা।

কাঁধে হাত রেখে বিজ্ঞানী ডাকলেন—"মিঃ বার্বিকেন।"

"কে ? মঁসিয়ে আর্দা ? ইউরেকা ! ইউরেকা ! সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি আমি। আর কোন চিন্তা নেই।"

"কিসের সমস্যা ?"

"সেই সমস্যা।"

"সেইটা কি ?"

"কামানের নলচে থেকে গোলাটা ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সেই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে ওঠার পথ বার করে ফেলেছি।"

শুনে আর্দার আনন্দ আর দেখে কে। হাসিমুখে শুধোলেন—"সত্যি বলছেন ?"

একটু হাসলেন বার্বিকেন। বললেন "ওটা আর এমন কি সমস্যা ! স্প্রিংয়ের কাজে জলকে লাগালেই হল। বসবার আসনটা থাকবে তারই ওপর। আরে, আরে, ম্যাসটনও হাজির দেখছি। বলি ব্যাপারটা কি ?"

বার্বিকেনের হাত ধরে আর্দা বললেন, "ক্যাপ্টেন নিকল দাঁড়িয়ে আছেন। আসুন তাঁর সাথে আলাপ করিয়ে দিই।"

আরক্তিম হয়ে উঠল বার্বিকেনের দুই কপোল। মহা অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বলে উঠলেন—"ছিঃ ছিঃ, এই সামান্য কথাটাও রাখতে পারলাম না আমি।" দূর থেকে ক্যাপ্টেন নিকলকে এগিয়ে আসতে দেখেই চীৎকার করে উঠলেন—"ক্যাপ্টেন নিকল, আমায় ক্ষমা করবেন। আমারই অন্যমনস্কতার জন্যে আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট হল। চাঁদে কিভাবে গোলা পাঠানো যায় আরোহীকে বাঁচিয়ে, তা ভাবতে ভাবতে ডুয়েলের কথা বেমালুম ভুলে গেছলাম। যাকগে, এবার আসুন, আমি তৈরী।" বলে বন্দুকটাকে তুলে নিলেন বার্বিকেন।

বাধা দিয়ে আর্দাঁ বলে উঠলেন—"আজ্ঞে না মশাই, সেটি আমি হতে দিচ্ছি না। দুনিয়ার কপাল ভাল আমরা এসে পৌছনোর আগেই শেষ হয়ে যায় নি লড়াইটা। আপনারা কেউই সাধারণ প্রকৃতির বদমেজাজী মানুষ নন। প্রত্যেকেই অসামান্য প্রতিভাধর। ধীশক্তিকে খুন করার জন্যেই কি ইহজগতে আপনারা এসেছেন?"

বার্বিকেন আর নিকলের মুখে আর কথাটি নেই। দুজনেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর্দাঁ বলে চললেন "বেশ বুঝছি, দুজনেই ছুটে মরছেন একটা বিরাট ভুলের পেছনে। চাঁদে যে গোলা পৌছবেই, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই বার্বিকেনের। আর নিকল ভাবছেন, তা কোনদিনই সম্ভব হবে না।"

নিকল বলে উঠলেন—"ঠিকই ভাবছি। চন্দ্রালোকের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না ও গোলা।"

বার্বিকেন চুপ করে থাকবার পাত্র নন। তিনিও বাধা দিয়ে বলে উঠলেন "আলবৎ পৌছবে।"

আর্দাঁ বললেন—"আরে, অত কথা কাটাকাটির দরকারটা কি? আপনারা দুজনেই চলুন না আমার সাথে? গোলাটা চাঁদের ধারে-কাছে যেতে পারে কি চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে পারে তা নিজের চোখে দেখেই ঝগড়াটা তখনি মিটিয়ে ফেলা যাবে'খন?" ভয় নেই, কামান দাগার সময়ে কেউ ছাতু হবে না।"

তৎক্ষণাৎ একই সাথে বলে উঠলেন বার্বিকেন আর নিকল, ' আমি রাজি।"

"হুররে!" সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন মাইকেল। "চলুন। ব্রেকফাষ্ট খেয়ে মিলনোৎসব করা যাক ফরাসি কায়দায়!"

২১॥ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নাগরিক

ক্যাপ্টেন নিকলের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের অথ-দ্বন্দ্বযুদ্ধ-ইতি-কথা সেইদিনই ছড়িয়ে গেল সারা আমেরিকায়। দলে দলে লোক এসে অভিনন্দন

জানাতে লাগল মাইকেল আর্দাকে। এদের মধ্যে একদিন এল একজন পাগল। আমেরিকায় এই ধরনের পাগল কিছু কিছু আছে।

লোকটা গম্ভীর মুখে আর্দাকে বললে—"চাঁদ আমার জন্মভূমি। আমাকে চাঁদে ফিরিয়ে নিয়ে যান।"

তাকে কোন মতে হাঁকিয়ে দিয়ে বার্বিকেনকে ঘটনাটা বললেন আর্দা—"আচ্ছা পাগল তো! আপনিও কি বিশ্বাস করেন চাঁদের প্রভাবে পৃথিবীতে এত অসুখ-বিসুখ হয়?"

"কদাচিৎ করি!"

"আমিও করি না। যদিও ইতিহাস তো বোঝাই হয়ে রয়েছে রাশি রাশি তথ্য প্রমাণে। ১৬৯৩ সালে ঠিক চন্দ্রগ্রহণের সময়ে দারুণ মহামারী শুরু হয় এবং বহুলোক মারা যায়। ঠিক চন্দ্রগ্রহণের সময়ে অনেকে কেবল অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ১৯৩৯ সালে ষষ্ঠ চার্লস পূর্ণিমা আর অমাবস্যা এলেই মোট ছবার উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। গল দেখেছেন, শুক্লকলার সঙ্গে তাল রেখে মাসে দুবার পাগলামি বাড়ত পাগলদের। আরও অনেক নজীর আছে। চাঁদের নাকি সত্যিসত্যিই রহস্যজনক প্রভাব আছে জ্বরজ্বালা, ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়ানো এবং উন্মত্ততার ওপর। এমন কি প্লুটার্চও বলেছেন—সব গল্পই কি আর মিথ্যে!"

এতো গেল পাগলের পাগলামি। সেই সঙ্গে আমেরিকান মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল আর একধরণের উন্মাদনা। মাইকেল আর্দার বউ হয়ে তারা চাঁদে যাওয়ার বায়না ধরল! আর্দার ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল মাঝবয়েসী মহিলাদের মধ্যে!

বার্বিকেন কিন্তু আগাগোড়া চিন্তিত ছিলেন একটা ব্যাপার নিয়ে। কামান দাগার ধাক্কা সইতে পারবেন তো তাঁরা?

গোলার মধ্যে মানুষ আরোহী থাকা সম্ভব কি না, তা তখনও অনেকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। সব জল্পনা-কল্পনা সংশয় অবিশ্বাস ইতি করার জন্যে একটা বত্রিশ ইঞ্চি কামান আনালেন বার্বিকেন। ভেতরটা কুশন দিয়ে মোটা স্প্রিংয়ের একটা ফাঁপা গোলাও বানানো হল। একটা বেড়াল আর কাঠবেড়ালীকে ভেতরে রেখে ঢাকনাটা স্ক্রু এঁটে বন্ধ করে দিলেন বার্বিকেন। ১৬০ পাউণ্ড বারুদ ঠাসা হল কামানে। তারপর বারুদে আগুন দিয়ে গোলাটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হল অতি সহজেই। হাজার ফুট ওপরে উঠে একটু বেঁকে সমুদ্রে আছড়ে পড়ল গোলাটা। ঢাকনাটা খুলে দেখা গেল বেড়ালটা সামান্য জখম হয়েছে বটে, তবে গোলার মধ্যে বসেই কাঠবেড়ালীটিকে দিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করেছে মূর্তিমান।

এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল দেখে বেজায় খুশী সবাই। ম্যাসটন সমানে বলতে লাগলেন, "আমিও চাঁদে যাব, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।" বার্বিকেন ঘাড় নেড়ে জবাব দিতে লাগলেন, "আরে ম্যাসটন, তা কি করে সম্ভব? গোলার মধ্যে অত লোক ধরবে কোথায়?" ম্যাসটন দারুণ দমে গিয়ে শেষকালে আর্দাঁর কাছে গিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলেন।

আর্দাঁ কিন্তু একটা নতুন বিপদ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলেন। প্রত্যেক দিনই এতলোক চাঁদে যাবার আবদার করতে লাগল তাঁর কাছে যে মেজাজ খিঁচড়ে গেল তাঁর। একদিন এক দঙ্গল এসে বলল—"দেখুন, আমরা চাঁদের দেশের লোক। দেশের দিকে মন টেনেছে।" মুচকি হেসে আর্দাঁ বললেন—"এবারকার মত আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারছি না এই কারণে যে গোলায় স্থানের বড় অভাব। তবে চাঁদে পা দিয়েই আপনাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যা হয় একটা বন্দোবস্ত করব কথা দিচ্ছি।"

মাইকেল আর্দাঁর দর্শনলাভে যারা বঞ্চিত হল তারা চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগল তাঁকে। প্রত্যেক দিন চিঠির পাহাড় বইতে বইতে তিরিক্ষে হয়ে রইল ডাকঘরের কর্মচারীদের মেজাজ। জবাব দেওয়া ত দূরের কথা ঐ পর্বতপ্রমাণ চিঠি পড়ারই বা সময় কোথায় তাঁর? চাঁদে যেতে গেলে যে এত ঝামেলা পোয়াতে হয়, তা তিনি জানতেন না।

তারপরে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর এল সেই শুভ দিনটি—দশই নভেম্বর। গোলা তৈরীর দায়িত্ব যে কোম্পানী নিয়েছিল তারা গোলাটা পৌঁছে দিয়ে গেল বার্বিকেনের কাছে। কাগজে কাগজে গোলা তৈরীর খবর ছাপা হতেই হাজার হাজার লোক উন্মাদের মত ছুটল গোলাটাকে একবার দেখার জন্য। গোলাটাকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখেছিলেন বার্বিকেন। যাতে প্রত্যেকেই দেখতে পারে, তবুও জনসমাবেশ এমনই বিপুল হয়ে উঠল যে অতবড় মাঠেও আর জায়গা ধরল না। চীৎকার হট্টগোলে সকলেরই কানের পোকা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। এ কি উৎপাত! গোলাটা আর্দাঁ দেখলেন। দেখে খুশী হলেন বটে, তবুও মস্করা করে বললেন—"মিঃ বার্বিকেন, এ কি জিনিস তৈরী করেছেন? এ রকম কদাকার গোলা দেখলে চাঁদের মানুষগুলো যে হেসে কুটিপাটি হবে।"

বার্বিকেন মুচকি হেসে বললেন—"বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়ে কি আর লাভ বলুন। আপনার পছন্দমত ভেতরটা সুন্দর করে সাজিয়ে নিন, তাহলেই হবে।" আর্দাঁ আর এ নিয়ে কোন কথা বললেন না।

বার্বিকেন জানতেন, লোহার স্প্রিং যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, এ

গোলায় তা দিয়ে কোন কাজই চলবে না। সেই কারণেই জলের ব্যবস্থা করেছিলেন উনি। তিন ফুট জল ঢালা হল গোলার ভেতরে, তার ওপরে বসান হল একটা কাঠের চাকৃতি। এমন কায়দায় গোলার গায়ে চাকতিটাকে লাগালেন বার্বিকেন যে দরকারমত তা খুলে ফেলা যাবে। এই চাকতির ওপরেই অভিযান-কারীদের বসবাসের ব্যবস্থা হল। পরপর কতকগুলো কাঠের চাকতি দিয়ে জলকে কয়েকটা স্তরে ভাগ করে ফেললেন বার্বিকেন। সবচেয়ে ওপরের চাকতিটায় যাত্রীদের বসবার আসন পাতা হল। আর, এই চাকতিটার নিচেই রইল অত্যন্ত জোরাল স্প্রিং।

বার্বিকেন বেশ বুঝেছিলেন, কামান থেকে গোলাটা বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ঐ প্রচণ্ড ধাক্কায় কাঠের চাকতিগুলো একটার পর একটা ভেঙে যাবে। একস্তরের জল অন্য স্তরের জলের সঙ্গে মিশে যাবে। কাজেই আরোহীদের ওপর ধাক্কাটা এসে পৌঁছবে না। গোলা ছিটকে বেরলে সর্বপ্রথম ধাক্কা লাগা উচিত সামনের দিকে, পরে পেছনের দিকে। বিচিত্র জলের স্প্রিং থাকায় সামনের ধাক্কাটা সামলে নেওয়া যাবে। আর পেছনের ধাক্কাকে সামাল দেওয়ার জন্য রইল শক্ত লোহার স্প্রিং। গোলার ভেতরে বসান হল ঘড়ির স্প্রিংয়ের মত নরম স্প্রিং। নরম হলেও সহজে ভেঙে যায় না এ স্প্রিং। তার ওপর পুরু গদী বসিয়ে দেওয়া হল।

এমন চমৎকার বন্দোবস্ত দেখে মাইকেল আর্দা বললেন,—"এর পরেও যদি ধাক্কা লেগে মাংসপিণ্ড হতে হয়, তবে তাই হব 'খন।"

গোলার ওপর দিকটা আস্তে আস্তে সরু হয়ে উঠে গেছল। দরজাটা বানানো হয়েছিল এই দিকটাতেই। ভেতর থেকে বেশ আঁট করে দরজা বন্ধ করার সব আয়োজনই করেছিলেন বার্বিকেন হঠাৎ বিপুল ধাক্কায় দরজা যাতে দড়াম করে খুলে না যায়, তাই ইলেকট্রিক সুইচের ব্যবস্থা রাখলেন উনি।

গোলার মধ্যে স্রেফ জড়ভরত হয়ে বসে চাঁদে পৌঁছনোটাই ত বড় কথা নয়, যাবার পথে মহাকাশের বিচিত্র রূপ দু'চোখ ভরে দেখাও দরকার। তাই চারটে কাঁচের জানলা বসানো হল স্প্রিং-ওয়ালা গদীর নিচে। দুপাশে দুটো, একটা ওপরে, আর একটা নিচে। কাজে কাজেই মহাকাশে ধেয়ে চলতে চলতে ফেলে আসা পৃথিবী, এগিয়ে আসা চাঁদ আর অগুন্তি তারকাখচিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কোন অসুবিধে আর রইল না। বাতাসের চাপে যাতে কাঁচগুলো ভেঙে না যায়, তাই ধাতুর চাদর দিয়ে এমন কৌশলে জানালাগুলো ঢাকা রইল যে কয়েকটা স্ক্রু খুলে নিলেই অনায়াসে সরে আসত ধাতুর আবরণ, উন্মুক্ত হয়ে যেত কাঁচের জানলা।

আলো আর উত্তাপের অভাব মিটানোর জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস নেওয়া হল গোলার ভেতরে। একটা নলের মুখ খুলে দিলেই হিস হিস করে বেরিয়ে আসত এই গ্যাস। এক হপ্তায় উপযুক্ত খাবার-দাবার, জল আর গ্যাস নিলেন বার্বিকেন। কোন মতে জীবন ধারণ করার জন্যে শুধু নয়, যাতে দিব্বি আরামে থাকা যায়, সেই রকম আয়োজনই করলেন বার্বিকেন। জায়গার অভাব না থাকলে পৃথিবীর সবরকম শিল্পেরই কিছু কিছু নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে যেতেন আর্দা।

আহার্য, পানীয় আর আলো ইত্যাদির আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাতাস নিয়ে মাথা ঘামান শুরু হল। গোলার ভেতরে যে পরিমাণ বাতাস ছিল, তা চারদিনের পথে তিন চারজনের পক্ষে যথেষ্ট। বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁর কুকুর দুটিও চলেছিল। কাজে কাজেই মোট পাঁচটি জীবের জন্যে কম করে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় সাড়ে তিন সের অক্সিজেন দরকার। ২১ ভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন মিশোলেই বাতাস পাওয়া যায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের মধ্যে অক্সিজেন প্রবেশ করে। চারদিক বন্ধ জায়গার বেশ কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিলে বাতাসের অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়—থাকে শুধু কার্বনিক অ্যাসিডের গ্যাস। বার্বিকেন ভেবে দেখলেন, গোলার মধ্যে পাঁচটি প্রাণীর উপযুক্ত অক্সিজেন বানিয়ে নেওয়ার পর সঞ্চিত কার্বনিক অ্যাসিডকে নষ্ট করে ফেলতে পারলেই গোলায় আর বাতাসের অভাব হবে না।

অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করে পটাশিয়াম-ক্লোরেট আর কষ্টিক পটাশ দিয়ে সমাধান করা হল এই সমস্যার। চারশো ডিগ্রী উত্তাপে পটাশিয়াম ক্লোরেট পালটে গিয়ে হয়ে গেল ক্লোরিন অফ পটাশ। এবং পটাশিয়াম ক্লোরেটের অক্সিজেন বেরিয়ে এল বাইরে। সাড়ে তিন সের অক্সিজেন বেরোয় ন সের পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে এবং একজনের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তা যথেষ্ট। বাতাসের কার্বনিক অ্যাসিডকে সব সময়ে শুষে নেয় পটাশিয়াম ক্লোরেট, তাই যথেষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম ক্লোরেট আর কষ্টিক নেওয়া হল সঙ্গে।

কিন্তু ম্যাসটন বললেন, "গোলার ভেতরে বাতাসের অভাব ঘটবে না, একথা বিজ্ঞান বললেও আমাদের উচিত তা হাতেনাতে পরখ করে নেওয়া। তাই নয় কি?"

প্রত্যেকেই রাজী হলেন এ প্রস্তাবে।

তখন সাতদিনের উপযুক্ত আহার্য, পানীয় আর প্রচুর পটাশিয়াম ক্লোরেট আর কষ্টিক পটাশ সঙ্গে দিয়ে ম্যাসটনকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হল ভেতরে। এক হপ্তা পরে ম্যাসটনকে গোলার ভেতরে দিব্বি সুস্থ অবস্থায় দেখে প্রত্যেকেই

বেজায় খুশী। বার্বিকেন কিন্তু দারুণ খুঁতখুঁতে। তাই সন্দেহ মিটানোর জন্যে ওজন করলেন ম্যাসটনকে। তখনই সবাই অবাক হয়ে দেখলে, বেশ খানিকটা ওজনও বেড়ে গেছে ম্যাসটনের।

২২॥ কামানের গোলা

কামান তৈরী তো শেষ হল; এবার জনসাধারণ পাগল হল কামানের গোলা দেখবার জন্যে। তিন-তিনজন ডাকাবুকো দুঃসাহসীকে নিয়ে এই গোলাটিই তো রওনা হবে মহাশূন্যের বুক চিরে চাঁদের দেশে।

গোলার নতুন নক্সা ব্রিডউইল কোম্পানীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দোসরা নভেম্বর তৈরী হল প্রোজেকটাইল অর্থাৎ গোলা। ইষ্টার্ন রেলওয়ে মারফৎ প্রোজেকটাইল এসে পৌঁছোলো ষ্টোন্‌স হিলে।

এখন তিন ফুট জল দিয়ে ভরতে হবে প্রোজেকটাইলের অভ্যন্তর। এই জল ঠেকা দিয়ে রাখতে হবে একটা কাঠের চাকতিকে। চাকতিটা এমনভাবে গোলার গায়ে লেগে থাকবে যে ধাতুর চাদরের ওপর দিয়ে পিছলে ওঠানামা করলেও ফাঁক দিয়ে এক ফোঁটা জলও ভেতরে ঢুকবে না। কাঠের তৈরী গোলাকার এই ভেলার ওপর অভিযাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা হল। পুরো জলটাকে হোরাইজনটাল অর্থাৎ অনুভূমিক পার্টিসন দিয়ে কয়েকটা স্তরে ভাগ করে ফেলা হল। কামান দাগার ধাক্কায় এ জলের ওপর চাপ পড়লেই একটার পর একটা পার্টিসন ভাঙতে থাকবে। তারপরেই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকা জলের স্তরগুলো বেরিয়ে যাবে নলের মধ্যে দিয়ে। একদম নীচের স্তর থেকে শুরু করে ওপরের স্তর পর্যন্ত। সব স্তরের জল নির্গমন-নল দিয়ে প্রোজেকটাইলের মাথার দিকে উঠে যাবে এবং সেখান দিয়ে ছিটকে যাবে বাইরে। সব মিলিয়ে অত্যন্ত জোরালো স্প্রিংয়ের কাজ দেবে জলের স্তরগুলো। কাঠের চাকতিটাও যে হুড়মুড় করে গোলার তলায় গিয়ে আছড়ে পড়বে, সে ভয় নেই। পার্টিসনগুলো একে-একে চুরমার না হলে চাকতির গায়ে ধাক্কা লাগছে না।

এই তো গেল প্রাথমিক চোট সামলানোর আয়োজন। জলটা পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তো প্রচণ্ড সংঘাত অনুভব করতে হবে অভিযাত্রীদের। শক্তিশালী জলের স্প্রিং প্রথম সংঘাত রুখে দেবে ঠিকই। এর পরেও বসানো হল আর এক সেট স্প্রিং। গোলার ওপর দিকটা চামড়ার পুরু প্যাড দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। সেরা স্টীলের সারি সারি স্প্রিং বসানো হল এই নদীর তলায়। তারও নীচে লুকোনো রইল জল বেরিয়ে যাওয়ার পাইপ।

কামান দাগার পর প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে বিপদ যত দিক দিয়ে আসতে পারে, তা আগে থেকে ভেবে নিয়ে হুঁশিয়ার হওয়া গেল। মাইকেল আঁর্দা বললেন—"এর পরেও যদি থেঁতলে যাই তো জানবো আমরাই বাজে ধাতু দিয়ে তৈরি!"

ধাতব বুরুজের ভেতরে ঢোকার প্রবেশপথটা রইল শঙ্কুর ওপর দিকের দেওয়ালে। সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ। অ্যালুমুনিয়াম প্লেট দিয়ে এমনভাবে তা ঢেকে দেওয়া হল যাতে বাতাস বেরিয়ে যেতে না পারে। ভেতর থেকে শক্তিশালী স্ক্রু-প্রেসার দিয়ে এঁটে দেওয়া হল ধাতুর চাদরটা। ফলে, চাঁদে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই প্লেট খুলে বেরিয়ে যেতে পারবেন অভিযাত্রীরা।

বাইরের আলো যাতে ভেতরে আসতে পারে এবং ভেতরে বসে যাতে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়, সে ব্যবস্থাও হল। চারটে গোলাকার জানলা বসানো হল জাহাজী পোর্টহোলের কায়দায়। জানলার কাঁচগুলো বেজায় পুরু।—মাঝে ইয়া মোটা—কিনারায় পাতলা। আতস কাঁচের লেন্স যেমন হয়, অবিকল তাই। বৃত্তাকার দেওয়ালে বসানো হল দুটো জানলা: তৃতীয়টা রইল পায়ের তলায়, চতুর্থটা মাথার ওপর। বাইরে থেকে খাঁজের মধ্যে ধাতুর চাদর বসিয়ে আড়াল করা হল কাঁচগুলো—যাতে কামান দাগার ধাক্কায় গুঁড়িয়ে না যায়। ভেতর থেকে স্ক্রু এঁটে প্লেটগুলো লাগানো রইল কাঁচের ঢাকনির মত। দরকারমত স্ক্রুগুলো ভেতর থেকে খুলে দিলেই ঢাকনিগুলো পড়ে যাবে বাইরে, উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে দেখা যাবে মহাকাশের দৃশ্য।

রইল শক্তভাবে আঁটা চৌবাচ্চাভর্তি জল আর ভাঁড়ারভর্তি খাবারদাবার। আগুন আর আলোর জন্যে রইল গ্যাস, বিশেষ ধরনের আঁধারে দারুণ চাপের মধ্যে ঘনীভূত আকারে রইল এই দাহ্য গ্যাস। কল খুললেই হল, একটানা ছ'ঘণ্টা আলো জ্বলবে এবং উনুনের আগুন দিয়ে মহাকাশযানের অভ্যন্তর উষ্ণ রাখা যাবে।

বাকী রইল শুধু বাতাসের সমস্যা; বার্বিকেন, তাঁর দুই সঙ্গী এবং দুটি কুকুরের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে চাই পর্যাপ্ত বাতাস। বাতাস ফুরিয়ে গেলে নতুন বাতাস বানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও থাকা চাই।

বাতাস কী? একুশ ভাগ অক্সিজেন আর উনআশি ভাগ নাইট্রোজেনের মিশ্রণ। ফুসফুস অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে, নাইট্রোজেনকে ফেলে রাখছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে কিন্তু বেরিয়ে আসছে কার্বন-ডায়-অক্সাইড।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? না, এয়ার-টাইট চেম্বারে অর্থাৎ যে-প্রকোষ্ঠে বাতাসের আনাগোনা নেই, সেখানে কিছুক্ষণ বাদে অক্সিজেন আর থাকছে না—থাকছে শুধু কার্বন-ডায়-অক্সাইড, যা কিনা জীবনের যম।

সুতরাং দুটো জিনিস আগে দরকার। প্রথম, যে পরিমাণ অক্সিজেন ফুসফুসে চলে যাচ্ছে, সেই পরিমাণ অক্সিজেন বানিয়ে নেওয়া; দ্বিতীয়, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা কার্বন ডায়অক্সাইডকে নষ্ট করে ফেলা। দুটোই খুব সোজা ব্যাপার। পটাসিয়াম ক্লোরেট আর কস্টিক পটাশ রাখলেই হল।

পটাসিয়াম ক্লোরেট সাদা রঙের ক্রস্ট্যাল। ৪০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় জিনিসটা ভেঙে গিয়ে ক্লোরাইড অফ পটাসিয়াম হয়ে যায় এবং অন্তর্নিহিত পুরো অক্সিজেন বেরিয়ে আসে। আটাশ পাউণ্ড ক্লোরেট থেকে এইভাবে পাওয়া যায় সাত পাউণ্ড অক্সিজেন, অথবা ২৫০০ লিটার—চব্বিশ ঘণ্টায় এই পরিমাণ অক্সিজেনই দরকার অভিযাত্রীদের।

কস্টিক পটাশের বড় লোভ কার্বনডায়অক্সাইডের ওপর। গেলেই টেনে নেয় নিজের মধ্যে—নিচে তখন রয়ে যায় পটাসিয়াম বাইকারবোনেট। দূষিতবায়ুকে শোধন করার জন্যে এই দুটি কেমিক্যালই যথেষ্ট।

এতো গেল সব তত্ত্বকথা। মানুষের ওপর কাজ হচ্ছে কতখানি, তা না জানা পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বর কোনো দামই থাকছে না। জে, টি, ম্যাসটন বুক বাজিয়ে এগিয়ে এলেন হাতেনাতে পরখ করার জন্যে।

বললেন—আমাকে সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং প্রোজেকটাইলের মধ্যে সাতদিন থাকতে দেওয়া হোক আমাকে।

তাকে নিরস্ত করা বৃথা চেষ্টা বুঝে সবাই রাজী হলেন। আটদিনের খাবার দাবার এবং প্রচুর পটাসিয়াম ক্লোরেট আর কস্টিক পটাশ ভেতরে রাখা হল। ১২ ই নভেম্বর ভোর ছটায় সবার সঙ্গে করমর্দন করে সুরুৎ করে গোলার মধ্যে নেমে গেলেন ম্যাসটন। যাবার আগে অবশ্য পই পই করে বলে গেলেন, বিশে-নভেম্বর সন্ধ্যে ছটার আগে যেন কয়েদখানার দরজা খোলা না হয়। বায়ুনিরোধক প্লেট এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হল প্রবেশপথ।

পুরো হপ্তাটা গোলার মধ্যে বসে কি করলেন ম্যাসটন? কিছুই জানা গেল না বাইরে থেকে। গোলার গা যা পুরু, ভেতর থেকে টুঁ শব্দটিও ভেসে এল না বাইরে। বিশে নভেম্বর সন্ধে ছটা বাজতেই খুলে ফেলা হল প্লেট।

সুদারুন উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন ম্যাসটনের সুহৃদবর্গ। কিন্তু নিমেষ মধ্যে তাঁদের বুক হাল্কা হয়ে গেল গোলার ভেতর থেকে ফুর্তি উজ্জ্বল কণ্ঠে দিলখোলা 'হুররে' ধ্বনি শুনে।

শঙ্কুর শীর্ষে অচিরে আবির্ভূত হলেন গান-ক্লাবের সেক্রেটারী। বিজয় গর্বে বুক তাঁর দশ হাত হয়ে গিয়েছে।

আশ্চর্য কাণ্ড! সাতদিনেই দিব্বি নধর হয়ে গিয়েছেন ম্যাসটন!

২৩॥ রকি পাহাড়ের টেলিস্কোপ

চাঁদকে ভাগ করে গোলাটা ছোঁড়বার পর পৃথিবী থেকে যাতে গোলাটাকে দেখতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই রকম আয়োজন করছিলেন বিজ্ঞানীরা। সে যুগের দূরবীন দিয়ে চাঁদকে যতখানি বড় দেখা যেত, চাঁদ যদি ৩৯ মাইল দূরে থাকত, খালি চোখে ততখানি বড় দেখাত। কিন্তু চাঁদের তুলনায় কামানের গোলাটা ত বেজায় ছোট। ব্যাস মাত্র ন ফুট। আর মহাকাশে ধাবমান বিন্দুর মত এই পুঁচকে গোলাটাকে, দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখতে হলে তাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা দরকার। এই নিয়েই উঠে পড়ে লেগেছিলেন বিজ্ঞানীরা। দূরবীনের সাহায্যে তখন যে কোন জিনিসকে ছ'হাজার গুণ বিবর্ধিত করে দেখা যেত। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন এই বিবর্ধন ক্ষমতাকে অন্তত আরও আট গুণ বাড়িয়ে তোলার। যাতে ৪৮,০০০ গুণ বিবর্ধিত আকারে দেখা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠের বস্তুকে। কেমব্রিজের সুবিখ্যাত অবজারভেটরীতে যে টেলিস্কোপটা তৈরী করলেন বিজ্ঞানীরা, তার নলটাই হল দুশ আশি ফুট লম্বা। বহুদূরের জিনিস দেখার জন্যে যে কাঁচ বসান হল নলচের মধ্যে, তারই ব্যাস হল ষোল ফুট।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে তবে চাঁদের আলোকে পৃথিবীতে পৌছতে হয়। এই সুদীর্ঘ স্তর পেরিয়ে আসতে আসতেই চাঁদের আলোর জলজলে দীপ্তি অনেকখানি কমে যায়। কিন্তু টেলিস্কোপকে যদি একটা উঁচু যায়গায় রাখা যায়, তাহলে ততখানি উচ্চতার বায়ুস্তরকে পেরিয়ে আসতে হবে না চাঁদের আলোকে। তাই ঠিক হল, কেমব্রিজের নতুন তৈরী অতিকায় টেলিস্কোপটাকে একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় বসাতে হবে। অনেক বাগ-বিতণ্ডার পর আমেরিকার রকি মাউন্টেনের চূড়োর ওপর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা বসানর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার সাতশ ফুট উঁচু এই রকি মাউন্টেনের চূড়োটি।

রকি মাউন্টেনে ওঠার পথটা কিন্তু মোটেই সুগম ছিল না। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, ঘন জঙ্গল আর দারুণ চড়াই উৎরাই থাকার ফলে চুড়োয় ওঠার পথটি রীতিমত দুর্গম হয়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও ছিল জংলীদের উৎপাত। এত বাধা সত্ত্বেও যে অঞ্চলে কোনদিন মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ত না, সেখানেই দুঃসাহসী ইঞ্জিনিয়াররা গেছলেন টেলিস্কোপটাকে বসাতে। এক বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর বসান হল বিরাটকায় টেলিস্কোপটাকে।

৩০,০০০ হাজার পাউণ্ড ওজনের কাঁচটাকে তুলতে হল অতি সাবধানে। দুরবীন বসাতে মোট খরচ হল চার লক্ষ ডলার। চাঁদে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই চন্দ্রপৃষ্ঠ এবং নক্ষত্রমণ্ডলী দেখার হিড়িক পড়ে গেল সেই টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে!

২৪॥ শেষের প্রস্তুতি

২২শে নভেম্বর। আর মাত্র দশদিন পরেই রওনা হবেন অভিযাত্রীরা। এখনো সবচাইতে কঠিন কাজটাই বাকি। ক্যাপ্টেন নিকল তাঁর তৃতীয় বাজি ধরেছেন এই বিপজ্জনক ব্যাপারে।

চারলক্ষ পাউণ্ড গান-কটন দিয়ে কোলাম্বিয়াডের নলচে ভরতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে অপরিসীম ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করা দরকার। নিকল বলছেন, বিপুল পরিমাণ পাইরোক্সিল দিয়ে কামান ঠাসতে গেলেই প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটবে। যদিও বা কামান ঠাসা সম্ভব হয়, বিপুল ওজনের পেল্লায় প্রোজেকটাইলটা যেই চেপে বসবে বারুদের ওপর, তৎক্ষণাৎ লক্ষ বজ্রগর্জন শোনা যাবে—মেদিনী কেঁপে উঠবে!

অসতর্ক আমেরিকানদের বেয়াকুবিতে এরকম একটা বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয় জেনেই গোড়া থেকেই হুঁশিয়ার হয়েছিলেন বার্বিকেন। স্টোনস হিলে বারুদ আনবার সময় যাতে বিপদ না ঘটে, তাই অল্প অল্প করে প্যাক করে এনেছিলেন পাইরোক্সিল। ট্যাম্পা শহর থেকে ক্যাম্পে প্যাকিংকেসগুলো এল রেলপথে। সেখান থেকে খালি পায়ে মাথায় বয়ে নিয়ে এল কুলিরা। কপিকল দিয়ে বাক্সগুলো আস্তে আস্তে নামিয়ে দেওয়া হল কামানের মধ্যে। আশপাশের স্টীম-ইঞ্জিনগুলো বন্ধ রইল এবং কামানের দু'মাইলের মধ্যে কোনোরকম আগুন জ্বলতে দেওয়া হল না।

নভেম্বর মাসেও দিনের বেলায় কাজ করতে ভয় পেলেন বার্বিকেন। পাছে রোদ্দুরের আঁচে গান কটন জ্বলে যায়, তাই কুলিরা কাজ করল সারারাত ধরে কামানের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে। কামানের অভ্যন্তর আলোয় আলো হয়ে রইল রুমকর্ফ যন্ত্রের দৌলতে। কার্তুজগুলোকে অতি সন্তর্পনে সাজানো হল। সবকটা কার্তুজের মধ্যে দিয়ে তড়িৎশক্তি চালিয়ে দেওয়ার উপযোগী তার টেনে নেওয়া হল। একটিমাত্র বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দিয়ে পলকের মধ্যে চারলক্ষ পাউণ্ড বারুদ জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল।

২৮শে নভেম্বর ৮০০ কার্তুজ দিয়ে কামান ঠাসা শেষ হল। নিঃসীম

উৎকণ্ঠায় কেটেছে এই কটা দিন। প্রতিমুহূর্তে প্রলয়ংকর নিনাদের সম্ভাবনায় কাঠ হয়ে থেকেছেন বার্বিকেন। স্টোনস্ হিলে জনতার প্রবেশ নিষেধ করেও কোনো লাভ হয় নি। প্রতিদিন কাতারে কাতারে লোক রগড় দেখতে এসেছে। গান-কটনভর্তি কার্তুজগুলোর আশে-পাশে ঘুর ঘুর করেছে মুখে সিগারেট লাগিয়ে।

ম্যাসটন লোক দেখলেই তাড়া করতেন। মাটি থেকে পোড়া সিগারেট কুড়িয়ে দূরে ফেলে আসতেন। ঘেরা জায়গার চারদিকে তিনলক্ষ ইয়াঙ্কি যদি ক্রমাগত ধূমপান করে যেতে থাকে, একা ম্যাসটন কাঁহাতক আর ঠেকাবেন? মাইকেল আর্দা এগিয়ে এলেন অবশ্য বারুদ আনার সময়ে কুলিদের কাজ তদারক করতে, মুখ থেকে কিন্তু জলন্ত চুরুটটি নামালেন না। ভয়ডর তাঁর একেবারেই নেই। বেপরোয়া সেই ফরাসিকে বাগে আনা সম্ভব নয় দেখে ম্যাসটন তাঁর পেছনে একজন রক্ষী মোতায়েন করলেন।

যাই হোক, তৃতীয় বাজিও হেরে গেলেন নিকল। এখন বাকী শুধু প্রোজেকটাইলকে বারুদের ওপর বসিয়ে দেওয়া! কিন্তু তার আগে পথ চলতে গেলে যেসব জিনিস দরকার, সেগুলি সন্তর্পণে সাজাতে হবে প্রোজেকটাইলের মধ্যে। মাইকেল আর্দা অনেক কিছুই সঙ্গে নিতে চান। কিন্তু বার্বিকেনের কড়া নির্দেশ—অনাবশ্যক দ্রব্য একটিও তোলা হবে না গোলার মধ্যে। বেশ কিছু থার্মো-মিটার, ব্যারোমিটার, টেলিস্কোপ প্যাক করা হল যন্ত্রপাতির বাক্সের ভেতর।

চাঁদকে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে নেওয়া হল বোর-মোলারের অত্যুৎকৃষ্ট মানচিত্র—ম্যাপা সেলেনোগ্রাফিকা। এ-ম্যাপে চাঁদের দৃশ্যমান পৃষ্ঠের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বিবরণও আঁকা আছে বিশদভাবে। আছে পাহাড়, উপত্যকা, জ্বালামুখ, খাদের ছবি—নামধাম সমেত।

নেওয়া হল তিনটে রাইফেল, প্রচুর বুলেট, ছররা এবং বারুদ। সেই সঙ্গে রইল কুড়ুল, গাঁইতি, করাত এবং আরও অনেক দরকারী যন্ত্র।

দারুণ-ঠাণ্ডা আর প্রচণ্ড গরম—দুরকম তাপমাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদও বাদ গেল না!

আর্দার ইচ্ছের কি আর শেষ আছে! এরপর তাঁর ইচ্ছে হল একগাদা চতুষ্পদ প্রাণী সঙ্গে নেওয়ার! সাপ, বাঘ, কুমীর নিয়ে গিয়ে চাঁদের দেশে ছেড়ে দেওয়াটা বিপজ্জনক, সেটা বুঝলেন। বার্বিকেনকে সেই সঙ্গে বোঝালেন—ষাঁড়, গরু, গাধা, ঘোড়া—এরা সঙ্গে গেলে ঝামেলাও কম, পরে কাজে লাগবে।

প্রেসিডেন্ট শুধু বললেন—"আর্দা, প্রোজেকটাইলটা নোয়ার নৌকা নয়। সেরকম বড়ও নয়, উদ্দেশ্যও ভিন্ন।"

অনেক আলোচনার পর শেষমেষ দুটো কুকুর সঙ্গে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। একটা কুকুর নিকলের। অপরটা একটা নিউফাউন্ড্ল্যাণ্ড। কয়েক থলি পৃথিবীর মাটিও গোলার মধ্যে তোলার ইচ্ছে ছিল মাইকেল আর্দাঁর—উদ্দেশ্য চাঁদের বুকে পৃথিবীর মাটি ছড়িয়ে তাতে চাষবাস করা। কিছু গাছ-গাছড়া অবশ্য তিনি নিলেন ; খড় দিয়ে বেশ করে মুড়ে গোলার মধ্যে তুললেন চন্দ্রপৃষ্ঠে রোপণ করার জন্যে। ফসলের বীজও রইল বিস্তর।

বছরখানেকের মত খাবার-দাবারের ব্যবস্থা আগেও করা হয়েছিল পুঁচকে পুঁচকে মাংসের আর আনাজের বড়ি বানিয়ে। বলা যায় না চন্দ্রপৃষ্ঠ উর্বর, কি অনুর্বর। অনুর্বর যদি হয়, সঙ্গে খাবার না নিলে অনাহারে মরতে হবে যে। ব্র্যাণ্ডি আর জলও রইল দুমাসের মত। আর্দাঁর অবশ্য খাবার নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তাঁর মতে, চাঁদের পিঠে পা দেওয়ার পর একটা কিছু হিল্লে হয়ে যাবে'খন। বিলকুল ন্যাড়া কখনো হতে পারে অমন সুন্দর চাঁদ মামা ? কখনই নয়। আহার্য ঠিকই মিলবে। বন্ধুদের ডেকে একদিন আরো একটা কথা বললেন। "পৃথিবীর বন্ধুরা নিশ্চয় আমাদের ভুলে যাবে না। চাঁদের পিঠে ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিতও থাকতে পারবে না।"

"তা তো পারবই না!" বললেন ম্যাসটন।

"কথাটার মানেটা কী ?" শুধোলেন নিকল।

আর্দাঁ বললেন—কোলাম্বিয়াড কামান যখন থাকছে, তখন মাঝে মাঝে খাবার দাবার ভর্তি একটা গোলা কামান দেগে চাঁদে পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল!

"হুররে! হুররে!" ম্যাসটনের সে—কী চীৎকার ; "বুদ্ধি বটে আপনার! খাসা আইডিয়া!"

"গোলার মারফৎ পৃথিবীর খবর নিয়মিত পাবো আপনার কাছ থেকে। আর, চাঁদে পৌছোনোর পর যদি সেখান থেকে এখানে খবর পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা করতে না পারি, তাহলে একেবারেই মাথা মোটা বলতে হবে আমাদের!"

শুনে তো আনন্দে নেচে উঠলেন গান-ক্লাবের সদস্যরা। চমৎকার বুদ্ধি তো! চাঁদের পিঠে পৌছোনোর পরেও যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখা যায়, তাহলে অনেক সমস্যারই সুরাহা হয়ে গেল।

তা তো হলো! কিন্তু গুরুভার গোলাটাকে এখন গান-কটন ঠাসা কামানের মধ্যে বসানো যায় কি করে। কাজটা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি অসুবিধাজনক। সুবিশাল কামানের 'শেল' স্টোনস হিলের চূড়ায় তোলা হল অতি সাবধানে।

আগে থেকেই ফরমাশ দিয়ে একটা কপিকল আনানো হয়েছিল। কামানের নলচের ঠিক মুখের কাছে গোলা ঝুলতে লাগল কপিকলের শেকলে। নিদারুণ উদ্বেগে ছটফট করতে লাগল গান-ক্লাবের প্রতিটি সদস্য! শেকলটা একবার ছিঁড়ে গেলেই, সর্বনাশ! চক্ষের পলকে কার্তুজের রাশির ওপর আছড়ে পড়বে গোলাটা, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে কার্তুজগুলো···তারপর···!

খুব সাবধানে একটু একটু করে কপিকলটার চাকা ঘুরিয়ে কামানের মধ্যে নামানো হতে লাগল গোলাটাকে। আস্তে আস্তে গোলাটা চোখের আড়ালে চলে যেতেই সবার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। দমবন্ধ করে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল কি হয় তা দেখার জন্যে। কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই ঘটলো না। ঠিক জায়গায় নির্বিঘ্নে গেল গোলাটা। দিব্বি দাঁড়িয়ে রইল পাইরোক্সিলের গদীর ওপর।

টাকা নিয়ে বার্বিকেনের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নিকল। গোলা বসানোর কাজ শেষ হতেই বার্বিকেনের করমর্দন করে অভিনন্দন জানালেন তিনি। বললেন—"তিন নম্বর বাজিও হেরে গেলাম। এই নিন তিন হাজার ডলার।"

বার্বিকেন বললেন—"একি করছেন! আপনি তো এখন আমাদের একজন। বাজির টাকা আর ত নেওয়া চলে না আপনার কাছ থেকে।"

"কেন চলে না? বাজি যখন ধরা হয়েছে, তখন তা বাজিই। এর মধ্যে আর কোন কথাই উঠতে পারে না। কথা যখন দিয়েছি, তখন তা রাখবই। ধরুন টাকাটা।"

মাইকেল আর্দা বলে উঠলেন—"ক্যাপ্টেন, আমার একটা মস্ত সাধ আছে! বলব?"

"স্বচ্ছন্দে," বললেন নিকল।

"বাকি দুটো বাজিও আপনি হারুন! তবেই নির্বিঘ্নে বেরিয়ে পড়া যাবে চাঁদের দিকে!"

২৫॥ দাগো কামান

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি—পয়লা ডিসেম্বর!

ঐদিনই রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডে প্রোজেকটাইলকে মহাকাশে নিক্ষেপ করতে হবে। নইলে অপেক্ষা করতে হবে আরও আঠারোটি বছর।

আবহাওয়া অতীব চমৎকার। শীত আসছে, সূর্যের তেজ কিন্তু কমেনি।

রোদ্দুর ঝকঝকে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে নতুন দুনিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দিতে চলেছে তিনজন পৃথিবীবাসী।

আগের দিন রাত্রে কত লোক যে ঘুমোতে পারেনি, তার হিসেব নেই! একমাত্র মাইকেল আর্দার হৃৎপিণ্ডই স্থির রইল—আর সবার হৃৎপিণ্ড উত্তাল হ'ল নিদারুণ উৎকণ্ঠায়।

ভোর হল। কাতারে কাতারে দর্শক ভীড় করল স্টোন্‌স হিলের আশে-পাশের প্রান্তরে। যতদূর দু'চোখ যায়, কেবল মাথা আর মাথা। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর এল ট্রেন বোঝাই লোক। 'ট্যাম্পা টাউন অবজারভার' খবর ছাপল, পঞ্চাশ লক্ষ দর্শক জড়ো হয়েছে ফ্লোরিডার মাটিতে কামান ছোঁড়া দেখতে।

একমাস আগে থেকেই দলে দলে লোক ছাউনী পেতেছিল ঘেরা অঞ্চলের বাইরে। এইভাবেই পত্তন হয়েছিল আর্দা টাউন-এর। প্রান্তর জুড়ে কেবল কটেজ, কুঁড়ে আর তাঁবু। পৃথিবীতে যে কটা জাতি আছে, তাদের কেউ না কেউ ঠাঁই নিয়েছিল ভাবীকালের আর্দা টাউনে। ছত্রিশ জাতের রকমারি ভাষায় কানপাতা দায় হয়ে উঠেছিল।

পয়লা ডিসেম্বর সকাল থেকেই আর্দা টাউনের বাসিন্দারা খেতে পর্যন্ত ভুলে গেল। বিকেল চারটের সময়ে দেখা গেল দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত বাদ দিয়ে দর্শকরা হা-পিত্যেশ করে বসে আছে!

রাত নামল। বিপুল বিপর্যয়ের ঠিক আগেই যেমন শব্দহীন উৎকণ্ঠায় থমথম করতে থাকে চারিদিক, উদ্বিগ্ন জনসমুদ্রের অবস্থাও দাঁড়াল সেইরকম।

সন্ধ্যে সাতটায় নৈঃশব্দ খানখান হয়ে গেল চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। দিগন্ত থেকে যেন লাফ দিয়ে উঠে এল চাঁদ। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'হুররে' হর্ষধ্বনি। তুমুল অভিনন্দনের ঠেলায় যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল চাঁদ—ঝ্যাড়মেড়ে কিরণ ধারায় ধুইয়ে দিল নির্মল আকাশ।

ঠিক সেই সময়ে কামানের কাছে এসে দাঁড়ালেন আর্দা, নিকল আর বার্বিকেন। দূর দেশে ট্রেনযাত্রা করার সময়ে মানুষের চোখেমুখে যেটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, এঁদের ক্ষেত্রে তার বাষ্পটুকুও দেখা গেল না। গোলার ভেতরে ঢোকার জন্যে তৈরী হলেন ওঁরা।

চন্দ্র-যাত্রীদের দেখেই অবশ্য পঞ্চাশ লক্ষ আমেরিকান কোরাস গেয়ে উঠেছিল একসাথে। মার্কিন জাতীয় স্তোত্রগাথা "ইয়াঙ্কি ডুড্‌ল্" পঞ্চাশ লক্ষ কণ্ঠে একই সঙ্গে ধ্বনিত হওয়ায় ত্রিভুবন যেন ফেটে-ফুটে উড়ে যাওয়ার উপক্রম হল চকিতের জন্যে। তারপরেই সব চুপ। যেন দম বন্ধ করে তিন ডাকা-বুকো

অভিযাত্রীর পানে চেয়ে রইল পঞ্চাশ লক্ষ আমেরিকান। দামীদামী পোশাক পরে, মূল্যবান জড়োয়া গয়না কানে-আঙুলে-গলায় ঝুলিয়ে, হরেকরকম রঙের বস্ত্র শোভিত হয়ে আদিবাসী থেকে আরম্ভ করে সুসভ্য মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল নিকল, বার্বিকেন, আর্দাঁর পানে।

জনসমাবেশের মাঝে ঘেরাও করা অঞ্চলে পা দিলেন তিনজনে। পেছন পেছন এলেন গান-ক্লাবের সদস্যরা আর ইউরোপের সবকটা মানমন্দিরের প্রতিনিধি। ধীর স্থির প্রশান্ত চিত্তে হুকুমের পর হুকুমজারী করে চললেন বার্বিকেন। নিকল দু'হাত পেছনে রেখে দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটে মেপে মেপে পা ফেলে পায়চারী করছিলেন প্রতিনিধিদের মাঝে। মাইকেল আর্দাঁ এমন সাজগোজ করছিলেন যেন বিদেশ বেড়াতে যাচ্ছেন। হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার বুট, ভেলভেট সুট, মুখে চুরুট। হাসছেন, ঠাট্টা-তামাসা করছেন, প্রাণ প্রাচুর্যে টলমল করছেন। একে ফরাসী, তায় প্যারিসবাসী—সুতরাং মাইকেল আর্দাঁর আর দোষ কী?

বিদায়মুহূর্তে মাইকেল আর্দাঁর মত সদা-প্রফুল্ল মানুষও অভিভূত হলেন। উচ্ছল-প্রকৃতি ম্যাসটনের চোখেও জল এসে গেল। দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল প্রেসিডেন্টের ললাটে।

বললেন—আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে—"বলুন, এখনো সময় আছে, কোনমতেই কি যেতে পারি না আমি?"

"অসম্ভব!" বললেন প্রেসিডেন্ট।

ঠিক দশটার সময়ে মেসিনের সাহায্যে গোলার মধ্যে ঢুকে পড়লেন নিকল, আর্দাঁ আর বার্বিকেন। লক্ষ লক্ষ লোকের চেঁচামেচিতে চোঙার ভেতরে প্রচণ্ড গুম্ গুম্ শব্দ জাগছিল। কিন্তু গোলার মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল নিশ্ছিদ্র নীরবতা।

ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন তখন লংক মাউণ্টেনের চূড়োয় দাঁড়িয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলেন ক্রনোমিটার-ঘড়ির কাঁটার দিকে। একই ঘড়ি রয়েছে গোলার মধ্যে বার্বিকেনের হাতে— তিনিও সময় গুনছেন চরম মুহূর্তের। সেই চরম মুহূর্তটি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল বৃদ্ধি পেতে লাগল জনতার উৎকণ্ঠা, আর কমে আসতে লাগল সোরগোল, ভয়াবহ উদ্বেগে টুঁ শব্দটি করতেও তারা যেন ভুলে গেল। নিস্পন্দ স্থির নীরব হয়ে প্রত্যেকেই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল……

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে মার্চিসন দেখলেন দশটা বেজে ছেচল্লিশ মিনিট। আর মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড বাকী। ভয়ে উদ্বেগে মার্চিসনের বুকটা

একবার দুলে উঠল—টিক টিক করে যাচ্ছে সেকেণ্ডের কাঁটা। নিদারুণ উত্তেজনায় অস্ফুটধ্বনি জাগল সমবেত জনতার কণ্ঠে। পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ! মার্চিসনের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠে যেন গলায় ঠেকল। উনচল্লিশ, চল্লিশ! রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড!!

ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারীর সুইচ টিপে দিলেন মার্চিসন!

কোনমতেই সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় সেই মহাপ্রলয়ের। সে কি কাণ্ড! লক্ষ লক্ষ বজ্র যদি অকস্মাৎ আছড়ে পড়ত ধরিত্রীর বুকে, তা'হলে যে অকল্পনীয় গর্জন হত—কামানের এই অবর্ণনীয় নির্ঘোষের সঙ্গে তারও তুলনা হয় না। আচম্বিতে ঘুমিয়ে পড়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে উড়ে গেলেও এরকম আওয়াজ হয় না। কামানের নলচে থেকে লকলক করে উঠল আগুন এবং সে আগুন নিমেষ মধ্যে যেন স্পর্শ করল নীল আকাশকে। সেই অভাবনীয় আগুনের আভায় চকিতের মধ্যে আলোয় আলো হয়ে গেল সারা ফ্লোরিডা—যেন আকাশের বুকে নব-সূর্যের উদয় হল রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডে।

দুলে উঠল ধরিত্রী এবং মুহূর্তের জন্যে কয়েকজন দর্শক অতি কষ্টে দেখল অগ্নিময় ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে বাতাস চিরে উঠে যাচ্ছে অতিকায় প্রোজেকটাইল।

২৬॥ মেঘে ঢাকা আকাশ

আগুনের পাহাড় ছিটকে গেল দূর গগনে। আগুনের আভা ছড়িয়ে গেল সারা ফ্লোরিডায়। এক লহমার জন্যে মনে হল দিনের আলো দেখা গিয়েছে বুঝি। সমুদ্রবক্ষে ১০০ মাইল দূর থেকেও দেখা গেল আগুনের অতিকায় চন্দ্রাতপ। বেশ কিছু জাহাজের ক্যাপ্টেন ভড়কে গিয়ে 'লগ-বুকে' লিখে রাখলেন—দানবিক উল্কা দেখা দিয়েছে আকাশে!

'কোলাম্বিয়াড' অগ্নিবর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প দেখা দিল। ফ্লোরিডার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। গান-কটনের গ্যাস নিদারুণ উত্তাপে প্রসারিত হয়ে বায়ুমণ্ডলকে ঠেলে সরিয়ে দিল নিমেষ মধ্যে; ফলে বাতাসের মধ্যে দিয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছুটে এল কৃত্রিম ঝটিকা।

কামানের আকাশফাটা গর্জনে কেঁপে উঠেছিল গোটা দেশটা। সেই প্রচণ্ড কাঁপুনির বেগে ভীড়ের মধ্যে কত লোক ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে। পলায়মান জনতার পায়ের চাপেই মারা গেল বিস্তর লোক। আতংক-চীৎকারে,

করুণ কান্নায় আর আর্তনিনাদে দেখতে দেখতে স্টোনসহিল রূপান্তরিত হয়ে গেল এক মহাশ্মশানে।

সংক্ষেপে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটি দুলে ওঠার ফলে পঞ্চাশ লক্ষ দর্শকই আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। অমন যে বিচক্ষণ ম্যাসটন, যিনি এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে আন্দাজ করেই বেশ খানিকটা দূরে দর্শকদের পুরোধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত কামানের গোলার মত দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়লেন ১২০ ফুট দূরে। তিন লক্ষ লোক কালা হয়ে গেল বেশ কিছুদিনের জন্যে এবং বুদ্ধিশুদ্ধি পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে রইল অনেকদিন পর্যন্ত।

ধাক্কার প্রথম চোটটা সামলে নিয়েই কালা, খোঁড়া এবং সুস্থ সকলেই গর্জে উঠল ভীম কণ্ঠে—"আর্দা জিন্দাবাদ! বার্বিকেন জিন্দাবাদ! নিকল জিন্দাবাদ!"

বিপুল হর্ষধ্বনি বুঝি পৃথিবীর গণ্ডীও পেরিয়ে গেছল সেদিন। হাজার-হাজার লোক চোখে দূরবীন এঁটে বসে রইল প্রোজেকটাইল দেখার প্রত্যাশায়। কিন্তু বৃথা প্রত্যাশা! প্রোজেকটাইলের চিহ্ন দেখা গেল না আকাশে! অগত্যা টেলিগ্রামের পথ চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় রইল না। কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের ডিরেক্টর নিজে বসেছিলেন লঙস পীক-য়ে সুবিশাল টেলিস্কোপের সামনে। সুদক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি। তাঁর টেলিগ্রাম এলেই উদ্বেগের অবসান ঘটবে দেশশুদ্ধ লোকের।

কিন্তু জনগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হ'ল অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে।

সারাদিন ঝলমল করছিল আকাশ। আচমকা মুখ পুড়ল আকাশের। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল দিক হতে দিগন্ত। আচম্বিতে বায়ুমণ্ডল লণ্ডভণ্ড হলে এমন হওয়াই স্বাভাবিক। তার ওপরে লক্ষ-লক্ষ পাউণ্ড পাইরোক্সিল-বারুদ পোড়া গ্যাস ঠেলে উঠেছে আকাশে।

ফলে সারাদিন ধরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ স্থির হয়ে ভাসতে লাগল আকাশ জুড়ে। রকি পাহাড়ও বাদ গেল না মেঘের আওতা থেকে। অস্থির হল জনগণ। কিন্তু উপায় কী? মেঘ তো নিজেদেরই তৈরী! ফল ভুগতে হবে বইকি!

চৌঠা ডিসেম্বর মাঝরাতে চাঁদে পৌঁছোবে প্রোজেকটাইল। তদ্দিন ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে বসে ছাড়া আর উপায় নেই। দুরন্ত বেগে ধাবমান পুঁচকে গোলাকে দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়ার আশা করা যায় না।

হায়রে কপাল! ডিসেম্বরের চার থেকে ছ তারিখ পর্যন্ত একই রকমভাবে মুখ পুড়ে রইল আকাশের। আমেরিকার সর্বত্র একই ধরনের খারাপ আবহাওয়া বিরাজ করায় ইউরোপের মানমন্দিরগুলো ঝকমকে চাঁদনী রাতে টেলিস্কোপে

চোখ লাগিয়ে বসে রইল বটে, কিন্তু কমজোরি দূরবীন দিয়ে উড়ন্ত গোলাকে দেখা গেল না।

সাত তারিখে আকাশ একটু পরিষ্কার হল। কিন্তু রাত হতেই আবার ভীড় করে এল মেঘের দল।

গতিক সুবিধের নয় দেখে চিন্তায় পড়ল সবাই। ন তারিখে সূর্য টিমটিমে পিদিমের মত উঁকি মারল মেঘের ফাঁকে। রেগেমেগে আমেরিকানরা সিটি দিয়ে এমন টিটকিরি দিল যে সূর্য বেচারী যেন ক্ষুন্ন হয়ে ফের মুখ লুকিয়ে রইল সারাটা দিন।

দশ তারিখেও কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না! উন্মাদের মত আচরণ শুরু করলেন ম্যাসটন। তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিল শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে। ম্যাসটনের করোটি গাটা-পার্চা দিয়ে তৈরী হলে কি হবে, মগজটা অত্যন্ত সুস্থ ছিল এতদিন!

কিন্তু এগারো তারিখে আচমকা দেখা দিল একটা অবর্ণনীয় ঝড়। সারা বায়ুমণ্ডল জুড়ে তাথৈ তাথৈ নাচ জুড়লো পুবের হাওয়া। তাল তাল মেঘকে যেন ঝেঁটিয়ে বিদেয় করল আকাশ থেকে।

ঝকঝকে চাঁদমামা রাজকীয় ভঙ্গীমায় আবির্ভূত হল নক্ষত্রখচিত আকাশে!

২৭॥ নতুন নক্ষত্র

সেই রাতেই সারা দুনিয়ায় টেলিগ্রাম চলে গেল—বজ্রের মত ফেটে পড়ল বহু প্রতীক্ষিত সংবাদটা! লঙস পীক-য়ের অতিকায় দূরবীন দিয়ে দেখা গিয়েছে প্রোজেকটাইলকে!

কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট এসে পৌছালো লঙস পীক থেকে। রিপোর্টটা এই রকম:

লঙস পীক, বারোই ডিসেম্বর

কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের অফিসারদের উদ্দেশে—

আজ রাত আটটা সাতচল্লিশ মিনিটে স্টোনসহিলের 'কোলাম্বিয়াড' থেকে নিক্ষিপ্ত প্রোজেকটাইলকে দেখতে পেয়েছেন মিস্টার বেলফাস্ট এবং মিস্টার ম্যাসটন। গন্তব্যস্থানে পৌছোয়নি প্রোজেকটাইল। চাঁদের পাশে সরে গেছে। তবে চাঁদের আকর্ষণের মধ্যেই রয়েছে।

চাঁদকে ঘিরে ডিমের মত কক্ষপথে ঘুরপাক দিচ্ছে প্রোজেকটাইল—চাঁদের উপগ্রহের মত।

দুটো ঘটনা ঘটতে পারে :

(১) চাঁদের টানে প্রোজেকটাইল চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে। অভিযাত্রীদের অভিযান সফল হবে।

(২) চাঁদকে অনন্তকাল ধরে প্রদক্ষিণ করে যাবে প্রোজেকটাইল।

ভবিষ্যতে কি ঘটবে, তা এখন বলা যাচ্ছে না। আপাততঃ শুধু এইটুকু বলা যায় যে গান-ক্লাব একটি নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি করেছে সৌরজগতে।

জে বেলফাস্ট

সারা পৃথিবী জুড়ে দুর্ভাবনা আরম্ভ হল অভিযাত্রীদের নিয়ে। পৃথিবী থেকে ওঁদের সাহায্য করতে যাওয়া কি সম্ভব? না! কেননা ওঁরা সৃষ্টিকর্তার বিধান লঙ্ঘন করে মনুষ্য সীমার বাইরে পদক্ষেপ করেছেন। ওঁদের সঙ্গে আছে দু'মাসের মত বাতাস আর বারোমাসের মত আহার্য। তারপর?

একজনেই কেবল ভেঙে পড়লেন না।

ইনি ম্যাসটন। প্রোজেকটাইলকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চাইলেন না তিনি। লঙস পীক তাঁর বাড়ী হয়ে গেল। চাঁদ উঠলেই টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অসীম ধৈর্য তাঁর। এক লহমার জন্যেই নজর ছাড়া করতে চাইতেন না তিন বন্ধু সমেত প্রোজেকটাইলকে।

বলতেন—চারুশিল্প, বিজ্ঞান আর যন্ত্রবিদ্যাকে ওঁরা তিনজনে বহন করে নিয়ে গেছেন মহাশূন্যে। অসাধ্য সাধন করা যায় এই তিনটে বিদ্যে জানা থাকলে। ওঁরাও একদিন অসাধ্য সাধন করবেন এবং বিপদ কাটিয়ে উঠবেন।

সম্পাদকীয় পুনশ্চ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয় দশকে প্রথম উঁকি দিল ভের্নের খ্যাতির সূর্য। 'অত্যাশ্চর্য অভিযান' লিখে রাতারাতি তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। দুর্দান্ত কল্পনার অধিকারী লেখক রূপে স্বীকৃত হলেন দেশে। এই সময়ে তাঁর ইচ্ছে হল নতুন ধরনের একটা কাহিনী লেখার। বেলুনে করে আফ্রিকার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বা নেভা আগ্নেয়গিরির মধ্যে ভূগর্ভে প্রবেশ-এর মত প্লট-য়ের বিপরীত ক্লাইমাক্স হলে চলবে না, অথচ অভিনব এবং চমকপ্রদ হওয়া চাই।

তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করলেন এমন এক লেখক যাঁর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন এবং যাঁর লেখার প্রভাব তাঁর নিজের লেখার ওপর পড়েছিল। এডগার অ্যালেন পো'র চাঁদে বেড়ানোর গল্পতে স্রেফ ধাপ্পাবাজি ছাড়া অবশ্য কিছুই ছিল না। টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি দিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করলেও তা অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু কাহিনীটি পড়ে উদ্বুদ্ধ হলেন ভের্ণ। এই কাহিনী প্রসঙ্গেই পো'কে খুব কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন ভের্ণ। লিখেছিলেন মহাকাশ অভিযানের এমন বিবরণ দেওয়া উচিত ছিল, যা বাস্তবে সম্ভব হলেও হতে পারে। ভের্ণ স্থির করলেন এই ধরণের একটি কাহিনী তিনি নিজেই লিখবেন।

নতুন-নতুন প্রচেষ্টায় আমেরিকানদের উদ্যোগী হওয়ার ঝোঁকটা ভের্নের খুব ভাল লেগেছিল। আমেরিকার হরেক-রকম মজাদার সমিতির খবরও তিনি রাখতেন। খানিকটা তামাসা করার জন্যেই তাই তিনি এমন একটা সমিতিকে কল্পনা করলেন যাঁরা চাঁদে গোলা ফেলার উপযোগী কামান তৈরী করবে। পো-য়ের ঢংয়ে সমিতির সদস্যদের চেহারা-চরিত্রের বিকট বর্ণনা দিতে গিয়েও তার মধ্যে ফুর্তি, হাসি এনে ফেললেন। বাল্টিমোর গান-ক্লাবের পঙ্গু যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞরা আর যাই হোন—বিকট-দর্শন নন—বরং বিলক্ষণ মজাদার।

গল্প জমে উঠতেই তামাসা করতে ভুলে গেছেন ভের্ণ। ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাবেশ করেছেন। চন্দ্রাভিযান সম্পর্কিত অংকের হিসেবকে যথাসম্ভব নিখুঁত রাখতে গিয়ে বিস্তর মেহনৎ করেছেন।

গল্পের মধ্যে অভাব ছিল এমন একটা বলিষ্ঠ চরিত্রের যিনি মধ্যে মধ্যে কৌতুক, হাসি, রঙ্গ, পরিহাস দিয়ে গল্পকে দানা বাঁধতে সাহায্য করবেন। এই

চরিত্রটিকে ভের্ণ ধার করলেন বাস্তব থেকে। প্যারিসের ফটোগ্রাফার ফেলিক্স টুর্ণাকন নিজেকে নাদার নাম দিয়েছিলেন এবং একটা অতিকায় বেলুন বানিয়ে বহু অসম্ভব অভিযানের পরিকল্পনা এঁটেছিলেন। সম্ভব হলে বেলুনে চেপে চাঁদে যেতেও তাঁর আপত্তি ছিল না।

মাইকেল আর্দার আবির্ভাব এই কারণেই। নীরস তত্ত্বকথায় যখনি গল্প ভারাক্রান্ত হয়েছে, ইনি তাঁর ফরাসি রঙ্গ দিয়ে পরিবেশ লঘু করে দিয়েছেন।

তত্ত্বকথার প্রয়োজন ছিল বইকি। পো'য়ের লেখায় এই অভাব ছিল বলেই উদ্ভটকে উদ্ভটই মনে হয়েছে। কিন্তু ভের্ণের কাহিনীতে উদ্ভটকে মনে হয়েছে সম্ভবপর।

মহাকাশ অভিযান নিয়ে সিরিয়াস ভাবে লেখা প্রথম গ্রন্থ হল ভের্ণের এই উপাখ্যান। পাঠক-পাঠিকারা কাহিনী পড়ে পাগল করে ছাড়লেন ভের্ণকে পরবর্তী কাহিনী জানবার জন্যে। তাই সাত বছর পরে ভের্ণ লিখলেন 'রাউণ্ড দি মুন'।

পরের পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হচ্ছে সেই কাহিনী। সে-যুগের তুলনায় মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত বিজ্ঞান এ-যুগে যথেষ্ট উন্নত। ভের্ণের কামান-কল্পনা কিন্তু একেবারেই অবাস্তব। কেন না কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রোজেকটাইল গুঁড়িয়ে তো যাবেই, দারুণ তাতে ধোঁয়া হয়েও যাবে। এই খুঁতটি ছাড়া দু'জায়গায় প্রায় নিখুঁত ভবিষ্যদবাণী করেছেন তিনি। পালোমার মাউণ্টেনের অতিকায় টেলিস্কোপের সঙ্গে তাঁর রকিমাউণ্টেনের দূরবীনের বর্ণনা প্রায় মিলে যায়। আয়নার সাইজ তো প্রায় এক বললেই চলে। আর ফ্লোরিডা থেকেই, ট্যাম্পা-শহরের অক্ষাংশে অবস্থিত ঘাঁটি থেকেই চাঁদে মানুষ গেছে এবং যাচ্ছে।

: দ্বিতীয় খণ্ড—রাউণ্ড দি মুন* :

১॥ রাত ১০.২০ থেকে ১০.৪৭ মিনিট

ঘড়িতে দশটা বাজতেই পৃথিবীর বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে বিদায় নিলেন মাইকেল আর্দা, বার্বিকেন এবং নিকল। চন্দ্রপৃষ্ঠে সারমেয় জাতির প্রচার এবং প্রসারের জন্যে নেওয়া কুকুর দুটিকে আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল প্রোজেকটাইলের মধ্যে।

তিনজনে এগিয়ে গেলেন ঢালাই-লোহার প্রকাণ্ড নলের মুখের সামনে। কপিকল ওঁদের নামিয়ে দিল নলচের মধ্যে গোলার প্রবেশপথে। উঠে গেল কপিকল। নলচের মধ্যে থেকে এবার স্পষ্ট দেখা গেল দূর আকাশ।

প্রবেশপথ বন্ধ করলেন নিকল। শক্ত ধাতুর চাদর এঁটে দেওয়া হল শক্তিশালী স্ক্রু দিয়ে। কাঁচের জানলাগুলোও ঢেকে দেওয়া হয়েছে স্ক্রু-আঁটা ধাতুর চাদর দিয়ে। বায়ু যাতায়াতের পথও রইল না কোথাও। ধাতুর কারাগারে বন্দী হয়ে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বসে রইলেন তিন অভিযাত্রী।

মাইকেল আর্দা বলে উঠলেন—"এবার একটু গুছিয়ে বসা যাক। ঘরদোর সাজাতে আমি কিন্তু ওস্তাদ।"

এই বলে জুতোর শুকতলায় ঘষে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালেন বেপরোয়া আর্দা, কয়লার গ্যাস ভর্তি আধারে লাগানো গ্যাসবাতির সামনে দাঁড়ালেন। উচ্চচাপে রাখা এই গ্যাস জ্বালিয়ে একনাগাড়ে একশ চুয়াল্লিশ ঘণ্টা আলো জ্বালানো যাবে এবং প্রোজেকটাইলকে উষ্ণ রাখা যাবে। জ্বলে উঠল গ্যাসবাতি। জোর আলোয় দেখতে ভালই লাগল প্রোজেকটাইলের ভেতরটা। দেওয়ালে পুরু গদীর প্যাড বসানো, বৃত্তাকার একটা ডিভান, গম্বুজাকৃতি ছাদ।

অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বাসনকোসন প্যাডে আটকানো—যাতে যাত্রারম্ভের প্রচণ্ড ধাক্কায় স্থানচ্যুত না হয়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করলেন মাইকেল আর্দা এবং বিলক্ষণ খুশী হলেন।

---

*এই রচনাবলীতে 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন'-এর দ্বিতীয় খণ্ডাকারে সন্নিবেশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে 'রাউণ্ড দি মুন' একটি পৃথক গ্রন্থ। 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' লেখার সাত বছর পরে প্রকাশিত হয়।

বললেন—"এ যে দেখছি বিদেশ ভ্রমণের উপযুক্ত কারাগার!"

নিকল আর বার্বিকেন অবশ্য তখন যাত্রাশুরুর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত।

ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসনের ঘড়ির সঙ্গে মিলোনো নিকলের ক্রনোমিটার ঘড়ি হাতে নিয়ে বললেন বার্বিকেন—"দশটা বেজে এখন কুড়ি মিনিট। 'দশটা সাতচল্লিশে মার্চিসন ইলেকট্রিক স্পার্ক দিয়ে কোলাম্বিয়াডের বারুদ জ্বালিয়ে দেবেন। তার মানে পৃথিবীর মায়া কাটাতে আর মাত্র সাতাশ মিনিট বাকী।"

"ছাব্বিশ মিনিট তেরো সেকেণ্ড," জবাব দিলেন হিসেবী নিকেল।

"বাঃ!" ফূর্তিতে গলা ছেড়ে বললেন আর্দা—"ছাব্বিশ মিনিট কম সময় নয়! অনেক কিছু করা যায়। রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে মানুষের নীতিবোধ পর্যন্ত আলোচনা করা যেতে পারে। ছাব্বিশ বছরে যা করা যায় না, ছাব্বিশ মিনিটে তা সেরে ফেলা যেতে পারে—"

"মিস্টার বচনফকিরের বক্‌বকানি কি শেষ হয়েছে?" শুধোলেন বার্বিকেন।

"আর মাত্র ছাব্বিশ মিনিট বাকী—এই বলেই শেষ করছি বক্‌বকানি," বললেন আর্দা।

"মাত্র চব্বিশ মিনিট," বললেন নিকল।

"হে মহান ক্যাপ্টেন," সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন আর্দা—"চব্বিশ মিনিটে কিন্তু—"

"মাইকেল," বললেন বার্বিকেন, "যাওয়ার পথে যত খুশী কথা বলবেন। আপাততঃ তৈরী হোন।"

"তৈরী কি নই?"

"তাতো বটেই। তবে প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর আয়োজন—"

"ও ঠিক হয়ে যাবে। আর তো চব্বিশ মিনিট—"

"কুড়ি মিনিট," বললেন নিকল।

"ধাক্কা সামলানোর জন্যে মাথাটা নীচের দিকে করে পা ওপর দিকে তুলে রাখলে হয় না?" বললেন আর্দা—"পোজটা অবশ্য সার্কাসের ক্লাউনের মত।"

"না," বললেন বার্বিকেন, "সবচাইতে ভালো হল চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকা। নিকল কি বলেন?"

"ঠিক কথা। আর মাত্র সাড়ে তেরো মিনিট।"

"নিকল দেখছি মানুষ নন—সজীব ঘড়ি বিশেষ" মন্তব্য করলেন আর্দা।

এইভাবে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে সময় আরো কমে এল। বার্বিকেন ঘোষণা করলেন—"আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। আসুন, হাত ধরুন।"

তিন অভিযাত্রী আবেগভরে পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বার্বিকেন

ধার্মিক মানুষ। তাই চরম মুহূর্তে শুধু বললেন—"ঈশ্বর আমাদের রক্ষে করুন!" আর্দাঁ এবং নিকল ঠিক মাঝখানে রাখা কেদারায় লম্বমান হলেন।

ক্যাপ্টেন বললেন—"দশটা সাতচল্লিশ!"

"আর মাত্র বিশ সেকেণ্ড," বলে ঝটিতি গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে বার্বিকেন শুয়ে পড়লেন দুই সঙ্গীর পাশে।

অখণ্ড নীরবতার মধ্যে কেবল শোনা গেল ঘড়ির টিক্-টিক্ শব্দ।

আচমকা অনুভূত হল ভয়ংকর একটা ধাক্কা। ১,০০০,০০০,০০০ লিটার বারুদ-পোড়া গ্যাসের প্রচণ্ড ঠেলায় মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হল প্রোজেকটাইল!

২॥ প্রথম আধঘণ্টা

সাংঘাতিক ধাক্কার পরে কি ঘটল? কল্পনাতীত দুঃসাহসের পরিণামটা কী? চার-চারটে প্লাগ, জলের কুশন, পার্টিসন আর স্প্রিং কি রুখতে পেরেছে ধাক্কার ভয়াবহতাকে? সেকেণ্ডে ১২,০০০ গজ উঠে আসার ভয়ংকর চাপ সইতে পেরেছেন কি অভিযাত্রীরা?

অভিযানের উদ্দেশ্য ভুলে পৃথিবীর সবাই মত্ত হলেন এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। ঠিক সেই সময়ে ম্যাসটন যদি দেখতে পেতেন প্রোজেকটাইলটিকে, কি দেখতেন?

কিচ্ছু না। অন্ধকারে চোখ চলে না কোনো দিকে। শঙ্কুর মত ছুঁচোলো সিলিণ্ডার কিন্তু অমন ধাক্কাকেও সামলে নিয়েছে। কোথাও এতটুকু চিড় খায়নি বা টোল পড়েনি। অতি-তীব্র রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফলে প্রোজেকটাইল তেতে লাল হয়নি, গলে তরল হয়নি, ফেটে অ্যালুমিনিয়াম পাউডার হয়ে হাওয়ায় ভেসে যায়নি—যে ভয় অনেকেই করেছিলেন! ভেতরেও খুব একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটেনি। দু'চারটে জিনিস ছিটকে পড়েছিল মেঝেতে। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা হল প্রোজেকটাইলের কোনো ক্ষতি হয়নি—কাঠামো অটুট রয়েছে।

পার্টিসন ভেঙে যাওয়ায় এবং জলের স্তর পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় কাঠের চাকতিটা গিয়ে ঠেকেছিল গোলার একদম তলায়। তিনটে নিশ্চল দেহ পড়েছিল তার ওপর। মনে হচ্ছিল প্রাণ নেই কারো দেহে। বার্বিকেন, নিকল এবং আর্দাঁর নিঃশ্বাস পড়ছে তো? নাকি তিন-তিনটে মৃতদেহ বহন করে মহাশূন্যে ক্ষিপ্তের মত ছুটতে ছুটতে উড়ন্ত কফিনে পরিণত হয়েছে প্রোজেকটাইল?

যাত্রারম্ভের কয়েক মিনিট পর একটা দেহ নড়ে উঠল। হাত নাড়ল, মাথা

তুলল এবং অতিকষ্টে উঠে বসল হাঁটুর ওপর। ইনি মাইকেল আর্দাঁ। অন্ধকারের মধ্যে শোনা গেল তাঁর ফুর্তিবাজ কণ্ঠস্বর—"মাইকেল আর্দাঁ অটুট —বাকী দুজনের খবর কী?"

উঠতে চেষ্টা করলেন অসমসাহসিক ফরাসি বৈজ্ঞানিক, পারলেন না। মাথা ঘুরছে, গা টলছে, দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় গিয়ে জমা হয়েছে, নিজেকে মাতালের মত বেহুঁশ মনে হচ্ছে।

তা সত্ত্বেও কপাল মুছে নিয়ে হাঁক দিলেন আবার:

"নিকল! বার্বিকেন!"

অপেক্ষা করলেন অধীরভাবে। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। একটা দীর্ঘশ্বাসও যদি শোনা যেত বোঝা যেত দুজনের একজনের ধড়েও অন্ততঃ প্রাণ আছে। আবার হাঁক দিলেন আর্দাঁ। এবারেও কোনো সাড়া নেই।

কোথায় ঘাবড়ে যাবেন, তা না টিটকিরি দিয়ে উঠলেন আর্দাঁ—"আরে গেল যা! এমন ভাব করছেন যেন পাঁচতলা বাড়ী থেকে পড়ে গেছেন! একজন ফরাসি যদি চাঙা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে, দুজন আমেরিকান পারবেন না কেন? যাক গে, আলোটা তো আগে জ্বালাই।"

ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ফিরে পাচ্ছিলেন আর্দাঁ। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। রক্তের গতি এখন অনেক শান্ত। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালালেন গ্যাসবাতি।

দেখলেন, বার্নারে কোনো চোট লাগেনি। গ্যাসের আধারও অটুট। তা না'হলে গ্যাসের গন্ধে টেঁকা দায় হত; তা'ছাড়া দেশলাই জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরভর্তি গ্যাস দপ্‌ করে জ্বলে উঠে প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটাতো।

গ্যাসের আলোয় ভূলুণ্ঠিত সঙ্গীদের পাশে হেঁট হয়ে বসলেন আর্দাঁ। দেখলেন, ধরাশায়ী বার্বিকেনের ওপর মড়ার মত পড়ে আছে নিকল—দুজনেই সংজ্ঞাহীন।

নিকলকে টেনে এনে ডিভানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসালেন আর্দাঁ। বেশ কিছুক্ষণ ঘষামাজার পর জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। চোখ মেলেই প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন "বার্বিকেন?"

"একে, একে, বন্ধু," বললেন আর্দাঁ। "আপনি ওপরে ছিলেন—তাই আগে আপনাকে সুস্থ করেছি। এবার বার্বিকেনের পালা।"

কিন্তু বার্বিকেনের জ্ঞান ফেরাতে হিমসিম খেয়ে গেলেন দুজনে। প্রচুর রক্ত ঝরছিল প্রেসিডেন্টের কাঁধ থেকে। তবে মারাত্মক চোট নয়। সযত্নে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন নিকল।

অনেকক্ষণ ঘষা-মাজা করার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন বার্বিকেন। তারপর উঠে বসে প্রথমেই শুধোলেন :

"নিকল, আমরা ছুটছি তো ?"

মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন আর্দা এবং নিকল। প্রোজেকটাইলের কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না কারো।

"তাই তো বটে, আমরা উঠছি কি ?" শুধোলেন আর্দা।

"নাকি ফ্লোরিডার মাটিতেই গ্যাঁট হয়ে বসে আছি ?" বললেন নিকল।

"মেক্সিকো উপসাগরে তলিয়ে যাইনি তো ?" বললেন আর্দা।

"তাজ্জব কথাবার্তা আপনাদের !" বললেন প্রেসিডেন্ট।

কথাগুলো কিন্তু উড়িয়ে দেবার নয়। প্রোজেকটাইল কিছুটা উঠেই সমুদ্রে পড়তে পারে, মাটিতে ফিরে আসতে পারে। অথবা সত্যি সত্যিই হয়তো মহাশূন্য দিয়ে ছুটে চলতে পারে। সত্যি কোনটা ?

বাইরে অখণ্ড নীরবতা। পুরু গদীর ভেতর দিয়ে বহির্জগতের কোনো শব্দ আসাও অবশ্য সম্ভব নয়। কিন্তু তাপমাত্রা এত বেশী কেন ? চমকে উঠলেন বার্বিকেন ! থার্মোমিটারে দেখা যাচ্ছে ৮১° ডিগ্রী ফারেনহিট পর্যন্ত পারা উঠে গেছে !

সোল্লাসে বললেন বার্বিকেন—"বন্ধুগণ ! আমরা ছুটছি ! বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণে দারুণ তেতে উঠেছিল গোলার বাইরের দিক, খানিকটা উত্তাপ ভেতরেও চলে এসেছে। তাপমাত্রা অবশ্য এখুনি কমে যাবে। শুরু হবে কনকনে ঠাণ্ডা !"

"তা'হলে কি আমরা বায়ুমণ্ডলের সীমানা পেরিয়ে এসেছি ?" আর্দার প্রশ্ন।

"নিঃসন্দেহে। এখন দশটা পঞ্চান্ন। আট মিনিট ধরে প্রোজেকটাইল ছুটছে। বাতাসের ঘর্ষণ না লাগলে চল্লিশ মাইল পুরা বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে আসার পক্ষে ছ সেকেণ্ডই যথেষ্ট।"

"বাতাসের ঘর্ষণে গতিবেগ কতখানি কমবে বলে মনে হয় ?" নিকলের প্রশ্ন।

"তিনভাগের একভাগ। সেকেণ্ডে ১২,০০০ গজ গতিবেগে যাত্রা শুরু করে থাকলে শেষ পর্যন্ত গতিবেগ দাঁড়াবে ৯,১৬৫ গজ।

আর্দা বলে উঠলেন—"বন্ধুবর নিকল তা'হলে আরো দুটি বাজি হারলেন। কামান না ফাটার দরুণ চার হাজার ডলার আর ছ'মাইলেরও বেশী উঁচুতে ওঠার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার। নিকল, টাকাটা বার করুন !"

"আগে প্রমাণ করুন, টাকা তারপর।" বললেন নিকল। "আমি বাজি হারলেও হারতে পারি। কিন্তু আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে যে।"

"আবার কি সমস্যা ?"

"যে কোনো কারণে হয়তো গান-কটনে আগুন-ই ধরেনি, আমরাও যাত্রা শুরু করিনি ?

"ক্যাপ্টেন !" সবিস্ময়ে বললেন আর্দা—"আমার মত আপনিও আবোল-তাবোল বকছেন ? যাত্রা শুরু না করলে বার্বিকেনের কাঁধে রক্ত ঝরল কি করে ?"

"তা ঠিক। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হচ্ছে না।"

"আঃ! কি সমস্যা ?"

"বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছেন কি ?"

"না তো!"

"বার্বিকেন, আপনি শুনেছেন ?"

"না।"

"তা'হলে ?"

"তা'হলে ··" মাথা চুলকে বললেন বার্বিকেন—"বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম না···ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো !"

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন তিনজনে। একী রহস্য ! প্রোজেকটাইল কামান থেকে বেরিয়ে ছুটছে, অথচ কামান দাগার আওয়াজ শোনা গেল না কেন ?

বার্বিকেন কাজের মানুষ। উনি স্ক্রু আলগা করে একটা জানলার প্যানেল সরালেন। রবার দিয়ে সাঁটা ছিল ধাতুর প্লেটটা। নাট আলগা করতেই বাইরের প্লেটটা কব্জার ওপর খুলে গেল। দেখা গেল পোর্টহোলের মত ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো লেন্স টাইপের কাঁচ। দ্বিতীয় জানলাটা আছে উল্টোদিকের দেওয়ালে। তৃতীয়টা গম্বুজাকৃতি ছাদে। চতুর্থটা পায়ের তলায় মেঝের মাঝে। চারদিকের জানলা দিয়ে দেখা যাবে মহাকাশ, পৃথিবী আর চন্দ্র।

খোলা জানলার সামনে দৌড়ে গেলেন তিন অভিযাত্রী। কিন্তু কণামাত্র আলোক-রশ্মিও দেখা গেল না সে জানলায়। অন্ধকার, অন্ধকার, নিঃসীম তমিস্রা !

সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়েই সোল্লাসে চীৎকার করলেন বার্বিকেন— বন্ধুগণ ! আমরা সমুদ্রে নেই, মাটিতেও নেই— চলেছি মহাশূন্য দিয়ে ! ঐ দেখুন অন্ধকারের মাঝে তারার ঝিকিমিকি। ঐ দেখুন পৃথিবী আর আমাদের মাঝে নিশ্ছিদ্র তমিস্রা !

'হুররে! হুররে!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন আর্দাঁ এবং নিকল

বাস্তবিকই অন্ধকার মানেই মহাশূন্য। পৃথিবীর ওপর থাকলে চন্দ্রালোকিত ভূ-পৃষ্ঠ দেখা যেত। এই অন্ধকারের আরো একটা মানে আছে। বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে এসেছেন ওঁরা। নইলে স্তিমিত আলোর ধারা জানলায় ভাসত। কিন্তু তাতো নয়। জানলা কুচকুচে অন্ধকারে ঢাকা। পৃথিবী পেরিয়ে এসেছে প্রোজেকটাইল, আর কোনো সন্দেহ নেই।

"হেরে গেছি আমি," বলে তক্ষুনি ন'হাজার ডলার বার করে দিলেন নিকল।

"অভিনন্দন রইল," বলে এক হাতে টাকার বাণ্ডিল পকেটে গুঁজে অপর হাতে রসিদ লিখে দিলেন বার্বিকেন। মহাশূন্যে দুই আমেরিকানের কীর্তি দেখে হাঁ হয়ে গেলেন ফরাসি আর্দাঁ।

রসিদ লেখা শেষ হলে আবার জানলায় ফিরে গেলেন তিনজনে। অগুন্তি নক্ষত্র-খচিত মহাকাশের পানে চেয়ে রইলেন মুগ্ধ বিস্ময়ে।

"এবার চাঁদ দেখা যাক," বলে আর একটা জানলার প্লেট সরাতে যাচ্ছেন বার্বিকেন, এমন সময়ে থমকে গেলেন একটা বিপুলাকার চাকতিকে এগিয়ে আসতে দেখে। মহাকায় চাকতির আলোক-উজ্জ্বল দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো। মনে হল যেন একটা শিশু চাঁদ জননী-চাঁদের কিরণকে প্রতিফলিত করছে আপন বুকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে উড়ন্ত চাকতিটা। পৃথিবীর চতুর্দিকে আপন কক্ষপথে ভ্রমণ করছে সে—কিন্তু তার কক্ষপথের দিকেই এগোচ্ছে প্রোজেকটাইল। পরিণামে সংঘর্ষ অনিবার্য!

"এ আবার কী! আরেকটা প্রোজেকটাইল নাকি?" শুধোলেন আর্দাঁ।

বার্বিকেন জবাব দিলেন না। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে গেল তাঁর। অতিকায় উড়ন্ত চাকতিটার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের পরিসমাপ্তি ঘটবে শোচনীয়ভাবে। অথবা, চাকতির আকর্ষণে তারই চারদিকে বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকবে প্রোজেকটাইল। নয়তো ফের ঠিকরে পড়তে হবে পৃথিবীর বুকে।

মূক বিস্ময়ে সবাই দেখল, নিঃশব্দে কাছাকাছি হচ্ছে উড়ন্ত গোলা আর চাকতি। ধাক্কা লাগল বলে!

আর্দাঁ শুধোলেন– "কোন উপায়ই তাহলে নেই?"

"না, নেই! মৃত্যুর প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমাদের। এইভাবে যে আমাদের অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।"

শুকনো হেসে আর্দাঁ বললেন—"ও কথা ভেবে আর মন খারাপ করে কি

হবে বলুন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেই প্রাণ দিতে চলেছি আমরা। কাজেই এখন আমাদের আনন্দ করাই উচিত।"

মুখে এ কথা বলেও মৃত্যুর পথে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলতে চলতে সত্যিই তিনি উল্লসিত হয়েছেন বলে মনে হল না অন্য দুজনের।

কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তাই ধাক্কা লেগেও লাগল না। কয়েক'শ গজ দূর দিয়ে কালো মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল বিশাল গ্রহাণুটা!

"বিদায়!" হাঁফ ছেড়ে বললেন আর্দা।

বার্বিকেন বললেন—"এ হল একটা উল্কা! পৃথিবীর টানে তার উপগ্রহ হয়ে গিয়েছে।"

তাও কি সম্ভব? পৃথিবীর তা'হলে দুটো চাঁদ রয়েছে—নেপচুনের মত?"

"হ্যাঁ, দুটো চাঁদ। যদিও ধরে নেওয়া হয়েছে পৃথিবীর চাঁদের সংখ্যা মাত্র এক। তবে এই দ্বিতীয় চাঁদের আকার এত ছোট এবং এর গতিবেগ এত বেশী যে পৃথিবীর মানুষ তাকে দেখতে পায় না। এম, পেটিট নামে এক ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী দ্বিতীয় চাঁদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। অনেক অঙ্ক কষে বলেছিলেন, পৃথিবীর চারদিকে এক চক্কর ঘুরতে ক্ষুদে-চাঁদের সময় লাগে মাত্র তিন ঘণ্টা বিশ মিনিট। কাজেই কল্পনা করে নিন কি প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে পুঁচকে চাঁদ।"

"সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীই কি এ-চাঁদের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন?" শুধোলেন নিকল।

"না! নিতেন, যদি আমাদের মত স্বচক্ষে দেখতেন। যাই হোক, পুঁচকে চাঁদ আমাদের একটা উপকার করল। পৃথিবী থেকে কতটা উঁচুতে আছি, এখন বলতে পারি।"

"কি ভাবে?" আর্দার প্রশ্ন।

"পুঁচকে চাঁদের দূরত্ব আমি জানি বলে। তার মানে, ক্ষুদে চাঁদের মুখোমুখি হওয়ার সময়ে ভূগোলক থেকে আমরা ৪৬৫০ মাইল দূরে ছিলাম।"

ঘড়ি দেখে বললেন নিকল,—"তেরো মিনিট হল আমেরিকা ছেড়ে এসেছি আমরা।"

"মাত্র তেরো মিনিট?" বললেন বার্বিকেন।

"হ্যাঁ। সেকেণ্ডে ১২,০০০ গজ গতিবেগ যদি না কমত, তাহলে ঘণ্টায় ২০,০০০ মাইল বেগে ছুটে চলা যেত।"

"তাতো বুঝলাম," বললেন বার্বিকেন। "কিন্তু মূল সমস্যার এখনো কোনো সমাধান হল না। কামান দাগার আওয়াজ শুনতে পাইনি কেন?"

কথা বন্ধ করে সবাই এই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। আর একটা জানলা খুলে দিতে চাঁদের আলোয় ভেতরটা ভেসে গেল। মিতব্যয়ী নিকল উঠে গিয়ে গ্যাসবাতি নিভিয়ে দিলেন।

• বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে দেখা গেল চাঁদের আর এক রূপ। কুচকুচে আঁধারের পটভূমিকায় ঝকঝকে চাঁদের সে রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আলো, আলো, শুধু আলো! বায়ুস্তরে চন্দ্রকিরণের প্রতিসরণ নেই। প্রতিফলন নেই—সোজা চন্দ্রকিরণ রৌপ্যধারার মতই ওঁদের স্নান করিয়ে সারা-অঙ্গে ঢেলে দিল আশ্চর্য সুষমা! এ-যেন চাঁদ নয়, প্লাটিনামের মুকুর।

এবার উন্মোচিত হল মেঝের জানলা। উনিশ ইঞ্চি ব্যাসের গোলাকার পার্টহোলে ছ' ইঞ্চি পুরু কাঁচ বসানো তামার জালে। নাটবল্টু খুলতেই খসে পড়ে গেল বাইরের অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনি।

"কিন্তু পৃথিবী কোথায়? এ যে নখের মত এক ফালি রুপোলি গ্রহ!" অবাক হলেন আর্দাঁ।

"ঐ হল পৃথিবী" বললেন বার্বিকেন।

বু.., বুঝিয়ে দিলেন তিনি। চারদিন পর পূর্ণিমার সময়ে চাঁদে পৌঁছোবেন ওঁরা। পৃথিবী তখন একফালি নখের মত দৃশ্যমান হবে এবং তারপর কিছুদিন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত থাকবে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে পৃথিবীর এই ক্ষয়িষ্ণু রূপের দিকে তাকিয়ে রইলেন অভিযাত্রীরা। এমন সময়ে অন্ধকারের বুক চিরে ঝরে পড়ল রাশি রাশি উল্কা। ঠিক যেন ফুলঝুরি ঝরছে অন্ধকার পৃথিবীর ওপর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, ডিসেম্বরে নাকি ঘণ্টায় চব্বিশ হাজার উল্কা খসে পড়তে দেখা যায় পৃথিবীর আকাশে।

আর্দাঁ অবশ্য অন্য কথা বললেন। তাঁর মতে নাকি ধরিত্রী বাজী পুড়িয়ে তিন সন্তানকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন!

অনেকক্ষণ এইভাবে তাকিয়ে থাকার পর চোখ ঢুলু-ঢুলু হল সকলের। একটানা এতক্ষণ অতি-উত্তেজনা গিয়েছে—ক্লান্তি আসবেই তো।

পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন তিন অভিযাত্রী। ঘুমোলেন সঙ্গে সঙ্গে।

পনেরো মিনিট ঘুমোতে না ঘুমোতেই আচম্বিতে উঠে বসলেন বার্বিকেন। হৈ-চৈ করে ডেকে তুললেন দুই বন্ধুকে।

বললেন—"পেয়েছি!"

"কী?" তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শুধোলেন আর্দাঁ।

"কামান দাগার শব্দ না শোনার কারণ।"

"কি কারণ?" নিকলের প্রশ্ন।

"শব্দের চেয়েও জোরে প্রোজেকটাইল ছুটছে বলে

৩॥ মহাকাশে ঘর-সংসার

ব্যাখ্যাটা অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু সত্যি। সুতরাং হৃষ্ট-চিত্তে তিন বন্ধু ফের নিদ্রাসুখে মগ্ন হলেন। তাছাড়া, ঘুমোবার পক্ষে এমন নিরিবিলি জায়গা আর কোথাও কি আছে? মাটির ওপর ঘুমোলে ঝাঁকুনি লেগেই আছে, সমুদ্রে ঘুমোলে আছে দুলুনি, বেলুনেও তাই। কিন্তু মহাশূন্য মাঝে ভাসমান এই প্রোজেকটাইলে প্রগাঢ় শান্তি ছাড়া কিছুই নেই।

সুতরাং মহাসুখে নিদ্রামগ্ন অভিযাত্রীদের নিদ্রা কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় পরিণত হত যদি না সকাল সাতটা নাগাদ একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ শোনা যেত গোলার অভ্যন্তরে।

সেদিন দোসরা ডিসেম্বর। সময়: যাত্রারম্ভের আট ঘণ্টা পর।

শব্দটা কুকুরের ডাক।

"কুকুর! কুকুর!" লাফ দিয়ে উঠে বসলেন মাইকেল আর্দাঁ।

"খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।" বললেন নিকল।

"কিন্তু কোথায় তারা?" শুধোলেন বার্বিকেন।

এদিক-ওদিক তাকাতে একটা কুকুরকে পাওয়া গেল ডিভানের নীচে! গুঁড়ি মেরে-বসেছিল সারমেয়টি। কামান দাগার প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে আতংকে আধমরা হয়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিল এক কোণে। এখন গলা ছেড়েছে খিদের জ্বালায়।

অনেক ডাক দেওয়ার পর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে গুটিসুটি মেরে বেরিয়ে এল কুকুর মহাপ্রভু! দেখা গেল সে কুত্তী—নাম ডায়না।

মাইকেল আর্দাঁ তাকে বাইরে আনার জন্যে অবশ্য বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করছিলেন।

যেমন—"ওহে ডায়না খুকী, কুকুর দুনিয়ায় তুই যুগান্তর সৃষ্টি করতে চলেছিস। সেকালে তুই আনুবিস দেবতার সঙ্গী হয়েছিলি, খৃষ্টানেরা তোকে সেন্ট রস-এর বন্ধু বানিয়েছিল। একালে গ্রহে-গ্রহে ভ্রমণের সুযোগ পেলি তুই! চাঁদ কুকুরদের দুনিয়ায় তুই-ই হবি প্রথম ইভ! ডায়না, আয় মা, বেরিয়ে আয়!"

ডায়না তোষামোদে গলে গিয়েই বোধহয় আচমকা করুণ-স্বরে গুঙিয়ে উঠল।

বার্বিকেন বললেন—"ইভকে তো পাওয়া গেল। আদম কই?"

"নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও আছে," বললেন মাইকেল। "স্যাটেলাইট! বেরিয়ে আয় বাবা!"

কিন্তু স্যাটেলাইট সাড়া দিল না, আবির্ভূতও হল না। ডায়নার করুণ বিলাপেরও অন্ত নেই।

কোথায় স্যাটেলাইট? গেল কোথায় সে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পাওয়া গেল প্রোজেকটাইলের মাচায়।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে নিশ্চয় খুপরির মধ্যে ছিটকে গিয়েছিল বেচারী। সাংঘাতিক জখম হয়েছে আঘাতের প্রচণ্ডতায়। অবস্থা শোচনীয়।

"আহা-রে!" বললেন মাইকেল।

ধরাধরি করে বেচারাকে নামিয়ে আনা হল নীচে। ছাদে লেগে তার খুলি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই একটা গদীর ওপর আরামে শুইয়ে রাখা গেল তাকে। শোবার পর একবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল মৃত্যুপথযাত্রী স্যাটেলাইট।

আবার চন্দ্র এবং পৃথিবী পর্যবেক্ষণে বসলেন অভিযাত্রীরা। পৃথিবীকে এখন মেঘাচ্ছন্ন চাকতির মত দেখাচ্ছে; চাঁদ আরো বড় হয়ে উঠছে।

"আহা-রে!" আপশোষের সুরে বললেন মাইকেল। "পৃথিবী যখন সূর্যের বিপরীত দিকে পৌছোতো, তখন রওনা হলেই ভাল ছিল।"

"কি হত তা'হলে?" নিকল শুধোলেন।

"পৃথিবীর মেরুঅঞ্চল দেখতে পেতাম—যা কেউ আজও দেখেনি।"

জোর গুলতানি শুরু হয়ে গেল মাইকেলের মন্তব্য নিয়ে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিজ্ঞান-সম্মত মতবাদ তুলে ধরলেন। কথায় কথায় সাড়ে আটটা বাজতে আরম্ভ হল ব্রেকফাষ্ট। ফরাসী আর্দা তাঁর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। অর্থাৎ উত্তম পাচক বনে গেলেন এবং তাঁর দৌলতে মহাশূন্যে প্রথম প্রাতরাশ মন্দ জমল না। শুরু হল সূপ দিয়ে, মাঝে এল শাকসব্জী আর চা। সবশেষে 'হঠাৎ পাওয়া' (!) একবোতল মদ্য।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রোজেকটাইল। ফলে, সূর্যের মুখ দেখল অভিযাত্রীরা।

বার্বিকেন বললেন—"বাঁচা গেল। আলো আর উত্তাপের জন্যে আর গ্যাস খরচ করতে হবে না।"

বাস্তবিকই ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠল প্রোজেকটাইল। ওপরে চাঁদ, নীচে সূর্য—আলো তো নয়, যেন অগ্নিধারায় ডুবে রইল ধাবমান গোলাটা।

আর্দা বললেন—"উত্তাপ বাড়লে প্রোজেকটাইলের আবরণ গলে না যায়।"

বার্বিকেন অভয় দিলেন তৎক্ষণাৎ। বললেন—"পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে আসবার সময়ে নিশ্চয় জ্বলন্ত উল্কা হয়ে গিয়েছিল প্রোজেকটাইল—ফ্লোরিডার দর্শকেরা অন্ততঃ সেই রকমই দেখেছিল—তাতেও যখন কিছু হয়নি, তখন ভয় নেই।"

এই বলে ছোট্ট প্রকোষ্ঠের ভেতরটা এমন গোছগাছ শুরু করলেন বার্বিকেন যেন এইখানেই বাকী জীবনটা থাকবেন তিনি। মহাকাশ-যানের মেঝের ক্ষেত্রফল মোটে চুয়ান্ন বর্গফুট। উচ্চতা বারো ফুট। যন্ত্রপাতি এবং বাসন-কোসন রাখার পরেও তিনজনের চলাফেরার সামান্য জায়গা থাকে। পায়ের তলায় পুরু কাঁচে ঢাকা জানলার ওপর দিয়েই হাঁটতেন ওঁরা। পুরু কাঁচ ভাঙবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না! কিন্তু সূর্যের আলো মেঝের জানলা দিয়ে ঢুকে প্রোজেকটাইলের ভেতরে অদ্ভুত আলোর খেলা শুরু করে দিলে।

খাবার-দাবারের ভাঁড়ার আগে দেখা হল। জল এবং আহার্য, কোনোটাই কামান দাগার ধাক্কায় নষ্ট হয়নি। খাবার যা আছে তাতে তিনজনের একবছর চলে যাবে। জল আর ব্র্যাণ্ডি আছে পঞ্চাশ গ্যালন—ছ' মাস দিব্বি যাবে। রাসায়নিক পন্থায় পটাসিয়াম ক্লোরেট দিয়ে অক্সিজেন পাওয়া যাবে মাস দুয়েক।

বারো ঘণ্টা পর দেখা গেল বিষাক্ত কার্বনিক অ্যাসিড জমেছে গোলার ভেতরে। এ-গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারী। তাই জমা হয়েছিল মেঝের ওপর। সুতরাং ডায়নার শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হল সবার আগে। দেখেই নিকল কিছু পটাসিয়াম ক্লোরেটের কৌটো খুলে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মেঝের ওপর। লোভী ক্লোরেট তৎক্ষণাৎ নিজের মধ্যে টেনে নিল কার্বনডায় অক্সাইড—পরিষ্কার হল বাতাস।

যন্ত্রপাতির মধ্যে দেখা গেল একটা থার্মোমিটারের কাঁচ ভেঙে গেছে। আর সব ঠিক আছে।

গোলার ওপর দিকে মাচার মত প্রকোষ্ঠে মাইকেল আর্দা কত কি যে সাজিয়ে রেখেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই। কাউকে ঢুকতে দিতেন না সেখানে। একলা উঠে বসে থাকতেন। এটা-ওটা নাড়তেন, আর আপন মনে বিড়বিড় করতেন।

বাইরের দৃশ্য পালটায় নি। মহাকাশ জুড়ে নক্ষত্রের মেলা; একদিকে ঝকমক সূর্য, অপরদিকে ঝলমলে চাঁদ; আর বিশাল চাকতির মত পৃথিবী।

হেথায়-সেথায় তারার মত দপ্‌দপ্‌ করছে নীহারিকামণ্ডলী। ছায়াপথে ছড়ানো ধুলোর মত নক্ষত্ররাশি। ভাষা দিয়ে অদৃষ্টপূর্ব সেই দৃশ্যের বর্ণনা করা যায় না।

বারো ঘণ্টার হিসেবে কাটল একটা দিন। সারাদিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন তিন অভিযাত্রী। মহাকাশের বুক চিরে বিপুল বেগে ধেয়ে চলল প্রোজেকটাইল এবং ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল তার গতিবেগ।

৪॥ সামান্য একটু বীজগণিত

প্রোজেকটাইলের মধ্যে থেকে মনে হচ্ছিল যেন মহাশূন্যে ভাসছে ধাতুর প্রকোষ্ঠটা। মনে হচ্ছিল, কোনোদিকে তার গতি নেই—স্থির নিষ্কম্প নিথর দেহে শুধু ভেসে রয়েছে মহাকাশের বুকে।

কিন্তু তা তো নয়। প্রচণ্ড বেগে ছুটছিল গোলা। চাঁদের আকার ক্রমশঃ বড় হচ্ছিল ঐ কারণেই।

তেসরা ডিসেম্বর সকালে মোরগের কোঁকর-কোঁ ডাক শুনে ঘুম ভাঙল অভিযাত্রীদের।

লাফিয়ে গেলেন মাইকেল আর্দাঁ। সাঁ করে উঠে গেলেন মাচায়। একটা বাক্সের ডালা চেপে বন্ধ করতে করতে ধমকে উঠলেন চাপা গলায়—"মুখটা একটু বন্ধ রাখতে পারো না? উজবুক কোথাকার! আমার প্ল্যানটা মাটি করে ছাড়বে দেখছি!"

ততক্ষণে ঘুম ছুটে গিয়েছে বাকী দুজনের।

"মোরগ!" বললেন নিকল।

"না, বন্ধু, না।" ঝটিতি বললেন মাইকেল। "আমিই মোরগ-ডাক ডাকছিলাম। এই দেখুন," বলে এমন কোঁকর-কোঁ ডাক ডাকতে আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক যে সঙ্গী দুজন হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন।

মাইকেল তখন আবোল-তাবোল বকে অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন। বীজগণিত আর সমীকরণ নামক গণিতশাস্ত্র নিয়ে দারুণ কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেল তিনজনের মধ্যে। বীজগণিতের অংক কষে প্রোজেকটাইলের বর্তমান গতিবেগ বার করা সম্ভব কিনা জানতে চাইলেন মাইকেল।

নিকল তখুনি ঝড়ের মত অংক কষা আরম্ভ করলেন। বার্বিকেন একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তাই দেখে মাইকেলের রগ টিপ্ টিপ্ করতে লাগল।

"কি হল?" মিনিট কয়েক পরে শুধোলেন বার্বিকেন।

"কি আবার হবে?" বললেন নিকল—"সব অংকেরই এক ফল। বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে আসবার পর, মহাকাশের যে অঞ্চলে চাঁদ আর পৃথিবীর আকর্ষণ

সমান সমান হচ্ছে—সে জায়গায় পৌঁছোতে প্রোজেকটাইলের গতিবেগ থাকা দরকার—"

"কত ?"

"সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ।"

"কি বললেন ?"

"বারো হাজার গজ।"

"সর্বনাশ হল !"

"হল কী ?" অবাক হলেন আর্দাঁ।

"ঘর্ষণের ফলে আমাদের গতিবেগ এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়ে থাকলে প্রাথমিক গতিবেগ হওয়া উচিত ছিল—"

"সতেরো হাজার গজ।"

"অথচ কিনা কেম্ব্রিজ মানমন্দির বলল, বারো হাজার গজ গতিবেগ দিয়েই যাত্রা শুরু করা যাবে। আমরা সেই গতিবেগেই মাটি ছেড়েছি—"

"তারপর ?" নিকলের প্রশ্ন।

"এখন তো দেখছি ও গতিবেগ যথেষ্ট নয়।"

"ভালই তো।"

"পৃথিবী আর চাঁদের আকর্ষণ যেখানে সমান-সমান, সেখানে কস্মিনকালেও পৌঁছোবো না আমরা।"

"যা-চ্চলে !"

"অর্ধেক পথও পাড়ি দিতে পারব না !"

"সর্বনাশ !" মাইকেল আর্দাঁ এমন লাফালেন যে আর একটু হলে মাথা ঠুকে যেত ছাদে।

বার্বিকেন বললেন—"শেষ পর্যন্ত আমরা আবার খসে পড়ব পৃথিবীতে !"

৩॥ মহাশূন্যের শৈত্য

শুনে মাথায় বাজ পড়ল যেন !

হিসেবে এরকম ভুল থাকবে কে জানত ? নিকল আবার অংক কষলেন, ফল সেই একই। প্রাথমিক গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৭,০০০ গজ হলে তবে পৌঁছোনো যেত নিউট্রাল পয়েণ্টে (উদাসীন অঞ্চলে) অর্থাৎ সেইখানে যেখানে চাঁদ আর পৃথিবীর আকর্ষণ সমান-সমান।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন তিনজনে। প্রাতরাশ

খাওয়ার কথাও মনে রইল না। বিড় বিড় করে বললেন মাইকেল আর্দা,—"এই তো বৈজ্ঞানিকদের কেরামতি! আহা-রে! গোলা সমেত যদি কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের মাথায় পড়তাম, বেশ হত। তাদেবর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে ছাড়তাম!"

হঠাৎ একটা কথা মনে এল ক্যাপ্টেনের। বার্বিকেনকে বললেন—"এখন সকাল সাতটা। তিন ভাগের দু'ভাগ পথ পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু পৃথিবীর দিকে পড়তে শুরু করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!"

তৎক্ষণাৎ কাঁটাকম্পাস নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন বার্বিকেন! ঘেমে নেয়ে গেলেন হিসেব নিয়ে।

অবশেষে বললেন—"সুসংবাদ! আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি না—এগিয়ে চলেছি! পৃথিবী থেকে ৫০,০০০ লীগ পথ চলে এসেছি। যাত্রা শুরুর সময়ে যদি গতিবেগ ১২,০০০ গজ হত প্রতি সেকেণ্ডে, তাহলে যে জায়গায় ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার কথা—সে জায়গা ছাড়িয়ে এসেছি।"

নিকল বলে উঠলেন—"এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে চার লক্ষ পাউণ্ড গান-কটনের শক্তি আমাদের যে গতিবেগ জুগিয়েছিল, তা সেকেণ্ডে ১২,০০০ গজের চেয়ে বেশী ছিল। সেই কারণেই কামান দাগার মাত্র ১৩ মিনিট পরে ২০০০ লীগ দূরে এসে দেখেছিলাম দ্বিতীয় উপগ্রহকে।"

বার্বিকেন বললেন—"গতিবেগ বেড়ে গেছে পার্টিসন ভেঙে জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। হাল্কা হয়ে গিয়েছিল প্রোজেকটাইল—তাই অত জোরে ঠিকরে গেছে আকাশে।"

"ঠিক বলেছেন," সায় দিলেন নিকল।

"বেঁচে গেলাম," বললেন বার্বিকেন।

"তা'হলে এখন খেয়ে নেওয়া যাক," বললেন আর্দা।

কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের সাংঘাতিক ভুল এইভাবেই বীজগণিত দিয়ে ধরে দিলেন ক্যাপ্টেন নিকল। ভাগ্যিস গতিবেগ বেড়ে গিয়েছিল। নইলে তো শঙ্কুর মত অনন্তকাল ঝুলতে হত মহাশূন্য মাঝে! এইসব কথা বলতে বলতে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে প্রাতরাশ খেয়ে নিলেন তিনজনে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মাইকেল বললে—"তাস, দাবা, ডোমিনো খেললে হয় না?"

"সে-কী!" চোখ কপালে তুলে বললেন বার্বিকেন তাস, দাবা, ডোমিনোর সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছেন নাকি?"

"বিলিয়র্ড টেবিলটা কেবল আনতে পারিনি," একগাল হেসে বললেন

আর্দা। "খোশ গল্প আর খেলা ছাড়া সময় কাটবে কি করে? তাছাড়া, চন্দ্রবাসীদেরও তাস-দাবা-ডোমিনো শেখানো দরকার তো।"

বার্বিকেন বললেন—"মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, চাঁদে যদি জীব থাকে, তা'হলে জানবেন তারা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির বহু হাজার বছর আগে থেকে রাজত্ব করছে সেখানে। সুতরাং আমাদের কাছে তাদের শেখবার কিছু নেই ; বরং তাদের কাছেই আমাদের শেখবার অনেক আছে।"

"বলেন কী!" লাফিয়ে উঠলেন মাইকেল, "মাইকেল এঞ্জেলো আর র‍্যাফেলের মত আর্টিস্টও তাদের আছে?"

"আছে।"

"হোমার. ভার্জিল, মিলটন, ম্যামারটিন, হুগোর মত কবিও আছে?"

"আছে বৈকি।"

"প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কান্টের মত দার্শনিক?"

"তাও আছে।"

"আর্কিমিডিস, ইউক্লিড, প্যাসকাল, নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক?"

"আলবৎ আছে।"

"আরনালের মত কৌতুক লেখক, নাদারের মত ফটোগ্রাফার?"

"নিশ্চয়।"

"বন্ধু বার্বিকেন, তাই যদি হয় তো অ্যাদ্দিন তারা পৃথিবীতে প্রোজেকটাইল পাঠায়নি কেন?"

"পাঠায়নি জানলেন কি করে?"

নিকল বললে,—"চাঁদ থেকে গোলা পাঠানো অনেক সোজা দুটো কারণে। প্রথমতঃ, চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণের ছ' ভাগের এক ভাগ। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবী থেকে গোলা নিক্ষেপ করতে যে শক্তি লেগেছে, চাঁদ থেকে লাগবে তার দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ।"

"ভালো, ভালো," বললেন মাইকেল "প্রশ্নটা তাহলে ফের করা যাক। অ্যাদ্দিনেও চাঁদ থেকে কেউ আসেনি কেন?"

"উত্তরটা তা'হলে ফের দেওয়া যাক" বললেন বার্বিকেন। "আসেনি জানলেন কি করে?"

"কবে? কখন? কোথায়?"

"পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু হাজার বছর আগে।"

"প্রোজেকটাইল? সেটা কোথায়?"

"ভূগোলকের ছ' ভাগের পাঁচভাগ জুড়ে আছে সমুদ্র। সুতরাং চান্দ্র-যান

সত্যিই যদি কোনোদিন নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে পৃথিবীর দিকে, এখন তা সমুদ্রগর্ভে অথবা ভূত্বকের তরলাবস্থায় কোনো ফাঁক-ফোকরে।"

"বার্বিকেন, আপনার সঙ্গে আমি কথায় পেরে উঠবো না। কিন্তু একটা জিনিষ চান্দ্র-মানবরা আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। তা হল গান-পাউডার"

ঠিক এই সময়ে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল ডায়না। সামনে কিছু খাবার ধরে দিতেই নীরব হল তার কণ্ঠ।

মাইকেল বললেন—"বেশ কিছু জন্তু-জানোয়ার চাঁদে নিয়ে গেলে হত নেওয়ার মত।"

"জায়গা কোথায়?"

কথার পিঠে আরও কিছু কথা বললেন নিকল এবং বার্বিকেন। গাধা নিয়ে গেলে ভাল হত কি গরু ঘোড়া ষাঁড় নিলে কাজ বেশী দিত, এই নিয়েও চলল জোর তর্ক। তারপরেই সবাই চমকে উঠলেন কাতর গোঙানি শুনে।

ডায়না কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে!

দৌড়ে গেলেন সবাই। ডায়না বসে আছে স্যাটেলাইটের নিথর দেহের পাশে।

"স্যাটেলাইট আর বেঁচে নেই," বিমর্ষ মুখে বললেন সদা-প্রফুল্ল মাইকেল। চাঁদের বুকে কুকুর বংশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নেরও ইতি হল সেই সঙ্গে।"

স্যাটেলাইট মারা গেছে! খুলি গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর বাঁচবার আশা আর ছিল না। চন্দ্রযাত্রী স্যাটেলাইট তাই এখন পরলোকের যাত্রী!

বার্বিকেন বললেন—"কিন্তু মরা কুকুরকে তো আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে রাখা যাবে না।"

"তা তো যাবেই না," বললেন নিকল। "জানলা খুলে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু হুঁশিয়ার হতে হবে দুটো কারণে। প্রথমতঃ, খোলা জানলা দিয়ে বেশী বাতাস বেরিয়ে না যায়। দ্বিতীয়তঃ, বাইরের ঠাণ্ডা যেন ভেতরে ঢুকে না পড়ে। তা'হলে আর বাঁচতে হবে না।"

"সূর্য তো রয়েছে।" বললেন মাইকেল।

"সূর্য তো বায়ুশূন্য মহাশূন্যকে উত্তপ্ত করতে পারে না। প্রোজেকটাইলের গা গরম হচ্ছে ঠিকই, বাতাস থাকলে মহাশূন্যও গরম হত। সূর্য কিরণ কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খেলে সে জায়গা গরম করতে পারে না। সূর্য যদি না থাকত, পৃথিবীকেও জমে বরফ হতে হত।

মাইকেল বলে উঠলেন—"সে রকম সম্ভাবনাও তো দেখা দিয়েছিল ১৮৬১ সালে। একটা ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল পৃথিবীকে।

ধূমকেতুর টানে সূর্য থেকে পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হলেই হয়েছিল আর কি—জমে যেতে হত, তাই না?"

"সাংঘাতিক কিছু ঘটত না," বললেন বার্বিকেন।

"কেন?"

"ঠাণ্ডা গরম সমান হয়ে যেত! সূর্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যাওয়ার সময়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেত। গ্রীষ্মকালে যে তাপ, বেড়ে যেত তার ২৮,০০০ গুণ। উত্তাপ সমুদ্রের জলকে বাষ্পাকারে শূন্যে তুলত, ঘন মেঘ হয়ে পৃথিবীকে ঘিরে রাখত এবং মহাশূন্যের ঠাণ্ডাকে রুখে দিত।"

"কিন্তু মহাশূন্যের তাপমাত্রা কত? নিকলের প্রশ্ন।

"তা নিয়ে মতভেদ আছে," বললেন বার্বিকেন, "কেউ বলেন শূন্য তাপাঙ্কের ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে, কেউ বলেন ৭৩ ডিগ্রী ফারেনহিট নীচে, আবার কারও মতে ২৫০ ডিগ্রী ফারেনহিট নীচে।"

এরপর শুরু হল স্যাটেলাইটের কবর দেওয়ার আয়োজন। মহাশূন্যে তাঁকে সমাধিস্থ করা হল অভিনব উপায়ে। এক পাশের জানলা খুলেই গলিয়ে দেওয়া হল মৃত স্যাটেলাইকে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল জানলা। সমস্ত ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে বাতাস অপচয় হল নামমাত্র।

তাই দেখে বার্বিকেন ঠিক করলেন, এবার থেকে প্রোজেকটাইলের মধ্যে জঞ্জাল জমিয়ে না রেখে জানলা গলিয়ে বাইরে পাচার করবেন।

৬॥ প্রশ্ন এবং উত্তর

চৌঠা ডিসেম্বর।

ঘুম থেকে উঠে হিসেব কষে দেখলেন অভিযাত্রীরা চুয়ান্ন ঘণ্টা হয়ে গেছে ওঁরা উড়ে চলেছেন একটানা। দশ ভাগের সাত ভাগ পথ মেরে এনেছেন।

নীচের জানলা দিয়ে পৃথিবীকে অবলোকন করলেন অভিযাত্রীরা। আগের সে রূপ আর নেই। নখের ফালির মত বা মেঘেঢাকা আলোর মত আর নয়। পৃথিবী এখন অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা চাকতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সময়ে মাইকেল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বললেন—"আচ্ছা, প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে আচমকা যদি দাঁড়িয়ে যায় প্রোজেকটাইল, তা'হলে কি হবে?"

---

*এই রচনাবলীর অন্য খণ্ডে সন্নিবেশিত হল "ধূমকেতুর পিঠে চড়ে"—মহাবিশ্বে ভ্রমণের চমকপ্রদ কাহিনী (অফ্ অন দি কমেট)।

"ছাই হয়ে যাবো, বললেন বার্বিকেন।

"কেন?"

"উত্তাপ গতির আরেক রূপ বলে। জলে উত্তাপ সঞ্চার করলে দেখা যায় জলের অণু-পরমাণু গতিশীল হয়েছে। সোজা কথায়, উত্তাপ মানেই পরমাণুর গতিশীলতা, পরমাণুর দুলুনি। রেলগাড়ীর ব্রেকে সেই কারণেই তেল মাখানো থাকে যাতে ঘুরন্ত চাকা হঠাৎ থেমে গেলে লোহা তেতে আগুন হয়ে না ওঠে। উত্তাপটা আসে ট্রেনের হঠাৎ বন্ধ হওয়া গতি থেকে।"

নিকল বললেন—"পৃথিবীটা যদি হঠাৎ গতি হারায়?"

"ধোঁয়া হয়ে যাবে" বললেন বার্বিকেন। "তেতে উঠে তক্ষুনি ধোঁয়া হয়ে যাবে পৃথিবী।"

"আর যদি সূর্যের বুকে আছড়ে পড়ে পৃথিবী?" আবার প্রশ্ন করলেন নিকল।

"ভূ-গোলকের সমান আয়তনের ১৬,০০০ কয়লা-গোলক পোড়ালে যতটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়, পৃথিবী সূর্যের বুকে আছড়ে পড়লে সেই পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হবে," বললেন বার্বিকেন। "যা বলছিলাম, যে কোনো গতিকে হঠাৎ রুখে দিলেই তা উত্তাপে পরিণত হবে। হিসেব করে দেখা গেছে—"

"সেরেছে! আবার হিসেব?" স্বগতোক্তি করলেন মাইকেল।

বার্বিকেন বলে চললেন—"সূর্যের বুকে উল্কাপাতের ফলেও উত্তাপ বেরিয়ে আসছে। এক-একটা উল্কা সমপরিমাণ ৪০০০ ডেলা কয়লা পোড়ানোর উত্তাপ সৃষ্টি করছে।"

ধাঁ করে মাইকেল শুধোলেন—"বার্বিকেন কি বিশ্বাস করেন, চাঁদ আসলে একটা বুড়ো ধূমকেতু?"

"ওরকম একটা কথা শোনা যায় বটে," বললেন বার্বিকেন। "আর্কেডিয়ানদের বিশ্বাস, চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ হওয়ার আগে থেকেই তাঁদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীর বাসিন্দা। এই থেকেই বৈজ্ঞানিকরা ধরে নিয়েছেন চাঁদ আসলে একটা ধূমকেতু। মহাশূন্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে পৃথিবীর টানে বাঁধা পড়েছে। প্রমাণ? নেই। কেন-না, ধূমকেতুমাত্রেই গ্যাসের আবরণ থাকে। চাঁদে তা নেই।"

"এমনও তো হতে পারে", বললেন নিকল, "পৃথিবীর টানে আটকে পড়ার আগে সূর্যের গা ঘেঁসে এসেছিল চাঁদ নামক ধূমকেতু; গ্যাসের আবরণ সেই সময়ে উবে গিয়েছে?"

"হলেও হতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।"

"কেন ?"

"কেন তা বলতে পারব না।"

আচমকা মাইকেলের চীৎকার শোনা গেল। পাশের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন উনি। কি দেখে ভীষণ অবাক হয়ে হৈ-চৈ করে উঠছেন।

দৌড়ে গেলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন। গিয়ে দেখলেন চ্যাপ্‌টা থলির মত কি যেন ভাসছে মাত্র কয়েক গজ দূরে। প্রোজেকটাইলের মতই গতিহীন মনে হচ্ছে বস্তুটাকে। তার মানে সমান গতিতে চাঁদের দিকে ছুটে চলেছে আজব বস্তুটা।

জিনিসটা কি, তাই নিয়ে দারুণ কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেল তিনজনের মধ্যে। শেষে মাইকেল বললেন—"আমি জানি জিনিসটা কি। না, যা ভাবছেন, তা নয়। উল্কা নয়, গ্রহাণুও নয়, এমন কি গ্রহভাঙা টুকরোও নয়।"

"তবে কী ?" বার্বিকেন শুধোলেন।

"ডায়নার স্বামী—বেচারা স্যাটেলাইট—মরা কুত্তা। প্রোজেকটাইলের আকর্ষণে লেগে রয়েছে সঙ্গে।"

সত্যিই তাই! কুকুরের নিষ্প্রাণ দেহ বিকৃত হয়ে এরকম আকার নেবে কে জানত! চুপসোনো থলির আকারে মহাশূন্যের বুক চিরে উড়ে চলেছে তো চলেইছে! বড় বস্তু ছোট বস্তুকে টেনে রাখবে কাছে—অনন্ত মহাশূন্যের এই নিয়ম অনুযায়ী প্রোজেকটাইল থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কুকুরের লাস।

৭॥ মুহূর্তের মাদকতা

পরের দিন ৫ই নভেম্বর।

হিসেব সঠিক হলে, এই দিনই রাত বারোটায় চাঁদে পৌছোনোর কথা। জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল চাঁদের রাজকীয় রূপ। ক্রমশঃ বড় হচ্ছে তার রজত-শুভ্র চাকতি নক্ষত্রখচিত মহাকাশের পটভূমিকায়।

একটা ব্যাপার ভাবিয়ে তুলল বার্বিকেনকে। হিসেব মত চাঁদের ঠিক কেন্দ্রে গিয়ে পড়া উচিত ছিল প্রোজেকটাইলের। কিন্তু বর্তমান গতি সেদিকে নয়—ঈষৎ উত্তর দিকে। অর্থাৎ প্রোজেকটাইল নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে একটু সরে গিয়েছে এবং চাঁদের উত্তর অঞ্চলে অবতীর্ণ হতে চলেছে।

কিন্তু যদি অল্পের জন্যেও চাঁদের গা ঘেঁসে প্রোজেকটাইল বেরিয়ে যায়, তা'হলেই বিপদ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই মহাশূন্যে পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু গতিপথ থেকে কেন সরে এল প্রোজেকটাইল? অনেক ভেবেও জবাব পেলেন না বার্বিকেন। সঙ্গীদের কাছেও দুর্ভাবনার ব্যাপারটা ফাঁস করলেন না। তন্ময় হয়ে রইলেন প্রোজেকটাইলের গতিপথ নিয়ে। আরও একটু বেঁকলেই সর্বনাশ! চাঁদকে ছাড়িয়ে ছুটে যেতে হবে আন্তর্গ্রহ মহাশূন্যে!

চাঁদ অনেক বড় হয়ে উঠেছে। পৃথিবী থেকে চাঁদকে অনেকটা মানুষের মুখের মত দেখায় যে সব পাহাড়-পর্বত-উপত্যকার জন্যে, সেগুলি এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মাইকেল বলে উঠলেন—"একেই যদি অ্যাপোলোর বোন বলা হয় তো বলব ভদ্রমহিলার মুখে বড্ড ব্রণ!"

এই বলে প্রাতরাশের আয়োজন আরম্ভ করলেন উনি। গ্যাস জ্বালিয়ে রান্নাবান্না সেরে নিলেন এবং মহানন্দে তিনজনে মিলে উদরস্থ করলেন সুপ, মাংস ও ফরাসি সুরা।

যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক মত চলছে কিনা, এবার দেখে নেওয়া হল। রেইসেট এবং রেনঃ... অ্যাপারেটাসে কোনো ত্রুটি নেই, পটাশ দিব্বি টেনে নিচ্ছে কার্বনডায়-অক্সাইডের প্রতিটি পরমাণুকে।

অভিযাত্রীদের আনন্দ তখন দেখে কে! অসম্ভবকে সম্ভব করা গিয়েছে। চাঁদ আর বেশী দূর নেই। নানা কথাবার্তায় কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল কেউ টের পেলেন না। প্রত্যেকের মাথায় নতুন নতুন আইডিয়ার ফোয়ারা খুলে গেল যেন। তিনজনেই হতবুদ্ধি হলেন নিজেদের অকস্মাৎ বাচালতা এবং মস্তিষ্কের উর্বরতা দেখে।

কথায় কথায় নিকল শুধোলেন—"চাঁদে তো নামছি, ফির কি করে?"

বার্বিকেন বললেন—"তা তো জানিনা।"

মাইকেল বললেন—"জানলেও আমি ফিরব না।"

অকস্মাৎ গলা চড়িয়ে বললেন নিকল—"কিন্তু আমি জানি।"

বার্বিকেন বললেন—"প্রোজেকটাইল তো থাকছেই, আর একটা কামান বানিয়ে নিলেই হল। বারুদ? সে বানিয়ে নেওয়া যাবেখন। চাঁদে ধাতু, সোরা, কয়লার অভাব হবে না নিশ্চয়। ছোট-খাট কামান হলেই চলে যাবে। কেননা, চাঁদ থেকে মাত্র ৮০০০ লীগ ওপরে উঠলেই পৃথিবী আমাদের টেনে নেবে। কিন্তু পৃথিবী থেকে তার দশগুণ পথ উঠতে হয়েছে চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে আসবার জন্যে।"

খুশী চনমনে কণ্ঠে বললেন মাইকেল—"তা'হলে আর ভাবনা কি!

প্রোজেকটাইলের পেছনে একটা সুতো বেঁধে আনলে আরো ভাল হত। টেলিগ্রামের আদান-প্রদান চলত তাহলে।"

নিকল গাঁক গাঁক করে উঠলেন—"মাথায় পোকা ঢুকেছে নাকি? আড়াই লক্ষ মাইল লম্বা সুতোর ওজন কতখানি জানেন? সুতোর ভারেই তো প্রোজেকটাইল পড়ে যেত পৃথিবীর ওপর।"

"তা ছাড়াও," বললেন বার্বিকেন, "পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে সুতোটা পৃথিবীর গায়ে জড়িয়ে যেত কাটিয়ে সুতো জড়ানোর মত। টানের চোটে আমরা আছড়ে পড়তাম পৃথিবীর বুকে।"

তারস্বরে বললেন মাইকেল—"তা'হলে ম্যাসটন আরেকটা গোলায় চেপে ফ্লোরিডা থেকে চাঁদে চলে আসবেন। সঙ্গে আসবে গান-ক্লাবের অন্য মেম্বাররা।"

শুনে হৈ-হৈ করে উঠলেন বাকী দু'জনে। সীমাহীন ফুর্তি যেন অন্তহীন উচ্ছলতা নিয়ে টগবগ করছে অভিযাত্রীদের মনের মধ্যে। কিন্তু কেন? কেন এই উত্তেজনা? মগজের মধ্যে অদ্ভুত খোঁচা লাগছে—নতুন নতুন আইডিয়া গজাচ্ছে, মুখে তুবড়ি ছুটছে, গলা ক্রমশঃ চড়ছে। চাঁদের কাছাকাছি আসার জন্যেই কি শুরু হয়েছে রহস্যজনক এই উত্তেজনা? চাঁদ তার অবর্ণনীয় অবোধ্য প্রভাব বিস্তার করে কি ক্ষিপ্ত করে তুলছে অভিযাত্রীদের? স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হচ্ছে কি চাঁদের নিগূঢ় কারসাজির জন্যেই? প্রত্যেকেরই মুখ যেন আগুনের আঁচে লাল হয়ে গিয়েছে, গলা উচ্চগ্রামে চড়ে রয়েছে এবং সোডার বোতলের মুখ থেকে ফটাস্ করে ছিপি ছিটকে যায় যেভাবে, মুখ দিয়ে বচনমালা বেরোচ্ছে সেইভাবে। সব চাইতে আশ্চর্য, কেউই বুঝতে পারছেন না যে অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনজনেই।

"ব্যাপার কী?"

খঁ। করে বললেন নিকল—"চাঁদ থেকে আদৌ ফিরব কিনা জানিনা যখন তখন আমি জানতে চাই কি করব সেখানে।"

দড়াম করে পা ঠুকে বললেন বার্বিকেন—"তাতো জানিনা।"

ভীষণ চেঁচিয়ে উঠলেন মাইকেল—"জানেন না মানে?"

পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন বার্বিকেনও—"না জানিনা!"

"আমি জানি," বললেন মাইকেল।

"তা'হলে তা বলা হোক," নিকল যেন ব্যাঘ্র গর্জন করলেন!

"বলা না বলা আমার খুশী," নিকলের হাত থামচে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মাইকেল।

"বলতেই হবে আপনাকে," বার্বিকেনের চোখে যেন আগুন জ্বলছে। মুঠো দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি মেরে বসবেন। "আপনার পাল্লায় পড়ে এই ঝুঁকি মাথায় নিয়েছি। বলুন কি জানেন।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন মাইকেল—"চাঁদে নতুন উপনিবেশের পত্তন করব। পৃথিবীর শিক্ষা-দীক্ষায় চন্দ্রবাসীদের দীক্ষিত করব।"

"যদি চাঁদে জীব না থাকে ?" গর্জে উঠলেন নিকল।

"কে বললে নেই ?" মারমুখো ভঙ্গীতে বললেন মাইকেল।

"আমি," জবাব দিলেন নিকল।

"ফের বলে দেখুন, দাঁতগুলো গলায় চালান করে দেব ?" বললেন মাইকেল।

দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন পরস্পরের ওপর, মাঝে এসে বাধা দিলেন বার্বিকেন—"থামুন! চন্দ্রবাসী না থাকে তো বয়েই গেল! আমরাই চাঁদকে সুসভ্য করব।"

"চাঁদে সাম্রাজ্য বিস্তার করব!" তুরুক লাফ দিলেন নিকল।

"কংগ্রেস বানাবো!" বললেন মাইকেল।

"গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব!" হেঁকে উঠলেন নিকল।

"বার্বিকেন হবেন প্রেসিডেন্ট!" সোল্লাসে বললেন মাইকেল।

"হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!"—সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন সকলে।

পরক্ষণেই শুরু হয়ে গেল উন্মত্ত নৃত্য! পাগলের মত অঙ্গ-ভঙ্গী করে, পা ঠুকে, সার্কাসের ক্লাউনের মত ডিগবাজী খেয়ে যেন পাগলের হাট বসিয়ে দিলেন তিন অভিযাত্রী! সেই সঙ্গে পাঁচ-ছটা মুরগী কোঁকর কোঁ শব্দে উড়তে লাগল বাদুড়ের মত ডানা ঝটপটিয়ে!

বাতাসের কারসাজিতে যেন আগুন লেগে গিয়েছিল ওঁদের ফুসফুসে। রহস্যজনক প্রভাবের মাদকতায় কিছুক্ষণ পরেই ওঁরা নিঃশেষিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে।

৮ ॥ আটাত্তর হাজার পাঁচশ চোদ্দ লীগ

ব্যাপার কী ? হঠাৎ কেন এই উন্মত্ততা ? কেন এই নাচানাচি ? ক্ষিপ্তের মত আচরণ ?

দোষটা মাইকেলের। কপাল ভাল, বেশী দেরী হওয়ার আগেই নিকল তা ধরে ফেললেন। নইলে মহাবিপর্যয় দেখা যেত।

বেশ কয়েক মিনিট সংজ্ঞাহীন ছিলেন ক্যাপ্টেন। চেতনা ফিরে পেয়ে প্রথমেই অনুভব করলেন দারুণ খিদেতে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হতে চলেছে। অথচ মাত্র দু'ঘণ্টা আগে কব্জি ডুবিয়ে প্রাতরাশ খেয়েছেন। তা সত্ত্বেও এমন পেট জ্বলছে যেন দিনকয়েক পেটে দানাপানি পড়েনি। কেন?

শুধু তাই নয়। উদর আর মস্তিষ্ক—দুটোই অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। উঠে বসলেন নিকল। মাইকেলকে কিছু খানা তৈরী করতে বললেন। মাইকেলের তখন জবাব দেওয়ার মত শক্তিও ছিল না। তাই পড়ে রইলেন নিঝুম হয়ে।

অগত্যা নিকল নিজেই উঠলেন। চা তৈরী করে ডজনখানেক স্যাণ্ডউইচ কোঁৎ কোঁৎ করে গেলার মতলব এঁটে গ্যাসের উনুন জ্বালাতে গেলেন। দেশলাইয়ের কাঠি ঘসতেই চমকে উঠলেন। গন্ধক কি এমন তীব্র দ্যুতি নিয়ে জ্বলে? চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে যে! গ্যাসের উনুন থেকেও তীব্র দ্যুতিময় শিখা উঠছে। অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বাতির মত!

চকিতে বুঝলেন নিকল কেন এই উন্মত্ততা, কেন এই অতি-উত্তেজনা, কেন মস্তিষ্ক আর উদরের মধ্যে এত দাপাদাপি, কেন এই তীব্র আলোকচ্ছটা!

"অক্সিজেন! অক্সিজেন!!" চীৎকার করে উঠলেন নিকল।

বাতাস-যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়তেই পরিষ্কার হয়ে গেল সবকটা রহস্য। কল খোলা—গন্ধহীন বর্ণহীন জীবনদায়িনী অক্সিজেন হু-হু করে বেরিয়ে আসছে আধার থেকে। অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না ঠিকই, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় অক্সিজেন ফুসফুসে গেলে মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে পারে! মাইকেল ভুলক্রমে সেই অক্সিজেনের কল পুরো খুলে রেখেছেন।

ঝটিতে কল বন্ধ করে দিলেন নিকল। বাতাসে ততক্ষণে অক্সিজেনের ভাগ এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মরতে হত সারা শরীরে অতিরিক্ত দহন-ক্রিয়ার জন্যে। ঘণ্টাখানেক পরে স্বাভাবিক হয়ে এল বাতাস। বিষক্রিয়ার খপ্পর থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেলেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু মদ যেমন মাতালকে বেহুঁশ করে রাখে, অক্সিজেনও তাঁদের সেইভাবে কিছুক্ষণ নিদ্রিত রাখল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে।

মাইকেল নিজের ভুল শুনে খুব একটা দুঃখিত হলেন না। যাত্রাপথের একঘেয়েমি ঘুচেছে তো! অক্সিজেনের প্রভাবে অনেক উদ্ভট কথা-বার্তা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অবশ্য। তাতে কী! কিছুক্ষণের মধ্যেই সব বিস্মৃত হলেন অভিযাত্রীরা।

বলে উঠলেন ফুর্তিবাজ ফরাসি—"পাগল-করা গ্যাসের খপ্পরে পড়ে তিলমাত্র

দুঃখ নেই আমার। বন্ধুরা, অক্সিজেন দিয়ে সমাজের কত উপকার করা যায় ভেবেছেন কী? রোগে ভুগে কাহিল যারা, অক্সিজেন-ঠাসা ঘরে তাদের রেখে কয়েক ঘণ্টার জন্যেও জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ দেওয়া যেতে পারে। অক্সিজেন-ঠাসা থিয়েটারে অভিনেতা আর দর্শকদের প্রাণে আরো উত্তেজনার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ কল্পনা করুন! উৎসাহ উদ্দীপনা যেন অগ্নিশিখার মত লকলকিয়ে উঠবে! কামনা-বাসনা প্রেম-ভালবাসা-আবেগ-উত্তেজনার জোয়ার বয়ে যাবে! নিছক জনসমাগমে যতটা না কাজ হবে তার সহস্র গুণ প্রাণ-চাঞ্চল্য-তৎপরতা-জীবনোচ্ছ্বাস দেখা দেবে অক্সিজেন ভরপুর পরিবেশে রেখে তাদের অণু-পরমাণুতে উত্তেজনার আগুন ধরিয়ে দিলে!* যে জাতের প্রাণশক্তি ফুরিয়ে এসেছে, তাকে ফের চাঙা করে তোলা যাবে। শক্তিশালী জাতে পরিণত করা যাবে। ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেওয়া যাবে স্রেফ অক্সিজেন দিয়ে!"

সে কী উত্তেজনা মাইকেলের! চোখ মুখ লাল হয়ে গেল কথা বলতে বলতে। তাই দেখে বার্বিকেন এবং নিকল দেখলেন অক্সিজেনের কলটা ফের খোলা আছে কিনা! না, নেই।

যাই হোক, এরপর তিনজনে মিলে প্রোজেকটাইলের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখেন। গোছ-গাছ করতে গিয়েই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন অভিযাত্রীরা।

পৃথিবী ছেড়ে আসার পর থেকেই ওঁদের ওজন, প্রোজেকটাইলের ওজন এবং প্রোজেকটাইলের ভেতরকার সবকিছুর ওজন হ্রাস পাচ্ছিল অল্প অল্প করে। দাঁড়িপাল্লায় অবশ্য ওজনের এই তারতম্য ধরা পড়বে না; কেননা বাটখারার ওজনও তো কমে গিয়েছে একই অনুপাতে একমাত্র স্প্রিং ব্যালেন্সেই বোঝা যেত কার কত ওজন কমছে।

আকর্ষণের আরেক নাম ওজন। আকর্ষণ বাড়ে বস্তুর ঘনাঙ্ক বাড়লে, কমে দূরত্ব বাড়লে। সুতরাং শূন্যপথে ধাবমান প্রোজেকটাইলকেও এক সময়ে ওজনশূন্য হতেই হবে। অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের কিছু আকর্ষণ তো রয়েছেই, চাঁদের প্রবল আকর্ষণও বাড়ছে। সুতরাং চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝে কোনো একটা স্থানে প্রোজেকটাইল এবং অভ্যন্তরস্থ সবকিছুর কোনো ওজন আর থাকবে না। চাঁদ আর পৃথিবীর ঘনত্ব যদি সমান সমান হত তাহলে এইস্থান

*এই ধারণা নিয়েই লেখা হয়েছে পরবর্তী উপন্যাস "ডক্টর অক্সের এক্সপেরিমেণ্ট।"

ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। কিন্তু ঘনত্ব অসমান হওয়ার দরুন ওজনশূন্য অবস্থা আসবে পৃথিবী থেকে ৭৮,৫১৪ লীগ দূরে। এইখানে পৌঁছোলে যে কোনো বস্তুকে স্থির হয়ে ভাসতে হবে অনন্তকাল—কেননা চাঁদের আকর্ষণ সেখানে যতখানি, পৃথিবীর আকর্ষণও ঠিক ততখানি।

হিসেব ঠিক থাকলে, নামেমাত্র গতিবেগ নিয়ে সে জায়গায় পৌঁছোবে প্রোজেকটাইল। তারপর তিন রকম ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা আছে :

১। ছিটেফোঁটা গতিবেগ থাকার দরুন বিপজ্জনক এই স্থান পেরিয়ে যাবে প্রোজেকটাইল এবং চাঁদের আকর্ষণের মধ্যে গিয়ে পড়ার দরুন শুরু হবে চন্দ্রাভিমুখী পতন।

২। অথবা, সেইস্থানে পৌঁছোবার আগেই যদি ছিটে-ফোঁটা গতিবেগ হারিয়ে ফেলে প্রোজেকটাইল, তাহলে তাকে পৃথিবীই ফের টেনে নেবে নিজের দিকে ; পতন শুরু হবে পৃথিবীর দিকে।

৩। অথবা, কোনো মতে সেইস্থানে পৌঁছোবার পরেই গতিবেগ হারিয়ে ফেলবে প্রোজেকটাইল এবং ত্রিশঙ্কুর মত অনন্তকাল ঝুলবে দুই সমান আকর্ষণের মাঝে।

বার্বিকেন সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত বুঝিয়ে দেওয়ার পর বেলা এগারোটা নাগাদ ওজনশূন্যতার পিলে চমকানো প্রমাণ পাওয়া গেল।

নিকলের হাত থেকে একটা গেলাস ফস্কে গিয়েছিল। কিন্তু শূন্যে আছাড় না খেয়ে গেলাস ভাসতে লাগল শূন্যে।

মাইকেল তো তাজ্জব ভাসমান গেলাসের ম্যাজিক দেখে! তারপরেই দেখা গেল, বন্দুক থেকে আরম্ভ করে বোতল পর্যন্ত—সব জিনিসকেই শূন্যে রেখে দিলে সেইখানেই থেকে যাচ্ছে—পড়ে যাচ্ছে না!

এমন কি ডায়নাকেও শূন্যে বসিয়ে দিলেন মাইকেল। ক্যাপটেন আর রবার্ট হুডিনীর শূন্য-বিহার জাদুবিদ্যাও বিনা কারসাজিতে দেখা গেল প্রোজেকটাইলের মধ্যে।

অভিযাত্রীরা বোকা নন, আকাট মূর্খও নন। বিজ্ঞান এই উদ্ভট কাণ্ড-কারখানার কি ব্যাখ্যা করে, তা তাঁরা জানেন। সব জেনেও তিন জনে হতভম্ব হয়ে গেলেন ভুতুড়ে ব্যাপার চোখের সামনে দেখে। মনে হল আশ্চর্য কোনো দুনিয়ায় এসে পড়েছেন তিনজনে। এ দুনিয়ায় শূন্যে হাত ছেড়ে দিলে হাত আপনা থেকে নেমে আসে না—জোর করে নামাতে হয়। মনে হল, যেন প্রচণ্ড নেশা করেছেন প্রত্যেকেই। তাই ভারহীনতা পেয়ে বসেছে ওঁদের। হাত পায়ের কোনো ওজন আছে বলে মনে হচ্ছে না।

আচমকা তিড়িং করে লাফ দিলেন মাইকেল এবং দাঁড়িয়ে রইলেন শূন্যে।

দুই সঙ্গীও তাই দেখে তিড়িং তিড়িং লাফ মেরে এসে দাঁড়ালেন—শূন্যে।

দুই চোখ কপালে তুলে বললেন মাইকেল—"অসম্ভব? অবিশ্বাস্য? অবাস্তব? মোটেই না! ষোলআনা সম্ভব, বিশ্বাস্য, বাস্তব!"

বার্বিকেন বললেন—"নিউট্রাল পয়েন্ট পেরিয়ে এলেই কিন্তু চাঁদের আকর্ষণ শুরু হবে। তখন ফের নেমে পড়ব মেঝেতে।"

মাইকেল ঈষৎ হেলে পড়ে শূন্যে দাঁড়িয়েই গেলাস আর বোতল টেনে নিলেন তাক থেকে এবং তিন বন্ধু হর্ষধ্বনি করতে করতে মদ্যপানে মত্ত হলেন পরমানন্দে।

এ-অবস্থা অবশ্য ঘণ্টাখানেকের বেশী রইল না। একটু একটু করে ওজন ফিরে পেতে লাগলেন অভিযাত্রীরা।

বার্বিকেন বললেন—"জানেন তো, চাঁদে আমাদের ওজন হবে পৃথিবীর যা ওজন ছিল, তা ছ'ভাগের এক ভাগ মাত্র।"

"মাংসপেশীর শক্তি কমবে না তো?" শুধোলেন মাইকেল।

"মোটেই না। এক গজ লাফাতে গিয়ে চাঁদে লাফাবেন আঠারো ফুট।"

"তা'হলে তো চাঁদে গিয়ে সবাই হারকিউলিস হয়ে যাবো!" মাইকেলের চক্ষু চড়কগাছ হল যেন।

"তা হব," বললেন নিকল। "চান্দ্র-মানবদের উচ্চতাও হবে চাঁদের আয়তনের অনুপাতে, অর্থাৎ বেঁটে খাটো বামনের মত। ফুটখানেক উঁচুও হবে কিনা সন্দেহ!"

"লিলিপুট!" সোল্লাসে বললেন মাইকেল—"আমি তা'হলে গলিভারের ভূমিকা অভিনয় করব। দৈত্যকাহিনী কি জিনিস, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাবে! পৃথিবী পেরিয়ে গ্রহে গ্রহে বেড়ানোর কত মজা বলুন তো!"

বার্বিকেন বললেন—"গলিভার হতে অত সাধ থাকলে যান বুধ, শুক্র আর মঙ্গল গ্রহে। পৃথিবীর চেয়ে সামান্য কম তাদের ঘনত্ব। কিন্তু উল্টো ফল হবে যদি যান বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন গ্রহে। সেখানে আপনাকেই হতে হবে লিলিপুট!"

"যদি যাই সূর্যে।

"সেখানে গিয়ে টের পাবেন পৃথিবীর সাতাশগুণ বেশী মাধ্যাকর্ষণ। সূর্য-লোকবাসীরাও নিশ্চয় সেই অনুপাতে শ দুই ফুট ঢ্যাঙা হবে," বললেন বার্বিকেন। "পৃথিবীতে যার ওজন ১৪০ পাউণ্ড, সূর্যে তার ওজন হবে ৩,৮৬০

পাউণ্ড। আপনার ওজন? দাঁড়ান হিসেব করে নিই। ৫০০০ হাজার পাউণ্ড! আরে মশাই, ঐ ওজন নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেও পারবেন না যে!"

"আরে গেল যা!" বললেন মাইকেল। "তা'হলে তো সঙ্গে কপিকল নিয়ে যেতে হয় দেখছি।"

৯॥ গতিপথ পরিবর্তনের ফলাফল

বার্বিকেনের আর কোনো ভয় রইল না। বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে গোলা ঢুকেছে চাঁদের গণ্ডীর মধ্যে। ত্রিশঙ্কুর মত অনন্তকাল শূন্যে ঝোলার শংকা নেই, পৃথিবীর টানে ফিরে যাওয়ার ভয়ও নেই। এখন ভাবনা কেবল একটা ব্যাপার নিয়ে। চাঁদের কোনে অঞ্চলে অবতীর্ণ হবে প্রোজেকটাইল?

৮২৯৬ লীগ কম পথ নয়। হতে পারে সেখানকার ওজন পৃথিবী পৃষ্ঠে যা ওজন তার ছ ভাগের মাত্র এক ভাগ। কিন্তু ৮,২৯৬ লীগ ওপর থেকে খসে পড়া বড় ভয়ানক ব্যাপার!

দু ভাবে এই ভয়ংকরের সম্মুখীন হতে হবে। পতনের গতিবেগ হ্রাস করতে হবে এবং আছড়ে পড়ার ধাক্কাকে সামলে নিতে হবে।

আছড়ে পড়ার ধাক্কা সামলানোর তোড়জোড় শুরু করলেন বার্বিকেন। চাঁদের আওতায় ঢোকার পর ধীরে ধীরে উল্টো মুখ হয়ে গিয়েছিল প্রোজেকটাইল। অর্থাৎ শঙ্কুর মত ছুঁচোলো মুখটা পৃথিবীর দিকে মুখ করেছিল এবং ভারী তলদেশটা ঘুরে গিয়ে চাঁদের দিকে—উপর থেকে নীচে পড়বার সময়ে যা হয় আর কী!

জলের স্প্রিং দিয়ে আছড়ে পড়ার ধাক্কাকে সামলানো আর সম্ভব নয়। খাবার জল ও-কাজে লাগানো যাবে না। কাঠের পার্টিসনগুলোকে ফের ইস্পাতের প্লাগের ওপর এঁটে নিলেন অভিযাত্রীরা। সুকঠিন স্পিং-প্লাগের ওপর একে একে আঁটা হল কাঠের পার্টিসন আর চাকতিটা। ওজন নামমাত্র হয়ে যাওয়ায়, ভারী ভারী কাঠ আর স্টিলকে পালকের মত তুলে নাটবল্টুর সাহায্যে এঁটে দিলে ওঁরা। ঠিক যেন পায়ার ওপর টেবিলের মত খাড়া রইল স্টীলপ্লাগ। প্রথম ধাক্কা লাগবে এই ইস্পাতের পায়ায়—কাঠের পার্টিসন আর চাকতি আটকে দেবে পতনের অবশিষ্ট ঝাঁকুনি।

এইসব করতেই গেল একটি ঘণ্টা। বারোটা নাগাদ ইস্পাতের প্লাগ যথাস্থানে বসিয়ে ওরা জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। চাঁদের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পতনের গতিবেগও টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ঈষৎ বেঁকে রয়েছে

প্রোজেকটাইল। সোজাসুজি চাঁদের দিকে না পড়ে যেন চন্দ্রপৃষ্ঠের সমান্তরাল রেখায় হু-হু করে এগিয়ে চলেছে প্রোজেকটাইল: এ কেমনতর পতন? অস্বস্তি বোধ করলেন অভিযাত্রীরা।

নিকল শুধোলেন—"চাঁদে পৌঁছোবো তো?"

"পৌঁছোবো মনে করেই প্রস্তুত হওয়া যাক," বললেন বার্বিকেন।

"আলবৎ পৌঁছোবো," বললেন মাইকেল।

বার্বিকেন পতনের গতিবেগ মন্দীভূত করার আয়োজন শুরু করলেন। বুদ্ধিটা মাইকেলের। এখন শুরু হল সেইমত প্রস্তুতি-পর্ব।

চাঁদে বাতাস নেই, অথচ চাঁদের আগ্নেয়গিরি ঠিক কাজ করে চলেছে। ঠিক তেমনি, চাঁদের আবহমণ্ডল বায়ুশূন্য হলেও আতসবাজীর খেলা সেখানে জমবে ভাল। অর্থাৎ প্রোজেকটাইলের তলদেশ থেকে নিক্ষিপ্ত হবে বিশাল বিশাল হাউই। হাউই নিক্ষিপ্ত হবে চাঁদের দিকে—সবেগে সামনে ধাবিত হওয়ার সময়ে ধাক্কা মারবে পেছনে অর্থাৎ প্রোজেকটাইলের ওপর। ফলে, মোটর গাড়ীর ব্রেক টেপার মত মুহুর্মুহু বিপরীত ধাক্কায় পতনের বেগ হ্রাস পাবে প্রোজেকটাইলের।

মস্ত রকেটগুলো সাজানো আছে ছোট ছোট স্টীল কামানের মধ্যে। প্রত্যেকটা কামান আঠারো ইঞ্চির মত বেরিয়ে আছে তলদেশ ফুঁড়ে। এরকম বিশটা কামান সাজানো আছে চক্রাকারে। পেছনকার ধাতুর চাকতি খুলে পলতেতে আগুন ধরিয়ে ফের চাকতি বন্ধ করে দিলেই হাউইগুলো প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবে চাঁদকে লক্ষ্য করে, রুখে দেবে পতনের বেগ।

তিনটা নাগাদ কামানগুলোয় হাউই ঠাসা শেষ হল। এখন শুধু প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর নেই।

মাধ্যাকর্ষণের শক্তি প্রোজেকটাইলের ওপর কাজ করছে না দেখে চিন্তায় পড়লেন বার্বিকেন। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তিনটি সম্ভাবনার কথা তাঁর হিসেবে ছিল—নিউট্রাল পয়েন্টে ঝুলে থাকা, চাঁদের দিকে পতন, নয়তো পৃথিবীর দিকে ফিরে যাওয়া। এখন দেখা যাচ্ছে একটা চতুর্থ সম্ভাবনা। ভয়ংকর সেই সম্ভাবনার ভয়াবহতা সইবার ক্ষমতা কেবল নিকলের মত নির্বিকার, বার্বিকেনের মত দৃঢ়চেতা এবং মাইকেলের মত অসমসাহসিক মানুষেরই আছে! অন্তর্গ্রহ পরিভ্রমণে এর চাইতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা বুঝি আর নেই।

কথা-বার্তা শুরু হল এই প্রসঙ্গ নিয়েই। মাইকেল বললেন—"তা'হলে এখন দেখা যাচ্ছে আমরা চাঁদের দিকে যাওয়ার পথ থেকে সরে গিয়েছি। কিন্তু কেন সরেছি?"

"কোলাম্বিয়াড কামানের নল ঠিকমত তাগ করা হয় নি বলে বোধ হয়," বললেন নিকল।

বার্বিকেন বললেন—"না, না, চাঁদকে ঠিকই টিপ করা হয়েছিল। কারণটা তা নয়।"

চাঁদের দিকে কাৎ হয়ে ছুটে চলল প্রোজেকটাইল। সরাসরি আছড়ে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না!

রাত আটটা পর্যন্ত জানলায় বসে রইলেন তিনজনে। একদিকে চাঁদ, আরেকদিকে সূর্য। প্রোজেকটাইলের ভেতরে যেন আলোর বন্যা।

হিসেব করে দেখলেন বার্বিকেন, চাঁদ থেকে ওরা ১০০০ লীগ ওপরে রয়েছেন। সেকেণ্ডে প্রায় ২০০ গজ বেগে ছুটছে প্রোজেকটাইল। দুটো শক্তি কাজ করছে ছুটন্ত গোলার ওপর—কেন্দ্রাভিগ শক্তি এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি। যে কোনো মুহূর্তে প্রোজেকটাইলের গতিপথ সরলরেখা থেকে বেঁকে গিয়ে বক্ররেখায় পরিণত হতে পারে। ফলটা কি দাঁড়াবে, তা এখন বলা যাচ্ছে না। চাঁদের দিকে না গিয়ে ছিটকে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে ধাবমান গোলা!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা করে চললেন বার্বিকেন। দুরূহ সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। চাঁদের কাছে এসেও কিন্তু চাঁদে পৌঁছোচ্ছে না প্রোজেকটাইল! কস্মিনকালেও পৌঁছোবে না! আকর্ষণ ও বিকর্ষণের যুগপৎ টানা-হ্যাঁচড়ায় গতিপথ বেঁকে গিয়েছে।

মাইকেল বললেন—"গুপ্ত-রহস্যটা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। কেন চাঁদে যাচ্ছি না আমরা? কিসের জন্যে?"

"নিপাত যাক, গোল্লায় যাক, জাহান্নামে যাক সে—যার জন্যে প্রোজেকটাল বিপথে চলেছে।" গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন নিকল।

সহসা যেন আলো ঝলসে উঠল বার্বিকেনের মনের মধ্যে। সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন গলার শির তুলে—"নিপাত যাক, গোল্লায় যাক, জাহান্নমে যাক সেই উল্কা—একচুলের জন্যে যে এড়িয়ে গেছে প্রোজেকটাইলকে!"

"কী!" বললেন মাইকেল আর্দাঁ।

"কী বললেন!" সবিস্ময়ে শুধোলেন নিকল।

"বললাম যে হতচ্ছাড়া সেই গ্রহাণুটাই বেঁকিয়ে দিয়েছে প্রোজেকটাইলের গতিপথ।"

"কিন্তু সত্যি সত্যিই তো গ্রহাণু আমাদের গা ঘেঁসে যায় নি," বললেন মাইকেল।

"না গেলেও প্রোজেকটাইলের আয়তনের অনুপাতে জিনিসটা ছিল

অতিকায়। সুতরাং তার আকর্ষণে প্রোজেকটাইল নড়ে-চড়ে উঠবে, এ আর আশ্চর্য কী?"

"কিন্তু সে তো অতি সামান্য!" বললেন নিকল।

"হ্যাঁ, সামান্য, অতি সামান্য," জবাব দিলেন বার্বিকেন। "কিন্তু একচুলও নড়ে যাওয়া মানে ৮৪,০০০ লীগ পথ পেরিয়ে আসার পর চাঁদকে পাশ কাটিয়ে মহাশূন্যে উধাও হওয়া! নিকল, আমরা চাঁদে পৌঁছোবো না এই কারণেই?"

১০॥ চন্দ্র পর্যবেক্ষক

বার্বিকেন ঠিক ধরেছিলেন। উড়ন্ত উল্কাই ঈষৎ নড়িয়ে দিয়েছে প্রোজেকটাইলকে। ফলে, চাঁদে অবতীর্ণ হওয়া আর সম্ভব নয়।

তা না হল, কিন্তু খুব কাছ দিয়ে গেলেও তো চন্দ্রপৃষ্ঠের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যেত। তা কি সম্ভব হবে? অভিযাত্রীরা শেষকালে তন্ময় হলেন এই চিন্তা নিয়ে। তখনো কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি কি বিপুল বিস্ময় অপেক্ষিত রয়েছে তাঁদের ভাগ্যে।

মহাশূন্যে উধাও হবার পর অশেষ দুর্গতি আছে কপালে। বাতাস ফুরোবে, খাবার ফুরোবে, জলও ফুরোবে। প্রোজেকটাইলের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে, অনাহারে মরতে হবে অভিযাত্রীদের।

২০০ লীগ ওপর থেকে চাঁদকে স্পষ্ট দেখা গেল না। অথচ পৃথিবীতে বসে লঙ পীক-য়ের দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন চাঁদ মাত্র দু লীগ দূরে এসে পৌঁছেছে।

প্রোজেকটাইল তীর্যক রেখায় ছুটে চলেছে চাঁদের দিকে। তাই দেখে মাইকেলের তখনো বিশ্বাস, চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁরা অবতীর্ণ হবেনই। কিন্তু প্রতিবার নিষ্ঠুর যুক্তি দিয়ে তাঁর আশাকে ধূলিসাৎ করছেন বার্বিকেন।

বলছেন—"কেন্দ্রাভিগ শক্তি প্রোজেকটাইলকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রোজেকটাইলকে কেন্দ্রের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। এখানে কেন্দ্র হল চাঁদ। শেষপর্যন্ত কেন্দ্রাতিগ শক্তির ঠেলায় চাঁদ থেকে আমরা দূরে সরে যাবোই।"

বলে, চাঁদের ম্যাপ খুলে বসলেন বার্বিকেন।

মধ্যরাত্রি এল। উড়ন্ত উল্কা বিভ্রাট না ঘটালে এখনি চন্দ্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ার কথা। কিন্তু সে আশা এখন দুরাশা! তাই দুরু দুরু বুকে অভিযাত্রীরা শুধু চোখ নিয়ে চাঁদকে যেন গিলতে লাগলেন। পৃথিবীর মানুষ চাঁদকে শুধু

চোখে এভাবে দেখেনি। মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঁরা তিনজন দেখলেন সে আশ্চর্য দৃশ্য।

ম্যাপের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠ মিলিয়ে দেখছিলেন মাইকেল। ধূ-ধূ বিস্তার দেখলেই চন্দ্রবিদরা সেগুলোকে 'সমুদ্র' ধরে নিয়ে উদ্ভট নামকরণ করেছিলেন। আসলে সেগুলো মরুভূমির মত প্রান্তর। কানাছেলের নাম যদি পদ্মলোচন দেওয়া যায়, নামগুলোরও মানে দাঁড়াচ্ছে। যথা: ঝটিকা-সমুদ্র, শিশির-উপসাগর, স্বপ্ন-সরোবর ইত্যাদি।

মাইকেল ব্যস্ত রইলেন তাঁর উদ্দাম কল্পনা নিয়ে, তাঁর দুই সঙ্গী তখন তন্ময় হয়ে রইলেন নতুন জগতের ভৌগোলিক খুঁটিনাটির মাপজোক নিয়ে।

চান্দ্র-গোলার্ধ ভূ-গোর্ধের তেরোভাগের একভাগ মাত্র। তা সত্ত্বেও চন্দ্রবিদরা ঐটুকু জায়গার মধ্যেই গুণেছেন প্রায় পনেরো হাজার জ্বালামুখ।

১১॥ শৈলতত্ত্ব

রাত বারোটার পর পর।

বার্বিকেন হিসেব করে দেখলেন, চন্দ্রপৃষ্ঠের ৭৫০ মাইল উর্ধ্বে পৌঁছেছে প্রোজেকটাইল এবং এগিয়ে চলেছে উত্তর খোলার্ধের দিকে। দূরবীন কষে এবার চন্দ্রপৃষ্ঠের এমন দৃশ্যাবলী দেখা গেল যা অ্যাদ্দিন পৃথিবীর পর্যবেক্ষকদের চোখে অদৃশ্য ছিল।

বোর এবং মিলারের 'ম্যাপা সেলেনোগ্রাফিকা' নামক মানচিত্র খুলে অভিযাত্রীরা পায়ের তলায় চন্দ্রপৃষ্ঠের অনেক কিছুই চিনতে পারলেন দূরবীনের মধ্যে দিয়ে।

বার্বিকেন ধারাবিবরণী দিয়ে চললেন—"ঐ দেখুন মেঘ-সমুদ্র। জনৈক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতানুসার মেঘ-সমুদ্র সত্যিই বালির মাঠ কিনা, এতদূর থেকে জানা সম্ভব নয়। রু অবশ্য বলেছেন, মেঘ-সমুদ্র নাকি গভীর অরণ্য। এঁর মতে অবশ্য, চাঁদের খুব ঘন একটা বায়ুমণ্ডলও আছে। দেখা যাক কোনটা সত্যি।"

ম্যাপে যদিও মেঘ-সমুদ্রকে অস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। চন্দ্রবিদদের ধারণা, বিশাল এই প্রান্তরে নাকি রাশি রাশি লাভা জমে আছে এবং সেই লাভা এসেছে ডানদিকের আগ্নেয়গিরিদের জঠর থেকে।

একটু পরেই দেখা গেল মেঘ-সমুদ্রর উত্তর প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা পাহাড়। সূর্যের আলোয় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে অপরূপ পর্বত—শিখর দেশ ছেয়ে আছে অত্যুজ্জ্বল সূর্যকিরণে।

"কি নাম পাহাড়টার?" শুধোলেন মাইকেল।

"কোপারনিকাস," জবাব দিলেন বার্বিকেন।

কোপারনিকাসের উচ্চতা ১০,৬০০ ফুট। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান এই পর্বত। 'টাইকো ব্রাহি'র মতে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে আলোক বিচ্ছুরণে মস্ত ভূমিকা নিয়েছে এই কোপারনিকাস। মেঘ-সমুদ্র আর তুফান-সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় দানবিক লাইট-হাউসের মত মাথা তুলে দুই সমুদ্রকেই পথের নিশানা দেখাচ্ছে কোপারনিকাস। রাত একটার সময়ে বেলুনের মতই ধাবমান প্রোজেকটাইল ভেসে এল চমকপ্রদ পর্বতের ঠিক মাথার ওপর।

কোপারনিকাসকে দেখে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি বলে মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে তা নয়। কোপারনিকাস এখন মৃত। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল পাহাড়ের আশেপাশে অগ্ন্যুৎপাতের বিস্তর চিহ্ন।

পাহাড়ের ঠিক ওপরে পৌঁছোলো প্রোজেকটাইল। অভিযাত্রীরা দেখলেন প্রায় বাইশ লীগ বৃত্তাকার পরিধির মধ্যে ধূসর প্রান্তর। তাতে হলদেটে আভাস। বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে মূল্যবান রত্নের মত ঝকমক করছে কয়েকটা আগ্নেয়শিলা।

দক্ষিণ দিকের প্রান্তর চ্যাটালো। উঁচু টিলার চিহ্ন মাত্র নেই। উত্তর দিকে ঠিক তার উল্টো। তরল পদার্থ ঝটিকা বিক্ষুব্ধ হলে যেমন দেখায়—সেখানকার উচ্চাবচ প্রান্তর অবিকল সেই রকম। যেন ঢেউ খেলে গিয়েছে বন্ধুর অঞ্চলে। সব কিছুর ওপর দিয়ে আলোকময় রশ্মিরেখা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কোপারনিকাসে।

অদ্ভুত এই রশ্মিরেখার উৎপত্তি রহস্য দিয়ে শুরু হল আলোচনা। বার্বিকেন বললেন—"হার্সচেলের মতে নাকি রশ্মিরেখাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়া লাভার স্রোত—সূর্যালোকে অমন ঝলমল করে।"

চান্দ্র-চাকতির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল প্রোজেকটাইল। মুহূর্তের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারলেন অভিযাত্রীরা। মিনিটে মিনিটে পালটে যাচ্ছে দৃশ্যাবলী। রাত দেড়টার সময়ে দেখা গেল আরেকটা পাহাড়। ম্যাপ দেখে নাম বললেন বার্বিকেন। ইরাটোসথেন্স।

এ-পাহাড়ের উচ্চতা ৯০০০ ফুট। বার্বিকেন আরো বললেন, বিখ্যাত গণিতবিদ কেপলারের মতে এই ধরনের জ্বালামুখ নাকি মানুষের হাতে গড়া।

"উদ্দেশ্য?" শুধোলেন নিকল।

"একটানা পনেরো দিন সূর্যকিরণের আঁচ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নাকি চান্দ্র-মানবরা মাটি খুঁড়েছে এইভাবে।"

"চান্দ্র-মানবরা আর যাই হোক, গবেট নয়," বললেন মাইকেল।

নিকল বললেন— "উদ্ভট কল্পনা সন্দেহ নেই। তবে কেপলারের অনুমানে ভুল আছে। ক্ষুদে চান্দ্র-মানবদের পক্ষে প্রকাণ্ড গর্ত খোঁড়া একেবারেই অসম্ভব!"

"কিন্তু চাঁদের ওপর ওজন তো পৃথিবীর ওপরকার ওজনের ছ-ভাগের এক ভাগ মাত্র," বললেন মাইকেল।

"চান্দ্র-মানবরাও তো ছ-গুণ ছোট," খ্যাঁক করে উঠলেন নিকল।

"চান্দ্র-মানব থাকলে তো!" বললেন বার্বিকেন।

সুতরাং আলোচনার ইতি হল সেইখানেই।

রাত দুটোর সময় বার্বিকেন দেখলেন চাঁদের ছ-শ মাইল ওপরে পৌঁছেছে প্রোজেকটাইল।

১২ ॥ চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য

রাত আড়াইটে!

প্রোজেকটাইল চাঁদ থেকে এখন ৫০০ মাইল উর্ধ্বে এবং উড়ে চলেছে চান্দ্র-সমাক্ষ রেখার ওপর দিয়ে। বার্বিকেন ঘাবড়ে গিয়েছেন গোলার গতিবেগ দেখে। কমও না বেশীও না। ৫০০ মাইল দূরত্ব থেকেই চাঁদের আকর্ষণের দরুণ গতিবেগ আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাচ্ছেন না প্রেসিডেন্ট। নীচে ঘন ঘন পট পাল্টানো, চাঁদের নতুন নতুন চেহারা দেখা যাচ্ছে— পর্যটকরা বিমুগ্ধ চাহনি মেলে প্রত্যেকটি দৃশ্য মুখস্থ করে নিচ্ছেন।

অনেক রঙের ছিটে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রপৃষ্ঠে। ধ্যাবড়া রঙ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। চন্দ্রবিশারদেরা এই রঙের হেঁয়ালী বুঝে উঠতে পারেন নি। কয়েক জায়গায় সবুজ রঙটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো জ্বালামুখের ওপর জ্বল্-জ্বল্ করছে নীলচে আভা—সদ্য পালিশ করা ইস্পাতের চাদরের মত। সবুজ আভাটা কিসের? গাছপালার কী? তার মানে কি চাঁদের বুক ঘেঁসে একটা বায়ুমণ্ডলও আছে? আরো কিছু দূর গিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল লালচে আভা। কিন্তু লালাভ বর্ণের উৎপত্তি রহস্য বোধগম্য হল না।

মাইকেল আর্দা সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন কতকগুলো সাদা রেখা দেখে। সূর্যের ঋজু কিরণে ঝলমল করছে সাদা রেখাগুলো—কোপারনিকাসের রেখার মত নয়—এ রেখা সমান্তরাল ভাবে চলেছে বহুদূর পর্যন্ত।

"দেখুন! দেখুন!! লাঙল চষা জমি!"

"লাঙল চষা জমি!" অবাক হলেন নিকল।

বার্বিকেন তখন বুঝিয়ে দিলেন, দূর থেকে যাকে লাঙল চষা মনে হচ্ছে, আসলে তা চাঁদের বুকে সারি সারি ফাটল। লম্বায় প্রতিটা ফাটল ৪০০ থেকে ৫০০ লীগ; চওড়ায় ১০০০ থেকে ১৫০০ গজ। এর বেশী তিনি কিছু জানেন না।

দূরবীনের মধ্যে দিয়ে ফাটলগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন বার্বিকেন। ঠিক যেন দুর্গ প্রাকার। কল্পনা করলেন, সুদক্ষ চান্দ্র-ইঞ্জিনীয়াররা সমান্তরাল রেখায় বানিয়ে গিয়েছে কেল্লার পর কেল্লা।

সুন্দর ভাবে মেপে-জুকে সাজানো বিচিত্র এই ফাটল নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু কল্পনা করেছেন এককালে। ১৭৮৯ সালে স্ক্রোটার গুণেছিলেন ফাটলের সংখ্যা। মোট সত্তরটা ফাটল উনি দেখেছিলেন—কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। কেল্লা নয় নিশ্চয়, শুকনো নদীখাতও নয়।

চাঁদ এখন মাত্র ৪০০ মাইল দূরে। প্রোজেকটাইল উড়ে চলেছে ৪০ ডিগ্রী চান্দ্র-অক্ষাংশ বরাবর। দূরবীনের পাল্লায় চন্দ্রপৃষ্ঠ এগিয়ে এসেছে মাত্র চার মাইল দূরে।

পায়ের তলায় দেখা যাচ্ছে মাউন্ট হেলিকন, ১,৫২০ ফুট উঁচু। বাঁ-দিকে বর্ষা-সমুদ্র।

চাঁদে জীব আছে কিনা, গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের জবাব নিয়ে এবার বিব্রত হলেন বার্বিকেন। এখনই পাওয়া উচিত এ-প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু ধু-ধু ধূসরতা, পাহাড় আর প্রান্তর ছাড়া এখনো পর্যন্ত জীবনের চিহ্ন চোখে পড়েনি। মানুষের হাতের কাজ নেই. ভগ্নস্তূপও নেই, জন্তু-জানোয়ারের দলও নেই। উদ্ভিদের চিহ্নও নেই কোথাও। পৃথিবী গ্রহে আছে খনিজ-জগৎ, পাদপ-জগৎ এবং জীব-জগৎ। চাঁদে আছে শুধু খনিজ-জগৎ।

সঙ্গীদের প্রশ্নের জবাবে বার্বিকেন বললেন—"সাড়ে তিন মাইল ওপর থেকে চান্দ্র-মানব বা চান্দ্র-জীবদের দেখার আশা করা যায় না। ওরা হয়ত প্রোজেকটাইলকে ঠাহর করতে পারছে, আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি না।"

ভোর পাঁচটায় পঞ্চাশতম সমাক্ষরেখায় পৌঁছোলো প্রোজেকটাইল। চাঁদ রয়েছে মাত্র তিনশ মাইল নীচে। বাঁদিকে পাহাড়ের সারি—সূর্যের আলোয় যেন জ্বলছে। ডান দিকে একটা অন্ধকারময় নিতল খাদ। যেন একটা পাতাল-কূপ।

এই হল কৃষ্ণ-সরোবর। সুগভীর জ্বালামুখটা প্লুটো। চাঁদের ওপর এই ধরনের কালোরঙ বিরল বললেই চলে। প্লুটোর প্রস্তর-প্রাকার লম্বায় সাতচল্লিশ মাইল এবং চওড়ায় বত্রিশ মাইল।

ভোর পাঁচটা। বর্ষা-সমুদ্র শেষ হল। ডাইনে দেখা যাচ্ছে কোনডামাইন পাহাড়, বাঁয়ে ফনটেনেলি পাহাড়। সারা জল্লাট জুড়ে কেবল পাহাড়। সবার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ফিলোলস পাহাড়—চূড়োর উচ্চতা ৫,৫৫০ ফুট।

চাঁদে বাতাস না থাকায় গোধূলি বলে কিছু নেই, আলো আঁধারির ছায়া মায়া নেই। ঝক্‌ঝকে আলোর পরেই, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। খট্‌খটে রোদ্দুরের পরেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

৮০ ডিগ্রী অক্ষাংশে পৌঁছেছে প্রোজেকটাইল। চাঁদ এখন মাত্র পঞ্চাশ মাইল নীচে। ভোর পাঁচটা নাগাদ তো গিয়োজা পাহাড়ের মাত্র পঁচিশ মাইল দূর দিয়ে উড়ে গেল প্রোজেকটাইল। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে মনে হল যেন মাত্র সোয়া মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে চাঁদের পাহাড়!

চাঁদ বুঝি এবার নাগালের মধ্যে এসে গেল! চাঁদের ছোঁয়া এবার বুঝি লাগল প্রোজেকটাইলের সঙ্গে। ঐ তো দূরে দেখা যাচ্ছে উত্তর মেরু। কালো মহাকাশের পটভূমিকায় ঝকঝক্ করছে মেরুপ্রদেশের বঙ্কিম রেখা। সেইদিকেই চলেছে চাঁদ এবং হয়ত মেরু অঞ্চলেই অবশেষে অবতীর্ণ হবে পৃথিবীর যান—উড়ন্ত গোলা!

মাইকেল আর্দাঁর দুর্বার সাধ হল জানলা খুলে চন্দ্রপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়ার। চাঁদে অবশ্য পৌঁছোতেন না তিনি। প্রোজেকটাইল যদি না পৌঁছোয়, তিনিও তাহলে পৌঁছোবেন না।

সকাল ছটা। চান্দ্র-মেরু আবির্ভূত হল দৃষ্টি সীমায়। একদিকে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, অপরদিকে নিবিড় তিমির আবৃত অন্ধকার প্রদেশ।

আচম্বিতে তীব্র আলোর রাজ্য থেকে নিশ্ছিদ্র তমিস্রার রাজ্যে প্রবেশ করল প্রোজেকটাইল!

১৩॥ সুদীর্ঘ রাত্রি

দপ করে আলো নিভে গেল যেন! যেন দানবিক ফুৎকারে নিমেষের মধ্যে নির্বাপিত হল জলন্ত সূর্য! অন্ধকার! নিঃসীম সেই অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা চলে না কোন কিছুরই।

এই হল চাঁদের রাত। সুদীর্ঘ রাত। তিনশ সাড়ে চুয়ান্ন ঘণ্টা দীর্ঘ—দিনের হিসেবে প্রায় পনেরো দিন!

এ-কাণ্ড যখন ঘটল, চাঁদের মেরু অঞ্চল তখন আরো কাছে এগিয়ে এসেছে—পঁচিশ মাইলও নয়।

মিতব্যয়ী বার্বিকেনকেও শেষকালে গ্যাসবাতি জ্বালতে হল পরস্পরের মুখ দেখার জন্যে।

সারারাত অতন্দ্রনয়নে চন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে এবার প্রাতরাশের আয়োজনে বসলেন মাইকেল। খাবার ইচ্ছে ছিল না কারোরই, তবুও যৎসামান্য খেয়ে নিয়ে ফের শুরু হল আলোচনা। চান্দ্র-মানবরা যদি আদৌ থাকে চন্দ্রপৃষ্ঠে, তা'হলে চাঁদের কোন অঞ্চল তাদের বসবাসের পক্ষে বেশী উপযুক্ত? যেদিকে পনেরো দিন রাত, সেইদিকে? না, যেদিক পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান, সেইদিকে?

প্রত্যেকেই স্বমত ব্যক্ত করলেন। বার্বিকেনের মাথায় কিন্তু ঘুরছে এক চিন্তা; উত্তর মেরুর পঁচিশ মাইলের মধ্যে এসেও চাঁদে আছড়ে পড়ল না কেন প্রোজেকটাইল?

গতিবেগ প্রচণ্ড না হলে বোঝা যেত চন্দ্রাবতরণের সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু তা তো নয়; গতিবেগ মাঝামাঝি, তা সত্ত্বেও চাঁদ কেন নিজস্ব আকর্ষণ দিয়ে প্রোজেকটাইলকে টেনে নিচ্ছে না? বাইরের কোনো আকর্ষণের আওতায় পড়ছে নাকি প্রোজেকটাইল? চাঁদের কোনো অঞ্চলেই তাঁরা নামছেন না—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যাচ্ছেন কোথায়? চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন কী? না, আরো কাছাকাছি হচ্ছেন চন্দ্রপৃষ্ঠের? নাকি অনন্ত শূন্যে ভেসে চলেছেন নিঃসীম অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে? ইথার নিমজ্জিত প্রোজেকটাইল কি পথভ্রষ্ট হল ছায়াপথের গহন অঞ্চলে?

অন্ধকারে দেখা না গেলেও চাঁদ হয়ত কাছেই রয়েছে। কিন্তু বায়ুশূন্যতার দরুণ ক্ষীণতম শব্দ ভেসে আসছে না তলদেশ থাকে।

দেখা যাচ্ছে কেবল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। তারকাখচিত কালো মহাকাশের সেই রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বাতাস না থাকায় নক্ষত্রেরা এখানে মিটমিট করে না—দ্যুতি বিকিরণ করে শুধু নীরবে চেয়ে থাকে।

নির্বাক বিস্ময়ে চেয়েছিলেন অভিযাত্রীরা, সম্বিৎ ফিরল কনকনে ঠাণ্ডায়। জানলার কাঁচে বরফ জমছে। মহাশূন্যের শৈত্য প্রোজেকটাইল আবরণ ভেদ করে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত আর্দ্রতা সেই ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে জমছে জানলার কাঁচে।

থার্মোমিটার দেখলেন নিকল; শূন্য তাপাংকের সতেরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে পৌঁছেছে পারা। নিরুপায় হয়ে গ্যাসের আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করতে শুরু করলেন বার্বিকেন। নইলে মৃত্যু অবধারিত।

নিকল শুধোলেন—"বাইরের টেম্পারেচার এখন কত?"

বার্বিকেন সোৎসাহে বললেন—মহাশূন্যের তাপাংক মাপবার এই হল সুবর্ণ-সুযোগ। দেখা যাক কার কথা ঠিক, ফোরিয়ার-য়ের না পোইলেট-য়ের।"

সাধারণ থার্মোমিটার দিয়ে অত ঠাণ্ডা মাপা যায় না। পারা জমে কঠিন হয়ে যাবে থার্মোমিটারের মধ্যেই। বার্বিকেন তাই বুদ্ধি করে স্পিরিট থার্মোমিটার এনেছিলেন সঙ্গে দারুণ কম তাপমাত্রা মাপবার জন্যে।

"কিন্তু থার্মোমিটারকে বাইরে রাখবেন কি করে?" শুধোলেন নিকল।"

"কেন, জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে," বললেন মাইকেল।

"হাতটা ঠাণ্ডায় খসে যাবে মশায়," বললেন বার্বিকেন।

"তা'হলে উপায়?" শুধোলেন নিকল।

"সুতো বেঁধে জানলা গলিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক। কিছুক্ষণ পরে সুতো ধরে টেনে নেব," বললেন বার্বিকেন।

প্রস্তাবটা মনে ধরল সবার। ঝট্ করে জানলা ফাঁক করেই সুতো বাঁধা স্পিরিট থার্মোমিটার গলিয়ে দেওয়া হল বাইরে। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই মহাশূন্যের খানিক শৈত্য ঢুকে পড়ল ভেতরে। সে কী ঠাণ্ডা! মাইকেল বলে উঠলেন—"বাসরে! এ ঠাণ্ডায় শ্বেত ভল্লুকও জমে যাবে!"

আধ ঘণ্টা পরে সুতো ধরে থার্মোমিটার টেনে নিলেন বার্বিকেন।

বললেন—"শূন্য তাপাংকের একশ চল্লিশ ডিগ্রী কম!"

পোইলেট-ই ঠিক বলেছিলেন—ফোরিয়ারের হিসেব ভুল। ভয়ংকর এই শৈত্য শুধু মহাকাশ জুড়েই নেই—সূর্যরশ্মি বঞ্চিত চাঁদের অন্ধকার অংশেও রয়েছে!

১৪॥ অধিবৃত্ত না পরাবৃত্ত?

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিৎ জেনেও অঙ্ক নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন বার্বিকেন এবং নিকল। ভাবগতিক দেখে মনে হল, বাড়ীতে বসে আছেন দু'জনে—মহাশূন্যে নয়!

পৃথিবীর হিসেবে সেদিন ডিসেম্বরের ছ' তারিখ। অজানা পথে ধেয়ে চলেছে প্রোজেকটাইল। উড়ন্ত যানের ওপর কোনো হাত নেই অভিযাত্রীদের। তাঁদের শক্তি নেই প্রোজেকটাইলের স্পীড কমানোর, গতিমুখ পাল্টে দেওয়ার। তবুও হিসেব করে চলেছেন দুজনে।

অবশেষে মুখ খুললেন বাক্যবাগীশ মাইকেল।

বললেন—"আমার তো মনে হয় এইভাবে যেতে যেতে চাঁদের বুকে ঠিকরে পড়বে প্রোজেকটাইল।"

বার্বিকেন বললেন—"তার কোনো ঠিক নেই। পৃথিবীতে যত উল্কা খসে পড়ে, তার অনেক বেশী উল্কা বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে জলতে জলতে মহাশূন্যে ছিটকে যায়। মাইল চল্লিশ ওপর দিয়ে পিছলে যায় বাইরে। আমাদের প্রোজেকটাইলেরও যে সেই দশা হবে না, তা কে বলতে পারে?"

"তাই যদি হয়," শুধোলেন মাইকেল, "মহাশূন্যে কিভাবে ছুটবে প্রোজেকটাইল?"

"অংকশাস্ত্র অনুযায়ী দুটো পথের নির্দেশ পাচ্ছি। হয় অধিবৃত্তের পথে, না হয় পরাবৃত্তের পথে।"

"সেটা আবার কী!" হাঁ হয়ে গেলেন মাইকেল।

বার্বিকেন তখন বুঝিয়ে দিলেন জ্যামিতিক বৃত্ত দুটোকে দেখতে কিরকম। সবশেষে বললেন, যে পথই ধরুক না কেন প্রোজেকটাইল—পৃথিবীতে আর ফিরে যেতে হচ্ছে না, চাঁদে অবতরণও ইহজন্মে আর সম্ভব নয়!

ভোর চারটের সময়ে বার্বিকেন আবিষ্কার করলেন, ভারী জিনিস ওপর থেকে নীচে পড়বার সময়ে যা হয়, প্রোজেকটাইলের অবস্থাও হয়েছে তাই। অর্থাৎ গুরুভার তলদেশ বেঁকে গিয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠের দিকে!

তবে কি শুরু হল চন্দ্রাভিমুখী পতন?

কিন্তু না, ভুলটা ভাঙল একটা লোহিত বিন্দু দেখে!

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে সহসা দেখা গেল একটা লাল আলো! দূর থেকে ক্রমশঃ আলোটা কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। চাঁদের বুকে কোথায় যেন আগুন জলছে!

অগ্নিরহস্য প্রাঞ্জল হওয়ার আগেই বার্বিকেন ধরে ফেললেন, প্রাজেকটাইল চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ছে না—চাঁদকে ঘিরে বৃত্তাকার পথে ছুটছে! তাই আগুনের কণাটা তীর্যক রেখায় দূর থেকে কাছে এসেছে।

এমন সময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন নিকল—"আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরি! চাঁদের পেটেও তা'হলে আগুন আছে! চাঁদ তাহলে একেবারেই মরে যায়নি!"

লাফিয়ে উঠলেন মাইকেল—"তা'হলে বাতাসও আছে। নইলে আগুন জলছে কি করে?"

বার্বিকেন এক কথায় তাঁর উৎসাহ নিভিয়ে দিলেন। বললেন—"আগ্নেয়-গিরির আগুন জলবার সময়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন বানিয়ে নেয়—অনেক সময়ে আগুন জলে সেই অক্সিজেনেই। নীচের আগুনের তেজ দেখে

মনে হচ্ছে নির্ভেজাল অক্সিজেনের যোগান আসছে ভেতরকার বস্তু থেকে। সুতরাং চাঁদে বাতাস আছে, চট করে সে সিদ্ধান্তে না আসাই ভাল।"

আচমকা অন্ধকারকে চমকে দিয়ে ইথারের মধ্যে আবির্ভূত হল একটা প্রকাণ্ড বস্তু। ঠিক যেন চাঁদ উঠল চাঁদের বুকে!

এ-চাঁদ জ্বলন্ত চাঁদ! কালো মহাকাশের পটভূমিকায় বস্তুটার আতীব্র-দ্যুতিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল অভিযাত্রীদের। শ্বেত আলোক বন্যায় ভেসে গেল প্রোজেকটাইলের অভ্যন্তর। ধবধবে সাদা আলোয় স্নাত বার্বিকেন, নিকল এবং মাইকেলকে দেখে মনে হল যেন শরীরী প্রেতচ্ছায়া।

"ইস! কী কদাকার দেখতে আমাদের!" সবিস্ময়ে বললেন মাইকেল।

"এ-রকম বীভৎস চাঁদ কখনো দেখিনি বাপু!"

"চাঁদ নয়, উল্কা," বললেন বার্বিকেন।

"মহাশূন্যে জ্বলন্ত উল্কা?"

"হ্যাঁ।"

জ্বলন্ত উল্কার আবির্ভাব ঘটল প্রায় ২০০ মাইল দূরে নীরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে। বার্বিকেন অনুমান করলেন, উল্কাপিণ্ডের ব্যাস কম করেও ২০০০ গজ। সেকেণ্ডে দেড় মাইল বেগে ছুটে আসছে···মিনিট কয়েকের মধ্যেই সংঘর্ষ লাগবে প্রোজেকটাইলের সঙ্গে। হু-হু করে কাছে আসছে আর ক্রমশঃ বৃহৎ আকার ধারণ করছে ভয়ংকর পিণ্ডটা!

পর্যটকদের মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁরা ভীরু নন, বিপদকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারেন হাসতে হাসতে, বুকের পাটা তাঁদের অত্যন্ত মজবুত; তা সত্ত্বেও অপরিসীম আতঙ্কে বোবা হয়ে গেলেন অকুতোভয় ত্রয়ী; নিথর, নিশ্চল হয়ে দেখতে লাগলেন আসছে·· আসছে···অগ্নিময় অতিকায় উল্কাপিণ্ড ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে···যেন ফার্নেসের গনগনে আগুনের দিকে সোজা ছুটে চলেছে তাঁদের প্রোজেকটাইল···বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তি-জ্ঞান দিয়েও উড়ন্ত যানের গতিপথ পাল্টানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই!

দুই হাতে সঙ্গী দুজনকে চেপে ধরেছিলেন বার্বিকেন। অর্ধনিমীলিত চোখে তিনজনে মূক আতঙ্কে চেয়েছিলেন শ্বেত উত্তাপে উত্তপ্ত অগ্নিময় গ্রহাণুর দিকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হলেও তখন নিষ্ক্রিয় হয়নি মস্তিষ্ক—তাই তিনজনেই উপলব্ধি করলেন—শেষে ভয়ংকরের জঠরেই শেষ হতে চলেছে তাঁদের অভিযান!

দু' মিনিট কাটল দু' দুটো শতাব্দীর মত। শ্বেত-গোলক প্রোজেকটাইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়রে এবার। আচমকা একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

বিস্ফোরিত হল শ্বেত-গোলক! কিন্তু কোনো শব্দ শোনা গেল না। বাতাস যেখানে নেই শব্দও সেখানেও থাকে না। শুধু দেখা গেল ফেটে চৌচির হয়ে গেল অগ্নি-গোলক।

• চীৎকার করে উঠলেন সকল! দৌড়ে গেলেন জানলার সামনে। সে কী দৃশ্য! কলম দিয়ে সে দৃশ্যকে বর্ণনা করা কি সম্ভব? রঙ তুলি দিয়ে অত্যাশ্চর্য সেই দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলা কি সম্ভব?

যেন একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ফেটে ছড়িয়ে গেল। হাজার হাজার আলোকময় অগ্নিকণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল আকাশে। বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন বর্ণের অগ্নিকণায় যেন বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেল দিক্‌বিদিকে। লাল, নীল, ধূসর, হলুদ রঙের রশ্মিতে ছেয়ে গেল ··হরেক রঙের আতসবাজীতে মহাকাশ ভরে গেল। অতিকায় ভয়ংকর গোলক আর রইল না—তার জায়গায় সহস্র অগ্নিপিণ্ড নিজেরাই এক-একটি গ্রহাণু হয়ে ধেয়ে গেল দিকে দিকে। সাদা মেঘের মত, সূচ্যগ্র তরবারির মত, মহাজাগতিক ধূলিকণার মত খণ্ড-বিখণ্ড অগ্নিস্রোত আচ্ছন্ন করে তুলল বহুদূর পর্যন্ত।

আগুনে, আগুনে সংঘর্ষও শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা টুকরো অগ্নিপিণ্ড সবেগে আছড়ে পড়ল প্রোজেকটাইলের ওপর। একটা জানলার কাঁচ ঈষৎ ফেটে গেল সাংঘাতিক সেই সংঘর্ষে। যেন অগুন্তি কামানের গোলার মধ্যে দিয়ে উড়ে চলল প্রোজেকটাইল। যে কোনো একটির সঙ্গে টক্কর লাগলেই ধ্বংস অনিবার্য।

ইথার প্লাবিত করে বুঝি শত বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। অতি তীব্র আলোকচ্ছটায় চন্দ্রপৃষ্ঠ উদ্ভাসিত হল। অভিভূত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন মাইকেল:

"অদৃশ্য চাঁদকে দেখা যাচ্ছে!"

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হয়েছিল সেই তীব্র দ্যুতি। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই পর্যটকেরা দেখে নিলেন চাঁদের রহস্যে ঘেরা উল্টো পিঠ। মানুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বসে দেখেনি চাঁদের এই অঞ্চল। দূর থেকে চকিতে দেখলেন সারিসারি চওড়াপটি, মেঘরাশি, পাহাড়ের শ্রেণী, জ্বালামুখ এবং আরো অনেক উন্নতশীর্ষ প্রাকৃতিক বিস্ময়। প্রান্তর নয়, প্রকৃত সমুদ্র···দূর বিস্তৃত সমুদ্রপৃষ্ঠে চোখ ধাঁধানো আলোর তাথৈ তাথৈ নাচের ম্যাজিক; সবশেষে দেখা গেল প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় বস্তুর মত মহাদেশ, তারাবাজীর আলোয় নিমেষের জন্যে উদ্ভাসিত গহন অরণ্য।

মুহূর্তের জন্যে যা দেখলেন, তা কি মরীচিকা? চোখের মায়া? পলকের

জন্যে অদৃশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠ দেখার পর চান্দ্র-মানব যে অলীক নয়—এ কথা বলা কি সম্ভব তিন ভ্যানপিটের পক্ষে? এক নিমেষে দেখা দৃশ্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে কী?

ধীরে ধীরে নিভে গেল তীব্র আলোকচ্ছটা। আগুনের টুকরোগুলো লক্ষ সর্পের মত বিসর্পিল ভঙ্গিমায় মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। ইথার জুড়ে ফের দেখা গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তারকারাজির টিমটিমে আলো আবার ফুটে উঠল কালো মহাকাশে। অদৃশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠ নতুন করে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘুটঘুটে আঁধারে।

১৫॥ দক্ষিণ গোলার্ধ

বড় ভয়ংকর বিপদের খপ্পর থেকে বেঁচে গেল প্রোজেকটাইল। অপ্রত্যাশিত এই ধরনের উৎপাত মহাশূন্যে বিরল নয়। অথচ উল্কাপিণ্ডের সাথে সংঘাতের কল্পনাও কারো মাথায় আসে নি। মহাকাশচারীদের পথের যম হল এই ছন্নছাড়া উল্কার দল।

সেজন্যে অবশ্য তিনজনের কোনো অভিযোগ নেই। উল্কাপিণ্ড বিস্ফোরিত হয়েছিল বলেই তো আলো ঝলসে উঠেছিল এবং হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চন্দ্রপৃষ্ঠ উদ্ভাসিত হয়েছিল বলেই তো মহাদেশ, সমুদ্র অরণ্য দেখা গিয়েছে! ক্ষণেকের জন্যে দেখা গেলেও এ-ভাগ্য ক'জন মানুষের বরাতে জোটে? একটা সমস্যার সমাধান অবশ্য এখনো হয়নি। সমুদ্র, অরণ্য যদি থাকে বায়ুমণ্ডলও কি আছে? চাঁদের এই অজ্ঞাত অঞ্চলে নিঃশ্বাস নেবার বাতাসও কি আছে?

এ-ঘটনা ঘটল বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে।

বিকেল পাঁচটায় ঠাণ্ডা মাংস আর রুটি পরিবেশন করলেন মাইকেল। খেতে-খেতেই জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন অভিযাত্রীরা।

পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে চাঁদের দক্ষিণ সীমানায় কতকগুলো কম্পমান আলোক-কণা দেখলেন নিকল। কুচকুচে কালোর পটভূমিকায় কতকগুলো তীব্র আলোকবিন্দু যেন এঁকাবেঁকা রেখায় সাজানো। চাঁদের প্রান্তদেশ এসে গেল!

না। উল্কা নয়। প্রখর দ্যুতিময় আলোকবিন্দুগুলো গতিশীল নয়, রঙিন নয়। এ-আলো আগ্নেয়গিরির আলোও নয়।

সোল্লাসে বললেন বার্বিকেন—"সূর্য!"

"সে-কী! সূর্য?" বললেন নিকল এবং মাইকেল।

"সূর্যের আলোয় চাঁদের দক্ষিণ দেশের পাহাড় পর্বত ঝলমল করছে। দক্ষিণ মেরুর কাছে এসে গিয়েছি আমরা।"

মাইকেল বললেন—"তা'হলে কি উত্তর মেরু ঘুরে দক্ষিণ মেরু এসে পড়লাম ?"

"হ্যাঁ।"

"অধিবৃত্ত আর পরাবৃত্তের আতঙ্ক উধাও হয়েছে বলুন ?"

"তা হয়েছে। আমরা এখন বদ্ধ বৃত্তে বন্দী।"

"মানে !"

"উপবৃত্ত। সোজা কথায়, চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছি ডিমের মত কক্ষপথে।"

"বলেন কী !"

"চাঁদের উপগ্রহ হয়ে গিয়েছে প্রোজেকটাইল।"

"চাঁদেরও চাঁদ !" সে কী উল্লাস মাইকেলের।

১৬॥ টাইকো

ভোর ছ'টার সময়ে দক্ষিণ মেরুর চল্লিশ মাইল ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রোজেকটাইল। ডিমের মত কক্ষপথ অব্যাহত রয়েছে। উত্তর মেরু থেকেও প্রোজেকটাইলের দূরত্ব ছিল চল্লিশ মাইল।

ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত ফের মুখ দেখা গিয়েছে সূর্যের। প্রখর সূর্যালোকে ভেসে যাচ্ছে প্রোজেকটাইলের অভ্যন্তর। তিনবার হুর-রে ধ্বনি দিয়ে সূর্যকে অভিনন্দন জানালেন অভিযাত্রীরা। আলোর সঙ্গে এল উত্তাপ। ধাতব আবরণ গরম হতেই উষ্ণ হল প্রকোষ্ঠ। বরফ গলে গেল, কাঁচ পরিষ্কার হয়ে গেল, গ্যাস নিভিয়ে দেওয়া হল।

চাঁদের দক্ষিণ অঞ্চল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দূরবীনের মধ্য দিয়ে—যেন ৮৫০ গজ তফাতে এগিয়ে এসেছে চন্দ্রপৃষ্ঠ। জানলার কাছে ঠায় বসে দু'চোখ ভরে চাঁদের চেহারা দেখতে লাগলেন অভিযাত্রীরা।

ডোরফেল পাহাড় আর লিবনিজ পাহাড় জলজ্বল করছে ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরে। খেয়াল-খুশীমত ছড়ানো ফাঁক-ফোকরে সাদা আস্তরণের দিকে তাকানো যাচ্ছে না—চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ মেরুর এই শুভ্র দ্যুতি নিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা অ্যাদ্দিন অনেক কথা কাটাকাটি করে এসেছেন। বার্বিকেন কিন্তু দেখেই চিনলেন সাদা আস্তরণটা কী।

"তুষার ! তুষার !" সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রেসিডেণ্ট।

"তুষার ?" নিকল তো অবাক।

"হ্যাঁ, নিকল, তুষার। ঐ জন্যেই তো রোদ্দুর ঠিক্‌রে যাচ্ছে। লাভা

জমে কঠিন হলে এমনি ভাবে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে পারত না।
তুষার থাকলে জল আছে, জল থাকলে চাঁদে বাতাসও আছে। খুব অল্প মাত্রায় থাকলেও, আছে! বাতাসের অস্তিত্ব আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

ধূ-ধূ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে উড়ে চলল প্রোজেকটাইল। জীবনের কোনো চিহ্ন নেই নীচে। উদ্ভিদ নেই, জীবও নিশ্চয় নেই—থাকলে দেখা যেত জনপদ, নয়তো ভগ্নস্তূপ। যে দিকে দু চোখ যায় কেবল আগ্নেয়শিলার স্তরে রোদ্দুরের চেকনাই। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিক। মৃত্যুর চিহ্ন সুস্পষ্ট চতুর্দিকে। মৃত্যু হয়েছে উপগ্রহের। এ-চাঁদ মৃত চাঁদ!

অনেকক্ষণ পরে দেখা গেল ২১,৩০০ ফুট উঁচু নিউটন পর্বত। নিউটনের সুগভীর জ্বালামুখ যেন সটান পাতাল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সূর্যের আলোও সেখানে পৌঁছোয় না। পৌরাণিকেরা ভয়ংকর এই গহ্বর দেখলে তৎক্ষণাৎ এর নাম দিতেন—"নরকের তোরণপথ"।

মিনিট কয়েক পরে দেখা গেল ক্লেভিয়াস পর্বতের প্রকাণ্ড জ্বালামুখ। বার্বিকেন বললেন—"পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিরা চাঁদের আগ্নেয়গিরিদের কাছে উইঢিপি বললেই চলে।"

"জ্বালামুখটা চওড়া কত?" শুধোলেন নিকল!

"১৫০ মাইল। কেউ বলেন ১০০, কারও মতে ৫।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন মাইকেল—"কল্পনা করুন দিকি জ্বালামুখগুলোর পেট থেকে লকলকিয়ে আগুন উঠছে, লাভা গড়াচ্ছে, পাথর ছিটকোচ্ছে, বজ্রনিনাদে চারিদিক কাঁপছে? আহা-রে! কত আশ্চর্য তারারাজির খেলা-ই না তখন দেখা গিয়েছিল! আর এখন? মরে গেছে! চাঁদ মরে গেছে!"

বার্বিকেন জবাব দিলেন না। চেয়ে রইলেন ক্লেভিয়াসের সানুদেশ থেকে বিস্তৃত মাইলের পর মাইল ব্যাপী প্রান্তরে শ'য়ে শ'য়ে নিভন্ত জ্বালামুখের দিকে।

এবার দেখা গেল চন্দ্রপৃষ্ঠের সব চাইতে ঝলমলে পাহাড়—টাইকো।

টাইকো! ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম অমর করে রেখেছে যে পাহাড়, বিখ্যাত সেই টাইকো-কে এবার দেখা গেল পায়ের নীচে।

নির্মেঘ আকাশে পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকালে টাইকো-কে চোখে পড়বে সকলেরই। চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে সব চাইতে উজ্জ্বল অঞ্চলটুকুই টাইকো। দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বিবিধ বিশেষণে টাইকো-কে ভূষিত করে ফেললেন মাইকেল!

টাইকো থেকে এত বেশী আলো ঠিকরোয় যে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে

পৃথিবীতে বসে দূরবীন ছাড়াই দেখা যায় তার চেহারা। এই থেকেই কল্পনা করা যায় মাত্র পঞ্চাশ মাইল উঁচু থেকে টাইকোর ভয়াবহ ঔজ্জ্বল্য!

পর্যটকদের চোখের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল নিমেষের মধ্যে। সে-কী তীব্রতা! খাঁটি ইথারের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলোর ধারা যেন অন্ধ করে দিল অভিযাত্রীদের। বাধ্য হয়ে দূরবীনের কাঁচে ভুষো লাগিয়ে কালো করে টাইকোর দিকে তাকালেন বার্বিকেন এবং তাঁর দুই সঙ্গী। নীরবে নিঃশব্দে বিমূঢ় বিস্ময়ে ওঁরা আহরণ করতে লাগলেন টাইকোর অনুপম সেই ঔজ্জ্বল্য।

অ্যারিস্টারকাস আর কোপারনিকাস পর্বতের মতই টাইকোর চারিদিকেও রশ্মিরেখার মত বিচ্ছুরিত হয়েছে তরঙ্গায়িত চন্দ্রপৃষ্ঠ। কিন্তু টাইকোর মত ভয়াল সুন্দর রূপ আর কারো নেই। আগ্নেয়গিরির প্রলয় রূপ যেন বিধৃত রয়েছে টাইকোর চারিদিকে বিক্ষুব্ধ জমির মধ্যে। পঞ্চাশ মাইল চওড়া জ্বালামুখটা রয়েছে ঠিক কেন্দ্রে। গোলাকার নয়—ডিম্বাকার।

একমাত্র পূর্ণিমার সময়ে টাইকোর পূর্ণরূপ বিকাশিত হয়। মিলিয়ে যায় ছায়ার মায়া, সাদায় সাদা হয়ে যায় সারা অঞ্চল। মাঝের জ্বালামুখকে কেন্দ্র করে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অগুন্তি ছোট-বড় আগ্নেয়গিরির অসংখ্য জ্বালামুখ-নিক্ষিপ্ত জমে যাওয়া লাভাস্রোত ক্রিস্টাল আকারে সহস্রধারায় প্রতিফলন করে সূর্যালোককে।

বিরাট সেই চত্বর যেমন নিরালা, তেমনি সুন্দর। প্রত্যেকটি জ্বালামুখের তলদেশ বিচিত্র শৈল-সাজে সজ্জিত। চান্দ্র-ভাস্কর্য যেন ষোলকলায় বিকশিত প্রকৃতির নিভৃত আলয়ে।

বন্য উদ্দাম বিরাট সেই প্রাঙ্গণে দশ-দশটা প্রাচীন রোম প্রতিষ্ঠা করা যেত অনায়াসে!

১৭ ॥ কঠিন সমস্যা

টাইকো পেরিয়ে এসেছে প্রোজেকটাইল।

বার্বিকেন, নিকল, মাইকেল তখনও বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে নীচের দিকে। কেন্দ্র থেকে যেন রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছে চারিদিকে। দিগন্ত জুড়ে রয়েছে এই অদ্ভুত রশ্মি।

প্রদীপ্ত রশ্মির রহস্য নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন বার্বিকেন। আলোকময় শিখাগুলোর কোনোটা চওড়ায় মাইল বারো, কোনোটা মাইল তিরিশেক। টাইকোর জ্বালামুখ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে উঁচু-নীচু রশ্মি রেখা। আলো ঠিকরে

আলছে প্রতিটি নিরালা থেকে। ঠিক যেন লাঙল চষা জমি। কিন্তু কি কারণে এই অদ্ভুত রশ্মিরেখার উৎপত্তি আজও সে রহস্যের কিনারা হয় নি। হার্সচেল অবশ্য বলেছিলেন, উত্তপ্ত লাভা দারুণ ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হওয়ায় অত উজ্জ্বল দেখায়। এ-ব্যাখ্যান অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মনে ধরে নি।

নিকল কিন্তু হার্সচেলের পক্ষে কথা বলতে গিয়েছিলেন। বার্বিকেন তখন বুঝিয়ে দিলেন, আগ্নেয়শিলা এরকম নিখুঁতভাবে অতদূর পর্যন্ত সাজানো থাকতেই পারে না। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে দিগন্তব্যাপী লাভাস্রোত সমান ছন্দে জ্যামিতিক নিয়মে জমি আশ্রয় করতে পারে না। সুতরাং রশ্মিরহস্য আজও রহস্যই রয়ে গিয়েছে।

মাইকেল বলে উঠলেন—"আরে দূর! মহাকাশ থেকে একটা মস্ত ধূমকেতু চাঁদের পিঠে লাফিয়ে পড়েছিল বলেই অমনি হয়েছে।"

হেসে ফেলে বার্বিকেন বললেন—"মাইকেল, কথাটা মন্দ বলে নি। তবে ধাক্কাটা চাঁদের ভেতর থেকেই এসেছে। তাই জমি কুঁচকে গেছে অমন ভাবে।"

কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল। চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে নিকল তর্ক আরম্ভ করলেন। বার্বিকেন বললেন—জীবন্ত-প্রাণী মাত্রই নড়াচড়া করে, কেমন?"

"তা আর বলতে।"

"কিন্তু মাত্র পাঁচশ গজ তফাৎ থেকে দেখেও চাঁদের পিঠে কোনো গতিশীলতা দেখিনি। এমনও হতে পারে, জীবজগৎ চাঁদের ভেতর সুড়ঙ্গ কেটে আশ্রয় নিয়েছে। সেক্ষেত্রে চান্দ্র-মানবদের হাতে গড়া সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ দেখা যেত চন্দ্রপৃষ্ঠে।"

মাইকেল আর্দা বলে উঠলেন—"তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক যে চাঁদে বাস করা যায় না!"

বার্বিকেন সিদ্ধান্তটা লিখে নিলেন তাঁর নোটবুকে; সেদিন ডিসেম্বরের ছ' তারিখ।

নিকল বললেন—"চাঁদে মানুষ থাকতে পারে কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক। চাঁদে কি আগে মানুষ ছিল?"

"আমার দিক থেকে বলতে পারি," বললেন বার্বিকেন, "চাঁদে এককালে আমাদের মতই সুসভ্য জীব ছিল। এখন তারা লোপ পেয়েছে!"

"চাঁদের বয়স কি তা'হলে পৃথিবীর চাইতে বেশী?" মাইকেল শুধোলেন।

"না, না," বললেন বার্বিকেন। চাঁদ আর পৃথিবী দুটোই প্রথম অবস্থায়

ছিল গ্যাসের পিণ্ড! আগে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়েছে চাঁদ, পরে পৃথিবী। চাঁদে তাই জীবন জেগেছে আগে, পৃথিবীতে পরে।"

নিকল বললেন—"কিন্তু যেখানে দিন অথবা রাত ৩৫৪ ঘণ্টা, সেখানে জীবন জাগতে পারে না।"

"পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলেও ছ'মাস দিন," বললেন মাইকেল।

"বাজে যুক্তি। মেরু-অঞ্চলে মানুষ থাকে না।"

"আমি কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলব," বললেন বার্বিকেন!

"যথা?"

"চাঁদে যখন জীবন ছিল, তখন দিন অথবা রাত ৩৫৪ ঘণ্টা লম্বা ছিল না।"

"কেন?"

"চাঁদের তখন মেঘ ছিল, বাতাস ছিল, কেন্দ্রে তরল পদার্থ ছিল। তখনকার চাঁদ এখনকার চাঁদের চেয়ে নিশ্চয় অন্য অবস্থায় ছিল। এখন চাঁদে বাতাস উধাও, মেঘ উধাও—মহাজাগতিক বিকিরণে ক্ষত-বিক্ষত চন্দ্রপৃষ্ঠ। চাঁদের অভ্যন্তরে তরল পদার্থও আর নেই। চাঁদের আবর্তন গতিবেগ ঘূর্ণন গতিবেগের সমানও ছিল না।"

"কেন সমান ছিল না?"

"সমান গতিবেগের উৎপত্তি হয়েছে পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে। পৃথিবী তখন তরলাবস্থায় ছিল বলেই চাঁদের এই দুটো গতিবেগ অসমান ছিল। কে জানে তরল পৃথিবীর আকর্ষণ অনেক বেশী ছিল বলেই চাঁদের ঘূর্ণন বেশ অন্যরকম ছিল কিনা?"

নিকল বললেন—"চাঁদ যে চিরকালই পৃথিবীর উপগ্রহ, এমন কথাও কি কেউ বলতে পারে?"

মাইকেল ভড়িঘড়ি বলে উঠলেন—"পৃথিবীর অনেক আগে থেকেই যে চাঁদের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথাই বা কে বলতে পারে?"

কল্পনার শেষ নেই। নিকল এবং মাইকেল দুরন্ত কল্পনার বাহনে চেপে কল্পলোকে পাড়ি দিতে চলেছেন দেখে বার্বিকেন তাঁদের রুখে দিলেন।

বললেন—"উদ্দাম কল্পনায় সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে কী? সোদ্দা কথা হল, ঘূর্ণনবেগ আর আবর্তনবেগ—এই দুটি গতিবেগ দু'রকম থাকার দরুণ পৃথিবীর মতই দিন এবং রাত ছিল চাঁদের বুকে। এ ছাড়াও, অন্যান্য পরিস্থিতিও জীবন-ধারণের অনুকূল ছিল।"

মাইকেল বললেন—"সেই জীবন এখন লোপ পেয়েছে চাঁদ থেকে?"

"হ্যাঁ। বহু লক্ষ শতাব্দী ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্র-মানব সভ্যতা টিঁকে ছিল

ততদিনই যতদিন পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। তারপর বায়ুমণ্ডল ফিকে হয়েছে, চন্দ্রপৃষ্ঠও জীবন-ধারণের অনুপযোগী হয়েছে—পৃথিবীও শীতল হলে একদিন তাই ঘটবে।"

"ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার জন্যেই কি চাঁদ থেকে জীবন মুছে গেল?"

"তা'ছাড়া আর কি। ভেতরের আগুন নিভে যেতে জলন্ত বস্তুগুলোও কঠিন হয়েছে কেন্দ্রের দিকে। ঠাণ্ডা হয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠ। আস্তে আস্তে জীব-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ লোপ পেয়েছে। ফিকে হয়ে এসেছে বায়ুমণ্ডল, খুব সম্ভব পৃথিবীর আকর্ষণে; তারপর উধাও হয়েছে বাতাস এবং উবে অদৃশ্য হয়েছে জল। তদ্দিনে চাঁদ থেকে প্রাণের সব চিহ্নই মুছে গিয়েছিল—নতুন করে প্রাণ সঞ্চারের প্রশ্নই আর ওঠে না। মরা উপগ্রহে পরিণত হল চাঁদ—আজ যা দেখছি, তাই—নিষ্প্রাণ দুনিয়া।"

"পৃথিবীর বরাতেও একই ঘটবে?"

"খুব সম্ভব।"

"কবে?"

"ভূত্বক যেদিন দারুণ শীতল হবে এবং প্রাণ ধারণের অনুপযোগী হবে।"

"হিসেব করে জানা গেছে কি দুর্ভাগ্যটা শুরু হবে কবে?"

"নিশ্চয়।"

"আপনি জানেন?"

"আলবৎ।"

"হে পণ্ডিত বন্ধু! তা'হলে তো ঝেড়ে কাশলেই হয়! উৎকণ্ঠায় মারা পড়লাম যে!" বললেন মাইকেল।

"একশ বছরে পৃথিবীর উত্তাপ কতটা কমে, আমরা তা জানি," প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন বার্বিকেন, "এই অনুপাতেই আঁক-জোক করে জানা গেছে চার লক্ষ বছর পরে পৃথিবী একেবারেই তাপহীন হবে—শূন্য তাপাংকে পৌঁছোবে!"

"চার লক্ষ বছর! হাঁফ ছাড়লেন মাইকেল—"আঃ! বাঁচালেন আমাকে! আমি তো ভেবেছিলাম আর মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর বাঁচব আমরা।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন বার্বিকেন এবং নিকল বন্ধুবরের অস্বস্তির কারণ শুনে। নিকল কিন্তু ছিনেজোঁকের মত ফের জিজ্ঞেস করলেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা।

"চাঁদে চান্দ্র-মানব ছিল কী?"

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু কঠিন তত্ত্বকথায় মশগুল থাকার সময়ে আর একটা কাণ্ড ঘটল।

চাঁদ থেকে দূরে সরে এল প্রোজেকটাইল। দ্রুতবেগে মহাশূন্যে ধাবিত প্রোজেকটাইলের জানলা থেকে দেখা গেল দ্রুত অপস্রিয়মান রেখাবহুল চন্দ্রপৃষ্ঠ ; পর্বতমালা পর্যবসিত হল কুহেলীপুঞ্জে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল অদ্ভুত, সুন্দর, ফ্যানটাস্টিক উপগ্রহ। অম্লান স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই রইল না।

১৮ ॥ অসম্ভবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

বিষাদনিমগ্ন চাহনি মেলে নীরবে ওঁরা চেয়ে রইলেন অপস্রিয়মান চাঁদের দিকে। চাঁদের বুকে তাঁরা নামতে পারেন নি। কিন্তু এখন আরো দূরে সরে যাচ্ছে চাঁদ। আর কোনোদিন প্রোজেকটাইল ফিরবে না পুরোনো উপগ্রহে। কারণ, প্রোজেকটাইলের তলদেশ এখন ঘুরে গিয়েছে পৃথিবীর দিকে।

কিন্তু তা কেন হবে ? বিস্মিত হলেন বার্বিকেন। উপবৃত্তের ডিম্বাকার কক্ষপথে থাকলে প্রোজেকটাইলের ভারী দিকটা চাঁদের দিকেই ফিরে থাকা উচিত। কিন্তু এরকম কেন হল ? ভারী দিকটা পৃথিবীর দিকে মুখ করল কেন ?

যে-পথ ধরে চাঁদে এসেছিল প্রোজেকটাইল, ফিরেও যাচ্ছে যেন সেই পথেই। উপবৃত্ত যদি হয়, বলতে হবে অতি দীর্ঘ উপবৃত্ত। পৃথিবীর টান যেখানে শুরু হয়েছে এবং চাঁদের টান যেখানে শেষ হয়েছে, উদাসীন সেই অঞ্চল পর্যন্ত হয়ত বিস্তৃত রয়েছে সুদীর্ঘ এই উপবৃত্ত।

মাইকেল আর্দা সব শুনে বললেন—"উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছোনোর পর কপালে কি আছে আমাদের ?"

"জানি না," জবাব দিলেন বার্বিকেন।

"না জানলেও অনুমান তো করা যায় ?"

"তা যায়। দুটো সম্ভাবনা আছে। প্রোজেকটাইলের গতিবেগ যথেষ্ট না হলে দুই আকর্ষণের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে অনন্তকাল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে—"

"অন্য সম্ভাবনাটা নিশ্চয় এর চাইতেও ভালো ?" বললেন মাইকেল।

"অথবা যথেষ্ট গতিবেগ থাকার দরুণ উপবৃত্তের কক্ষপথে অনন্তকাল চাঁদকে আবর্তন করবে প্রোজেকটাইল।"

"হায় রে ! কপালে শেষে এই ছিল ?"

জবাব দিলেন না বার্বিকেন এবং নিকল।

"কি হল ? জবাব দিচ্ছেন না কেন ?"

"জবাব নেই বলে," বললেন নিকল।

"লড়তে দোষ কী?"

"লড়বেন? অসম্ভবের সঙ্গে?" বললেন বার্বিকেন।

"কেন নয়? দুজন আমেরিকানের সঙ্গে একজন ফরাসি এক হলে অন্ততঃ এ-কথা বলা সাজে না।"

"কি করতে চান?"

"যে গতিবেগে চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, তাকে প্রশমিত করতে চাই।"

"প্রশমিত করতে চান?"

উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মাইকেল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি না পারি, গতিপথ এমন ভাবে পালটে দিতে চাই যাতে আমাদের সুবিধে হয়।"

"কিভাবে?"

"সেটা আপনার ব্যাপার। গোলন্দাজ যদি গোলাকে বাগে আনতে না পারে, গোলা-ই যদি গোলন্দাজকে কব্জায় এনে ফেলে, তাহলে সেই গোলন্দাজকে কামানের মধ্যে ঠুসে দেওয়া উচিত।"

"কিন্তু কিছুই করবার নেই, মাইকেল!" বললেন বার্বিকেন।

"প্রোজেকটাইলকে অন্য পথে চালাতে পারি না?"

"মোটেই না।"

"স্পীড কমাতে পারি না?"

"না।"

"তা'হলে এখন করবার মধ্যে একটা কাজই আছে দেখছি।"

"কী?"

"ব্রেকফাষ্ট খাওয়া।" বললেন মাইকেল এবং রাত দুটোর সময়ে প্রাতরাশ খাইয়ে দিলেন সঙ্গীদের।

মহাশূন্যের ভ্রাম্যমান প্রতিটি বস্তুর কক্ষপথ এক-একটি উপবৃত্ত। সুতরাং চাঁদকে প্রদক্ষিণরত প্রোজেকটাইলের কক্ষপথও উপবৃত্ত হবে না কেন? উপবৃত্তে যে থাকছে, তাকে ভেতর থেকে যে টেনে রেখেছে, সে নিজে কিন্তু থাকছে একপেশে অবস্থায়—ডিম্বাকৃতি উপবৃত্তের যে কোনো একটা লম্বাটে দিকে। প্রোজেকটাইল এখন চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার স্পীডও কমছে। কমতে কমতে হয়ত একেবারে শূন্য স্পীডে দাঁড়াবে উপবৃত্তের অন্য দিকে পৌঁছে। একবার ঘুরে এলেই আবার গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে চাঁদের দিকে এগোনোর সময়ে। বার্বিকেন মনে মনে ভাবছিলেন, চাঁদের ঠিক বিপরীত দিকে পৌঁছে প্রোজেকটাইল যখন প্রায় গতিশূন্য হবে, তখন কিছু করা যায় কিনা।

এমন সময়ে শোনা গেল মাইকেলের দারুণ চীৎকার—"উফ্! কী নিরেট বোকা আমরা!"

"তাতো বটেই। কিন্তু কেন?" শুধোলেন বার্বিকেন।

"স্পীড রুখে দেওয়ার সোজা উপায়কে কাজে লাগাচ্ছিনা বলে!"

"উপায়টা কি শুনি?"

"হাউইয়ের বিপরীত ধাক্কাকে কাজে লাগালেই ল্যাঠা চুকে যায়।"

"কিস্তিমাৎ!" বললেন নিকল।

"বেশ তো, ছোঁড়া যাবে'খন রকেটগুলো।" বললেন বার্বিকেন।

"কখন?" শুধোলেন মাইকেল।

"সময় এলেই ছুঁড়বো। এখন প্রোজেকটাইল যে ভাবে হেলে রয়েছে, হাউইয়ের পেছন-ধাক্কার ঠেলায় চাঁদ থেকে আরো দূরে সরে যেতে পারি। সুতরাং সবুর করা যাক। কারণ এখন প্রোজেকটাইলের নীচের দিকটা এখন পৃথিবীর দিকে ফিরে রয়েছে। আশা করছি উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছে গতিশূন্য হবে প্রোজেকটাইল, ছুঁচোলো মাথাটাও চাঁদের দিকে ফিরবে। তখন রকেট ছুঁড়ে পেছন-ধাক্কার উল্টো ঠেলায় ফের চাঁদের দিকে ছুটে যেতে পারি।"

"ব্র্যাভো!" সোল্লাসে বললেন মাইকেল। "উদাসীন অঞ্চল পেরিয়ে আসবার সময়ে আগেই সেটা করা উচিত ছিল আমাদের।"

"ঠিক বলেছেন," সায় দিলেন নিকল।

বার্বিকেন হিসেব করে দেখলেন, ডিসেম্বরের সাত তারিখে রাত একটায় উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছোবে প্রোজেকটাইল।

এই সময়ে নিকল প্রস্তাব করলেন—"একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। একটানা চল্লিশ ঘণ্টা জেগে আছি।"

"না" বললেন মাইকেল।

"আপনার খুশী। আমি কিন্তু এই ঘুমোলাম," বলে ডিভানে শুয়ে আটচল্লিশ-পাউণ্ড কামানের মত নাসিকা গর্জন শুরু করলেন নিকল।

"নিকল বুদ্ধিমান," বলে বার্বিকেনও লম্বা হলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুই সঙ্গীর বাস্তব বুদ্ধির নমুনা দেখে মাইকেল দ্বিরুক্তি করলেন না। তৎক্ষণাৎ লম্বমান হলেন এবং নিদ্রাদেবীর আরাধনা আরম্ভ করলেন।

সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল তিনজনের।

প্রোজেকটাইল তখনো চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শংকুর মত শীর্ষদেশ ক্রমশঃ হেলে পড়ছে চাঁদের দিকে। রহস্যজনক ব্যাপার। কিন্তু বার্বিকেন

দেখলেন, তিনি যা চাইছেন, তাই হতে চলেছে। রকেট ছোঁড়ার উপযোগী অবস্থায় পৌঁছোচ্ছে প্রোজেকটাইল।

আর মাত্র সতেরো ঘণ্টা। তারপর আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ছুটবে রকেট!

অসহ্য প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটল সারাটা দিন। রাত বারোটা বাজল। আর মাত্র একঘণ্টা! একঘণ্টা পরেই গতিশূন্য হবে কি প্রোজেকটাইল? বার্বিকেনের হিসেব মত ঠিক একটার সময়ে প্রোজেকটাইলের আর কোনো স্পীড থাকবে না। দেখা যাক কি হয়।

উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছোনো মানেই ওজনশূন্য হওয়া। সেখানে চাঁদের টান নেই। পৃথিবীরও টান নেই। আসবার সময়ে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে অভিযাত্রীদের। আবার শুরু হবে ভারহীন অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করতে হবে রকেট বাজীর খেলা!

প্রোজেকটাইলের মাথা আরো ঘুরে গেছে চাঁদের চাকতির দিকে। রকেট নিক্ষেপের উপযুক্ত মুহূর্তের আর দেরী নেই। প্রোজেকটাইলের গতিবেগও অনেক কমে এসেছে।

"একটা বাজতে পাঁচ মিনিট" বললেন নিকল।

গ্যাস বাতির কাছে দেশলাইয়ের কাঠি হাতে দাঁড়িয়ে মাইকেল বললেন—"সব তৈরী।"

"দাঁড়ান!" ক্রনোমিটার হাতে হাঁক দিলেন বার্বিকেন।

ভারহীন অবস্থা অনুভূত হল ঠিক সেই মুহূর্তে। উদাসীন অঞ্চল এসে গেছে। অকস্মাৎ ওজন হারিয়ে পালকের মত হাল্কা হয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা।

"একটা বাজল," বললেন বার্বিকেন।

রকেটের সলতেতে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিলেন মাইকেল। বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল না। জানালা দিয়ে দেখা গেল কেবল ধোঁয়ার সুদীর্ঘ রেখা। আগুন অবশ্য নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

স্পষ্ট বোঝা গেল, ধাক্কা খেয়েছে প্রোজেকটাইল!

উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে চেয়ে রইলেন তিনজনে—কথা বলতে ভুলে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে শুধোলেন মাইকেল—"আমরা কি চাঁদে নামছি?"

"না," জবাব দিলেন নিকল—"প্রোজেকটাইলের ভারী দিকটা এখনো চাঁদের দিকে ফেরেনি!"

ঠিক তখনি জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন বার্বিকেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, কপাল কুঞ্চিত, ঠোঁট দৃঢ় সংবদ্ধ।

বললেন—"আমরা পড়ছি।"

"বাঁচালেন!" বললেন মাইকেল—"চাঁদের ওপর?"

"না। পৃথিবীর ওপর!"

শুরু হয়েছে শূন্য হতে মর্তে পতন! যেটুকু গতিবেগ অবশিষ্ট ছিল, তাই নিয়েই উদাসীন অঞ্চল পেরিয়ে এসেছে প্রোজেকটাইল এবং রকেট ছুঁড়েও তাকে মোড় ঘোরানো যায় নি! শুরু হয়েছে ভয়ংকর পতন-পর্ব! ১,৬০,০০০ মাইল ওপর থেকে উল্কার মত খসে পড়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। যে স্পীড নিয়ে কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই স্পীড নিয়েই ভূতলে অবতীর্ণ হবে প্রোজেকটাইল—সেকেণ্ডে ১৬০০ গজ গতিবেগেই!

ঈশ্বরের নাম জপ করতে আরম্ভ করলেন বার্বিকেন এবং মাইকেল!

১৯॥ 'সাসকুইহানা' জাহাজ জল মাপছিল

"লেফটেন্যাণ্ট, জল মাপা হল?"

"স্যার, আমেরিকার উপকূল থেকে মাত্র ২০০ মাইল দূরে জল এত গভীর কে জানত?" বললেন লেফটেন্যাণ্ট ব্রন্সফিল্ড।

"তা ঠিক," সায় দিলেন ক্যাপ্টেন ব্লমসবেরী—"জল এখানে বেজায় গভীর। ডুবো উপত্যকা রয়েছে যে জলের তলায়। কদ্দুর মাপা হল?"

"৩,৫০৮ ফ্যাদম পর্যন্ত দড়ি ছেড়েছি। সীসের গুলুই এখনো তলায় পৌঁছোয়নি।"

এমন সময়ে সোরগোল উঠল জাহাজে। তলদেশে সীসের ওজন ঠেকেছে।

"কত গভীর?" শুধোলেন ক্যাপ্টেন।

"তিন হাজার ছশ সাতাশ ফ্যাদম!"

"আমি শুতে চললাম। দড়ি তোলা শেষ হলেই যেন জাহাজ রওনা হয়," বলে গট্‌গট্ করে কেবিনে ফিরে গেলেন ক্যাপ্টেন।

রাত তখন দশটা। তারিখটা এগারোই ডিসেম্বর। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা মাপছিল আমেরিকান নৌবহরের ৫০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন জাহাজ 'সাসকুইহানা'। আকাশ নির্মেঘ। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে দিক্‌-দিগন্ত।

চাঁদের চেহারা দেখে চন্দ্রাভিযান নিয়ে আলোচনা শুরু হল জাহাজের ডেকে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জনৈক অফিসার বললেন—"প্রোজেকটাইল ঠিকই

* এক ফ্যাদম ছয়ফুটের সমান।

পৌঁছে গেছে চাঁদে। আজ ১১ই ডিসেম্বর, ওঁদের পৌঁছোনোর কথা ৫ তারিখের মাঝরাতে।"

"পৌঁছেই চিঠি লেখা উচিত ছিল মিস্টার বার্বিকেনের," বললেন অন্যজন।

হাসির ফোয়ারা ছুটল এই কথায়। একজন বললেন—"ইচ্ছে করলে চাঁদে বসে চিঠি লেখা যেত। পৃথিবীতে বসে দূরবীন কষে সে-চিঠি পড়া যেত।"

"কিভাবে?"

"আরে বাবা, লর্ড পীক-য়ের পেল্লায় দূরবীন দিয়ে চাঁদের বুকে ন'ফুট লম্বা জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। দানবিক অক্ষর তো দেখা যাবেই! তিন ফ্যাদম লম্বা শব্দ আর তিন মাইল লম্বা বাক্য পৃথিবীতে বসেই চিঠি পড়া যেত!"

হাততালির শব্দে বাকি কথা ডুবে গেল। লেফটেন্যান্ট শুদ্ধ মানতে বাধ্য হলেন, আইডিয়াটা উড়িয়ে দেবার মত নয়।

কথায় কথায় রাত গভীর হল। রাত একটা নাগাদ দেখা গেল তখনো দড়ি তোলা শেষ হয়নি।

একটা সতেরো মিনিটে কেবিনে যাবেন বলে পা বাড়িয়েছেন লেফটেন্যান্ট, এমন সময়ে বহুদূর থেকে একটা হিস্-হিস শব্দ ভেসে এল তাঁর কানে! অদ্ভুত শব্দটা শুনলেন আরো অনেকে। প্রথমে ভেবেছিলেন বুঝি স্টিম বেরিয়ে যাচ্ছে কোথাও। পরক্ষণেই বুঝলেন, শব্দটা আসছে শূন্য হতে—দূর আকাশ থেকে ভেসে আসছে হিস্-হিস্-হিস্-হিস্ ধ্বনি। কথা বলার আগেই তীব্র হতে তীব্রতর হল সোঁ-সোঁ শব্দ। ভয়ংকর শব্দে যেন কানে তালা লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত চোখের সামনে আবির্ভূত হল একটা প্রকাণ্ড উল্কা। দুরন্তবেগে নামতে নামতে বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে দাউদাউ করে জ্বলছে বিপুলায়তন উল্কাটা, বিকট গর্জনে বুক পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছে।

চক্ষের নিমেষে আরো নেমে এল উল্কাপিণ্ড, বজ্রগর্জনে আছড়ে পড়ল জাহাজের সামনের দিকে এবং কর্ণবধিরকারী শব্দে গলুই চুরমার করে তলিয়ে গেল জলে।

আর কয়েকফুট সরে এলেই হয়েছিল আর কি! গোটা জাহাজটাই নিশ্চিহ্ন হত জলতলে!

অর্ধ-উলংগ অবস্থায় ডেকে দৌড়ে এলেন ক্যাপ্টেন—"কী হল? কী হল?"

"কম্যাণ্ডার, ওঁরা ফিরে এলেন!"

২০॥ ম্যাসটনের ডাক পড়ল

'ওঁরা' যে কারা, তার আর বুঝিয়ে বলতে হল না। জাহাজশুদ্ধ লোকে বুঝল গান-ক্লাবের প্রোজেকটাইল ফিরে এসেছে! কিন্তু অভিযাত্রীরা বেঁচে আছেন তো?

একজন বলল—"মরে ভূত হয়ে গেছেন!"

অপর জনে—"দূর! দিব্বি বেঁচে আছেন! জল এখানে বেশ গভীর। তলিয়ে গেছে গোলাটা – কিছু ক্ষতি হয় নি।"

তৃতীয় জন বলল—আরে, বাতাস থাকলে তো বেঁচে থাকবেন? নিশ্চয় অ্যাদ্দিনে বাতাস ফুরিয়ে গিয়েছে।"

সবাই মিলে তখন হৈ-চৈ করে উঠল--"কি এসে যায় তাতে? মৃত অথবা জীবিত, যে অবস্থাতেই হোক তাঁদের জল থেকে তুলতে হবে।"

কিন্তু অত বড় একটা গোলাকে জল থেকে তোলার মত ডুবুরী আর সরঞ্জাম তো জাহাজে নেই। কাজেই সবচেয়ে কাছের বন্দরে ফিরে চলল সাসকুইহানা। জায়গাটা যাতে হারিয়ে না যায় তাই জল মাপার যে-দড়ি এখনো জলের তলায় ডুবেছিল তার ওপরের প্রান্তটা একটা বয়া ভাসিয়ে তাতে বেঁধে দেওয়া হল।

পুরোদমে জাহাজ চালিয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা পরে সাড়ে চারশ মাইল পথ পেরিয়ে রাত একটা সাতাশ মিনিটে ভাঙা জাহাজটা ঢুকল সানফ্রান্সিসকো উপসাগরে।

দেখতে দেখতে জেটিতে লোক দাঁড়িয়ে গেল ভাঙা জাহাজ দেখতে! তীরে নেমে ভীড় ঠেলে টেলিগ্রাম অফিসে দৌড়োলেন ব্লমসবেরী এবং ব্রন্সফিল্ড। চারটে টেলিগ্রাম চলে গেল নৌদপ্তরের সেক্রেটারী, গান-ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ম্যাসটন এবং কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের সহ-পরিচালকের কাছে।

টেলিগ্রামটা এই:

"২০°৭´ উত্তরে এবং ৪১°৩৭´ পশ্চিমে ১১ই ডিসেম্বর রাত একটা সতেরো মিনিটে কোলাম্বিয়াডের প্রোজেকটাইল প্রশান্ত মহাসাগরে নেমেছে। নির্দেশ পাঠান।"

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই গোটা সানফ্রানসিসকোয় খবর ছড়িয়ে গেল। তারপর দাবানলের মত বিস্ময়কর সংবাদটা চমকে দিল সারা পৃথিবীকে।

পাহাড়ের চূড়োয় বিশাল দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসেছিলেন ম্যাসটন।

টেলিগ্রাম পেয়েই এমন লাফিয়ে উঠলেন যে ২৮০ ফুট গভীর চোঙা দিয়ে তলিয়ে গেলেন নীচে! কপাল ভাল, তাই হাতের হুক লোহার খোঁচে আটকে গিয়ে তিনি ঝুলতে লাগলেন শূন্যে এবং অতিকষ্টে তাঁকে তুলে আনা হল চোঙার ভেতর থেকে।

সোরগোল পড়ে গেল কেম্বিজ মানমন্দিরে। তাঁরা জানতেন, প্রোজেকটাইল চাঁদের উপগ্রহ হয়ে গিয়েছে। ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখে দেখা গিয়েছিল গোলাকে চাঁদের ওপিঠে অদৃশ্য হতে। তারপর থেকেই তাকে আর দেখা যায়নি।

সুতরাং তুমুল কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেল উল্কাপিণ্ডের স্বরূপ নিয়ে। লঙ পীক মানমন্দিরের চন্দ্রবিদরা বললেন—"আরে দূর! অত জোরে যে উল্কা জলে তলিয়েছে, তাকে চেনা কি সম্ভব? আন্দাজে বললেই হল গান-ক্লাবের প্রোজেকটাইল?" গান-ক্লাবের সদস্যরা কিন্তু বললেন—"কেন নয়? দূরবীন দিয়ে পাঁচ তারিখের পর থেকে তো প্রোজেকটাইলকে আর দেখা যায়নি?"

তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে গান-ক্লাবের মোড়লেরা ছুটে এলেন জাহাজ ঘাটায়। হাতের হুক নাড়তে নাড়তে এলেন ম্যাসটনও।

বললেন ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠে—"চটপট চলুন! প্রোজেকটাইলকে উদ্ধার করতেই হবে!"

২১॥ সমুদ্র এবং প্রোজেকটাইল

"জলদি চলুন! জলদি চলুন!" হাঁক-পাক করতে লাগলেন ম্যাসটন। "খাবার-দাবারের অভাব হবে না ওঁদের—ফুরিয়ে যাবে কেবল বাতাস। দম আটকে মরবার আগেই উদ্ধার করতে হবে অভিযাত্রীদের।"

কিন্তু উদ্ধার করার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বানাতে হবে তো! শুধু আঁকশি আটকে জলের তলা থেকে প্রোজেকটাইল তোলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। প্রোজেকটাইলের গা এমন তেলতেলে মসৃণ যে আঁকশি আটকাবে কোথায়?

সুতরাং ইঞ্জিনীয়ার মার্চিসন দৌড়োলেন সানফ্রান্সিসকো। অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিলেন বিশেষ ধরনের অটোমেটিক আঁকশি। একবার প্রোজেকটাইলকে ধরতে পারলে আর চিন্তা নেই। আপনা থেকেই শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরবে গোলাকে।

ডুবুরীর পোশাকও বানিয়ে নেওয়া হল অর্ডার দিয়ে। সমুদ্রতলে নেমে যদি খুঁজতে হয়, এ-পোশাক না হলেই নয়।

ম্যার্চিসনের কপাল ভালো। তৈরী অবস্থায় একটা ডাইভিং বেল-ও পেয়ে গেলেন। অভিনব এই ডুবো-কামরার বিভিন্ন খুপরিতে খুশীমত জল ঢুকিয়ে যতদূর খুশী নেমে যাওয়া যাবে। প্রয়োজন মত ঘনীভূত বাতাস ঢুকিয়ে সেই জলকে ঠেলা মেরে বার করেও দেওয়া যাবে।

সাগরতলে ডুব দেওয়ার প্রস্তুতি পর্বে কোনো ত্রুটি রাখা হল না। কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে না তো? জীবন্ত অবস্থায় অভিযাত্রীদের উদ্ধার করা যাবে কী? অত উঁচু থেকে ঐরকম সাংঘাতিক বেগে জল আছড়ে পড়ার পরেও যদি আস্ত থাকে প্রোজেকটাইল, ২০,০০০ ফুট নীচে গিয়ে প্রচণ্ড জলের চাপে কি তা আস্ত থাকবে?

সারা পৃথিবী উদ্বিগ্ন হয়ে রইল অভিযাত্রীদের ভাগ্য নিয়ে। একুশে ডিসেম্বর রাত আটটায় জাহাজে চেপে রওনা হলেন ম্যাসটন, মার্চিসন এবং গান-ক্লাবের প্রতিনিধিরা। ডেকে তোলা হল ডাইভিং-বেল নামক ডুবো-প্রকোষ্ঠ, সমুদ্রতল পর্যন্ত পৌঁছোনোর উপযুক্ত লম্বা লোহার শেকল—এই শেকলে বেঁধেই কপিকলে করে ডুবো-প্রকোষ্ঠ আর ডুবুরীর পোশাক নামিয়ে দেওয়া হবে জলে।

জাহাজের লোকজন কিন্তু নিরাশ হয়ে পড়েছিল। চার মাইল জলের নীচে বন্দী ধাতুর কারাগারে ওঁরা বেঁচে আছেন তো?

তেইশ তারিখে সকাল আটটায় পৌঁছোলো জাহাজ।

বারোটা সাতচল্লিশে বয়ার কাছে হাজির হল জাহাজ।

একটা পঁচিশ মিনিটে ডাইভিং-বেল ডুব দিল জলে। ভেতরে রইলেন মার্চিসন, ম্যাসটন এবং ব্লমসবেরী। সমুদ্রতলে পৌঁছে কিন্তু সামুদ্রিক গুল্ম আর বালির প্রান্তর ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। লণ্ঠনের আলো রিফ্লেকটর দিয়ে আরো জোরালো করে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন ম্যাসটন—কিন্তু পাওয়া গেল না প্রোজেকটাইলকে।

ডুবুরি-গোলককে সমুদ্রতলের কয়েক গজ ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল জাহাজ। মাইলের পর মাইল এমনিভাবে খুঁজলেন ম্যাসটন—কিন্তু বৃথাই। সন্ধ্যে নাগাদ ডুবুরি-গোলককে টেনে তোলা শুরু হল—রাত বারোটায় ডেকে উঠে এল ডুবো-কামরা।

চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশে ডিসেম্বর—ডুবুরি-গোলকে বসে সমুদ্রতলে অভিযান চালালেন গান-ক্লাবের সদস্যরা—প্রতিবারেই উঠে এলেন রিক্ত হস্তে।

আটাশ তারিখে মনে মনে ভেঙে পড়লেন সবাই। বৃথা চেষ্টা! পতনের প্রচণ্ড সংঘাতে নিশ্চয় অণু-পরমাণু হয়ে হারিয়ে গিয়েছে গোলাটা।

ম্যাসটন একা হাল ছাড়লেন না।

উনত্রিশ তারিখে জাহাজ ফিরে চলল সানফ্রান্সিসকোর দিকে। দশটার সময়ে হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল একজন নাবিকের।

"বয়া ভাসছে!"

সত্যিই তো! নদীর মোহানায় যে-রকম বয়া ভাসতে দেখা যায়, অবিকল সেই রকম একটা বয়া ভাসছে সমুদ্রের জলে। শঙ্কুর মত চূড়োর ওপর পত পত করে উড়ছে একটা নিশান। জল থেকে পতাকার উচ্চতা পাঁচ ছ'ফুটের মত। বয়ার আবরণ যেন রূপোলী চাদরে মোড়া—তাই রোদ্দুরে চকচক করছে।

ঢেউয়ের মাথায় উঠছে আর নামছে ঝকঝকে বয়া। রেলিংয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন গান-ক্লাবের সদস্যেরা। উদ্বেগে উত্তেজনায় আবেগে কাঁপছেন প্রত্যেকেই। অথচ মনের চিন্তা মুখে প্রকাশ করতে পারছেন না।

নিশানটা আমেরিকার!

আচমকা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল ডেকের ওপর। ম্যাসটন চেঁচাচ্ছেন। শুধু চেঁচাননি। নিজের মাথার খুলিটা যে গাটাপার্চা দিয়ে তৈরী, তা বেমালুম ভুলে গিয়ে ডানহাতের আঁকশি দিয়ে দড়াম করে মাথায় ঘুষি মেরেছেন।

ব্রেন-বক্সের ওপর অমন চোট পড়লে কেউ স্থির থাকতে পারে? ম্যাসটন গড়াচ্ছেন ডেকের ওপর।

কী হল? কী ব্যাপার? হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে গেলেন সকলে। ম্যাসটনকে ধরাধরি করে খাড়া করতেই তুবড়ির মত গালি-গালাজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে :

"উফ্! কী জানোয়ার! কী বোকা! কী গাধা আমরা!"

"কেন? কেন? কেন?" শুধোলেন সবাই।

"উজবুক! আহাম্মক! প্রোজেকটাইলটার ওজন কত? ১৯,২৫০ পাউণ্ড, তাই তো?"

"তা তো বটেই!"

"খোলটা তো ফোঁপরা। যে পরিমাণ জল হটিয়েছে, তারই ওজন ৫৬,০০০ পাউণ্ড। সুতরাং কি হবে? না, প্রোজেকটাইল জলে ভাসবে!"

আশ্চর্য! জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঠাসা পণ্ডিতদের মগজে এই সহজ কথাটাই এতদিন আসে নি? জলের নীচে না খুঁজে উচিত ছিল জলের ওপরে গোলকে খোঁজা! উঁচু থেকে পড়ার দরুণ তলিয়ে গিয়েও প্রোজেকটাইল জলের ওপরেই তো ভেসে উঠবে! ফাঁপা গোলক কি জলে ডুবে থাকতে পারে?

নৌকো নামান হল। সঙ্গীদের নিয়ে ম্যাসটন উঠে বসলেন। গোলার কাছে গিয়ে কি অবস্থায় অভিযাত্রীদের দেখবেন, তা কেউ জানেন না। কারও

মুখে কথা নেই। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যাচ্ছে না। চোখও ঝাপসা হয়ে আসছে।

দেখা গেল, প্রোজেক্টাইলের একটা জানলার কাঁচ ভেঙে ফেলা হয়েছে। জল থেকে জানালার উচ্চতা মোটে পাঁচ ফুট।

নৌকো গিয়ে ভিড়ল তলায়। ভাঙা জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন ম্যাস্টন। ঠিক সেই সময়ে আনন্দোচ্ছ্বল কণ্ঠস্বর ভেসে এল ভেতর থেকে। গলাটা ফূর্তিবাজ মাইকেল আর্দার:

"কিস্তিমাৎ, বার্বিকেন, কিস্তিমাৎ!

ডোমিনো খেলছেন বার্বিকেন, মাইকেল আর্দা এবং নিকল!

২২॥ সমাপ্তি

রাতারাতি অধি-দেবতার পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন বার্বিকেন, নিকল এবং মাইকেল আর্দা। বাল্টিমোরে ফিরে আসার পর তুমুল অভিনন্দন জানানো হল তাঁদের। বার্বিকেনের ডাইরী বিপুল মূল্যে কিনে নিল 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' নামক সংবাদপত্র এবং 'চন্দ্রাভিযান' উপাখ্যান ছাপা হতে না হতেই কাগজের কাটতি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল পঞ্চাশ লক্ষ কপিতে।

চাঁদ সম্বন্ধে এতদিন চন্দ্রবিদেরা যা জানতেন, নস্যাৎ হয়ে গেল 'চন্দ্রাভিযান' কাহিনী প্রকাশ পাওয়ার পর। মাত্র পঁচিশ মাইল ওপর থেকে তাঁরা স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তা উড়িয়ে দেওয়ার সাহস কারোরই হল না। প্লুটোর অতলস্পর্শী খাদ আর টাইকো পাহাড়ের আশ্চর্য বর্ণনা নিয়ে তর্ক করার দুঃসাহস কারো হল না। মানুষ কোনোদিন চাঁদের উল্টোপিঠ দেখেনি। কিন্তু অভিযাত্রী সেদিকে গিয়েছেন এবং দৈবযোগে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দেখেছেন অদৃষ্টপূর্ব সেই দৃশ্য!

গান-ক্লাব থেকে তিন অভিযাত্রীকে ভোজসভায় আপ্যায়ন করার আয়োজন করা হল অভিনব উপায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের সবকটা রেলপথ জুড়ে দেওয়া হল সাময়িক রেলরাস্তা দিয়ে। সবকটা প্ল্যাটফর্মে উড়তে লাগল একই নিশান। টেবিল পাতা হল প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে। ইলেকট্রিক ঘড়ির সময় অনুসারে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। অমুক সময়ে অমুক প্ল্যাটফর্মে যেন জনগণ ভোজ খেতে আসেন।

জানুয়ারী মাসের ৫ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত, চারদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রেলপথে রেল যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হল—শুধু একটি ছাড়া। একটি মাত্র

ইঞ্জিন পুরোদমে এই চারদিন বিজয়-গৌরবে ছুটে বেড়ালো যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। প্রতিটি প্ল্যাটফর্ম নির্দিষ্ট সময়ে ছুঁয়ে গেল ইঞ্জিনটা—ঠিক সেই সময়ে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা ভোজসভার টেবিলে বসে তুমুল হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানালেন বার্বিকেন, নিকল, মাইকেল এবং ম্যাসটনকে।

কিন্তু অভাবনীয় এই অভিযানের পরিণতি কী? এই কি শেষ? না, দুঃসাহসিক এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরকালেও অভিযাত্রীরা ছুটে যাবেন সৌরজগতের দিকে দিকে? বিজয় কেতন উড়বে অন্য গ্রহে, অন্য নক্ষত্রে?

আগামী যুগে আমেরিকানরা প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের প্রচেষ্টাকে যদি কাজে লাগান, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

মহাকাশ সম্পর্কিত পরিশিষ্ট : ২য় খণ্ড : রাউণ্ড দি মুন

(ব্রিটিশ আন্তর্গ্রহ সমিতির সদস্য আই. ও. ইভান্সের মতামত—১৯৫৮)

পরিচ্ছেদ—১

বাস্তবক্ষেত্রে, 'ভয়ংকর ধাক্কা'র সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর ইতি হয়ে যাওয়া উচিত। কেন না, মহাকাশ-অভিযাত্রী শুধু চিঁড়ে-চ্যাপ্টাই হবেন না, বায়ুমণ্ডলের প্রচণ্ড ঘর্ষণে প্রোজেকটাইল সমেত ধোঁয়া হয়ে যাবেন।

পরিচ্ছেদ—২

বলাবাহুল্য, 'দ্বিতীয় চাঁদে'র কোনো অস্তিত্বই নেই! প্লুটোর আবিষ্কার ডক্টর ক্লাইড টমবাগ সম্প্রতি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলেন কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো উপগ্রহের সন্ধান পান নি।

পরিচ্ছেদ—৩

পরবর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী চাঁদে যদিও বা কোনো বায়ুমণ্ডল থাকে, তা এত পাতলা যে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী নয়। চাঁদে জলও নেই।

পরিচ্ছেদ—৪

মূল কাহিনীতে একটা বিরাট অংক আছে। তাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা (বাস্তব-জীবনে ভের্ণের

টেকনিক্যাল উপদেষ্টা) বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে প্রোজেকটাইল খানিকটা গতি হারাবে।

পরিচ্ছেদ—৫

চান্দ্র-মানবদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে ভের্ণ যা কল্পনা করেছেন,—তা যেন লাপ্লেস-য়ের 'নেবুলার হাইপোথিসিস' থেকে ধার নেওয়া। সিদ্ধান্তটা যুক্তিবিহীন। চাঁদ আয়তনে ছোট, তাই ঠাণ্ডা হয়েছে পৃথিবীর আগে—শুধু এই অর্থেই চাঁদ পৃথিবীর বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠ যখন বসবাসের উপযোগী হল, তখন সেখানে প্রাণের যে বিবর্তন দেখা দিল, তা পৃথিবীর জীব-বিবর্তনের সমান হবে—এ কল্পনা অর্থহীন।

পরিচ্ছেদ—৬

উদাসীন অঞ্চলে প্রোজেকটাইল কোনো অবস্থাতেই গতি হারিয়ে স্থির হয়ে থাকবে না। উদাসীন অঞ্চল টপকে যাওয়ার মত স্পীড যদি না থাকে, পৃথিবীর দিকেই ফের নেমে আসবে প্রোজেকটাইল। কারণ খুবই সোজা—পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে হচ্ছে বলেই প্রোজেকটাইলের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে চাঁদ। আর একটা অসম্ভব সম্ভাবনা আছে; কৃত্রিম উপগ্রহের মত পৃথিবীকে আবর্তন করবে প্রোজেকটাইল।

ভারহীন অবস্থা যে শুধু উদাসীন অঞ্চলে অনুভূত হবে তা নয়; যাত্রাপথের আগাগোড়া এই অবস্থায় কাটবে।

তলদেশ ভারী হওয়ার জন্যে প্রোজেকটাইলের অবস্থান পরিবর্তিত হবে না; রাইফেল থেকে বুলেট যেমন ভাবে ঘূর্ণন বেগ নিয়ে বেরিয়ে আসে, সেইভাবে প্রোজেকটাইলকেও ঈষৎ ঘুরিয়ে না দিলে ডণ্টে-পাল্টে ডিগবাজী খেতে খেতে ছুটবে গোলাটা। যাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ থাকবে না।

মহাশূন্যে ধেয়ে যাওয়ার সময়ে মদকে ঢালা যাবে না। কেননা, মদেরও তো ওজন থাকছে না। ঢালতে গেলেই কুয়াশার মত স্প্রে আকারে ছড়িয়ে পড়বে। তাই নল লাগিয়ে চুষে খেতে হবে!

পরিচ্ছেদ—১১

চাঁদের কাছাকাছি হওয়ার দরুণ বা নিজস্ব গতিবেগের দরুণ প্রোজেকটাইলের কাৎ হওয়া অবস্থার হেরফের ঘটবে না।

হিসেব করে দেখা গেছে, উল্কার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, তার মাধ্যাকর্ষণ প্রোজেকটাইলের চাঁদে যাওয়া আটকাতে পারত না।

পরিচ্ছেদ—১৮

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রোজেকটাইল হয় চাঁদের নয় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে; অথবা পৃথিবীতেই নেমে আসবে। কিন্তু কোনক্রমেই 'দুই আকর্ষণের টানা-হ্যাঁচড়ায়' অনন্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

পরিচ্ছেদ—১৯

প্রোজেকটাইল জলে পড়ার দরুণ যে ঢেউ উঠবে, তাতে ভেসে না গেলেও জাহাজ তলিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

সমাপ্ত